আল-কুর'আন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৩

কুরআন, মহাবিশ্ব মূলতত্ত্ব
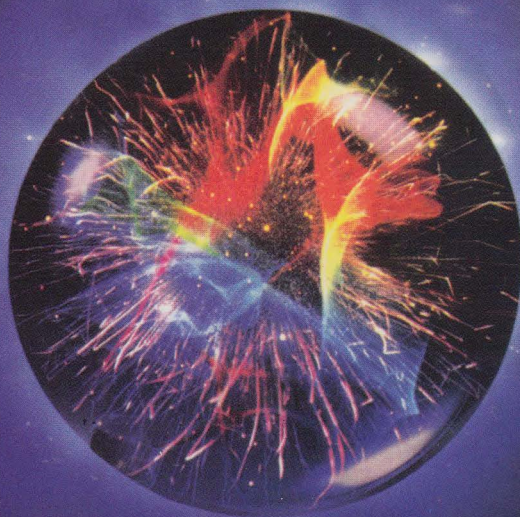
মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড.এস.এম. আজহারুল ইসলাম

'অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে আর নয় কোন অজুহাত, মহান স্রষ্টা 'আল্লাহকে দেখার এসেছে নতুন প্রভাত'।

যা দেখিনা, তা বিশ্বাস করিনা, সমাজের অনেকের এই প্রিয় উক্তিকে বর্তমান বিজ্ঞান বাস্তবতায় বিশাল অঙ্গনে প্রমাণ করেছে 'মস্তবড় অজ্ঞ ও বোকা মানুষের প্রলাপ' হিসেবে। কেননা আমাদের এই মহাবিশ্বে প্রায় ৯৭% বস্তু-ই অদৃশ্য বস্তু (Dark matter), অথচ বাস্তবে আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। এখন যদি তা অদৃশ্য থাকার পরও অস্বীকার করা না যায়, তাহলে অদৃশ্য প্রভু আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে কোন যুক্তিতে? বক্ষমান **'সিরিজ-৩'** এ বিষয়ে বিস্তারিত 'তথ্য ও ছবি' মেলে ধরেছে সৃষ্টির সেরা মানব সমাজের প্রসারিত জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মুখে।

- আপনি কি বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষিত নতুন আলোতে মহাবিশ্বের অদৃশ্য প্রভু আল্লাহকে দেখতে আগ্রহী? তাহলে বইটি একবার পড়ে দেখুন।
- আপনি কি নিজ 'ঈমান' বহুগুনে বৃদ্ধি করতে চান? তাহলে বইটি পড়ে দেখুন না।
- আপনি কি 'সত্য ও মিথ্যা'র মধ্যে পরখ করতে চান? তবে বইটি আপনারই প্রয়োজন বেশি।
- আপনি কি মহাকাশ বিজ্ঞান বুঝতে চান? তাহলে বইটি একবার পড়ে দেখতে পারেন।
- আপনি কি আগামী দিনে সোনালী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে রাজপথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলা যুবক? তাহলে বইটি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করতে পারে।

কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব
The Quran, The Universe & the ORIGIN

"আল্লাহ্-ই ঊর্ধ্বদেশে (মহাশূন্যে) আকাশমণ্ডলী (মহাবিশ্ব) স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত (ভাসমান অবস্থায়), তোমরা (বর্তমানেও) ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি 'আর্শের (নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের) নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্থিরকৃত সময়) পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।" (আল-কুরআন ১৩ : ২)

আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৩

(প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক)

মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব
মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন
পরিচালক
দ্যা ডিভাইন লাইট রিসার্চ সেন্টার
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ISBN 984-873-001-1

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
র‍্যাক্‌স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

প্রচ্ছদ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা

কম্পোজ
ফেয়ার ওয়েভ
১৩ জি.এ. ভবন,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ ৩২০.০০ টাকা মাত্র
$ 6.00

মুদ্রণে
নয়নমনি প্রিন্টার্স
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম

RAQS Publications Series-06

AL-QURAN THE TRUE SCIENCE SERIES-3

THE QURAN, THE UNIVERSE & THE ORIGIN

(Scientific findings confirmed)
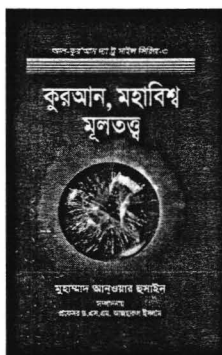
MOHAMMAD ANWAR HUSSAIN

Edited by :
Dr. S. M. Azharul Islam
Professor, Physics Department
Jahangirnagar University
Dhaka, Bangladesh.

উৎসর্গ

'আমার শ্রদ্ধেয় জননী– যিনি আমার সার্বিক কল্যাণ কামনা করেছেন, সেই অকৃত্রিম ও অতুলনীয় দরদী মাতা'র ইহজাগতিক সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায়ু এবং পরকালীন অফুরন্ত কল্যাণময়, সুখকর জান্নাতি জীবন কামনা করে মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে আমার এই নগণ্য সাধনাকে উৎসর্গ করছি।'

প্রকাশকের নিবেদন

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি করুণা করে 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৩' কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে আমাদের সুপ্রিয় পাঠককুলের হাতে পৌঁছাবার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা অবনত শিরে ফরিয়াদ করছি যেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এই মহৎ কাজে নিয়োজিত রাখেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোহ্‌ফা হিসেবে তা কবুল করেন।

আমরা খুবই আনন্দিত হচ্ছি এই জন্যে যে, সুধী পাঠক সমাজ সিরিজ-১, ও সিরিজ-২-এর প্রতি অবিশ্বাস্য আগ্রহ দেখিয়েছেন, সেই আগ্রহ অটুট থাকাবস্থায়ই সিরিজ-৩ও তাদের সম্মুখে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আশান্বিত যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য অনুরূপভাবে অবিরত বর্ষিত হতে থাকে এবং সম্মানিত পাঠকবৃন্দ প্রকৃত সত্য বিষয়কে জানার জন্য তাদের আগ্রহকে বর্তমানের ন্যায় প্রয়োজনে ধরে রাখেন, তাহলে অল্প-অল্প করে সিঞ্চনের মাধ্যমে বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের অনেক দৃশ্য-অদৃশ্য তথ্যই সঠিকভাবে প্রমাণভিত্তিক অবহিত হয়ে আমরা সবাই প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবো, ইন্‌শাআল্লাহ্।

বক্ষমান 'সিরিজ-৩' একমাত্র প্রভু 'আল্লাহ্' সম্পর্কে মানব সমাজের কাল্পনিক, মনগড়া ও অজ্ঞতা প্রসূত সকল প্রকার ধ্যান-ধারণা, কল্প-কাহিনী, চিত্র, কাঠামো ও আকৃতি সব ধূলিস্যাত করে দিয়েছে। না দেখার অজুহাতে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার জ্ঞানীদের চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রবণতা, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম কণিকাদের বিশাল কর্মকাণ্ডের সচিত্র প্রতিবেদনের সম্মুখে বুদ্-বুদের মত চিরতরে মিলিয়ে গেছে। সাথে সাথে অযৌক্তিকভাবে 'Big Bang'-কে মহাবিশ্বের প্রথম শুরু হিসেবে আখ্যায়িত

করে তার পূর্বের কর্মকাণ্ডকে স্বীকার না করে প্রকারান্তরে আল্লাহ্'কে প্রতারণার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখার এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীর হঠকারিতামূলক ষড়যন্ত্রও নাস্তা-নাবুদ হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে মহাবিশ্বের প্রকৃত 'মূলতত্ত্ব' কুরআন ও বিজ্ঞানের নতুন আলোতে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর পরিকল্পনায় তৈরি সমগ্র মহাবিশ্বের তথ্য বাস্তবভাবে আগমন করেছে।

সুতরাং আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) থেকে সকল প্রকার স্থায়ী পদার্থের পরমাণু (stable stom) পর্যন্ত যে বিশাল মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য জগত ও তার ব্যবস্থাপনার ওপর দৃশ্যমান মহাবিশ্ব টিকে আছে, আর বিজ্ঞান তার আবিষ্কার দিয়ে সেই অদৃশ্য রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে তার সত্যতা মানব সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছে, এখন এরই প্রেক্ষাপটে সেই অদৃশ্য জগতকে বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বাস করার কারণে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্কে অদৃশ্যের অজুহাত দেখিয়ে আর অস্বীকার করা যে চলবে না এবং কেউ তা করতে চাইলে অবশ্যই যে তা হবে অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি –এ বিষয়ে এক সাগর তথ্য নিয়ে বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। তাই উল্লেখিত বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পুস্তকখানি একবার পড়ে দেখা যেতে পারে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী সঠিক জ্ঞানের অগ্রযাত্রা ক্রমান্বয়ে বেগবান হয়ে সর্বপ্রকার মিথ্যা ও অন্ধকার দূরীভূত করুক এবং বিনিময়ে মানব সমাজ সার্বিক সফলতা লাভে ধন্য হোক– এই কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
র‍্যাক্‌স পাবলিকেশন্স

সূচী

বিষয়

সম্পাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ্, অবশেষে সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক 'আল্লাহ্‌র অদৃশ্যে বর্তমান থাকার এক মহাবিস্ময়কর জ্ঞানের সমারোহে ধন্য ও বিজ্ঞানের সর্বশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কারসমূহের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে জ্ঞানী পাঠক সমাজের সম্মুখে প্রকাশিত 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজ-৩, 'কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব' নামক এই পুস্তকখানি সম্পাদনা করতে পেরে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি।

একজন 'পদার্থবিদ' হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বক্ষমান সিরিজটিতে মহাবিশ্বের আদি সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যন্ত বিশাল যে অদৃশ্য অথচ বাস্তব মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণা ও মহাসূক্ষ্ম 'শক্তিকণার' অবিশ্বাস্যভাবে সক্রিয় উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ড প্রমাণিত তথ্যের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে এবং 'আল্-কুরআনের' আনীত ঐশীবাণীকে মহাসত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিজ্ঞান স্বীকার করছে, তাতে মহান ও একক সত্তা 'আল্লাহ্'কে আর জ্ঞানের মাধ্যমে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে অন্ততঃ অস্বীকার করা যাবে না। 'আল্লাহ্'কে এখন অস্বীকার করার মানসিকতা সৃষ্টি হলে প্রথমেই চরম বাস্তবতায় অর্জিত বর্তমান বিজ্ঞানের সকল প্রকার আবিষ্কার আর অগ্রগতিকেই অস্বীকার করে এগুতে হবে, যা হবে বোকার মত স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করে মিথ্যার ধ্বংসস্তূপে আত্মাহুতি দেয়ার-ই নামান্তর। মানব সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীজন পক্ষপাতহীন মতামতে বিশ্বাসী বিধায় পুস্তকখানি তাদেরকে নতুন আলোতে উদ্ভাসিত এক নতুন মহাবিশ্ব যে উপহার দিবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

দীর্ঘদিন থেকে সমাজে মহাবিশ্ব, আল্লাহ্, ইহ্‌জগত ও পরজগত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যার প্রকৃত ও যথার্থ সমাধান না পেয়ে জ্ঞানীজন যে হতাশায় ভুগছিলেন, আলোচিত অধ্যায়গুলোতে সে সকল সমস্যার প্রকৃত

সমাধান বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে বেরিয়ে আসায় সকল প্রকার হতাশা নির্মূল হয়ে গিয়ে এক সুন্দর ও মনমুগ্ধকর 'জগত ও জীবন' তাদের সম্মুখে ভেসে উঠবে। একজন মহাজ্ঞানী 'সত্তা' ও তাঁর কল্পনাতীত জ্ঞানে মোড়ানো অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ড তাদের করে তুলবে বিমোহিত। তারা তাদের জ্ঞানময় দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন 'আল্লাহ্' তাঁর মহাজ্ঞান দিয়ে বিস্ময়করভাবে সৃজিত সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে অকল্পনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এক মহাজগত উপহার দিয়েছেন। একজন অতুলনীয় সার্বক্ষণিক ও সর্বশক্তিমান পবিত্র 'সত্তার' সার্বিক উপস্থিতি ও সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া যে এ ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ম-নীতি সম্পন্ন মহাবিশ্বে বিস্ময়াভূত জ্ঞানের চিড়িয়াখানার মত বিচিত্রতার সমাহার ঘটানো সম্ভব নয়, তা তাদের সম্মুখে আবারও স্পষ্ট হয়েই ধরা দেবে।

লেখকের প্রতি থাকলো আন্তরিক দোয়া, যেন তার লেখায় উপস্থাপিত সিরিজের বাকী প্রতিটি খণ্ড-ই প্রমাণ করে এগিয়ে যেতে পারে- 'কুরআন' এবং সঠিক 'বিজ্ঞান'-এর মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নেই; বরং উভয়েরই উৎসস্থল মাত্র 'একটি'- এক ও একক 'প্রভু' মহান 'আল্লাহ্'। সাথে সাথে কুরআন ও বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব ও আবিষ্কার দিয়ে যেন এক 'আল্লাহ্‌র' উপস্থিতিকে বাস্তবতার ভেতর দিয়ে প্রমাণ করে উদ্‌ভ্রান্ত মানবমণ্ডলীকে সঠিক পথটি প্রদর্শন করে যেতে পারে।

সত্য-সঠিক জ্ঞান লাভে বিশ্ব মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলুক এবং সার্বিকভাবে ধন্য হোক এই কামনা করে এখনকার মত শেষ করছি।

ডঃ এস.এম. আজহারুল ইসলাম
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ্‌, অবনত শিরে প্রথমেই সকল প্রশংসা ও গুণগান প্রকাশ করছি ঐ মহাজ্ঞানী, প্রচণ্ডশক্তি ও ক্ষমতাধর, সর্বশক্তিমান, মহান, অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন একক সত্তা আল্লাহ্‌র, যিনি জ্ঞানের জগতে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ দিক রয়েছে তার একটিতে অন্ততঃ প্রবেশ করে যৎসামান্য হলেও 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান'-এর সর্বশেষ তথ্যের আলোচনা তুলে এনে এ মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' সম্পর্কে জ্ঞান পিপাসু পাঠককুলের জ্ঞানের থালায় উপস্থাপন করার তৌফিক দিয়েছেন।

আমি জানি, অনেক অনেক কমতি ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য সাথে পেয়ে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিয়েছি, তা খুব একটা সহজ বিষয় নয় যে, সকল পাঠক-ই এক নজরে আমার অভিব্যক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করে আমার হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত পথেই এগিয়ে যাবেন। আমি এও বিশ্বাস করি যে, সম্মানিত পাঠককুলের মধ্যে কেউ একবারে, কেউবা বহুবার অধ্যয়নের পর হয়তো সিরিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবনে সক্ষম হবেন। কেউ যদি এক'শ বছর পরও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তাহলেও তাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু থাকবে না। কেননা, 'সত্যপন্থী' হতে আগ্রহীদের জন্য পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ সিরিজের খণ্ডগুলো একরাশ রজনীগন্ধার ন্যায় জান্নাতি শুভেচ্ছা ছড়িয়ে যেতে থাকবে। এর আবেদন জ্ঞানী সমাজের জন্য কখনও এতটুকুও ম্লান হবে না।

আমি আরও জানি, আমার লেখনি যদি 'সত্যে'র পথ প্রদর্শনে অকাট্য যুক্তিনির্ভর ও সঠিক জ্ঞান অবলম্বনে পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে, তাহলে সমগ্র বিশ্বের একজন মানুষও যদি তা গ্রহণ না করে বরং ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয়, তাতে আমার প্রভুর নিকট আমার প্রতিদান ইন্‌শাআল্লাহ্‌ চুল পরিমাণও কম করা হবে না। এ পথে শুধু সফলতা ও সার্থকতা ছাড়া ব্যর্থতার কোন স্থান নেই। যদিও অনেকেই তাদের বইতে লিখে থাকেন– একজনও উক্ত বই থেকে উপকৃত হলে নিজকে সার্থক মনে করবেন। বাক্যটি বিশ্বাসীদের জন্য

অশোভনীয়। কারণ মানব সমাজ গ্রহণ করবে কি করবে না তার সাথে আহ্বানকারীর কোন সম্পর্ক নেই। আহ্বানকারীর দায়িত্ব হচ্ছে সর্বাবস্থায় সঠিক দাওয়াত পৌঁছানো। এর বিনিময় রয়েছে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের কাছে নয়।

অনেক সময়ই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, একজন সচেতন জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে একদিকে 'সৎ ও বিদ্বান' ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাজে উপস্থাপন করবেন, অথচ যখন তার সম্মুখে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র অদৃশ্যে বিরাজমান 'সত্তা' দিবালোকের স্পষ্ট আলোতে নিদর্শন, বাস্তব প্রমাণ নিয়ে, হাজারো দলিলসহ উপস্থিত হবে, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে তা না দেখার ভান করবেন– এটাতো মোটেই শোভনীয় নয়; বরং প্রশ্ন উঠা তখন স্বাভাবিক যে, এ কেমন জ্ঞানীর পরিচয়?

আঠারো শতকের পূর্বে এবং কিছুদিন পরেও জ্ঞানীজনের এই জাতীয় অভিনয় 'সৌন্দর্য ও আর্ট'রূপে সমাজে পরিগণিত হলেও হতে পারে কিন্তু বিংশ শতাব্দি ও তার পরবর্তী সময়ে এ জাতীয় আচরণ একদম বেমানান। কেননা এক সময় মহান আল্লাহ্‌' যে আছেন বিজ্ঞানের আবিষ্কার দিয়ে প্রমাণ করা ছিল এক কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষিত নতুন বিশ্বে বিজ্ঞান এত বেশি তথ্যবহুল আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে যে, যার কারণে এখন আল্লাহ্‌' নেই এ কথাই প্রমাণ করা একেবারে অসম্ভব এবং দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তারা অবশ্যই উল্লেখিত তথ্যের বাস্তব প্রমাণ ইতিমধ্যেই হয়তোবা নিজ চোখেই দর্শন লাভ করে থাকবেন। আর যারা এখনও উক্ত বিষয়ে অবহিত নন, অথচ সত্যকে সত্য জেনেই আলিঙ্গন করতে আগ্রহী এবং মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেই বর্জন করতে আপোষহীন, সেই সকল পরিচ্ছন্ন ও সুশীল সমাজের সুপ্রিয় জ্ঞান অন্বেষণকারী পাঠককুলের জন্য 'আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স'-এর বক্ষমান 'সিরিজ-৩' এক প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিক্ষণে 'ভিত্তিস্বরূপ' অদৃশ্য অসংখ্য প্রকার মহাসূক্ষ্ম বস্তু ও শক্তি কণিকাসমূহ কিভাবে এক আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিক 'চেইন অব কমাণ্ডের' মধ্য দিয়ে কল্পনাতীত শৃঙ্খলা

ও নিয়ম-নীতি মেনে বর্তমান আলোর গতি কিংবা ক্ষেত্র বিশেষ আরও অধিক গতিতে ভ্রমণ করে মহাবিশ্বের সার্বিক গোপন কর্মকাণ্ডের কাঠামো যথাযথ রেখে মহাবিশ্বকে দৃশ্যযোগ্য বর্তমান রূপ ও সৌন্দর্যসহ তুলে ধরেছে, তার এক তথ্যবহুল সচিত্র আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে। মহাবিশ্বে দৃশ্যমান জগতের তুলনায় অদৃশ্য জগত যে আরও ব্যাপক ও বিশাল, সাথে সাথে সুশৃঙ্খল, মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তার উপস্থিতি ও সক্রিয় কর্মতৎপরতা না থাকলে যে সমগ্র মহাবিশ্বটি সৃষ্টি না হয়ে অস্তিত্বহীন থেকে যেত, সেই জ্ঞানগর্ভ তথ্যও এতে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

একই সাথে উক্ত সিরিজের 'মহাবিশ্বের মূলতত্ত্ব' (The origin of the Universe) বিষয়ক এক সাগরতুল্য তথ্য হাজির করে কুরআন ও বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞান একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ও অভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে। ফলে এ সিরিজ সমাজে বিজ্ঞানের নামে মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত সকল প্রকার খোদাদ্রোহিতাকে শক্ত হাতে গুড়িয়ে দিয়েছে। চুরমার করে দিয়েছে ঐ সকল বিজ্ঞানীদের মিথ্যা অহমিকার ভিত্তিকে, যারা মহাবিশ্বের প্রকৃত শুরু (beginning) হিসেবে 'Big Bang'-কে নির্দিষ্ট করে তার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং 'Big Bang'-এর পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব এতদিন স্বীকার করতে চাননি। ভোরের অমানিশায় উজ্জ্বল শুভ্রতায় এক রাশ আলো ছড়ানো সূর্যের মত 'সিরিজখানি' মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে 'Big Bang' কে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রে চলে গেছে এবং মহাবিশ্বটি যে মূলতঃই 'আল্লাহ্‌র নূর' থেকে তথা 'স্থিতি শক্তি' (static energy) হতে তাঁরই পরিকল্পনায় পদ্ধতিগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা বাস্তবতার আলোকে প্রমাণসহ তুলে ধরে মানব সমাজের সম্মুখে মেলে ধরেছে।

বক্ষমান সিরিজটির কারণে লেখক ও সম্মানিত পাঠক সবার ঈমান বাস্তবতার নিরিখে লক্ষগুণে বর্ধিত হোক, সত্য ও কল্যাণের পথ সবার জন্যই আরও অবারিত ও উন্মুক্ত হোক এবং সবার জীবনে সকল প্রকার ব্যর্থতা ঝরে গিয়ে সফলতায় পরিপূর্ণ হোক, পরিশেষে এ কামনার সাথে উক্ত সিরিজের প্রতিটি খণ্ডই সংগ্রহ ও অধ্যয়নের আহ্বান জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। বিনীত

মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন

LANDMARK IN SPACE EXPLORATION

4 October 1957 - মনুষ্য তৈরী প্রথম রাশিয়ান কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellite) 'Sputnik 1' মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয়।

3 November 1957 - সোভিয়েত ইউনিয়নের 'লেইকা' (Laika) নামক একটি 'কুকুর' (dog) প্রাণী হিসেবে সর্বপ্রথম মহাশূন্য (Space) পরিভ্রমণের সুযোগ লাভ করে।

31 January 1958 - ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ অ্যামেরিকা (U.S.A) প্রথম বারের মত কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellite) 'Explorer 1' মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে।

10 October 1959 - সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরী Luna 3' Space craft চাঁদের বিপরীত দিকের (far side) ছবি প্রথম বারের মত ধারণ করে পৃথিবীবাসীকে ধন্য করে।

12 April 1961 - সোভিয়েত ইউনিয়নের 'মিঃ ইউরি গ্যাগারিন' মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম নভোচারী হিসেবে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে খ্যাতি অর্জন করেন।

5 May 1961 - 'মিঃ এ্যালন শীপার্ড' প্রথম অ্যামেরিকান নভোচারী হিসেবে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন।

20 February 1962 - 'মিঃ জন গ্লেন' (Mr. John Glenn) প্রথম অ্যামেরিকান মহাশূন্যচারীরূপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন।

10 July 1962 - আমাদের এ বিশ্বের প্রথম 'Commercial Communication Satellite' মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয়।

16 June 1963 - সোভিয়েত ইউনিয়নের 'Valentine Tereshkova' নামক মহিলা প্রথম মহিলা নভোচারী হিসেবে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেন।

18 March 1965 - সোভিয়েত নভোচারী 'Alexei Leonov' প্রথমবারের মত মানব ইতিহাসে মহাশূন্য পদচারণা (Space walk) করেন।

15 July 1965 - অ্যামেরিকান 'Space craft Mariner 4' সর্বপ্রথম সফলভাবে মঙ্গল গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হয়।

3 February 1966 - 'Soviet Luna 9' নামক প্রথম Craft হিসেবে চন্দ্র পৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণ করে।

27 January 1967 - Apollo 1 এর launch pad-এ আগুন লেগে ৩ জন অ্যামেরিকান নভোচারীর মৃত্যু ঘটে।

24 April 1967 - 'Vladimir Komarov' নামক একজন সোভিয়েট নভোচারী তার 'Capsule parachutes'-এ করে পৃথিবীতে ফিরে আসার পথে প্রথম মহাশূন্যে মৃত্যুবরণ করেন।

18 October 1967 - 'শুক্র' (Venus) গ্রহে সোভিয়েট 'Venera 4' সর্বপ্রথম সফলভাবে অবতরণ করে।

24 December 1968 - 'U.S. Apollo 8' প্রথম মনুষ্যবাহী যান সফলভাবে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে।

20 July 1969 - অ্যামেরিকান নভোচারী 'Neil Armstrong' সর্বপ্রথম চন্দ্র পৃষ্ঠে পদচারণা করেন।

17 November 1970 - রাশিয়ান 'Lunokhod 1' নামক প্রথম 'Rover' চন্দ্র পৃষ্ঠে চালনা করা হয়।

19 April 1971 - সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরী 'Salyut 1' নামক বিশ্বের প্রথম Space Station মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয়।

29 June 1971 - সোভিয়েত 'Salyut 11' Capsule পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে পুনঃ প্রবেশের (re-enter) সময় তিন জন নভোচারী-ই মৃত্যুবরণ করেন।

19 December 1972 - চাঁদে অবতরণের সর্বশেষ মিশন হিসেবে তৈরী অ্যামেরিকান Apollo 17 বিধ্বস্ত (Splashdown).

5 December 1973 - অ্যামেরিকান Space craft 'Pioneer 10' প্রথম বারের মত গ্রহরাজ 'বৃহস্পতি গ্রহ'কে প্রদক্ষিণ করে।

29 March 1974 - অ্যামেরিকান 'Space craft 'Mariner 10' সর্বপ্রথম 'বুধ গ্রহ'কে প্রদক্ষিণ করে।

17 July 1975 - মহাশূন্যে ভাসমান ও উড়ন্তাবস্থায় প্রথমবারের মত অ্যামেরিকান 'Apollo' এবং সোভিয়েত 'Soyuz' পরস্পর পরস্পরের সাথে docking করে মিলিত হওয়ায় নভোচারীগণও পরস্পর মিলিত হন।

20 July 1976 - অ্যামেরিকান 'Space craft 'Viking 1' সর্বপ্রথম 'মঙ্গল গ্রহে' সফলভাবে অবতরণ করে।

1 September 1979 - অ্যামেরিকান Space craft 'Pioneer 11' সর্বপ্রথম 'শনি গ্রহ'কে প্রদক্ষিণ করে।

12 April 1981 - অ্যামেরিকান Space Shuttle 'Columbia' সর্বপ্রথম মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়।

24 January 1986 - অ্যামেরিকান Space craft 'Voyager 2' সর্বপ্রথম ইউরেনাস গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে।

28 January 1986 - অ্যামেরিকান Space Shuttle 'Challenger' মহাকাশে উৎক্ষেপণের সময় বিধ্বস্ত হয়। সাত জন নভোচারী সবাই মৃত্যুবরণ করেন।

20 February 1986 - সোভিয়েত নির্মিত মহাশূন্য গবেষণাগার 'Mir' উৎক্ষেপণ করা হয়।

14 March 1986 - ইউরোপিয়ান 'Giotto' probe সর্বপ্রথম ধূমকেতু 'Halley' কে প্রদক্ষিণ করে।

25 August 1989 - অ্যামেরিকান Space Craft 'Voyager 2' সর্বপ্রথম 'নেপচুন গ্রহ'কে প্রদক্ষিণ করে।

24 April 1990 - অ্যামেরিকান Space Shuttle Discovery-এর মাধ্যমে 'Hubble Space Telescope' কে মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়।

22 March 1995 - রাশিয়ান নভোচারী 'Valeri Poliakov' মহাশূন্যে রেকর্ড পরিমাণ ৪৩৮ দিন একটানা অবস্থান করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

29 October 1998 - অ্যামেরিকান নভোচারী 'জন গ্লেন' বয়সে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ নভোচারী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

20 November 1998 - International Space Station-এর প্রথম অংশ (first part) মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয়।

বিজ্ঞানের জননীতুল্য 'আল্-কুরআন'

আমাদের এই মহাবিশ্বের বয়স পূর্বে একাধিকবার বিজ্ঞানীমহল সঠিকভাবে নিরূপণের চেষ্টা করে মোটামুটিভাবে প্রায় ১২০০ কোটি বছর থেকে ১৫০০ কোটি বছর নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য ইতোমধ্যে সর্বশেষ তথ্যে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর বলেই চূড়ান্তভাবে জানিয়েছেন। এর মধ্যে সৃষ্ট মহাবিশ্বে আমাদের গ্রহের আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় সাড়ে চারশত কোটি (৪৫০) কোটি বছর থেকে পাঁচশত (৫০০) কোটি বছর পূর্বে। আর পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে মাত্র কয়েক হাজার বছর পূর্বে। এখানে স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে যে, মহাবিশ্বের সূচনাক্ষণ থেকে পরবর্তী বড় বড় বিবর্তনের ধারায় যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ওলোট-পালট ঘটেছে, তখন আমরা মানবজাতি এই ভূ-পৃষ্ঠে ছিলাম না। আর এ কারণে আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি, এর বিবর্তন, এর মাঝে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল প্রকার বস্তুর আবির্ভাব এবং এদের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে - এর কোন বিষয়ই একেবারে যথার্থভাবে নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়সমূহ অধিক নির্ভুলভাবে অবহিত হতে হলে আমাদেরকে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে অবশ্যই ঐ মহান 'সত্ত্বা'র সরবরাহকৃত 'তথ্য'কে সম্মুখে রাখতে হবে, যে মহান 'সত্ত্বা' মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় যেমন বিরাজমান ছিলেন, এখনও তেমনি বর্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপভাবে বিরাজমান থাকবেন। তাহলেই কেবল যে কোন তথ্য সঠিকভাবে হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, নইলে মূল সেই রিপোর্টের অভাবে বিজ্ঞানের খন্ডিত ও অসম্পূর্ণ 'তথ্যে'র ওপর নির্ভর করে এগিয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু বিভ্রান্তি যে বৃদ্ধি পাবে তার হাজারো প্রমাণ ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে এই মারাত্মক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাঁর পক্ষ থেকে ঐশীগ্রন্থ পবিত্র 'কুরআন' একটা দীর্ঘ সময় (প্রায় ১৪০০ বৎসর) পূর্বেই মানব সমাজের নিকট অবতীর্ণ করেছেন। যে গ্রন্থটিতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত মানব সম্প্রদায় এই মহাবিশ্বের মাঝে যে যে বিষয়গুলো আবিষ্কার
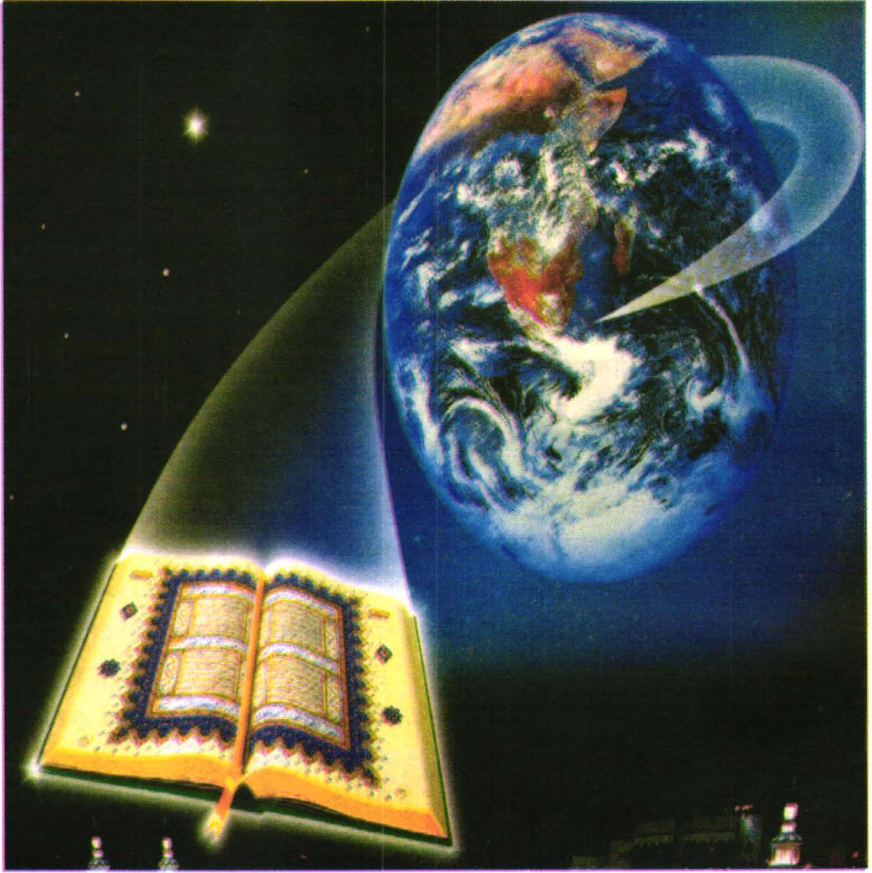
চিত্র -১

"ইহা দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ। এক কিতাব, (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে) বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, (মানব সমাজের প্রকৃত) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।(বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা) সুসংবাদদাতা ও (অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা) সতর্ককারী। (সকল প্রকার বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ লইয়া অবতীর্ণ হওয়ার পরও) কিন্তু অধিকাংশ লোক (সত্যের দিক হইতে) মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। সুতরাং উহারা শুনিবে না।" (৪১ ঃ ২-৪)।

--মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ তা'আলা'র পক্ষ থেকে সৃষ্টির সেরা জীব পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানরত মানব সম্প্রদায়ের নিকট মহাবিস্ময়কর এ 'কুরআন' অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হিসেবে। যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্তই মানব সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান ও সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বিতরণ করে যেতে সক্ষম এ অনন্য 'কুরআন'। বস্তুতঃ 'আল-কুরআন' -এর তুলনা সে নিজেই।

আর উদ্‌ঘাটন সফল করে তুলতে পারবে, ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞানগত অগ্রগতির ধারায় সব তথ্যগুলোই 'সূত্রাকারে' বাণীবদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে আমাদের বর্তমান সময়কালে যখন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যে পরিপূর্ণ পরিবেশে একের পর এক গভীর জ্ঞানসম্পন্ন 'তথ্য ও তত্ত্ব' উদ্‌ঘাটিত ও আবিস্কৃত হচ্ছে, তখন 'কুরআন' খুলে ঐ একই বিষয়ের মূল 'তথ্য ও তত্ত্ব' সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলো লিপিবদ্ধ আকারে দর্শন করে আমরা চম্‌কে উঠ্‌ছি। কি আশ্চর্যজনক কথা! এও কি সম্ভব? আল্লাহ্ তা'আলা সত্যি-সত্যি বিরাজমান না থাকলে, তাঁর নামে আগত গ্রন্থ 'কুরআন'- এ বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো এত অগ্রিম প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয় কি করে?

নিজের অজান্তেই আমাদের মন বলে দিচ্ছে এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক 'আল্লাহ্' একজন মহান স্রষ্টারূপে বিরাজমান আছেন। যিনি তাঁর উপস্থিতির স্বাক্ষর স্বরূপ বিজ্ঞান প্রমাণ করার বা আবিষ্কার করার প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই অবিজ্ঞান যুগে মানবসমাজকে বিষয়গুলো মৌলিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি অদৃশ্যে অবস্থান নিলেও বাস্তবে যে সত্যিই বিরাজমান আছেন, এটা তার একটি বড় ধরনের প্রমাণ। আর এরই প্রেক্ষাপটে 'কুরআন' এবং বর্তমান 'বিজ্ঞান'-এর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে - জননী এবং সন্তানতুল্য। 'কুরআন' একটা দীর্ঘ সময় পূর্বেই আগমন করে 'বৈজ্ঞানিক' প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ করে (প্রসব করে) মাতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে আছে। আর 'বিজ্ঞান' উল্লেখিত একটা দীর্ঘ সময় পরে আবির্ভূত হয়ে কুরআনের সম্মুখে 'সন্তানতুল্য' ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বে নিহিত অসংখ্য বিষয়ে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব 'কুরআনে' পূর্বেই উদ্ধৃত হয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করছে, যে বিষয়গুলোর ধারে কাছেও 'বিজ্ঞান' এখনও পৌছুতে পারেনি, আবিষ্কার করাতো অনেক অনেক পরের কথা। সময়ের আবর্তনে পরবর্তীতে বিজ্ঞান তার সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নত উৎকর্ষতার পরিবেশে হয়তো এক এক করে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলোকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হবে।
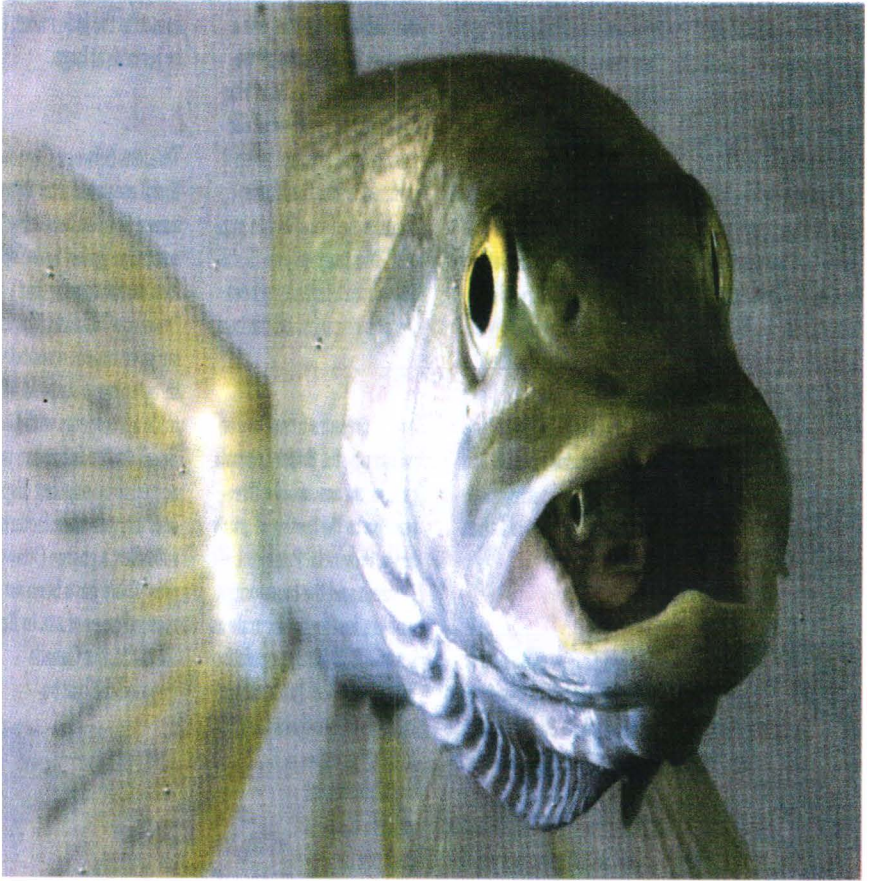
চিত্র -২

"এই 'কুরআন' মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।" (৪৫ ঃ ২০)

"বস্তুতঃ যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে"। (২৯ ঃ ৪৯)।

"আল্-কুরআন বিজ্ঞানময়।" (৩৬ ঃ ২)।

-- আজকের বিজ্ঞানময় উন্নততর বিশ্বে যে যে বিষয়গুলো আবিস্কার আর উদঘাটন করে বিজ্ঞানী সমাজ মানব সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপকভাবে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করছেন, সেই 'বৈজ্ঞানিক প্রস্তা-বসমূহ' প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই হুবহু বুকে ধারণ করে 'আল্-কুরআন' মানব সম্প্রদায়ের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে 'আল্-কুরআন' বিজ্ঞানের জননীরূপে সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

অতএব, এই মহাবিশ্বে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ও প্রস্তাবসমূহ আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন করে 'বিজ্ঞান' সমগ্র বিশ্বব্যাপী সুনাম, সুখ্যাতি ও বাহ্‌বা পেয়ে আজ ধন্য, সেই জ্ঞানময় তথ্যগুলো প্রস্তাব আকারে বুকে ধারণ করে যে 'কুরআন' বিজ্ঞানের জন্মেরও বহু বহু পূর্বে মানবসমাজে আগমন করেছে, সেই অনন্য ও অদ্বিতীয় পবিত্র গ্রন্থখানা যে সকল প্রকার তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে প্রকৃতপক্ষে 'বিজ্ঞান' এর 'জননী'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে।

সুতরাং 'জননী'কে অস্বীকার নয়, বরং স্বীকার করার মধ্যেই সন্তানের মর্যাদা ও পরিচয় নির্ধারিত হতে পারে। 'জননী'কে অস্বীকার করতে চাইলে সন্তান-এর নিজ ভিত্তি-ই থাকতে পারে না। তাই বাস্তবতার আলোকে বিজ্ঞানের স্বার্থেই 'কুরআন'কে 'মৌলিক গ্রন্থ' (Basic Information Book) হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে এবং একই কারণে 'কুরআন'-এর রচয়িতা মহান 'আল্লাহ্'কেও অবনতশিরে মেনে নিতে হবে।

ওপরে আলোচিত বক্তব্যকে প্রমাণসাপেক্ষে পরখ করতে চাইলে চলুন সম্মুখপানে, যেখানে দেখা যাবে 'বিজ্ঞান' তার আবিষ্কৃত বিষয়সমূহের বাস্তব 'ছবি ও তথ্যে'র ডালি হাতে নিয়ে 'কুরআনের' শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করছে এবং যেন চিৎকার দিয়ে বলতে চাইছে- 'এই কৃতিত্ব আমার নয়; বরং 'কুরআন এবং বিজ্ঞান'সহ সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক ও একক সত্ত্বা মহান 'আল্লাহ্ তায়ালা'রই জন্য শুধু নিবেদিত। চলুন তাহলে সম্মুখপানে।

“মহাবিশ্বের মূলতত্ত্ব”

আল্-কুরআন ঃ

“উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী।” (২২ ঃ ৭৪)

“আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।” (২ ঃ ২২৮)

“তিনি ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।” (৩০:৫৪)

“তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন?” (২৯ ঃ ১৯)

“বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।” (২৯ ঃ ২০)

“তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই।” (৫৯ ঃ ২৪)

“আমার আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায়, একবার ব্যতীত নহে।” (৫৪ ঃ ৫০)

“আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তিনি যখন কোন কাজ সমাধা করিতে চাহেন তখন শুধু বলেন ‘হও’, সাথে সাথে উহা হইয়া যায়।” (২ ঃ ১১৭)

“তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।” (৫৭ ঃ ৩)

“আমি আকাশমন্ডলী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছি শক্তি বলে এবং আমি সম্প্রসারণ করিতেছি।” (৫১ ঃ ৪৭)

“আল্লাহ্‌র ‘নূর’-এ উদ্ভাসিত আকাশন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব)। তাঁহার ‘নূর’-এর উপমা যেন একটি দীপাধার। যাহার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরনের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জল নক্ষত্র সদৃশ; ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; আলোর উপর আলো। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁহার ‘নূর’-এর (আলোর) দিকে।

আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

(২৪ ঃ৩৫)

"আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত (বর্ণনা)।"

(২৪ ঃ ৩৪)

"তাঁহার মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

"এইগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

একটি বিষয়ে পূর্বেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন তাঁর নিকট থেকে, আমরা সেই জ্ঞানের আলোতেই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি। ইতোপূর্বে বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ-জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে উল্লেখিত সুরা 'নূর'-এর ৩৫ নং আয়াতটি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে কোন কুল-কিনারা পাইনি, সবাই যেন বিষয়ের মূল কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি গুছিয়ে উপস্থাপনে অপারগতা প্রদর্শন করছিলেন অতি মিনতির সাথে। ফলে উপলব্ধিতে একথা বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বচ্ছ-স্ফটিকের ন্যায় আবিষ্কার সম্পন্ন হয়ে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবে সমৃদ্ধ উক্ত আয়াতটির মূলবক্তব্য উজ্জ্বল আলোতে বেরিয়ে আসতে হয়তোবা সক্ষম হবে না।

আল্হামদুলিল্লাহ্, অবশেষে বর্তমান বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বিশ্বে সৃষ্টিতত্ত্বঃ "বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) প্রস্তাব প্রমাণিত হওয়ায় এবং অতি সম্প্রতি কয়েকজন 'কণা পদার্থ বিজ্ঞানী ' (Particle Physicists) কর্তৃক বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করে, গুরুত্বপূর্ণ 'তথ্য ও তত্ত্বের' উদ্ঘাটনে সক্ষম হওয়ায়, আমাদের বক্ষমান অধ্যায়টি উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে মহাবিশ্বের ভিত্তিমূলক জটিল থেকে জটিল ও জ্ঞানপূর্ণ-বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবের 'তথ্য' আমাদের বোধগম্যের সীমানায় আগমন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং আমরা খুবই তৃপ্তির সাথে তা হৃদয়ঙ্গম করে মহান স্রষ্টার কৃতিত্বপূর্ণ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে আবারও নীরবে মস্তক অবনত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা আমাদের আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোন প্রকার বাড়াবাড়ি কিংবা অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করা থেকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। বর্তমান সর্বশেষ উৎকর্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদৌলতে মহাবিজ্ঞানময় কুরআনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহের যতটুকু সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছি ঠিক ততটুকুই সাধ্যমত আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের খেদমতে পেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। যেহেতু সঠিক জ্ঞানের একমাত্র উৎস 'আল্লাহ্', তাই প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল বিষয়ের 'সত্য-সঠিক' কথাগুলোই পৌঁছাবার তৌফিক দান করেন।

এখন আমরা অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখিত কুরআনের ঐশীবাণীতে মহাবিশ্বের 'ভিত্তিমূলক' বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনার যে বক্তব্য, তা উপস্থাপনে ব্রতী হব এবং পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞানের হীরন্ময় কিরণে ইতোমধ্যে যা কিছু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাও প্রকাশ্য আলোতে পরখ করে দেখার প্রয়াস পাবো, ইন্‌শাআল্লাহ্।

উদ্ধৃতঐশী বাণীতে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যে মূলবক্তব্য উৎকীর্ণ হয়েছে, তা হলো- এই মায়াময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত 'পৃথিবী' নামক গ্রহে অবস্থানরত মানবমন্ডলীর মাঝে যারা এক ও একক স্রষ্টায় অবিশ্বাসী, তারা তাদের বাস্তব সত্য 'প্রভুর' মহাক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির যথার্থতা ও মর্যাদা অনুধাবন করতে অক্ষম বিধায় এই বিদ্রোহীতামূলক আচরণ প্রদর্শন করছে। অথচ এই মহাবিশ্বে একমাত্র তিনিই স্বাধীন 'সত্ত্বা' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত বিধায় যখন যা চান তাই তিনি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেন। কেউ তাতে খবরদারি করার কোন প্রকার অধিকার রাখে না। বিষয়টি বাস্তবভাবে উপলব্ধি করার জন্য তারা তাদের দৃষ্টি ও জ্ঞান দিয়ে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ের কলা-কৌশলও তো পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে দেখতে পারে, তাহলে তাতে তারা অবশ্যই দেখতে পেত তাদের প্রভু কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন করে ক্রমান্বয়ে এই জটিল কাজকে কত সুক্ষ্মভাবে এগিয়ে নিয়ে বর্তমানের দৃশ্যযোগ্যরূপে দাঁড় করিয়েছেন।

এই মহাবিশ্বের পরিকল্পনাকারী (Planer), নক্‌শাকারী (Designer), সৃষ্টিকারী (Creator), পরিচালনাকারী (Administator), ও

নিয়ন্ত্রণকারী (Controller) হিসেবে আজ পর্যন্ত যখন কোন 'মানুষ' প্রমাণভিত্তিক দাবী তুলতে পারেনি (কখনই তা সম্ভব নয়) তখনতো তাদের বুঝে নেয়া দরকার যে, উক্ত বিষয়সমূহের পিছনে তাদের একমাত্র 'প্রভু'-ই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর তাঁর সেই বৈশিষ্টের ওপর ভিত্তি করে একমাত্র তাঁর জন্যই সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামে মানুষ কখনো ভূষিত হতে পারে না।

বর্তমান এই বিশাল সীমা-পরিসীমাহীন 'মহাবিশ্বকে' (Universe) প্রায় শূন্যবস্থা থেকে দৃশ্যমান বিশাল জগতরূপে আনয়ন করার জন্য তাদের তুলনাহীন 'প্রভু'কে শুধু এতটুকু-ই বলতে হয়েছে যে 'হও' আর অমনি পূর্নাঙ্গ কাজটি চোখের ঝলকের চেয়েও দ্রুততার সাথে তোলপাড় সৃষ্টি করে (স্রষ্টার প্রচন্ড ক্ষমতার ভয়ে) এগিয়ে গেছে যথাযথভাবে সমাপনের লক্ষ্যে। তাও শুধু একবারই নির্দেশ দিতে হয়েছে বহুবার বলার প্রয়োজন পড়েনি। তাদের প্রভুর এতবড় প্রভাবকে তারা কিভাবে অস্বীকার করছে? তাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে তো তারা তাদের 'প্রভুর' অতুলনীয় এই বিস্ময়কর সৃষ্টিকার্যকে উপলব্ধি করতে অবশ্যই সক্ষম। তাহলে কেন তাদের এই অপরাগতা? সত্যের প্রতি তাদের কেন এই বিষন্নতা?

যদি তারা তাদের 'প্রভুর' সার্বিক মাহাত্ম্যকে স্বীকারের পূর্বে আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা সহকারে এই 'মহাবিশ্বের' (Universe) 'সৃষ্টিরহস্য'-এর মূলভিত্তি থেকেই অবহিত হতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের জানা দরকার মহাবিশ্বটি সৃষ্টির পূর্বে এক ও একক 'সত্ত্বা' হিসেবে একমাত্র তিনিই ছিলেন, আবার মহাবিশ্বটি ধ্বংস করে দেয়ার পর আবারও তিনি একাই থাকবেন, এখন তিনি তাঁর মহাক্ষমতা- শক্তি, মহাজ্ঞান ও প্রভাব নিজ সৃষ্টিকে দেখাবার জন্যই এই 'মহাবিশ্বটি' (Universe) সৃষ্টি করেছেন এবং যুক্তি ও নিদর্শনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ("যেন তোমাদিগকে আমার কুদ্‌রত দেখাইতে পারি," ২২ঃ৫)। 'মহাবিশ্ব' (Universe) নামক এই প্রদর্শনীটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই চলবে। নির্ধারিত সময়টি উপস্থিত হওয়ামাত্র সমগ্র মহাবিশ্বটি অস্তিত্বহীন করে দেয়া হবে। তখন আবার তিনি গুপ্ত হয়ে যাবেন, কেউ থাকবে না তাঁর উপস্থিতি-অনুপস্থিতির বিষয় নিয়ে তর্ক বা বাদানুবাদ

করার। যেহেতু তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী, তাই সমগ্র বিষয়-ই তাঁর জন্য কোন ব্যাপারই না।

তাদের প্রভু 'আল্লাহ্' আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী তথা এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'প্রচন্ড শক্তির উৎস' (Source of Tremendous Power) থেকে এবং সৃষ্টিমূহুর্ত থেকে তিনি এই 'মহাবিশ্বকে' চতুর্দিকে কেবলই বৃদ্ধি করে চলেছেন, বিস্তৃত করে চলেছেন, যে মহাসম্প্রসারণের কোথায়, কখন, কিভাবে, কোন পরিবেশে যে সমাপ্তি ঘটবে, সে বিষয়ে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।

এতটুকু বলার পরও হয়তোবা অবিশ্বাসীদের জ্ঞানের কপাট এখনও খুলবে না, তাই আরও ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিষয়ের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায়- মূলতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী তথা এই মহাবিশ্বটি ও এর অভ্যন্তরে যত কিছু আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে বৃহৎ-বৃহৎ গ্যালাক্সী পর্যন্ত, সবই আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' (আলো) থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আবার সকল কিছুই অস্তিত্ব ধারণ করে 'নূর'-এর মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়েছে। (দেখুন 'আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১, 'আলো থেকে সৃষ্টি' অধ্যায়)। এক কথায় 'মহাবিশ্বের' সার্বিক কার্যক্রমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু 'নূর' আর 'নূর'-এর খেলা। যে কোন দিক থেকেই অবলোকন করতে সক্ষম হলে মানুষ দেখতে পাবে 'নূর' বা 'আলো' (Highest Energetic Radiation)-এরই কেবল প্রাধান্য সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে আছে। বিষয়টিকে বাস্তবভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একটি উপমা উপস্থাপন করা যেতে পারে, তা হলো- দুধের তৈরী সুস্বাদু মিষ্টি 'রসমলাই'। যে পরিমাণ দুধকে 'রসমলাই' তৈরী করার জন্য জড়ো করা হয়, তা থেকে প্রথমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধকে পৃথক করে তাপ দিয়ে ঘনায়নের মাধ্যমে জমিয়ে 'ছানা' তৈরী করা হয়। অতঃপর ঐ 'ছানা' বা মলাই (ক্রীম) থেকে 'রসগোল্লা' তৈরী করে রান্না করা হয় চিনি মিশ্রিত পানিতে। তারপর অবশিষ্ট দুধকেও তাপ দিয়ে কিছুটা ঘন করে ঐ ঘনায়নকৃত দুধের মধ্যে তৈরী 'রসগোল্লা'গুলো ডুবিয়ে রাখা হয়।
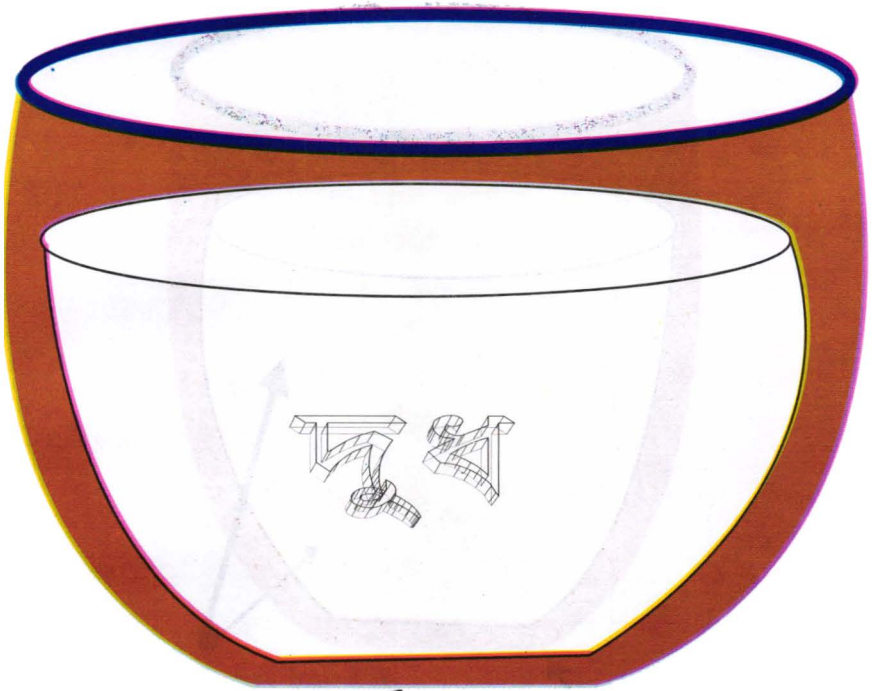
চিত্র -৩

"আল্লাহ্‌র নূর-এ উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি)"। (২৪ঃ৩৫)

--সুস্বাদু খাবার 'রসমলাই' তৈরীর জন্য সংগ্রহকৃত দুধ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 'দুধ'কে পৃথক করে একাধিক ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বনে ঐ দুধ থেকে 'মলাই' (Cream) তৈরী করা হয়। পরে ঐ 'মলাই' দিয়ে রসগোল্লা বানিয়ে চিনি মিশ্রিত পানিতে রান্না করে আবার ঐ অবশিষ্ট দুধকে ঘন করে তার মধ্যেই ডুবিয়ে রাখা হয়। ফলে দুধ দিয়ে তৈরী মিষ্টি দুধের মধ্যেই অবস্থান গ্রহণ করে 'রসমলাই'র নামকরণ স্বার্থক করে তোলে।

একইভাবে আল্লাহ তা'আলা 'নূর' (আলো)-এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে এ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে আবার ঐ 'নূর'-এর মধ্যেই ডুবিয়ে রেখে মহাবিশ্বকে ভারসাম্য, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিকভাবেই উদ্ভাসিত করেছেন। মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা হিসেবে এটা আল্লাহ তা'আলার একক ও অতুলনীয় মহাবিস্ময়কর কর্মকান্ডরূপেই ফুঠে উঠেছে।
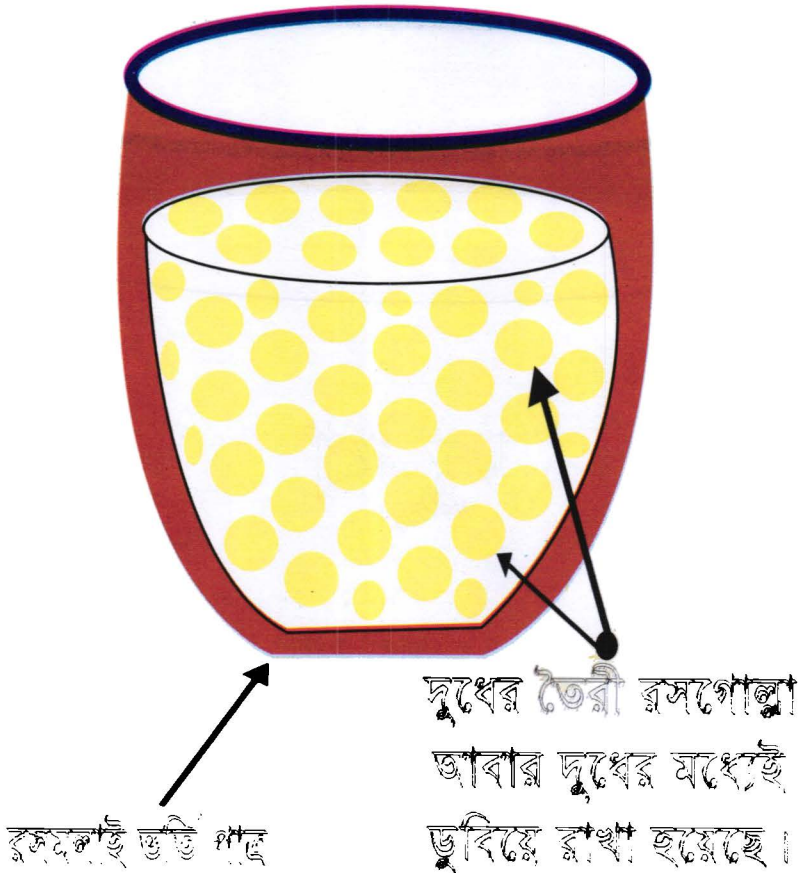
চিত্র -৪

"তাহারা কি লক্ষ করে না কিভাবে আল্লাহ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।" (২৯:১৯)

--মৌলিকভাবে 'নূর' তথা 'আলোকশক্তি' (Highest Energetic Radiation) থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টির পর সকল কিছুসহ সমগ্র মহাবিশ্বকে আবার 'নূর'-এর অকল্পনীয় সাগরসুপের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। ফলে মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণসহ সকল কাজগুলোই সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন ঐ 'নূর' (আলো)-এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে।

ইতোমধ্যেই বিজ্ঞান তার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমের প্রাপ্ত তথ্যে আমাদের অবহিত করেছে যে, সম্পূর্ণ মহাকাশ ভয়ঙ্কর 'তেজস্ক্রিয়তা' (Radiation) দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। বিষয়টি মোটেই আবেগতাড়িত ব্যাপার নয়; বরং অবিশ্বাস্যরূপেই তা প্রকট বাস্তবতায় বিরাজমান।

এই অবস্থায় রসগোল্লাগুলো দেখতে মূল দুধ থেকে পৃথক অন্য কিছু মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা একই দুধ থেকেই পদ্ধতিগতভাবে তৈরী করা হয়েছে। সে কথা-তো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

এখানে যেরূপ দুধ থেকে 'রসগোল্লা' তৈরী করে পুনরায় দুধের মধ্যেই ডুবিয়ে রেখে 'রসমলাই' নামক নতুন এক মুখরোচক সুস্বাদু খাবারের সার্থকতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর 'নূর' (আলো) থেকেই 'মহাবিশ্ব' এবং এর যাবতীয় মহাজাগতিক বস্তু সৃষ্টি করে আবার তা ঐ 'নূর'-এর মহাসাগরে ডুবিয়ে রেখেছেন। কেন 'নূর'-এর মধ্যে ডুবিয়ে রেখে মহাবিশ্বকে উদ্ভাসিত করেছেন, সে বিষয়ে আলোচনা আমরা সম্মূখে পাবো ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন খুবই দয়ালু বিধায় তাঁর বান্দাহ্র স্বার্থে তিনি পরম ধৈর্য্যের সাথে বান্দাহ্কে বার বার প্রকৃত বিষয় অবহিত করার মানসে ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়কেও তিনি সেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

এক 'আল্লাহ' এবং তাঁর মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ে এই পর্যায়ে এতটুকু বাস্তব সত্য তথ্য উপস্থাপনের পরও যদি অবিশ্বাসীরা বিষয়টি আরও খোলামেলাভাবে জানার আবদার করে, তাহলে তারা চূড়ান্তভাবে একটি বিশেষ উপমার মাধ্যমে তাদের একমাত্র প্রভুর মহাশক্তি-ক্ষমতা, মহাজ্ঞান ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং এর মূলভিত্তিগত তথ্য এভাবেও অবগত হতে পারে যে, আল্লাহ্ তায়ালার সেই 'নূর'-এর উপমা যেন একটি দীপাধার (যেখানে অসংখ্য-অগনিত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব) যার বর্নণাতীত বিশালত্ব, ব্যাপকতা মানবজ্ঞানের সম্পূর্ণ আওতা বহির্ভূত। যে দীপাধারে আল্লাহ্ তা'আলা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা উপলক্ষে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন (বিষ্ফোরণ ঘটিয়েছেন, কেননা যে কোন প্রকার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন মানেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিষ্ফোরণ' ঘটানো মাত্র)। সেই প্রদীপ থেকে (বিষ্ফোরণ থেকে)-উৎপন্ন 'আলো' (Radiation) পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রূপধারণ করেছে।

মূলতঃই আল্-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ বিধায় প্রায় সকল ব্যাপারেই মূল তথ্যগুলো উপস্থাপন করে সুক্ষ্ম-সুক্ষ্ম ও বিস্তারিত আলোচনাকে পরিহার করে কলেবরকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সুকৌশলে। আর সেখানেই আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র তৈরী করে গেছে।

এখন কথা হলো, একটি প্রদীপ যখন প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন একথা আমরা বুঝে নিয়ে থাকি যে, উক্ত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্য যে সকল পূর্বশর্ত রয়েছে, তা অবশ্যই যথাযথভাবে পূর্বেই পূর্ণ করা হয়েছে। নতুবা পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো অসম্পূর্ণ থাকার কারণে পুরো কাজটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহ্ তা'আলা দীপাধার নামক ব্যাপক বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে থাকা তাঁর 'নূর'-এর মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। এ তথ্য লাভ করার সাথে সাথে আমরা উপলব্ধি করছি যে, উক্ত প্রদীপ জ্বলবার পূর্বশর্তগুলো তিনি অবশ্যই পূর্ণ করে থাকবেন। নতুবা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বর্তমান রূপ লাভ করতে পারতো না। মহান আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্বে সকল ব্যাপারেই ভিন্ন ভিন্ন হলেও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন, যদিও কোন পদ্ধতি ব্যাতিরেকেও সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর আছে।

তাই একটি প্রদীপ যথাযথভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে চাহিদানুযায়ী 'আলো' (Radiation) বিতরণ করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শর্তগুলো হচ্ছেঃ-

(১) এলাকা নির্ধারণ বা সীমানা চিহ্নিতকরণ। অর্থাৎ, প্রদীপটি কতটুকু এলাকার জন্য কাজ করবে তা নির্ধারিত হওয়া।

(২) প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য উৎকৃষ্ট জ্বালানীর (তৈলের) ব্যবস্থা করা।

(৩) জ্বালানীর (তৈলের) সর্বত্র অনুপাত (Ratio) ও ঘনত্বের (Density) সমতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।

(৪) প্রদীপের মাথায় জ্বলবার স্থানে (বার্নিং পয়েন্টে) তৈলের প্রবাহ নিশ্চিত করা।

(৫) বিশেষ কোন পদ্ধতিতে জ্বালানীকে পূর্বেই সম্ভবমত চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘনীভূত (Compressed) করে নেয়ার ব্যবস্থা করা।

(৬) প্রজ্জ্বলন (বিস্ফোরণ) যাতে সর্বোচ্চ মানে হয় সেজন্য পূর্বেই জ্বালানীকে (তৈলকে) চাপ ও তাপের মাধ্যমে পর্যাপ্ত মাত্রায় উত্তপ্ত (Pre-Heating) করার ব্যবস্থা রাখা।

মোটামুটি উক্ত ৬টি শর্ত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক সম্পাদিত হয়ে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা এখন আমরা একটু পরখ করে দেখি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এই 'মহাবিশ্ব' (Universe) সৃষ্টিজনিত উল্লেখিত 'প্রদীপ প্রজ্বলন'-এর (বিষ্ফোরণের) পূর্বেই সমগ্র ব্যাপারটি এরাদা করে 'হও' নির্দেশ প্রদান করতেই উক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ হয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের চূড়ান্ত মূহুর্তের দিকে এগিয়ে যায়। উল্লেখিত শর্তপূরণে কুরআন যে ধারণা দিচ্ছে তার প্রথমটি হলো- আল্লাহ্পাক নক্ষত্র সদৃশ উজ্জ্বল কাঁচপাত্র নামক 'আসন' সম্বলিত 'আরশ্ মহল্লা' দ্বারা পরিবেষ্টন করে (মহাশূন্যে) একটি নির্দিষ্ট 'এলাকাকে' কল্পিত মহাবিশ্বরূপে নির্ধারণ করেছেন।

"তাঁহার আসন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (সমগ্র মহাবিশ্বকে) পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদের রক্ষনাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ" (২ঃ২৫৪),

এখানে স্পষ্টভাবে 'প্রভুর' পবিত্র 'আসন' ধারণকৃত 'আর্শ' চতুর্দিক হতে ঘিরে আছে বলে উল্লেখিত হয়েছে, যে মহা আর্শের পবিত্র 'নূর'-এর কিরণচ্ছটা এত ব্যাপকভাবে আলোকময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে তা মানবজ্ঞানে দৃশ্যমান সবচেয়ে বেশী শুভ্রতা প্রদানকারী বস্তু নক্ষত্র (সূর্য) সদৃশ, যার আলো আর আলো সকল প্রকার দৃষ্টিকেও অবদমিত করে দেয় আর্শ মহল্লার সেই প্রচন্ড নূরানী কিরণচ্ছটায় 'সিদরাতুল মুন্তাহায়' কুল বৃক্ষটিও যে বিস্ময়করভাবে ঝলমল করছে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ গমনকালে আল্লাহ্ তায়ালার মহাবিস্ময়কর নিদর্শন হিসেবে স্বশরীরে তা বাস্তবচোখে অবলোকন করেছেন, সে কথাও 'উজ্জ্বল আরশ্ মহল্লার' বড় দলীল হিসাবে সুরা 'নাজমে' উল্লেখিত হয়েছে এভাবে- "যখন বৃক্ষটি, যদ্দারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দারা ছিল আচ্ছাদিত, তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই, সে তো তাহার প্রতিপালকের মহা নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।" (৫৩ ঃ ১৬-১৮)

আলো ঝল্মল্ 'কাঁচপাত্র' নামক 'আর্শ মহল্লা' পরিবেষ্টিত বেল্টের ভেতরই যে 'ইহ্জগত' ও 'পরজগত' পরপর অবস্থিত সে কথাও সুরা 'নাজমের' উক্ত ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

চিত্র -৫

"আল্লাহ্‌র 'নূর'এ উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব)।" (২৪:৩৫।)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী ও মহাক্ষমতাধর এবং সকল ব্যাপারে-ই সর্বশক্তিমান এক মহান পবিত্র 'সত্ত্বা'। তিনি তাঁর এই পবিত্র মহান সত্ত্বার কল্পনাতীত মহাবিস্ময়কর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য এবং অতুলনীয় গুণাবলী প্রদর্শনের জন্য তাঁর 'নূর' বা আলোকশক্তি (Highest Energetic Radiation) *থেকেই প্রদ্ধতিগতভাবে এই প্রকান্ড মহাবিশ্ব এবং এর ভেতর সকল প্রকার বস্তু ও শক্তি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্ট বস্তু ও শক্তি বাহ্যদৃষ্টিতে যে রূপেই দেখা যাক না কেন এবং যেভাবেই কাজ করুক না কেন মুলতঃ এদের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'নূর' (আলোক শক্তি)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাকা যতই ঘুরবে ততই বিষয়টি সমাজের জ্ঞানবানদের নিকট উজ্জ্বল আলোতে প্রকাশ পাবে। ফলে তাদের প্রভূর উপস্থিতি এবং মহাবিশ্বের সর্বত্র সকল ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় কর্মকান্ড তাদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আর প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে সৌভাগ্যবান।*

চিত্র -৬

"তাহার 'নূর'-এর উপমা যেন একটি দীপাধার। যাহার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; আলোর উপর আলো। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার 'নূর'-এর দিকে। আল্লাহ্ মানুষের (বুঝার) জন্য (কোন কোন বিষয়ে) উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (২৪ ঃ ৩৫)

"তাঁহার আসন (আর্‌শ মহল্লা) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (সমগ্র মহাবিশ্ব) পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ"। (২ঃ২২৫)

--আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট এলাকার 'নূর'কে তাঁর পবিত্র আসন তথা আরশ মহল্লা দ্বারা ঘিরে ফেলে বক্রাকৃতি দান করেছেন, যা নক্ষত্র সদৃশ উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। ভেতরের দিকের 'নূর' তথা তৈল নামক জ্বালানী থেকেই পরবর্তীতে ঘনায়ণ পদ্ধতিতে মহাবিশ্বটি তৈরী করেছেন। আল্লাহ্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিরাট বিষয়কে বোধগম্যের জন্য ছোট্ট একটি উপমা দিয়ে জ্ঞানীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

"প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।" (৫৩ ঃ ১৪, ১৫) এতে আরও স্পষ্ট হয়েছে যে বস্তুজগত বা 'ইহ্জগত' এর চতুর্দিকেই 'পরজগত' বিস্তৃত হয়ে আছে। অতএব, 'ইহ্জগতের' স্থান মধ্যস্থানে এবং উভয় জগত-ই 'আর্শ মহল্লা' দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্যাক্ট (Packed) হয়ে আছে। ফলে সমগ্র মহাবিশ্বটি আল্লাহ্ তা'আলার নখদর্পনে বিরাজমান।

এখানে আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র 'সত্ত্বা' আমাদের এই মহাবিশ্বকে 'আর্শ মহল্লা' দিয়ে ঘেরাও করে নির্দিষ্ট একটা আয়তনে নির্ধারণ করেছেন এবং অবশ্যই এর মাপঝোপ একমাত্র তিনিই জানেন, মানবীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানে তা কখনই সংকুলান হবে না।

অতএব, আমরা দেখতে পেয়েছি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার প্রথম পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শর্তটি এখানে পূর্ণতা লাভ করেছে।

অতঃপর দ্বিতীয় শর্তটির বেলায় প্রদীপের জ্বালানী হিসেবে 'জয়তুন তৈল' নামক (উপমাস্বরূপ) উৎকৃষ্ট জ্বালানীর ব্যবস্থা করেছেন, যে তৈল আগুণ স্পর্শ না করলেও যথেষ্ট আলো দেয়, নিজ থেকেই ব্যাপক আলো ছড়ায়। উক্ত তৈল যে মূলতঃই আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাঁর 'নূর'-ই সমগ্র মহাবিশ্বে প্রভুর পক্ষ থেকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে এবং পূর্ণসমতা বহাল রাখতে পারে এবং চতুর্দিকে সমভাবে ছড়াতে পারে।

তাছাড়া উক্ত তৈল যে আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' সে কথা বক্ষমান আয়াতটির প্রথমেই ঘোষিত হয়েছে। যেমন- "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) আল্লাহ্ তা'আলার 'নূরে' উদ্ভাসিত।" (২৪ ঃ ৩৫)

অতএব, প্রদীপটির জ্বালানী তৈল হিসেবে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র 'নূর'কে সনাক্ত করতে সক্ষম হচ্ছি, যা জ্বালানী হিসেবে সমগ্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে (প্রদীপের ভিতরে যেভাবে তৈল ছড়িয়ে অবস্থান করতে থাকে)। ফলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর (বিষ্ফোরণের পর) আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে জ্বালানী তৈল নামক ঐ 'নূর'-এর মধ্যে আবার ডুবে আছে (পূর্বে উল্লেখিত উপমা রসমলাই-র দুধের মধ্যে রসগোল্লা ডুবে
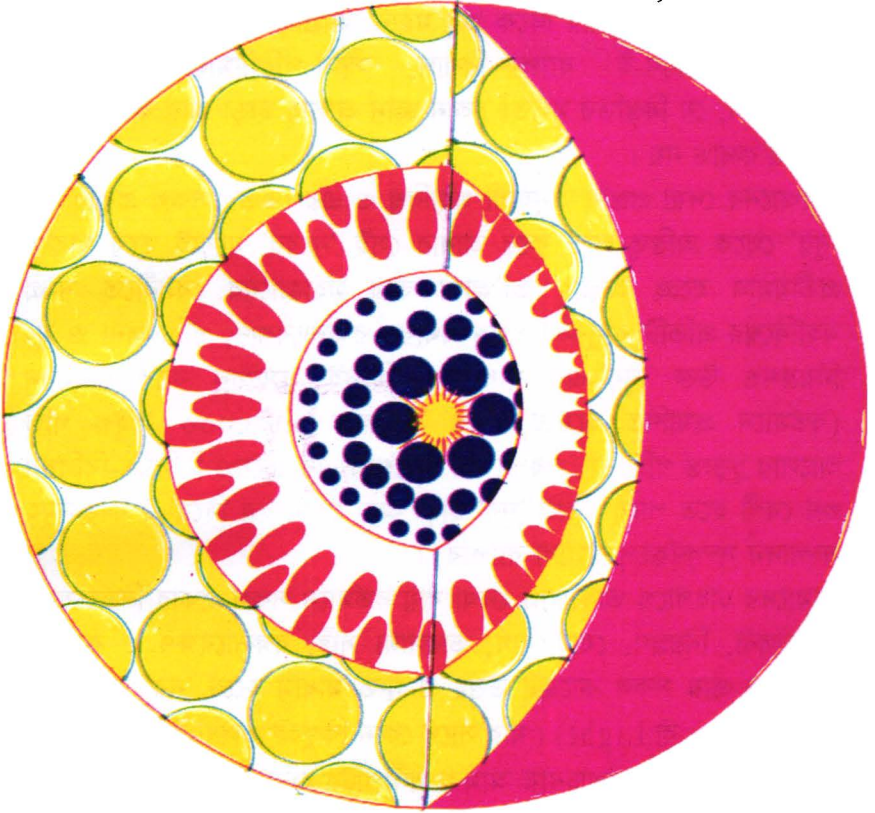
চিত্র -৭

"প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই। সে তো তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।" (৫৩ঃ১৪-১৮)

--'আরশ মহল্লা' দ্বারা পরিবেষ্টিত বক্রাকৃতি বেল্টের ভেতরেই ইহজগত ও পরজগত বিরাজমান। 'আরশ মহল্লা'র সাথে চতুর্দিকেই ভিড়ানো রয়েছে পরকাল তথা 'জান্নাতসমূহ' এবং বক্রাকৃতির তথা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে ইহজগত (এই বস্তুজগত)। ইহজগত ও 'জান্নাত'এর মধ্যস্থানে ব্যবস্থিত হয়ে আছে পরকালে হাশরের তথা বিচারের ব্যবস্থাপনা এবং তার সাথেই 'জাহান্নাম'-এর অগ্নিময় শাস্তির স্থান। আর এই পুরো মহাবিশ্বের সীমান্তের সাথেই বাইরের দিক থেকেই শুরু হয়েছে 'আল্লাহ্ তা'আলা'র পবিত্র আসন তথা 'আরশ মহল্লা'। কুরআনের সরবরাহকৃত ধারণা অনুযায়ী 'আরশ মহল্লা'র পরে বাইরের দিকে শুধু 'নূর' আর 'নূর', যে বিষয়ে মানুষকে আর কোন প্রকার জ্ঞান সরবরাহ করা হয়নি।

থাকার মতই)। মহান স্রষ্টার এ এক মহা কীর্তিই বলা চলে।

ধারাবাহিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধারণাও স্পষ্টতা লাভ করছে যে, 'আর্‌শ মহল্লার' বাইরের দিকে শুধু মহান 'আল্লাহ্'র 'নূর' ও তাঁর পবিত্র সত্ত্বার মহাজ্ঞান-ই ব্যাপক-বিশাল, সীমা-পরিসীমাহীন বিস্তৃতিতে বিরাজমান, যে বিস্তৃতির মূলতঃ কোন জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই, থাকার কথাও নয়।

কুরআনের দেয়া প্রস্তাব অনুযায়ী মহাবিশ্ব ও এর ভেতর সকল প্রকার বস্তু 'নূর' থেকে অস্তিত্ব লাভ করে আবার সেই 'নূরের' মধ্যেই ডুবে থাকায় প্রতীয়মান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের বেষ্টনীতে সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিটি বালুকণা পর্যন্ত যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ, পরিচালনা ও সু-নিয়ন্ত্রণও উক্ত 'নূর'-এর মাধ্যমে নিমিষেই সুসম্পন্ন করে থাকবেন (বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে, প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি আলোর চূড়ান্ত গতি নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়েও বিলিয়ন-বিলিয়ন গুণ বেশী হতে পারে। তাই 'নূর' ছাড়া অন্য কোন বস্তু দিয়ে ঐ কাজসমূহ সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য ব্যাপার)।

আমাদের চারপাশে তাকালেও দেখা যায় বর্তমানে সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, ভারসাম্য সৃষ্টি, রক্ষনাবেক্ষণ ও কর্মক্ষম রাখা সহ প্রায় সকল কাজেই উত্তম ও দ্রুত মাধ্যম হচ্ছে 'নূর' বা আলো (Radiation বা Light)। যার সাথে কোন কিছুরই তুলনা-ই হয় না।

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় আমরা প্রদীপটির জন্য উত্তম 'জ্বালানী তৈল' (Fuel) হিসেবে অতুলনীয় আল্লাহ্‌র পবিত্র 'নূর'কে পেয়েছি, যা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের দ্বিতীয় শর্তটি যথাযথভাবেই পূরণ করেছে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক তৃতীয় শর্তটির ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাবিশ্বটিকে 'আর্‌শ মহল্লা' দিয়ে পরিবেষ্টন করায় মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণ 'বক্রতা' (Curvature) লাভ করার মাধ্যমে উক্ত শর্তটি যথাযথভাবে পূর্ণ করেছে। কেননা 'নূর' বা 'আলো' হচ্ছে 'মূলতঃ চলমান মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার সমষ্টি মাত্র।' তাই 'আরশ মহল্লা' দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ায় ঐ নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে ব্যাপকভাবে তোলপার সৃষ্টি করে পরিভ্রমণের

কারণে সর্বত্র 'নূর'-এর অনুপাত (Ratio) ও ঘনত্ব (Density) সর্বাবস্থায় সমতা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছে।

তাছাড়া এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র 'নূর' থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'হও' নির্দেশ প্রদান করার সাথে সাথে 'নূর'-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে 'চাঞ্চল্য' (Vibration) সৃষ্টি হয়ে গতির ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে থাকবে। বাস্তবভাবে আল্লাহ্‌র 'নূর' মানবীয় জ্ঞানে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বিধায় এর প্রকৃত গতি, রূপ, অবস্থা সবটাই মানবীয় বোধগম্যের বাইরে। তবে এতটুকু বুঝে নিতে পারি যে, সকল প্রকার আলো (Light) বা তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) থেকে এই 'নূর'-এর গতি, বৈশিষ্ট্য ও কর্মক্ষমতা সকল কিছুই অনন্য ও অতুলনীয় উৎকর্ষতায়মন্ডিত। আর সে কারণেই হয়তো এই 'নূর' থেকেই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে। সে কারণে হয়তো বলা যায় 'আর্‌শ মহল্লা' পরিবেষ্টিত স্থানে 'হও' নির্দেশ প্রদানের পর 'নূর'-এর মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে 'গতি' আমাদের অনুমান অসাধ্য এক অসীম স্কেলে উন্নীত হয়ে থাকবে, ফলে 'নূর'-এর আভ্যন্তরীণ অনুপাত ও ঘনত্ব সর্বত্র সমতা বজায় রাখতে বাধ্য ছিল। সুতরাং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পূর্বে 'তৈল' নামক 'নূর'-এর আভ্যন্তরীণ অনুপাত ও ঘনত্ব (Ratio & Density) আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে 'হও' নির্দেশটি প্রদান করার সাথে সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে যথাযথভাবে সর্বত্র সমতা আনে এবং শর্তটি পূর্ণ করে।

চতুর্থ শর্তটিও তৃতীয় শর্তটির মত একই কারণে পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা 'হও' (Be) আদেশ প্রদান করায় 'নূর'-এর মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গতির সূচনা হলে তখন জ্বালানী নামক 'নূর' বার্ণিং পয়েন্ট পর্যন্ত এগিয়ে চলার শর্তটিও পূর্ণ হয়ে যায়।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শর্ত দুটি আমরা একসাথে আলোচনা করতে চাই। উক্ত শর্তসমূহ দাবী করছে যে, একটি বিশেষ পদ্ধতিতে জ্বালানী তৈলকে তথা 'নূর'কে প্রচন্ড ঘনায়ণের মাধ্যমে সম্ভবমত সঙ্কুচিত করে নিতে হবে। যে কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে প্রতিটি প্রদীপের তৈল জ্বলবার যে স্থান (বার্ণিং পয়েন্ট), তার পূর্বের অংশকে সরু বা চিকন করে তৈরী করা

চিত্র -৮

"আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) স্রষ্টা এবং তিনি যখন কোন কাজ সমাধা করিতে চাহেন তখন শুধু বলেন 'হও', সাথে সাথেই উহা হইয়া যায়।" (২ঃ১১৭)

--আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর পবিত্র 'নূর' থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে একটিবারের মত 'হও' নির্দেশ প্রদান করতেই আরশ্ মহল্লা পরিবেষ্টিত বক্রাকৃতি ধারণকারী 'নূর'-এর ভিতর আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। এতে 'নূর'-এর সর্বত্র গতির সঞ্চার হয়ে ঘনত্ব ও তাপমাত্রা (Density & Temperature) একদিকে বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং অপরদিকে সমতা (Equalized) আনয়ন করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার শুধু একটি বারের মত আদেশ 'হও' বলতেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে 'নূর'-এর ভিতর উক্ত চাঞ্চল্য শুরু হয়ে পদ্ধতিগতভাবে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয়বারের মত আর এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করতে হয়নি।

চিত্র -৯

"বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর। আল্লাহ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।" (২৯:২০)

--আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক একমাত্র মহান আল্লাহ তাঁর 'নূর' থেকে মহাবিশ্ব এবং এর ভিতরকার সকল প্রকার বস্তু ও শক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে 'হও' নির্দেশ প্রদান করতেই প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক তোলপাড়ের মাধ্যমে বক্রাকৃতি মহাবিশ্বে গতির আবির্ভাব ঘটে। চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত থাকায় উক্ত গতি একদিকে যেমন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তেমনি অপরদিকে কেন্দ্রমুখী গতির প্রাধান্য ও বাড়তে থাকে। গতিপ্রাপ্ত 'নূর'-এর সকল স্থানে চাপ, তাপ ও ঘনত্ব ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হয়ে থাকে। তাতে তৈল বার্ণিং পয়েন্টে আসার পূর্বেই প্রয়োজন মত সঙ্কুচিত ও উত্তপ্ত (Pre-Heating) হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'নূর'কে 'হও' নির্দেশ দানের ফলে স্রষ্টার প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতার ভয় এবং প্রভাবে 'নূর'-এর ভেতর ব্যাপক চাঞ্চল্য (Fluctuation) সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ গতি, সর্বোচ্চ ঘনত্ব ও সর্বোচ্চ তাপের উদ্ভব হয়ে এবং পূর্বেই 'আরশ্ মহল্লা' কর্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় ঐ 'আরশ্ মহল্লা'-র সর্বোচ্চ বক্রতার (Curvature) চাপে পৃষ্ঠদেশ থেকে ভেতরের দিকে কেন্দ্রমূখী প্রবল টানের কারণে কোন এক পর্যায়ে 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) তৈরী হয়ে থাকতে পারে। একটি বালতিতে পানি ভর্তি করে কাঠি দিয়ে ঘুরাতে থাকলে পানির গতি যখন বৃদ্ধি পায় তখন দেখা যায় সর্বোচ্চ গতির কারণে পানি বালতির ভিতর 'ব্ল্যাক হোলে'র (Black hole) আকৃতি ধারণ করেছে। অনুরূপভাবে বক্রাকৃতি (গোলক আকৃতি) মহাবিশ্বে 'নুর'-এর গতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় কেন্দ্রের দিকে 'ব্ল্যাক হোল' সৃষ্টি হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে যে 'ব্ল্যাক হোল' ক্রমান্বয়ে বিশাল রূপ পরিগ্রহ করে ব্যাপক থেকে ব্যাপক পরিমাণ 'নূর'কে প্রথমে গলাধঃকরণ ও পরে প্রচন্ড ঘনায়ণের মাধ্যমে সঙ্কুচিত ও উত্তপ্ত করে এক মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত করে থাকবে।

এই 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) আদি মহাবিশ্বে সৃষ্টি হওয়ার পিছনে আরও যুক্তি হচ্ছে- 'সুরা ওয়াকিয়া'র ৭৫ ও ৭৬ নং আয়াতদ্বয়। "আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্রসমূহের ধ্বংসপতন স্থানের (ব্ল্যাক হোলের), অবশ্যই ইহা এক গুরুতর শপথ, যদি তোমরা জানিতে" (৫৬ঃ৭৫-৭৬)। এখানে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বিষয়কে শপথ আকারে গুরুত্ব বাড়িয়ে প্রকাশ করার পর আবার বিষয়টিকে 'গুরুতর' ব্যাপার বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় এর পিছনে যে মহাবিস্ময়কর কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, প্রস্তাবটি কিন্তু মানব মনে সেরকম ধারণার স্পর্শ-ই বুলিয়ে যায়। শেষে আরও আকর্ষণ সৃষ্টি করে বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্য মানবসমাজকে বলা হলো "যদি তোমরা জানিতে (পারিতে)"! অর্থাৎ, 'তারকা পতনস্থান'এ (নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসস্থান) বা 'ব্ল্যাক হোল'এর সৃষ্টি ও তার কর্ম তৎপরতা এই
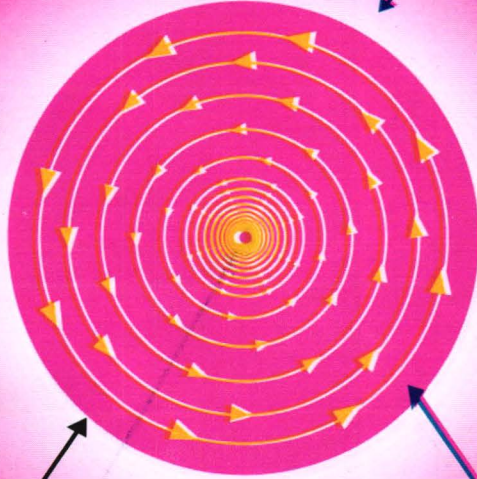
চিত্র -১০

"তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই।" (৫৯ ঃ ২৪)

-- আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন অতুলনীয় এক ও একক মহান পবিত্রতম 'সত্ত্বা'। তাঁর মহাজ্ঞান দিয়ে যে তিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তা মহাবিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসের যে কোন পর্যায়ে জ্ঞানের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম হলে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। তিনি তাঁর 'নূর'-এর একটি নির্ধারিত অংশকে তাঁর পবিত্র 'আসন' দিয়ে ঘিরে ফেলে 'হও' আদেশ করার সাথে সাথে চাঞ্চল্য, তোলপাড় ও গতির সৃষ্টি এবং পরক্ষণে উক্ত গতিকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করায় কেন্দ্রমুখী প্রবল টান সৃষ্টি হয়ে এক সময় 'ঘনায়ন' প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। যা ছবিতে কেন্দ্রে বিন্দু আকারে দেখানো হয়েছে, এই 'ঘনায়ণ' প্রক্রিয়া চালু হওয়াতে 'নূর' বা আলোক শক্তি প্রচণ্ড চাপে এখানে জমতে শুরু করে। ফলে চাপ, তাপ ও ঘনত্ব পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।
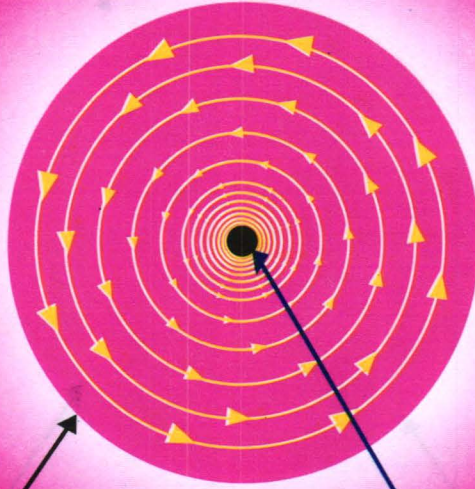
চিত্র -১১

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ?" (২৯ ঃ ১৯)

--ছবিতে কল্পিত মহাবিশ্বের কেন্দ্রে 'Black hole' সৃষ্টির চিহ্ন প্রদর্শিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'তায়ালা তাঁর 'নূর'কে প্রথমে বক্রাকৃতি দান করেছেন। পরে চাঞ্চল্য ও তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং সর্বশেষে গতি ও ক্রমান্বয়ে সেই গতির অস্বাভাবিক মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে শক্তির কেন্দ্র বিন্দুতে ঘনায়ণ প্রক্রিয়ায় একটি 'ব্ল্যাক হোল'- এর সৃষ্টি করেছেন। 'Black hole'টি শক্তির প্রচণ্ড গতি ও চাপের কারনে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ শক্তিকে গলাধঃকরণ করে করে 'নিজদেহ' সত্ত্বাকে বর্ধিত করতে থাকে। এতে করে ঐ নির্দিষ্ট স্থানের আলোক শক্তির চাপ, তাপ ও ঘনত্ব পূর্বের তুলনায় আরও ব্যাপক হারে বেড়ে যেতে থাকে।

মহাবিশ্বের বড় বড় ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে যে জড়িয়ে আছে, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণে তা স্পষ্টভাবে মানবজ্ঞানে ধরা পড়তে পারে। আর তখন তারা দেখতে পাবে তাদের 'প্রভুর' বাণীর যৌক্তিকতা কতখানি এবং যে বাণীর কোন পরিবর্তন নেই।

আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি যে, বর্তমান প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রেই সৃষ্টি হয়ে রয়েছে বৃহৎ-বৃহৎ 'ব্ল্যাক হোল' (দেখুন, আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২, কিয়ামাত-অধ্যায়), যেগুলি সংশ্লিষ্ট গ্যালাক্সীর চূড়ান্ত ধ্বংসমুহূর্তে ওর সমগ্র বস্তুভরকে (Mass) গিলে গিলে এক পর্যায়ে মহাসুক্ষ্ম একটি বিন্দুতে উপনীত করছে, যার অর্থ হচ্ছে প্রবল ধ্বংসমুহূর্তে প্রচন্ডতাকে পূর্ণ সহযোগিতা করে আরও প্রবল করা মাত্র। ফলে প্রথম পর্যায়ে গ্যালাক্সীর আভ্যন্তরীণ সকল ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়ে পরবর্তীতে সমস্ত বস্তুভর (Mass) মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করে প্রচন্ড চাপ ও তাপের কারণে শর্ত পূর্ণ হয়ে নতুন করে বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতুনভাবে জগতের সৃষ্টি করবে। স্পষ্টতঃই প্রমাণ হচ্ছে 'ব্ল্যাক হোল' ছাড়া একটি প্রাক-বিষ্ফোরণ মুহূর্তের জন্য প্রয়োজনীয় 'ঘনায়ণ' ও তার মাধ্যমে চূড়ান্ত 'চাপ ও তাপ' সৃষ্টি করা অন্য কোন পদ্ধতিতে অন্ততঃ এই মহাবিশ্বে সম্ভব নয়, যে রকম 'ব্ল্যাক হোল'র (Black hole) মাধ্যমেই কেবল সম্ভব হচ্ছে।

বক্ষমান আলোচনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শর্ত পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানী তৈলকে (নূরকে) উত্তমভাবে বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে জ্বলবার জন্য উপযোগী পর্যায়ে আনতে যে আভ্যন্তরীণ 'চাঞ্চল্য ও তোলপাড়' (Fluctuation) অত্যন্ত জরুরী ছিল বলে আমরা ইতোমধ্যেই অবহিত হয়েছি, আল্লাহ্ তায়ালার 'হও' নির্দেশটির মাধ্যমে সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং তার ফলে যে ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রকাশ পাওয়ার কথা, তাতে সম্ভবত সেখানে বিশাল এক 'ব্ল্যাক হোলই' সৃষ্টি হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকবে (বালতির ভেতর কাঠি দিয়ে পানি ঘুরাবার মত)। কেননা প্রচন্ড ঘনায়ণ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অনবরত কেন্দ্রমুখী টান এবং তার ফলে বর্ণণাতীত চাপ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য 'ব্ল্যাক হোলে'র মত অত মোক্ষম
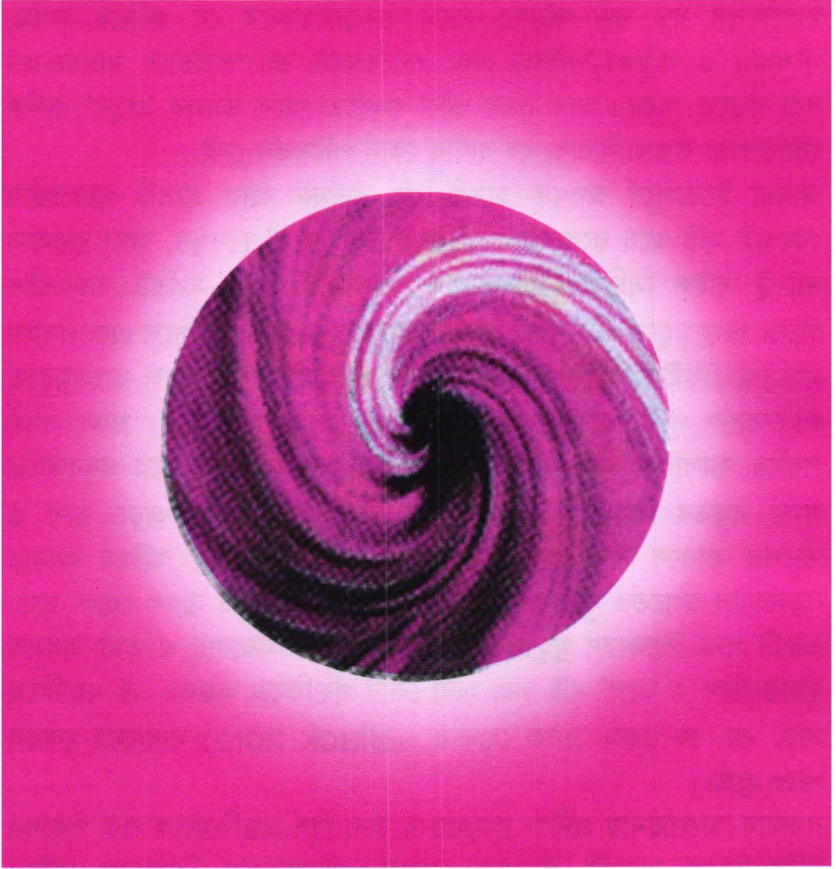
চিত্র -১২

"আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্রসমূহের ধ্বংসপতনস্থানের (Black hole), অবশ্যই ইহা এক গুরুতর শপথ, যদি তোমরা জানিতে।" (৫৬ঃ৭৫,৭৬)

--আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে এবং পরবর্তীতে এক একটি ব্যাক্তি গ্যালাক্সী ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তেও Black hole-এর অতুলনীয়, ভয়ংক ও অবিশ্বাস্য কর্মকান্ড সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ব্ল্যাক হোল চৌঙের (Tunnel) ভিতর যে কোন বস্তুকে ঘনায়ন পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ সংকোচনের মাধ্যমে যেভাবে প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা যায়, তা অন্য কোনভাবেই এই মহাবিশ্বে সম্ভব নয়। আজকের বিজ্ঞান বিশ্বে বিষয়টির সত্যতা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্-কুরআনে তাই গুরুত্বপূর্ণ এই 'ব্ল্যাক হোল' বিষয়ক বক্তব্যটি ব্যাপক গুরুত্বসহ উপস্থাপিত হয়েছে। ছবিতে সর্বোচ্চ শক্তিসনন্ন 'ব্ল্যাক হোল' সংকোচনের চূড়ান্ত মুহূর্তে ব্যাপকভাবে 'নূর'কে ঘনিয়ে ফেলতে দেখা যাচ্ছে।
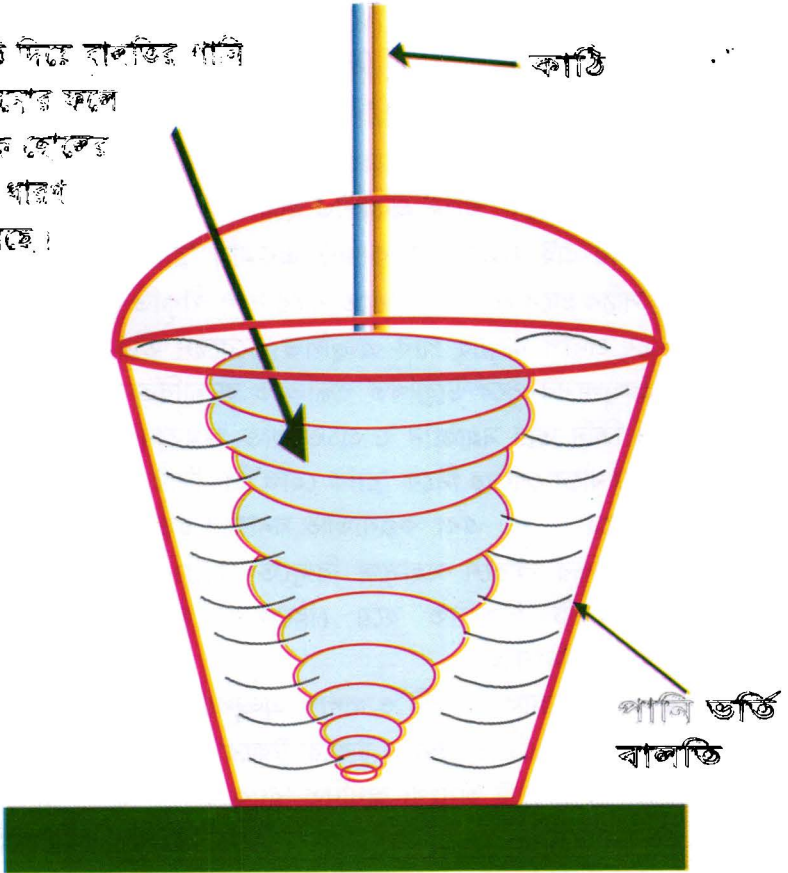
চিত্র -১৩

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।" (২ ঃ ২২৮)

--ছবিতে একটি বালতির ভিতর রক্ষিত পানিকে একটি কাঠি দিয়ে ঘুরানোর এক পর্যায়ে ঘুর্নণগতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাল্তির কেন্দ্রের দিকে নিচে শেষপ্রান্তে চুড়ান্ত ঘনায়ন তথা 'ব্ল্যাক হোল'র যে গঠনাকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রদর্শন করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে একটি 'ব্ল্যাক হোল'-এ অনুরূপ 'জিওমেট্রি' সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'নূর' কে অনুরূপ পদ্ধতিতে মহাসংকোচনে নিক্ষেপ করে প্রায় সমস্ত আলোকশক্তিকে (কল্পিত মহাবিশ্বের) প্রচন্ড চাপে 10^{-33} cm. স্থানে আবদ্ধ করেছিলেন। যে অকল্পনীয় 'শূন্য প্রায়' অবস্থায়-ই একটি মহাবিষ্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার মত পর্যায়ে পৌছার যোগ্যতা অর্জন করেছিল এবং যে বিষ্ফোরণের পরিণতি-ই হচ্ছে আজকের এই মহাবিশ্ব।

ব্যবস্থা দ্বিতীয় আরেকটি প্রাকৃতিকভাবে এখনও মানবজ্ঞানে ধরা পড়েনি এবং কুরআনের প্রস্তাবেও আমরা সে ধারণাই লাভ করে থাকি।

আমরা আরও অবহিত হয়েছি যে, বিস্ফোরণ ঘটে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তুভর (Mass) এক মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে ক্ষুদ্রস্থানে (10^{-33} cm) আটকানো ছিল। যার জন্য বিস্ফোরণ ঘটে গিয়ে পরবর্তীতে মহাসংকোচনে জমানো 'শক্তি' প্রকাশিত হয়ে বর্তমান মহাসম্প্রসারণে রূপ নিয়েছে। আর এই কল্পনাতীত কাজটি একমাত্র 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole)ই সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে বলে স্বীকৃতি রয়েছে।

অতএব, যে প্রদীপ আল্লাহ্ পাক প্রজ্জ্বলিত করেছেন তাঁর 'নূর' দিয়ে, তা পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলনের পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে অঘোষিত অথচ প্রয়োজনীয় শর্তগুলোও তিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতার বলে সম্পন্ন করে থাকবেন। যেখানে শেষের দিকে 'ব্ল্যাক হোল' প্রকাশিত হয়ে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কল্পনাতীত ঘনায়নে চূড়ান্ত পর্যায়ের চাপ ও তাপ মাত্রা বৃদ্ধির কারণে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) ঘনীভূত 'শক্তির' আঁধারটি প্রজ্জ্বলিত হয়ে (বিস্ফোরণ ঘটিয়ে) বর্তমান এই মহাবিশ্বটির জন্ম দিয়েছে।

অতঃপর বিশাল 'ব্ল্যাক হোলটি'ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের (বিস্ফোরণের) প্রচণ্ড ধাক্কায় (Thrust-এ) ছিন্নভিন্ন ও টুকরো টুকরো হয়ে সৃষ্ট নবীন মহাবিশ্বে ছিট্‌কে গিয়ে ছোট ছোট অসংখ্য-অগনিত 'ব্ল্যাক হোলে' রূপ নিয়ে থাকতে পারে, কেননা ছিন্নভিন্ন হওয়া প্রতিটি অংশেই পূর্বের শক্তি (মহাকর্ষ বল) তখনও গতিজড়তার কারণে বিরাজমান থাকায় বিকল্প অন্য কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তখন 'ব্ল্যাক হোল' আর 'ব্ল্যাক হোল'-ই প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটে থাকবে। অর্থাৎ, কোটি-কোটি 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) সৃষ্টি হয়ে থাকবে নবীন মহাবিশ্বে। আর একারণেই হয়তোবা আল্লাহ্ তা'আলা 'ব্ল্যাক হোলের' গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। সুতরাং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শর্ত দুটিও যে বাতি প্রজ্জ্বলনের পূর্বেই পূরণ করে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরীতে অবদান রেখেছিল সে কথা স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

চিত্র -১৪

"উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী।" (২২:৭৪)

--ছবিতে আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 'হও' নির্দেশ লাভ করার পর ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে এগিয়ে গিয়ে মহাসংকোচন পদ্ধতিতে 'ব্ল্যাক হোল'-এ চূড়ান্তভাবে 10^{-33} cm.-এ ঘনীভূত হয়ে পড়ে। উক্ত বিন্দুতে তখন মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তুভর একত্রিত অবস্থায় মিশে ছিল।

এই অবস্থায় বিন্দুবত শক্তির আধারটিতে চাপ অসীম স্কেলে উন্নীত হওয়ায় তাপমাত্রাও অসীম এক স্কেলে উঠে আসে। একই কারণে শক্তির ঘনত্বও অনুরূপভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলা পদ্ধতিগতভাবে 'ব্ল্যাক হোল'-এর মাধ্যমে তাঁর 'নূর'কে মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্ণিত পর্যায়ে আনয়ন করেন। যা সর্বশক্তিমান স্রষ্টা হিসেবে একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পক্ষেই এ জাতীয় মহাবিস্ময়কর কর্মকান্ড ঘটানো সম্ভবই না।

চিত্র -১৫

"যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে (উহাদের প্রত্যেককে) পৃথক করিয়া দিলাম (প্রচণ্ড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে) এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে, তবুও কি উহারা ঈমান আনিবে না ?" (২১ ঃ ৩০)

--আল্লাহ্ তায়ালার 'নূর'-এর বিশাল পরিমাণ অংশ 'ব্ল্যাক হোল' পদ্ধতিতে প্রচণ্ড ঘণায়নের কারণে মহাসঙ্কোচনপ্রাপ্ত হয়ে যখন (10^{-33} cm) মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে জমে যায়, তখন বিন্দুটিতে শক্তির চাপ ও ঘণত্ব অসীম এক স্কেলে উন্নীত হওয়ায় তাপমাত্রাও সর্বোচ্চ পর্যায়ে (প্রায় 10^{32} k-এ) উঠে যায়। আর সাথে সাথেই বিন্দুটি সামাল দিতে না পেরে এক মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে মহাসম্প্রসারণের স্রোতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। উল্লেখিত বিষ্ফোরণটিকেই 'আল্লাহ্ তা'আলা' উপমা স্বরূপ বাতি বা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কথা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মুলতঃই বিষ্ফোরণ ও বাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্যে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য নেই।

চিত্র -১৬

"তাঁহার 'নূর'-এর উপমা যেন একটি দ্বীপাধার। যাহার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ।" (২৪ ঃ ৩৫)

--ওপরের ছবিতে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রদর্শন করা হয়েছে। আল্-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা একটি প্রদীপের উপমা.টেনে বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত হতে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কতকগুলো কাজ যেমন পূর্বেই সম্পন্ন করে নিতে হয়, তেমনিভাবে তার 'নূর' থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে অর্থাৎ, 'বিগ ব্যাংগ' বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই বিশ্বজগতের আবির্ভাব ঘটাতে তাঁকে 'বিগ ব্যাগ' এর পূর্বেই প্রাক প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো এক এক করে পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন করে নিতে হয়েছে।

এখানে মূলতঃই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা 'বিগ ব্যাংগ' মহাবিস্ফোরণকেই ব্যাখ্যা করেছেন। যাতে সহজেই মানব সম্প্রদায় তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

চিত্র -১৭

"তিনি ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।" (৩০ ঃ ৫৪)

--আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন তথা মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে যে মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়েছেন সেই বিষ্ফোরণের প্রচন্ডতায় বৃহৎ 'ব্ল্যাক হোল'টিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে অসংখ্য-অগণিত খন্ডে চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়েছে, কিন্তু গতিজড়তার কারণে ছিট্‌কে পড়া প্রতিটি খন্ডই আবার নবীন মহাবিশ্বে নতুন পরিবেশে 'ব্ল্যাক হোল'এ রূপ নিয়েছে। ঐ অগণিত-অসংখ্য 'ব্ল্যাক হোল'ই এখন প্রতিটি গ্যালাক্সীর ভিতর বৃহৎ (Massive) আকার-আকৃতি ধারণ করে ব্যাপক রাক্ষসী তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় আবার গ্যালাক্সীর ধ্বংসীয় কাজে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। যে কারণে জ্ঞানীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন "ব্ল্যাক হোল-এর কর্মকান্ড যদি তোমরা জানিতে।" (৫৬ ঃ ৭৬)

চিত্র -১৮

"তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন তিনি বলেন 'হও', তখনই হইয়া যায়। তাঁহার কথাই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

"আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত (বর্ণনা)।" (২৪ ঃ ৩৪)

--আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর 'নূর' থেকে একটা ধারাবাহিক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি সরাসরি এবং ক্ষেত্রবিশেষে উপমা ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়ে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, মানবসম্প্রদায় যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় যখন বিষয়গুলো উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালাবে, তখন তারা তাদের প্রভুর দেয়া তত্ত্বের গণ্ডির ভিতরই নিজেদের আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনকে দেখতে পাবে। কেননা আল্লাহ্ 'সত্য' বলেন এবং তাঁর কথার কোন নড়চড় হয় না।

এবার আমরা আবার সূরা 'নূর'-এর ৩৫নং মূল আয়াতের শেষের অংশে ফিরে যাচ্ছি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে-"আলোর উপর আলো"।

আল্লাহ্‌র 'নূর' প্রজ্জ্বলিত হয়ে মহাবিশ্বের সূচনা করার সময় নবীন মহাবিশ্বটি শুধু 'নূর আর নূরের'-(আলো আর আলোর) ঝল্‌কানিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ, মহাবিশ্বটি ব্যাপক আলোক রশ্মির এক মহাসাগরে পরিণত হয়ে ছিল, যে আলো থেকেই পরবর্তীতে ধাপে ধাপে মহাজাগতিক বস্তুর উদ্ভব হয়েছে।

একটু খুলে বললে বলা যায়, প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর (বিস্ফোরণ ঘটার পর) 'নূর'-এর ঘনত্ব ও তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের ওপর নির্ভর করেই মহাবিশ্ব ও এর সকল প্রকার পদার্থ ও বস্তু তাদের অস্তিত্ব ধারণ করেছে। তাই এই ধাপসমূহের ভিন্নতাকে মৌলিকভাবে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার নিমিত্তে জ্ঞানপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে- 'আলোর ওপর আলো' বাক্যটি দিয়ে। বিষয়টি জ্ঞানবানদের জন্য বিরাট গবেষণার ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে, যার প্রকৃত বাস্তবতা দর্শনে তাদের অন্তরচক্ষু খুলে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র 'সত্ত্বা'র উপস্থিতিতে তাঁর 'নূর' থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ময়কর ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন জ্ঞানময় কৌশলটি জ্ঞানীদের প্রখর দৃষ্টির সামনে তিনি এভাবে সহজ ও বোধগম্য 'উপমা' (প্রদীপ) দিয়ে খোলামেলা অথচ বিজ্ঞোচিতভাবে পেশ করে তাদেরকে সুধালেন এই বলে যে, যখন তারা হাতে-কলমে প্রমান পেয়ে বুঝতে সক্ষম হলো- 'এক আল্লাহ' অতীব-সুকৌশলে উক্ত মহাবিস্ময়কর কাজটি তাঁর 'নূর' (আলো) থেকেই সুসম্পন্ন করেছেন, তখন তাঁর সেই 'নূর'-এর আলো ঝল্‌মল্ পথে শরীক হওয়ার জন্য যদি কেউ অগ্রসর হয় তাহলে 'আল্লাহ্' তার ঐ কামনাকে সফলতায় পৌঁছাবার জন্য নিজ থেকেই করুণা করে সঠিক পথের দিশা তাকে দান করে থাকেন।

অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত আয়াত সমূহের শেষের বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে- যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা সকল বিষয়ে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ ও কোন্ 'উপমা' প্রদান ফলপ্রসু ও সহায়ক হবে, তা তিনিই ভালো জানেন এবং সে ভাবেই তিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে পৃথিবীর মানবমন্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রকৃত

বাস্তবতার একেবারে নিকটবর্তী যা দীপাধার ও প্রদীপ, কাঁচপত্র, জ্বালানী তৈল ও 'আলোর উপর আলো' নামে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। সমাজের জ্ঞানীরা বিষয়টির যথার্থতা অনুধাবন করার নিমিত্তেই তিনি উক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণেরত হলে তারা অবশ্যই দেখতে পাবে তাদের 'প্রভুর' বাণী সর্বোতভাবে সত্যমন্ডিত, যেখানে অন্য কিছুর (অসত্ব্যের) চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর তখন নিরেট বাস্তবতার কারণে তাদের সম্মূখে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হবে যে, তাদের প্রভু এক ও একক স্রষ্টা 'আল্লাহ' এক চিরসত্য, চির বাস্তব পবিত্র সত্ত্বা এবং তাঁর বিপরীতে সবই মিথ্যা।

আমাদের এই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' বিষয়ক মহাগ্রন্থ 'কুরআনের' উদ্ধৃত বাণীসমূহের এই হচ্ছে মোটামুটি মর্মকথা। (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন)।

ওপরে 'কুরআনিক' দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের এই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the Universse) বিষয়ে আলোচনার মধ্যে যে মূল পয়েন্টগুলো আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, আমরা এখন সেগুলিকে সাজিয়ে নিতে চাই। যেমন ঃ

(১) আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিজগতে অতুলনীয় এক ও একক 'সত্ত্বা' যিনি মহাজ্ঞানী, মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী।

(২) অবিশ্বাসীরা স্পষ্টতঃই তাদের দূর্ভাগ্যের কারণে আল্লাহর সঠিক মর্যাদা বুঝতে পারে না।

(৩) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা (Unlimited Power) ও অসীমজ্ঞানের (Unlimited Knowledge) মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

(৪) তিনি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী যখন যা চান তখন তা-ই সৃষ্টি করেন এবং এই ব্যাপারে ইচ্ছা করে শুধু 'হও' নির্দেশ প্রদান করতেই সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হয়ে কাঙ্খিত অস্তিত্ব ধারণ করে।

(৫) সমগ্র মহাবিশ্ব ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল প্রকার বস্তুই আল্লাহ্ তায়ালার 'নূর' (Highest Energetic Radiation) থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়ে আবার সেই 'নূর'-এর মধ্যেই বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে ভাসছে।

(৬) আল্লাহ্ তায়ালার 'নূর' সীমা-পরিসীমাহীন, বিরাট-বিশাল বিস্তৃতিতে দীপাধারের ন্যায় ছড়িয়ে আছে, যার প্রকৃত অবস্থা শুধু তিনিই জানেন। মানবজ্ঞানে তা কখনই উপলব্ধি করার মত বিষয় নয়।

(৭) সীমা-পরিসীমাহীন সেই 'নূর'-এর মাঝে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে 'আসন' বিশিষ্ট 'আর্‌শ মহল্লা' দ্বারা পরিবেষ্টন (বক্রাকৃতি দান) করা হয়েছে, ফলে ঐ এলাকায় 'নূর'- (Highest Energetic Radiation) এর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় গতি, চাপ, তাপ ও ঘনত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

(৮) 'আর্‌শ মহল্লা' দ্বারা পরিবেষ্টিত 'নূর'-এর প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে 'হও' নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে ব্যাপক চাঞ্চল্য, (Vibration) তোলপাড় (Fluctuation) সৃষ্টি হয়ে 'নূর'-এর গতি, ঘনত্ব, চাপ ও তাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং সর্বত্র সমতা আনয়ণ করে।

(৯) একই সময় সীমাহীন চাঞ্চল্য ও গতির বৃদ্ধি ঘটায় বক্রাকৃতি ধারণকারী আদি মহাবিশ্বে কেন্দ্রমুখী প্রবল 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force) সৃষ্টি হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ এক 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রচন্ড ঘনায়ণ শুরু করে।

(১০) এক পর্যায়ে 'ব্ল্যাক হোল' ব্যাপকহারে 'নূর' (Highest Energetic Radiation)কে গিলে গিলে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘনায়ণের মাধ্যমে এক 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে' (Singularity) জমিয়ে দেয়। ফলে ঐ বিন্দুতে 'নূর'-এর ঘনত্ব, চাপ ও তাপমাত্রা এক অসীম স্কেলে গিয়ে পৌঁছে।

(১১) অসীম ঘনত্ব, চাপ ও তাপমাত্রা প্রাপ্ত 'শক্তির' আধার নামক ঘনায়ণকৃত 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটি' আর স্থির থাকতে না পেরে প্রচন্ড 'বিস্ফোরণ' ঘটিয়ে মহাবিশ্বে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

(১২) সমগ্র নবীন মহাবিশ্ব 'আলোর বন্যা'য় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সর্বত্র শুধু তখন 'আলো আর আলো' (Radiation & Radiation) বিরাজমান।

(১৩) অসীম শক্তির মহাবিষ্ফোরণের প্রভাবে 'ব্ল্যাক হোল'টি নিজের অস্তি-ত্বকে ধরে রাখতে পারেনি, অসংখ্য খন্ডে টুকরো টুকরো হয়ে নবীন মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি খন্ডই আবার নতুন নতুন 'ব্ল্যাক হোল'র জন্ম দেয় 'গতি জড়তা'র কারণে।

(১৪) পরবর্তীতে ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে সৃষ্ট আলোর বন্যার আভ্যন্তরীণ ঘনত্ব ও তাপ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায়, এক এক পর্যায়ে বা ধাপে-ধাপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে ঐ আলোর বন্যা হতে এই মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। এক কথায় ধাপ সমূহকে গুছিয়ে বললে 'আলোর ওপর আলো' (Radiation upon Radiation) বলা যায়।

(১৫) প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের (বিষ্ফোরণ ঘটার) মাধ্যমেই যে আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রকৃত পক্ষে যাত্রা শুরু (Beginning) ঘটেনি বরং তারও অনেক পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে (আল্লাহর 'নূর'-এর মাঝে 'হও' নির্দেশ প্রদানের কারণে যে তোলপাড় ও 'ব্ল্যাক হোল' সৃষ্টি হয়ে এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়) সে কথাও প্রমাণিত হয়েছে। পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ ছাড়া মূলতঃ কিছুই ঘটতে পারে না বিধায় (Big Bang) শুরু নয়; বরং আদি 'নূর' থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে।

(১৬) মহাবিশ্বের প্রকৃত আদি ইতিহাস কুরআনের অনুকুলে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় 'আল্লাহ্' তায়ালার পবিত্র সত্ত্বার উপস্থিতি স্বপ্রমাণে হাজির হয়েছে।

(১৭) আল্লাহ্‌র মহাবাণীর কোন পরিবর্তন নেই। সকল যুগে নিরেট 'সত্য-সঠিক' উদ্‌ঘাটন ঐশীগ্রন্থ কুরআনের পদতলেই কেবল আশ্রয় নিতে বাধ্য।

(১৮) 'আল্লাহ্'কে সত্যরূপে জানার পর যে বা যারা তাঁকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে চাইবে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই তখন সঠিক

পথ 'আলোর পথে' পরিচালিত করবেন। এটা 'আল্লাহ্'র ওয়াদা। আর আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না।

(১৯) এই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় মহান আল্লাহর সত্যতাকে বিশ্বব্যাপী সগৌরবে বহন করে বেড়াচ্ছে। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ উদ্ঘাটন যার প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছে।

বিজ্ঞান ঃ

মানব ইতিহাস হতে জানা যায় যে, বিজ্ঞানের যাত্রাক্ষণ থেকেই মানব সম্প্রদায় এই মহাবিশ্বের সূচনা বিষয়ক 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the Universe) সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চালিয়ে এসেছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি 'মহাবিশ্ব' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম, তাই শত চেষ্টা করেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সঠিক সমাধানমূলক বড় ধরনের কোন সুরাহা পেশ করতে পারেনি। তবে বিজ্ঞানীসমাজ যে হাল ছাড়েননি, বরং দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অনরবত অধ্যবসায়ের সাথে তাদের গবেষণাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সে কথা স্বীকার করতেই হয় এবং ইতোমধ্যেই তারা যে এ ব্যাপারে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশ অগ্রসরও হতে পেরেছেন, আমরা আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ে এখন তা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো, ইন্শাআল্লাহ্।

আমাদের এই মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (Cosmology) ও 'মুলতত্ত্ব' (Origin of the Universe) নিয়ে প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাবের ঝড় বিজ্ঞানীমহলে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীতেই বেশি। শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় সবাই নিজ নিজ সিদ্ধান্তের আলোকে এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। এদের কেউ বললেন, একটি বিশৃংখলার ভিতর থেকেই মহাবিশ্বের জন্ম। কেউ বললেন, মহাবিশ্ব শৃংখলার ভিতর দিয়ে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে আবার নিজ থেকেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আবার কেউ এসে বললেন, কারো কথাই সঠিক নয়, মূলতঃ মহাবিশ্বটির সৃষ্টিও নেই এবং ধ্বংসও নেই। পূর্ব থেকেই

এভাবে আছে আবার অনন্তকাল পর্যন্তও এভাবেই থাকবে। আবার কেউ এসে বলে গেলেন, কারো কথাই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রতিটি দিক ও বিভাগেই ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সর্বাবস্থায় ব্যাপকজ্ঞানের সমারোহ, নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি ও শৃংখলা এবং ক্রমের যে ধারা বিদ্যমান তাতে একথাই প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে, একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তিধর 'সত্ত্বা' সৃষ্টি করেছেন, যিনি এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ অদৃশ্য থেকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করছেন। আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটিয়ে তিনি সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিবেন।

উল্লেখিত শেষের দিকের প্রস্তাবের সমর্থনে বেলজিয়াম জগত বিজ্ঞানবিদ 'ল'মেইটর' (L-Maitor) ১৯২৭ সালে বেসরকারিভাবে (Un Officially) 'সৃষ্টিতত্ত্বঃ বিগ-ব্যাংগ' প্রকাশ করলেও ১৯৩৩ সালেই প্রথম সরকারীভাবে (Officially) সমগ্র বিশ্বব্যাপী তা প্রচার করেন যদিও তখন বিজ্ঞানী 'স্যার জেমস্ এইচ জেইন'র দৈবক্রমে বিশৃংখলায় জন্ম নেয়া মহাবিশ্ব বিষয়ক প্রস্তাবটি একচেটিয়া বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সময় 'বিগ-ব্যাংগ (Big Bang) প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন লাভ করলেও এর হিসাবের মধ্যে কিছু ভুল থাকায় জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। এরই সুযোগে ১৯৪৮ সালে থমাস গোল্ড, হারম্যান বন্ডি, ও ফ্রেড হোয়েল সহ অনেকেই নতুন প্রস্তাব হিসাবে 'ষ্টেডি ষ্টেট' (Steady State) প্রস্তাব পেশ করেন। তাদের এই নতুন প্রস্তাবের মূলবক্তব্য হলো- এই মহাবিশ্বের শুরুও নেই আবার শেষ বলতেও কিছু নেই। অনাদিকাল থেকেই মহাবিশ্বটি এভাবে আছে আবার অনন্তকাল পর্যন্তও তা এভাবেই থাকবে, শেষ হবে না। খালি মাঠে 'গোল' করার মত এই নতুন প্রস্তাবটি 'বিগ-ব্যাংগ'-এর জায়গা দখল করে নেয়।

'ষ্টেডি ষ্টেট' (Steady State) প্রস্তাবটি বেশী দিন বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করতে পারেনি। ১৯৫০ সালেই 'রেডিও এ্যাসট্রোনমি' (Radio Astronomy) এসে একে প্রত্যাখান করে। এরই ফাঁকে ১৯৪৬ সালে
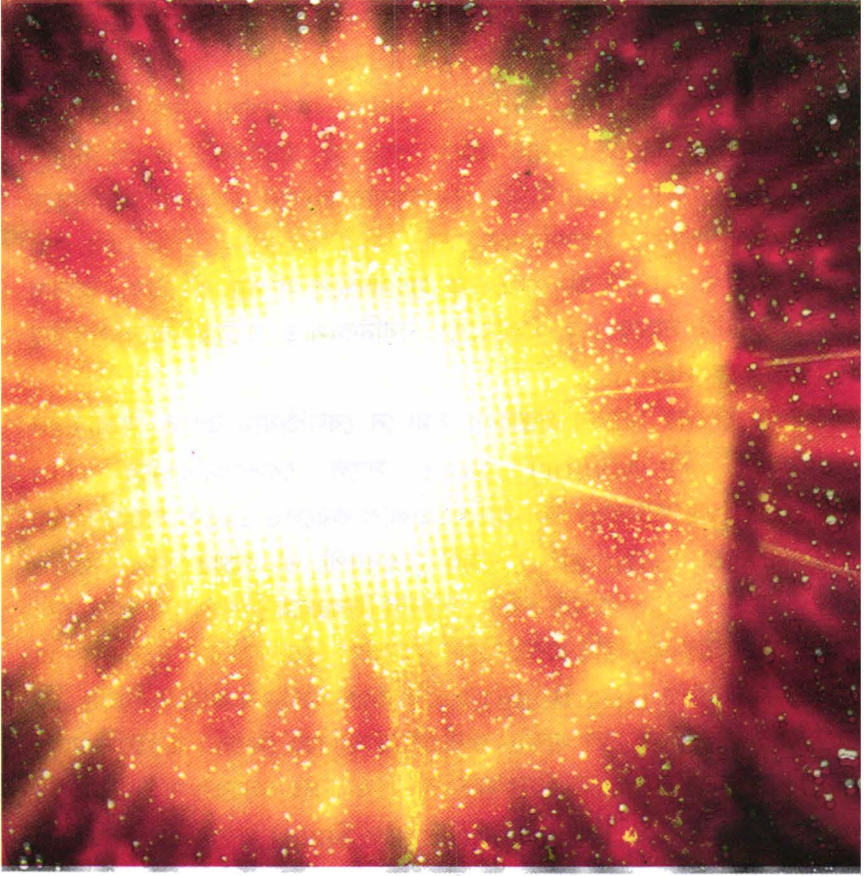
চিত্র -১৯

"বলো, আল্লাহ্-ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০:৩৪)

--দীর্ঘ সময় থেকেই মানবসমাজের জ্ঞানীজন আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কমবেশী চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা লাভ করতে না পারায় তারা পূর্বে বেশী একটা অগ্রসর হতে পারেননি। মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীতে এসেই বিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানের নতুন বিস্তৃত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে তাদের গবেষণা কাজকে চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ফলে একাধিক প্রস্তাব এ বিষয়ে উত্থাপিত হয়। তবে সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'Big Bang' প্রস্তাবটি অন্যান্য সকল প্রস্তাবের তুলনায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় মানবসমাজের মনে আশার আলো সঞ্চার করে, যা বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'জর্জ ল' মেইটর' ১৯২৭ সালে বেসরকারীভাবে তা প্রথম প্রকাশ করেন।

মার্কিন বিজ্ঞানী 'মি-গামো' (Mr. Gamo) 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) কে সমর্থন করেন এবং ম্যাথমেটিক্যালী প্রমাণ করে দেখান যে, 'বিগ-ব্যাংগ' সত্য ঘটনা। প্রমাণ হিসেবে 'বিগ-ব্যাংগ' বিষ্ফোরণ পরবর্তী সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকণার অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা প্রায় ৩ k. (Back Ground Radiation 3k.) এখনও মহাবিশ্বে বর্তমান আছে বলে মত প্রকাশ করেন এবং যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা উদ্‌ঘাটিত হতে পারে বলে জানান। যাই হোক এভাবে তথ্যের টানাপোড়েন চলতে থাকাবস্থায় ১৯৬০ সালে 'দূর্বল বেতার ধ্বনি' (Feeble Radio Hiss) 'বিগ-ব্যাংগ' প্রস্তাবকে সমর্থনের মাধ্যমে আবার জোরালোভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরে। অবশেষে ১৯৬৫ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী 'আর্নো পেনজিয়াস' (Arno Pezias) ও 'রবার্ট উইলসন' (Robert Wilson) 'Bell' টেলিফোন কম্পানীতে তাদের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তৈরী 'আলট্রা সেনসিটিভ রেডিও এ্যানটেনাতে' (Ultra Sensitive Radio Antena) এক প্রকার নতুন ধরনের শব্দের সন্ধান লাভ করেন এবং ঐ শব্দকে তাপমাত্রায় পরিবর্তন (Convert) করার সাথে সাথেই ২.৭৩k. নির্দেশ করে। বিজ্ঞানীগণ ব্যবহৃত 'এ্যানটেনাকে' মহাবিশ্বের যেদিকেই ঘুরান সকল দিকেই উক্ত ২.৭৩k. নির্দেশ করায় প্রায় ২৫ বছর পূর্বে বিজ্ঞানী মিঃ গামোর প্রস্তাবকৃত পশ্চাদপট বিকীরণ (Back Ground Radiation 2.73k) প্রমাণিত হয়ে বিজ্ঞানী 'ল মেইটর' কর্তৃক প্রস্তাবকৃত 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বিশ্ববাসীর জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মূখে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক 'সত্য' প্রস্তাব হিসেবে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যায়। সর্বত্র 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বিষ্ফোরণকে নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে কম্পিউটার সিমুলেশন (Computer Simulation) ও Boomarang, Maxima এবং COBE Satellite এর মাধ্যমে তোলা ছবির সাহায্যেও বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে ব্যাপক তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম

চিত্র -২০

"বলো, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান করো আল্লাহ্ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।" (২৯ ঃ ২০)

--মানবসমাজের মধ্যে অনেকের মতই বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'জর্জ ল' মেইটর' এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গিয়ে 'মহাবিস্ফোরণ' (Big Bang) তথ্য ও তত্ত্বকে খুঁজে পান। ১৯২৭ সালে তিনি তা প্রথম তার ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে প্রকাশ করেন। পরে ১৯৩৩ সালে প্রস্তাবটিকে তিনি সরকারীভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচার করেন। প্রস্তাবটি অন্যান্য প্রস্তাবের তুলনায় অধিকতর বাস্তবতা সম্পন্ন হওয়ায় সমাজের জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। সর্বত্র এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনা শুরু হয়ে যায়। পক্ষে-বিপক্ষে কথা উঠতে থাকে। কিন্তু ১৯৬৪ সালের পূর্বে মানবসমাজ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। উক্ত সময়ে অন্যান্য প্রস্তাবের মত জ্ঞানের সাগরে 'বিগ ব্যাংগ' প্রস্তাবটিও হাবুডুবু খাচ্ছিল।
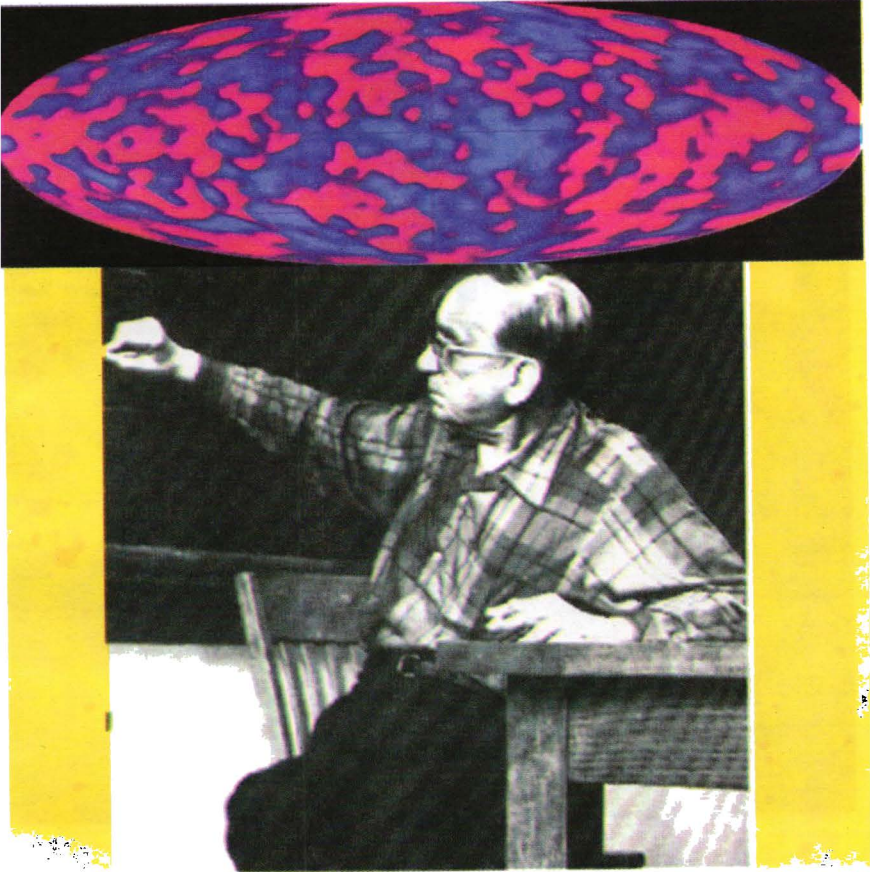
চিত্র -২১

"তাহারা কি নিজেদের মধ্যে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং ইহাদের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথ পরিমাপে ও সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।" (৩০ ঃ ৮)

--বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো'(Mr. Gamo) ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে অনুধাবন করতে গিয়ে একপর্যায়ে বিজ্ঞানী 'জর্জ ল' মেইটর' কর্তৃক উত্থাপিত সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'বিগ-ব্যাংগ' প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি উক্ত 'বিগ-ব্যাংগ' প্রস্তাবকে সঠিক প্রস্তাব হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে ম্যাথম্যাটিক্যালি হিসেব করে দেখান যে, মহাবিষ্ফোরণ ঘটার সময় যে ভয়ানক তাপমাত্রা ($10.^{32}K.$) সৃষ্টি ও প্রদর্শিত হয়েছিল- তা পর্যায়ক্রমে কমতে কমতে এখন প্রায় মাত্র ৩ K. (তিন কলভীন) এ নেমে এসেছে। যথাযথভাবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হলে তা আবিস্কৃত হতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।
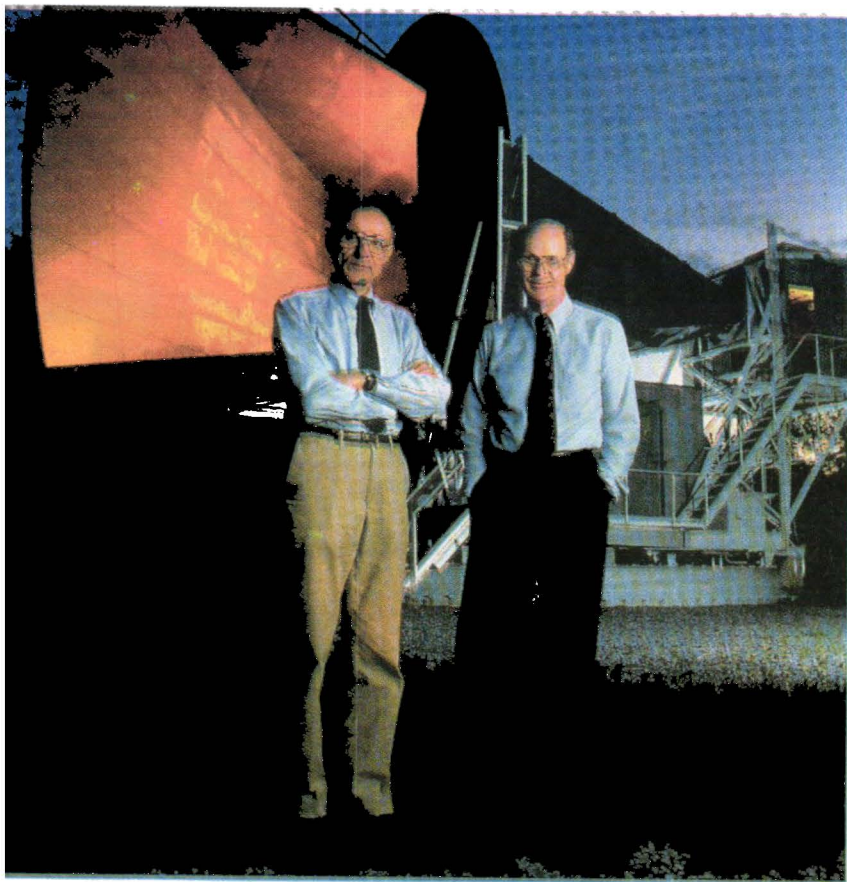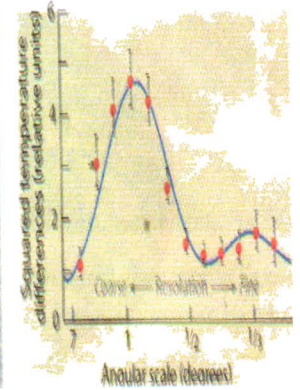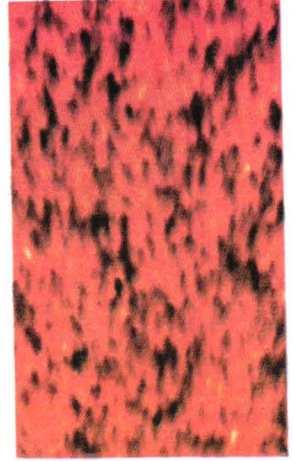
চিত্র -২৩

" তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বা অদৃশ্য বিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং খুব শীগ্রই তোমরা অবহিত হইবে"। (৬ ঃ ৬৭)

-- ১৯৬৪ সালে 'বিগ-ব্যাংগ' মহাবিস্ফোরনে ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় 2.73K. আবিস্কৃত হওয়ায় সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী হৈ চৈ পড়ে যায়। বিজ্ঞান বিশ্ব বিষয়টিকে আরও দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য পরবর্তীতে কয়েকটি প্রজেক্ট হাতে নেয়। `Boomerang' ও `Maxima' প্রজেক্টের আওতায় বেলুনে টেলিস্কোপ স্থাপন করে মহাকাশে পাঠিয়ে অসংখ্য ছবি ধারণ করে আবার বেলুনকে ভূমিতে নামিয়ে এনে ছবিগুলো এ্যানালাইছিছ করে প্রমান করেন যে, পূর্বে উদঘাটিত 2.73 K. তাপমাত্রা সত্য ঘটনা।

চিত্র -২৪

"তিনিই মানুষকে অবহিত করিয়াছেন, ইতোপূর্বে যা সে জানতো না।" (৯৬ ঃ ৫)

" তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

-- ওপরের ছবিতে `COBE Satellite' ও `Big Bang' মহাবিস্ফোরণে ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তুকণার অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Cosmic Microwave Background Radiation) দেখানো হয়েছে। 'Boomerang ও Maxima' প্রজেক্টের পর 'COBE Satellite' এর মাধ্যমে বিজ্ঞান জগত মহাকাশের ছবি ধারণ করে পরবর্তীতে উল্লেখিত তাপীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে একই ফলাফল(অর্থাৎ 2.73 K. তাপমাত্রা) লাভ করেন। এতে মহাকাশের সর্বত্র 'Background Radiation' যে বিরাজমান আছে এখনও, তা সনাক্ত করতে সক্ষম হন। ফলে বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ব 'Big Bang' প্রস্তাব মেনে নেয়া হয়।

হন। আজকের পরিবেশ পর্যন্ত 'বিগ-ব্যাংগ' মডেলের (Big Bang Model) মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ যে সকল তথ্যের সাগর লাভ করেছেন তাতে তারা এই প্রস্তাবের বাস্তবতার আলোকেই মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিষয়সমূহ, পরিবেশসমূহ ও জটিলতাকে খুবই চমৎকার ও সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছেন, যা অন্য কোন প্রস্তাব দিয়ে সম্ভব নয়। আজকে সে জন্য অন্যান্য দূর্বল ও ভিত্তিহীন প্রস্তাবগুলো 'বিগ-ব্যাংগের' মুকাবিলায় কোন প্রকার ভিত্তি না পেয়ে নিজ থেকেই ক্রমান্বয়ে নির্মূল হয়ে বিদায় গ্রহণ করছে।

'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বলতে প্রচন্ড উচ্চ শব্দে 'মহাবিষ্ফোরণ' প্রকাশ পায়, যে মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের এই মহাবিশ্বটি বর্তমান অস্তিত্ব লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। 'ষ্টান্ডার্ড বিগ-ব্যাংগ মডেল' (Standard Big Bang Model) অনুযায়ী 'বিগ-ব্যাংগ' বিষ্ফোরণটি যে মুহূর্তে ঘটেছিল তখন সময় ছিল $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড, অর্থাৎ এক লিখে তার ডানে ৪৩টি শূন্য বসিয়ে যে বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে এক সেকেন্ডকে ততভাগ করে তার থেকে মাত্র এক ভাগ নিলে যে সূক্ষ্ম সময়মান পাওয়া যাবে তার সমান। অর্থাৎ, এক সেকেন্ডকে প্রথমে মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করে তাকে বিলিয়ন দিয়ে পরে আবার ট্রিলিয়ন দিয়ে এবং সব শেষে জিলিয়ন দিয়ে ভাগ করলে যে মহাসূক্ষ্ম কল্পনাতীত সময়মান পাওয়া যাবে তার সমান। এই সময় মহাবিশ্বে তাপমাত্রা $১০^{৩২}$ k. (কেলভীন) ছিল। অর্থাৎ, এক লিখে তার পিঠে ৩২টি শূন্য বসিয়ে যে মান পাওয়া যাবে তার সমান কেলভীন তাপমাত্রা। মহাবিশ্বের আয়তন মহাসূক্ষ্ম একটি বিন্দুসম প্রায় $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার, যা শুধু তাত্ত্বিকভাবেই মেনে নেয়া যায়। তখন '৪টি মৌলিক শক্তি' (Basic Four Forces) একত্রিত অবস্থায় (Unified) বিরাজমান ছিল। বিষ্ফোরণ পরবর্তী নবীন মহাবিশ্বটি 'সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তেজস্ক্রিয়তা' (Highest Energetic Radiation) দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। অগ্নিগোলক (Primordial Fire Ball) মহাসম্প্রসারণের নেশায় কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি ঘটতে াকে। তখনও কোন প্রকার পর্দা সৃষ্টি হয়নি।

সময় বৃদ্ধি পেয়ে যখন $১০^{-৩২}$ সেকেন্ড, তখন নবীন মহাবিশ্বটি উত্তপ্ত নরম 'অগ্নিগোলক'রূপে বৃদ্ধি পেয়ে $১০^{-২৪}$ সেন্টিমিটারে পৌঁছে। এ সময় প্রথম 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force) পৃথক হয়ে যায়। তাপমাত্রা কমে $১০^{২৮}$ k.-এ পৌঁছে। তেজস্ক্রিয়তার (Radiation) 'শক্তিশালী ফোটন' (Energetic Photon) কণিকা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের (Colliding) সূত্রপাত ঘটিয়ে প্রথম মহাসূক্ষ্ম পদার্থ কনিকা 'কোয়ার্ক' (Quark) ও 'এ্যান্টি কোয়ার্ক' (Anti Quark) সৃষ্টি করতে থাকে। কোয়ার্ক ও রেডিয়েশনের মিশ্রণে ঘন কুয়াশার (Dense Fog) সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব পূর্ণ করে দেয়।

পরবর্তীতে সময় গড়িয়ে যখন $১০^{-৬}$ সেকেন্ড, তখন মহাবিশ্বটি আরো বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের বর্তমান সৌর জগতের সমান আকৃতি ধারণ করে। ফলে তাপমাত্রা $১০^{১৩}$ k.-এ নেমে আসে। প্রবল পারমাণবিক শক্তি (Strong Nuclear Force) আলাদা হয়ে যায়। 'কোয়ার্ক' এবং 'এন্টি কোয়ার্ক' পরস্পর সংঘর্ষে 'এ্যানিহিলেশান' (Annihilation) ঘট্‌তে থাকে।

সময় যখন পূর্ণ এক (১) সেকেন্ড, তখন মহাবিশ্বটি কয়েকটি সৌরজগতের সমান আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তাপমাত্রা আরও কমে গিয়ে $১০^{১০}$ k.-এ উপনীত হয়। সংঘর্ষে উদ্বৃত্ত 'কোয়ার্ক' পদ্ধতিগতভাবে একত্রিত হয়ে 'প্রোটন' (Proton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) নামক ক্ষুদ্র পদার্থ কণিকার জন্ম দিতে থাকে। ঘন কুয়াশা তখনও বিরাজমান।

'বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি' (Electro Magnetic Force) ও 'দূর্বল পারমাণবকি শক্তি' (Weak Nuclear Force) পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।

তারপর সময় আরো বেড়ে গিয়ে যখন পূর্ণ তিন মিনিট, তখন মহাবিশ্ব কয়েক আলোকবর্ষ (Light Year) বৃদ্ধি ঘটে। তাপমাত্রা কমে $১০^{৯}$k-এ পৌঁছে। পদার্থ কণিকা 'প্রোটন' (Proton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' (Atomic Nuclei) গঠন শুরু করে। ঘন কুয়াশা (Dense Fog) তখনও কাটেনি।
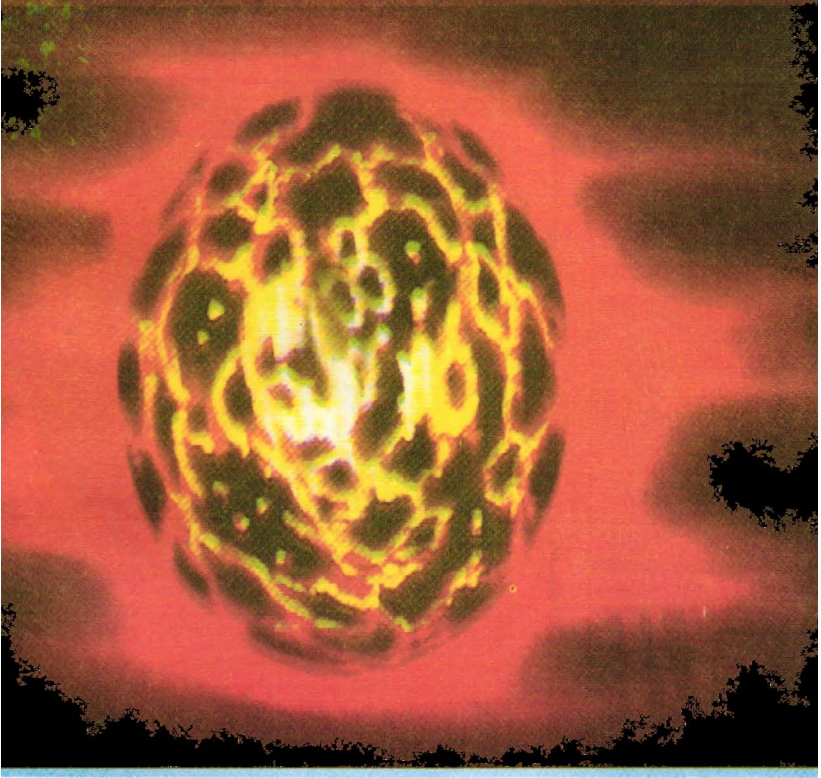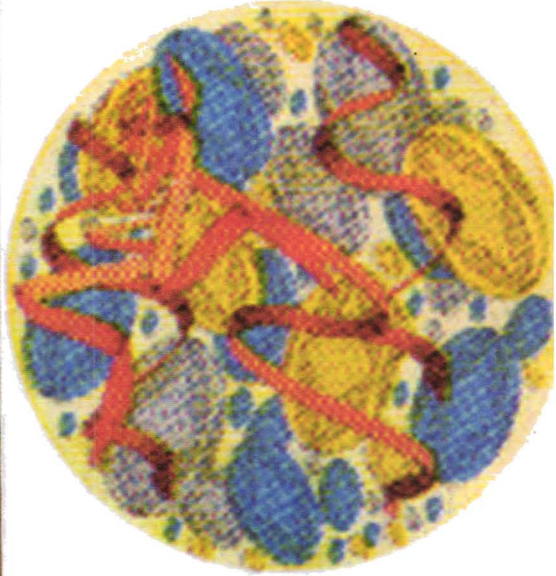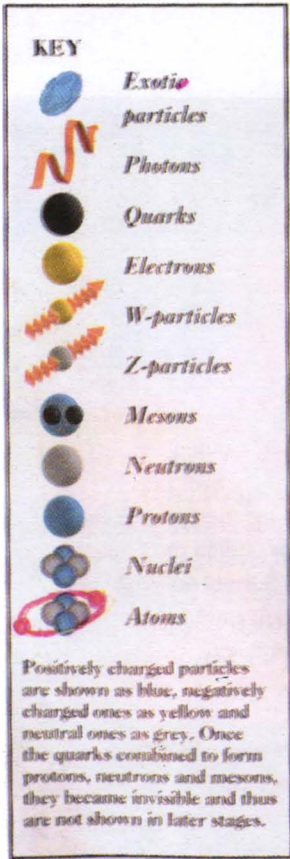
চিত্র -২৬

"এই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হইতে তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন আয়ত্তাধীন, নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে অনেক শিক্ষণীয় নিদর্শন।" (৪৫ ঃ ১৩)

--আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের আয়ত্তাধীন করে দেয়ার কারণেই প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া 'বিগ-ব্যংগ' মহাবিষ্ফোরণকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষত মাধ্যমে জ্ঞানের মাপকাঠিতে খুঁজে বের করতে সক্ষম হচ্ছে।

মহাবিষ্ফোরণ পরবর্তী অগ্নিগোলকের বয়স যখন 10^{-32} Sec. তখন তাপমাত্রা 10^{17} K. এ নেমে আসে। তখন প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তায় 'ফোটন' কণিকা সমূহ পরিবেশ অনুকুলে পেয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সুত্রপাত ঘটিয়ে প্রথম বারের মত পদার্থ কণিকারূপে 'কোয়ার্ক' (Quark) ও প্রতি পদার্থ কণিকারূপে 'এ্যান্টি কোয়ার্ক' (Anti-Quark) সৃষ্টি করে। এই সময় নবীন মহাবিশ্বের আয়তন প্রায় 10^{-24} cm. 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force) পৃথক হয়ে যায়।
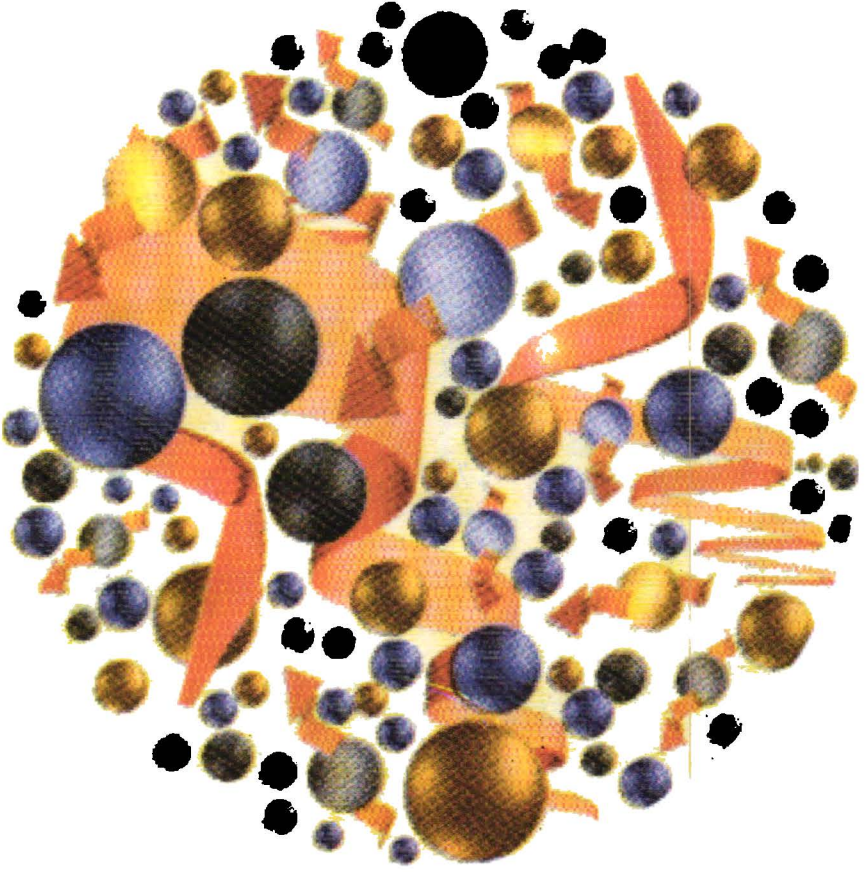
চিত্র -২৭

"তোমাদের সত্য প্রতিপালক স্রষ্টা, তিনিই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব, হে মানুষ! বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় ফিরিয়া চলিলে ?" (৪০ ঃ ৬২)

--মহা বিস্ফোরণের পর সময় যখন 10^{-6} Sec. তখন নবীন মহাবিশ্বটি আরও বর্ধিত হয়ে প্রায় আমাদের বর্তমান সৌরজগতের সমান আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ফলে তাপমাত্রাও কমে 10^{3} K-এ উপনীত হয়। উক্ত তাপমাত্রার পরিবেশে অনুকূল পরিবেশ তৈরী হওয়ায় 'কোয়ার্ক' (Quark) এবং 'এ্যান্টি কোয়ার্ক' (Anti-Quark) পরস্পর সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়, এতে একে অপরকে ধ্বংস করতে থাকে। এই অবস্থায় 'সবল পারমানবিক শক্তি' (Strong Nuclear Force) আলাদা হয়ে পৃথক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পদার্থ এবং তেজস্ক্রিয়তার মিশ্রণে সৃষ্ট 'ঘন কুয়াশা' (Dense Fog) দিয়ে নবীন মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়।
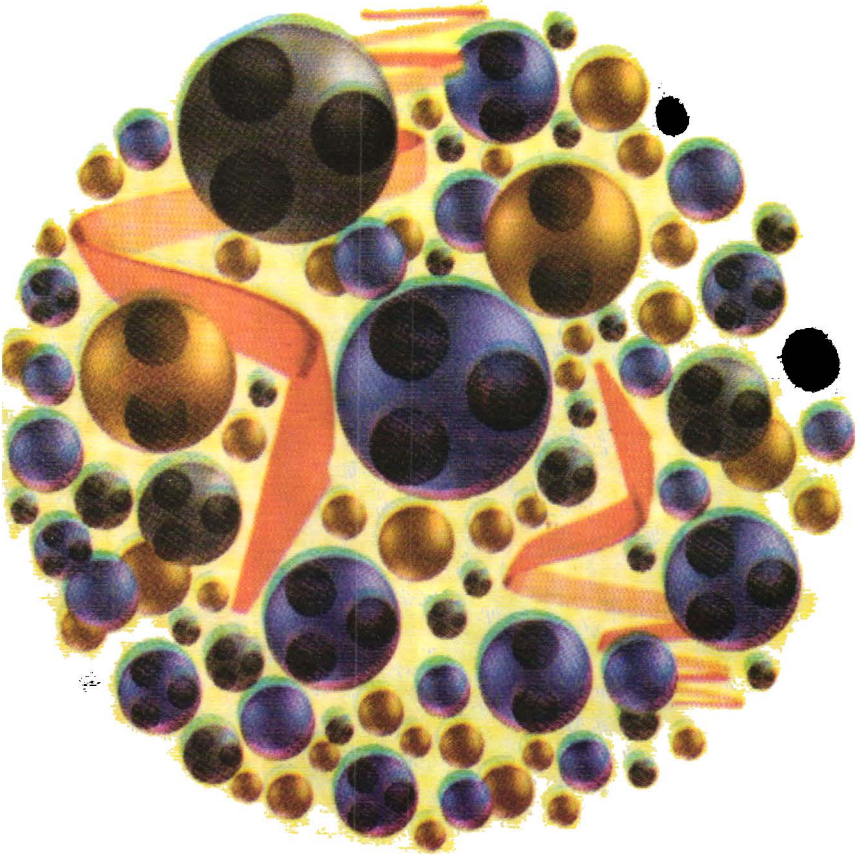
চিত্র -২৮

"আল্লাহ্‌র বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাণ। (১৩ ঃ ৮)
--সৃষ্ট নবীন মহাবিশ্বটির বয়স যখন পূর্ণ এক সেকেন্ড (1 Sec.), তখন মহাবিশ্বটি বর্ধিত হয়ে আমাদের সৌরজগতের ন্যায় কয়েকটি সৌরজগতের সমান আয়তন দখল করে মহাশূন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাপমাত্রা আরো কমে 10^{10} K. এ আগমন করে। এই অবস্থায় সংঘর্ষে বেঁচে থাকা উদ্বৃত্ত 'কোয়ার্ক' অনুকূল পরিবেশ লাভ করে একাধিক একত্রিত [illegible] 'প্রোটন' (Proton), নিউট্রন (Neutron), ইলেকট্রন (Electron) ও নিউট্রি[illegible]) কণিকাসমূহ সৃষ্টি করতে থাকে। উক্ত পরিবেশে 'বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি' (Electromagnetic Force) ও 'দূর্বল পারমানবিক শক্তি' (Weak Nuclear Force) আলাদা হওয়ার সুযোগ পেয়ে পৃথক পৃথক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ঘন কুয়াশা তখনও বিরাজমান।
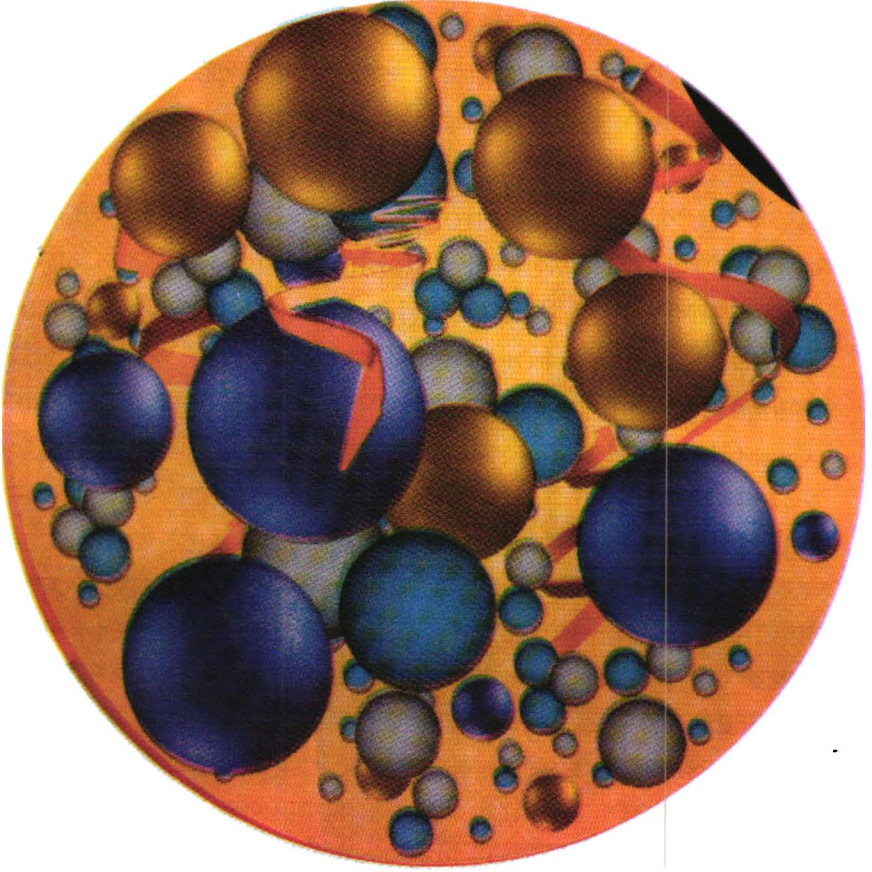
চিত্র -২৯

"তাহারা কি নিজেদের মধ্যে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং এদের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ (সকল প্রকার পদার্থ ও শক্তিসমূহ) সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথ পরিমাপে সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।" (৩০ : ৮)

--সৃষ্ট নবীন মহাবিশ্বের বয়স যখন পূর্ণ 'তিন মিনিট' (3 Minutes), তখন মহাবিশ্বটি চতুর্দিকে মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে কয়েক আলোকবর্ষ (Light Year) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাপমাত্রা আরও অনেক কমে গিয়ে 10^9 K. এ উপনীত হয়। এতে পরিবেশ অনুকূলে আগমন করায় 'প্রোটন' ও'নিউট্রন' কণিকা মিলিত হয়ে মহাবিশ্বে প্রথমবারের মত 'এ্যাটমিক নিউক্লি'(Atomic Nuclei) গঠন করতে থাকে। ঘন কুয়াশা তখনও মহাবিশ্ব ঢেকে আছে।

এরপর ক্রমান্বয়ে সময় গড়িয়ে যখন প্রায় তিন লক্ষ (৩,০০,০০০) বৎসর, তখন ব্যাপক সময়ের ব্যাবধানের কারণে মহাবিশ্বটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ঘটে গিয়ে তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, প্রায় ৩০০০ k-এ নেমে আসে। ফলে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' (Atomic Nuclei) পদার্থ কণিকা 'ইলেকট্রন'কে (Electron) ধারণ করে প্রথমবারের মত এই মহাবিশ্বে 'অটল বা স্থায়ী পরমাণু' (Stable atoms) সৃষ্টি করতে থাকে। এই সময় পদার্থ থেকে 'রেডিয়েশন' (Radiation) পৃথক হওয়ার কারণে 'ঘন কুয়াশা' (Dense Fog) দূরীভূত হয় ঠিকই, তবে 'অটল বা স্থায়ী পরমাণুর' (Stable Atoms) ব্যাপক ঘনত্বের কারণে সৃষ্ট ধোঁয়ার মেঘ (Gas Cloud) দিয়ে মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

অতঃপর সময় আরো গড়িয়ে যখন প্রায় এক বিলিয়ন বৎসর, তখন মহাবিশ্ব আরও বৃদ্ধি পেয়ে তাপমাত্রা মাত্র ২০ k-এ নেমে আসে। ধূঁয়ার আকারে ছড়িয়ে থাকা পদার্থকণা থেকে 'অভিকর্ষ' বলের প্রভাবে প্রথমতঃ 'গ্যালাক্সী' মহাজাগতিক বস্তুরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। সময় গড়িয়ে যখন মহাবিশ্বটি ১৫ বিলিয়ন বছর অতিক্রম করে তখন আরও সম্প্রসারিত হয়ে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ আয়তন দখল করে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাপমাত্রা আরও কমে গিয়ে ৩ k.-এ পৌঁছে। আর তখনই ঐ পরিবেশে মানুষরূপে আমাদের আগমন সম্ভব হয় এই মহাবিশ্বে এবং মহাবিশ্বকে নিয়ে গবেষণায় নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ আমরা পেয়ে যাই। বর্তমান বিজ্ঞানের প্রমাণিত 'বিগ-ব্যাংগ মডেল'র (Big Bang Model) আঙ্গিকে আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বিবর্তন এবং আমাদের অবস্থানের এ হচ্ছে মোটামুটি বর্ণনা।

'বিগ-ব্যাংগ মডেল' (Big Bang model) থেকে আমরা আরও অবহিত হতে পেরেছি যে, বিষ্ফোরণ পরবর্তী পরিবেশে সময় যখন এক সেকেন্ড এবং তাপমাত্রা $১০^{১০}$k তখন সংঘর্ষে বেঁচে থাকা 'কোয়ার্ক' (Quark) পরস্পর একত্রিত হয়ে ব্যাপকভাবে 'নিউট্রন' ও 'প্রোটন' (Neutron, Proton) সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে ঐ সকল পদার্থকণা দিয়ে মহাবিশ্বটি পূর্ণ হতে থাকে। পরবর্তী ধাপে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাসমূহ
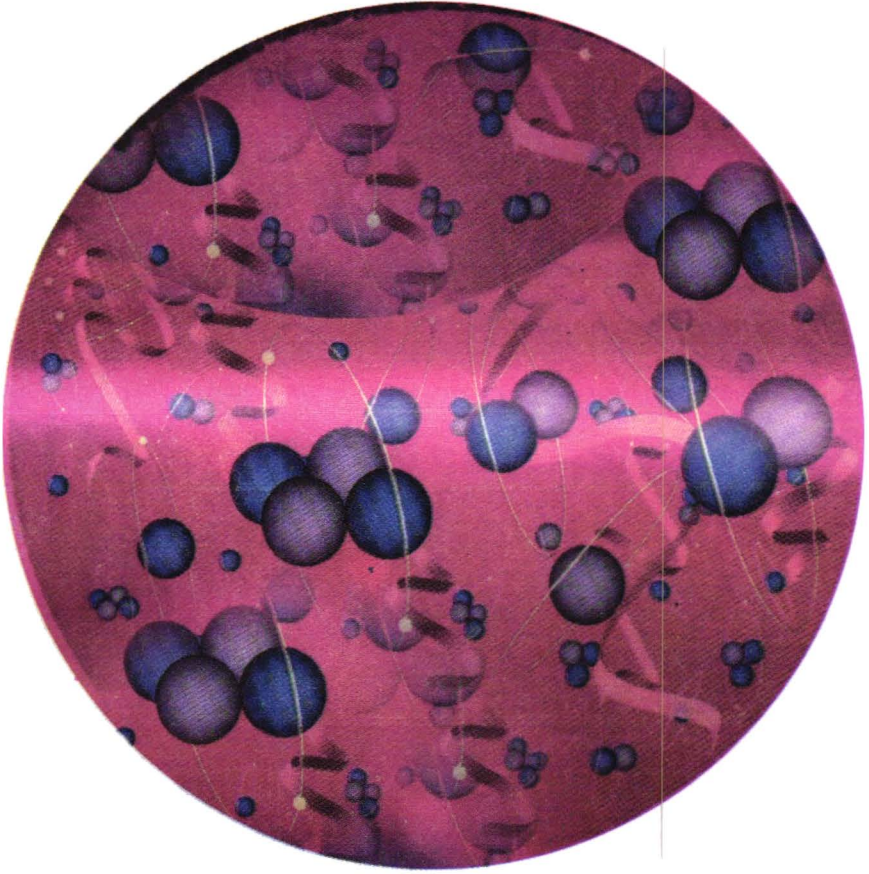
চিত্র -৩০

" তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) ছয়টি সময়কালে (পর্যায়ে) সৃষ্টি করিয়াছেন। " (৫৭ ঃ ৪)
-- মহাবিস্ফোরণের পরে সময় গড়িয়ে গড়িয়ে মহাবিশ্বের বয়স তিন লক্ষ (৩,০০,০০০) বৎসর প্রায়, তখন মহাবিশ্বটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে বর্ধিত হয়ে যায়। ফলে তাপমাত্রাও ব্যাপক হারে কমতে কমতে মাত্র ৩০০০ K. এ নেমে আসে। অপেক্ষাকৃত এই ঠান্ডা পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতিতে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' (Atomic Nuclei) 'ইলেক্ট্রন' (Electron) কণিকাকে চারপাশে কক্ষপথে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং প্রথমবারের মত মহাবিশ্বে 'স্থায়ী' বা 'অটল পরমানু' (Stable Atom) সৃষ্টি করতে থাকে। এতে করে ঘন কুয়াশা (Dense Fog) দূরীভূত হয়। তবে সৃষ্ট পদার্থ কণার মেঘপুঞ্জ (Gas Cloud) দিয়ে মহাবিশ্ব আবার ছেয়ে যায়।
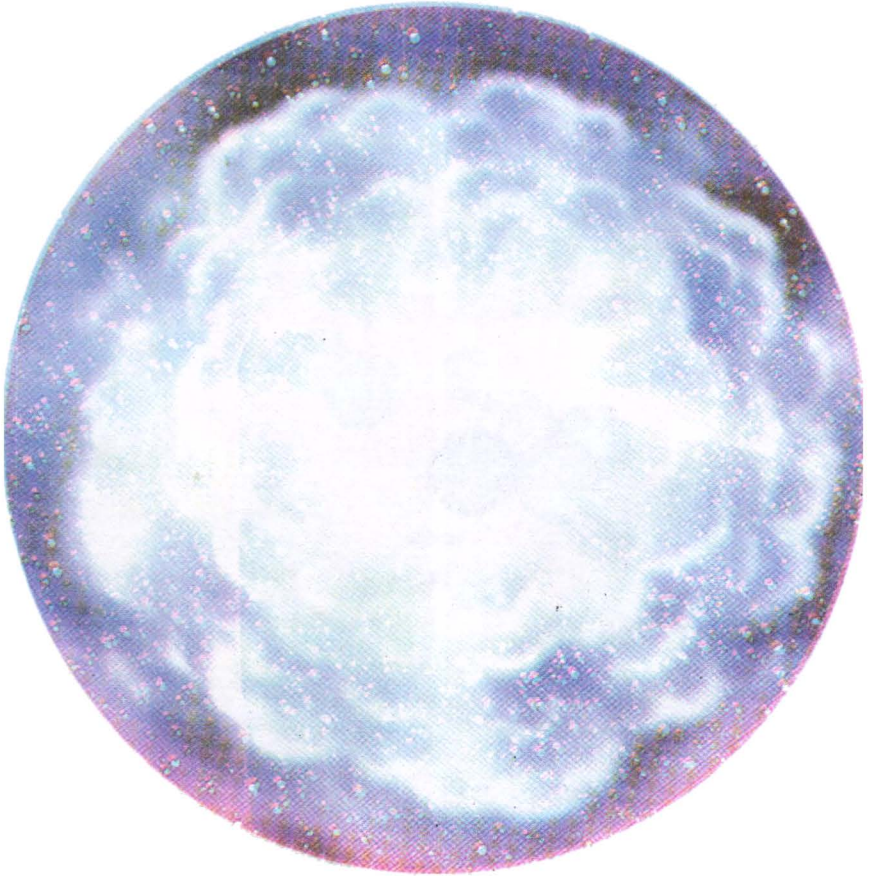
চিত্র -৩১

-"এতদ্ভিন্ন তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যাহা ছিল 'ধূঁয়ায়' পরিপূর্ণ। অনন্তর তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (সমগ্র মহাবিশ্বকে) বলিলেন, "তোমরা উভয়-ই আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, "আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।" (৪১ ঃ ১১)

--'বিগ-ব্যাংগ' নামক মহাবিষ্ফোরণ থেকে সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে চূড়ান্তভাবে মোট ছয়টি পর্যায়ে অতিক্রমের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের মূলভিত্তি হিসেবে 'পরমানু' (Atom) সৃষ্টি হয়। এই 'পরমানু'ই স্থায়ী পদার্থ (Stable Atom)। পরবর্তীতে উক্ত ধূঁয়াময় পরমানুসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে 'অনু' (Molicule), আবার অগনিত 'অনু' মিলিত হয়ে 'বস্তু' এবং অসংখ্য 'বস্তু' মিলিত হয়ে এই বিশ্ব এবং বিলিয়ন বিলিয়ন অনুরূপ বিশ্ব একত্রিত হয়ে বিশাল এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব ধারণ করেছে।

Magenta

চিত্র -৩২

"অতিশয় উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন তিনিই সেই মহান আল্লাহ্, যিনি আকাশে সৃষ্টি করিয়াছেন গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ) এবং সুর্য ও চন্দ্র।" (২৫ ঃ ৬১)

--মহাবিস্ফোরণের পর সৃষ্ট মহাবিশ্বটির বয়স যখন প্রায় এক বিলিয়ন বৎসর, তখন বিশাল বিস্তৃতিতে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া মহাবিশ্বে তাপমাত্রা আরো অনেক কমে গিয়ে মাত্র ২০ K.এ পৌঁছে যায়। এ সময় পদার্থ কণার ধূঁয়ায় পূর্ণ মেঘময় পরিবেশ থেকে 'প্রোটো গ্যালাক্সী'সমূহ (Proto-Galaxies) সৃষ্টি হতে থাকে। এই 'প্রোটো-গ্যালাক্সী'রূপ ধারণ করার জন্য অবশ্য মহাজাগতিক তারের (Cosmic String-এর) বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেগুলো ধূঁয়ার পরিবেশে আবির্ভূত হয়ে 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force)-এর প্রভাবে মহাবিশ্বকে গুচ্ছাকারে রূপ

চিত্র -৩৩

" আমরা আকাশে সৃষ্টি করিয়াছি সুরক্ষিত দূর্গসদৃশ গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ) উহাদিগকে আমরা সজ্জিত করিয়াছি তাহাদিগের জন্য যাহারা প্রকৃত দর্শক।" (১৫ ঃ ১৬)

--মহাবিশ্বের বয়স যখন প্রায় চার বিলিয়ন বৎসর, তখন 'প্রোটো-গ্যালাক্সী'গুলো পূর্ণ গ্যালাক্সী রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে মহাবিশ্বটি প্রায় দশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত চতুর্দিকে মহাসম্প্রসারণের কারণে ছড়িয়ে পড়ে। এক একটি গ্যালাক্সী প্রায় গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ স্থান জুড়ে মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান প্রায় একশ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছে।
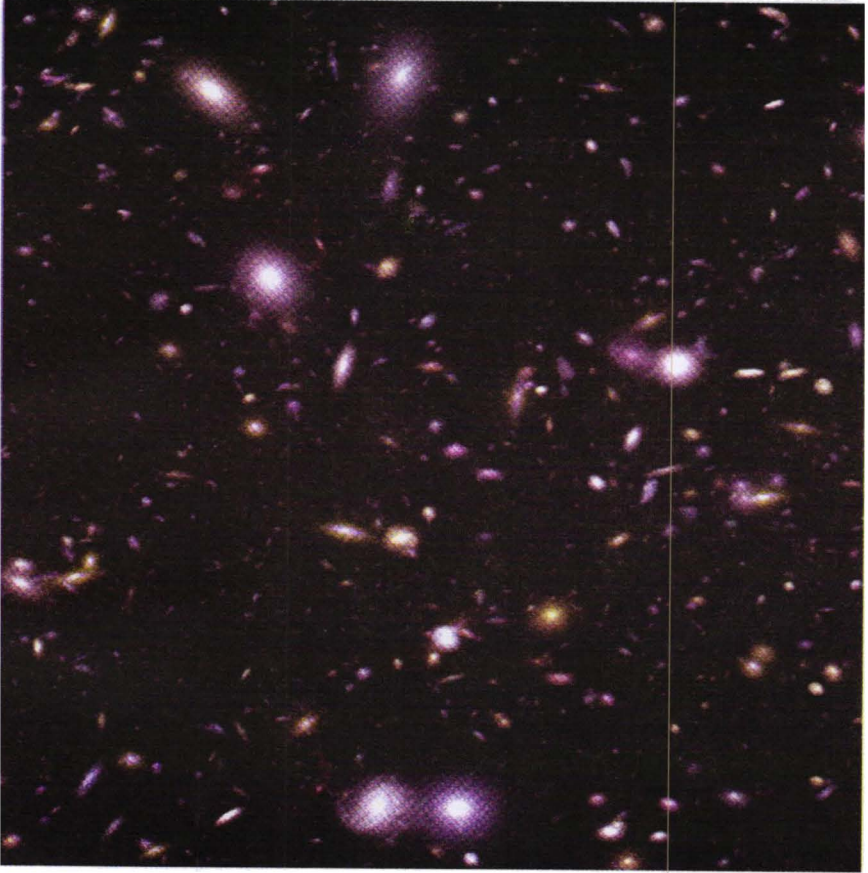
চিত্র -৩৪

"শপথ আকাশ জগতের, যাহা গ্যালাক্সী সমুহ (বুরুজ) দিয়ে সমুন্নত।" (৮৫ ঃ ১)

--- আমাদের এই মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে এক একটি ব্যক্তি গ্যালাক্সী। একটি গ্যালাক্সীতে গড়ে প্রায় বিশ হাজার কোটি 'নক্ষত্র' সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার সমসংখ্যক 'নক্ষত্র' সৃষ্টি হওয়ার মত 'নেবুলা' অবশিষ্ট থেকে যায়। একটি গ্যালাক্সীর 'ব্যাস' গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ এবং পুরুত্ব (Thickness) প্রায় দশ হাজার আলোকবর্ষ। অনুরূপ প্রায় একশ কোটি গ্যালাক্সী বর্তমান বিজ্ঞানীগণ তাদের উন্নততর টেলিস্কোপ দিয়ে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সকল গ্যালাক্সী-ই মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় ভাসমান অবস্থায় উড়তে উড়তে এক সময় অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ছবিতে এক ঝাঁক উড়ন্ত গ্যালাক্সীকে দেখা যাচ্ছে । মহাবিস্ময়কর নয় কী?
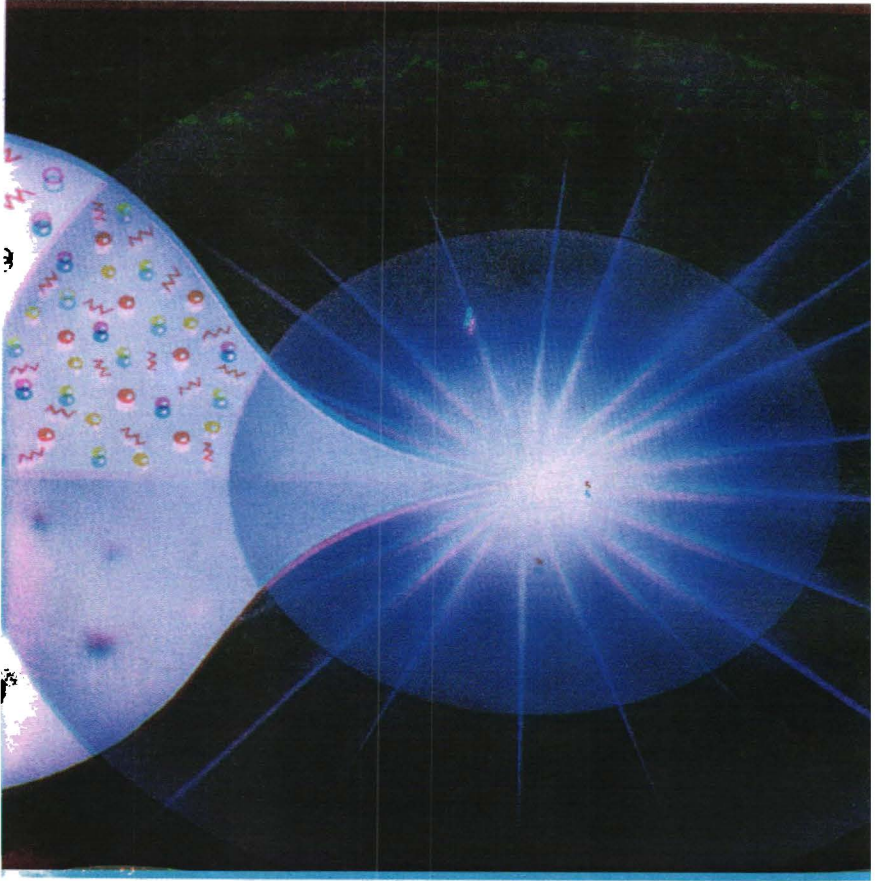
চিত্র -৩৫

"বলো, আল্লাহ্-ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং উহার পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০ ঃ ৩৪)
--ওপরের ছবিটি এবং পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবিটি একত্রে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে, কেননা মহাবিশ্বের শুরু 'বিগ-ব্যাংগ' থেকে শেষে গ্যালাক্সী পর্যন্ত এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ছবির প্রথম এই অর্ধাংশে স্পষ্টভাবেই ' Big Bang' মহাবিষ্ফোরণ ও তার পরবর্তী ' Inflation, Annihil ation Hadrons, Atomic Nuclei ও Stable Atom Period' গুলো ফুটে উঠেছে। Stable Atom তথা 'স্থায়ী পরমানু' সৃষ্টি পর্যন্ত-ই হচ্ছে মৌলিকভাবে সৃষ্টির পর্যায়কালসমূহ। এই 'পরমাণু' (Atom) সৃষ্টির পরই মহাবিশ্বে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের আগমন ঘটে এবং এই দৃশ্যযোগ্য পরিবেশ তৈরী হয়

চিত্র -৩৮

" মানুষ সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।" (৪০ : ৫৭)

---আজকে সুন্দর মনোরম দৃশ্যযোগ্য এ মহাবিশ্বটি প্রথম থেকেই এরূপ মনোমুগ্ধকর মনোরম সাজে সজ্জিত ছিল না। প্রায় ১৫০০ কোটি বছর ধরে ধারাবাহিক একটি শৃংখলাবদ্ধ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে 'আলোক শক্তি' (Highest Energetic Radiation) এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে আবর্তিত হয়ে হয়ে 'শক্তি' এবং 'বস্তুর' আবির্ভাব ঘটায়ে অতঃপর অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত এই দৃশ্যযোগ্য পরিবেশের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সাথে সাথে বর্ণনাতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর শাখা-প্রশাখা যে এর পেছনে সার্বিকভাবে কার্যরত ছিল, সে 'তথ্য'ও বিজ্ঞান প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করে চলেছে। উল্লেখিত তথ্যে প্রমাণীত হচ্ছে মহাবিশ্বটি অকল্পনীয় জটিল জ্ঞানের সমাহারে পরিপূর্ণ। যার কোন তুলনাই হতে পারে না।
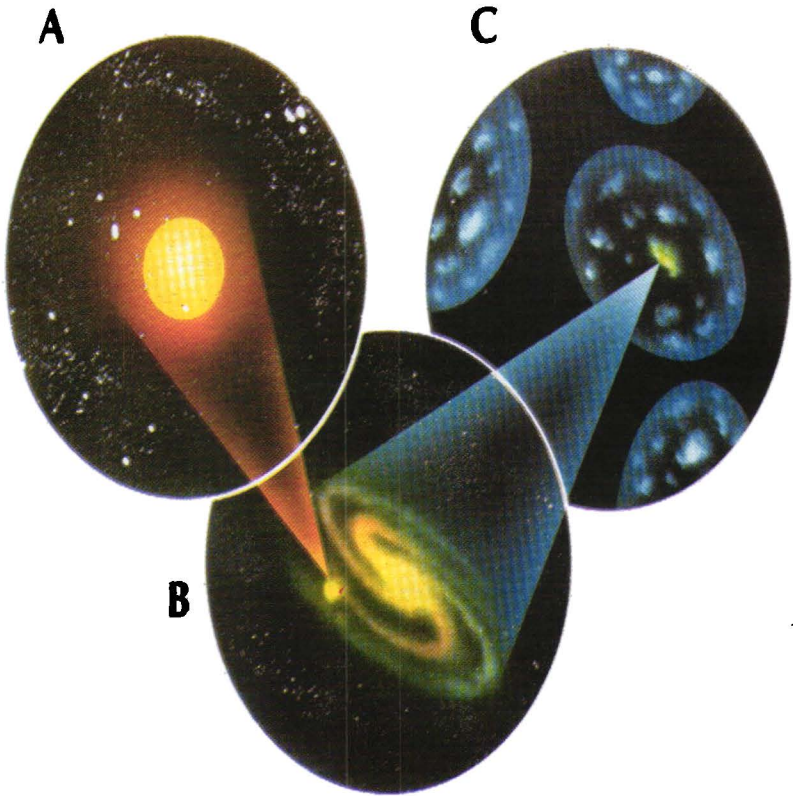
চিত্র -৩৯

" অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যাহা ছিল ধূম্র-পুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।" (৪১ ঃ ১১)

--- প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে অবস্থান নেয়া বিশাল এ মহাবিশ্ব গণনাতীত মহাজাগতিক বস্তু সম্ভার দিয়ে পরিপূর্ণ। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে গ্যালাক্সী গুচ্ছ, তারপরের পর্যায়ে রয়েছে ব্যক্তি গ্যালাক্সী। গ্যালাক্সীর পর স্থান হচ্ছে 'নক্ষত্র' কেন্দ্রিক সৌর জগতের। আমাদের 'মিলকি ওয়ে' গ্যালাক্সীতে প্রায় ২০,০০০ কোটি অনুরূপ 'নক্ষত্র' রয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর মহাজাগতিক বস্তুসমূহ এভাবে পর্যায়ক্রমে এক এক করে আত্মপ্রকাশ লাভে সক্ষম হয়েছে। পরে গ্রহ বা উপগ্রহ সমূহে পর্যাযক্রমে আবাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে।
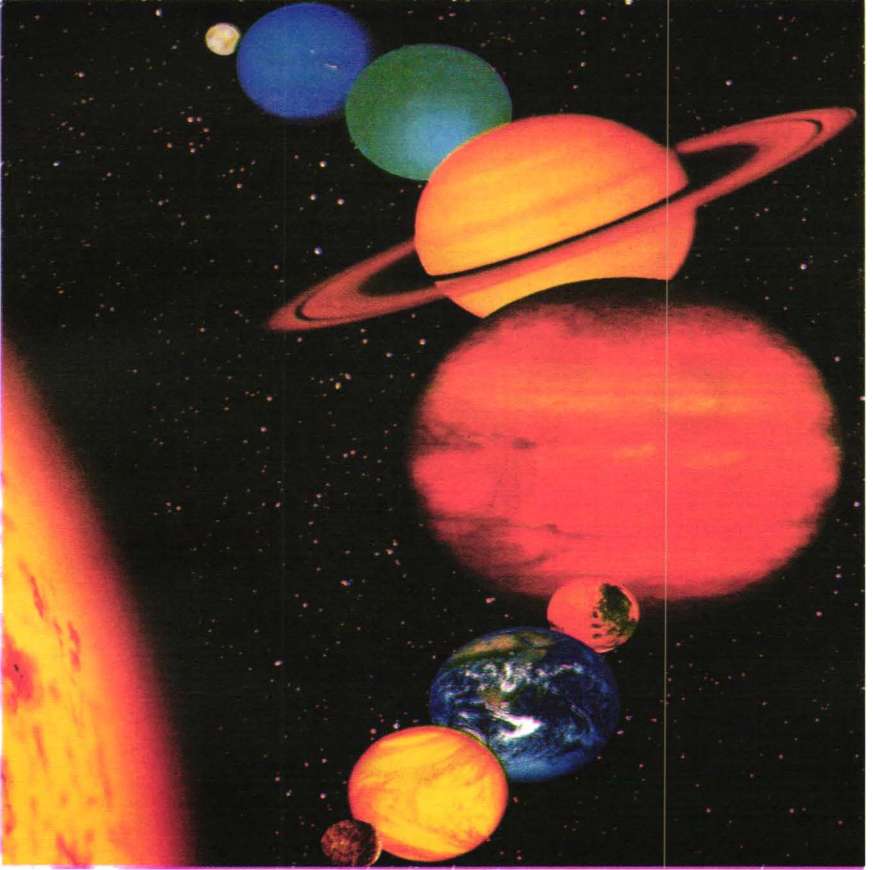
চিত্র -৪০

" আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" (৪৬ ঃ ৩)

--- এ মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুরূপে প্রথমদিকে গ্যালাক্সী এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ সৃষ্টি হয়ে দৃশ্যযোগ্য বর্তমান রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। উপগ্রহ গুলো গ্রহদের চারদিকে পরিভ্রমণ করে এবং গ্রহগুলো উপগ্রহদের সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট কোন নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণের মাধ্যমে সৌরজগতের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। আমাদের পৃথিবীও অনুরূপ একটি সৌর জগতের বাসিন্দা বা সদস্য। এ পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীকেই এই সৌর পরিবারে একমাত্র জীবনময় গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।]

চিত্র -৪১

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত ও স্বর্গীয়) বাণীকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার ?" (৫৫ ঃ ৩৪)

--- 'Big Bang' মহাবিষ্ফোরণ বিন্দুতে প্রথমত তাপমাত্রা ছিল প্রায় 10^{32} K. (কেলভীন)। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তণে প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসর পরে আজকের এই মানব সম্প্রদায়ের আবাসযোগ্য পরিবেশে সেই তাপমাত্রা 2.73 K. (কেলভীন)-এ নেমে আসায় আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছি। মাত্র 10^{-33} cm. শক্তির আধার নামক বিন্দুটি মহাবিষ্ফোরণে খুলে গিয়ে মহাসম্প্রসারণের মাধ্যমে আজকে প্রায় বিশ হাজার বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং যার ভিতর সকল প্রকার প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। মহান স্রষ্টার মহা কীর্তি নয় কী?
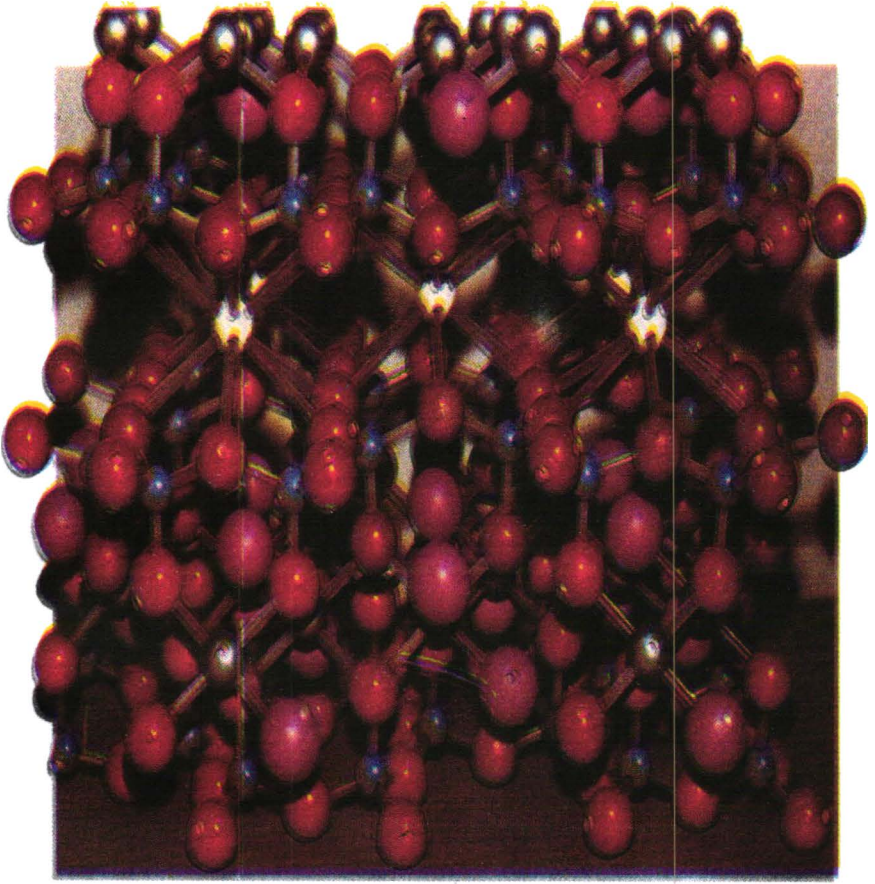
চিত্র -৪২

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার (মাটি-ধূলাবালির) উপাদান হইতে। অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।" (২৩ ঃ ১২, ১৩)

--- আমাদের মহাবিশ্বটি প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী মহাশূন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় তাপমাত্রা প্রায় 3 K.- এ নেমে আসে। ফলে অনুকুল পরিবেশ তৈরী হওয়াতে ৫টি মৌলিক পদার্থ যেমন- অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও সালফার মিলিত হয়ে প্রথমবারের মত আমিষ অণু সৃষ্টি করার পর্যায়ে আগমন করে। পরবর্তীতে আলোর ঝল্‌কানিতে প্রভাবিত হয়ে জীবন সৃষ্টিতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। সবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দনের পেছনে এটাই হচ্ছে মূল ভিত্তি। সমাজের জ্ঞাণীদের জন্য এতে রয়েছে অসংখ্য নির্দশন।

চিত্র -৪৩

" (আল্লাহ্) যিনি তাহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম (মাটি, ধূলাবালি) হইতে মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার বংশ উৎপন্ন করিয়াছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে। পরে তিনি উহাতে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহার নিকট হইতে এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।" (৩২ ঃ ৭, ৯)

--- আমাদের এই পৃথিবী ঘেরা বিশ্বে ৫টি মৌলিক পদার্থের 'পরমাণু' প্রথমে মিলিত হয়ে 'অণু', আবার অনুরূপ অসংখ্য 'অণু' মিলিত হয়ে সূর্যের আলোর ঝল্কানিতে সাগর সৈকতে 'আমিষ অণু'তে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখিত আমিষ অণুগুলিই মহাজাগতিক বিবর্তণের ধারায় এক পর্যায়ে অদৃশ্য জগত থেকে প্রাণের স্পন্দন লাভ করে ('কুরআনের' দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্ অদৃশ্য থেকে 'রূহ' ফুঁকে দেন) জীবনের উন্মেষ ঘটায়। বর্তমানে অসংখ্য প্রাণের স্পন্দনে প্রতিনিয়ত মুখরিত হচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবী।

চিত্র -৪৪

" তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।" (৪২ ঃ ২৯)

--- 'Big Bang' মহাবিস্ফোরণের পর থেকে নিয়ে প্রায় ১৫ বিলিয়ন তথা ১৫০০ কোটি বৎসর মহাজাগতিক অসংখ্য বিবর্তন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসরমান এই মহাবিশ্বে আলোকশক্তি হতে পর্যায়ক্রমে কোয়ার্ক, ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন অতপর পরমাণু , অণু ও আমিষ অণু সৃষ্টির পর শেষ পর্যায়ে অদৃশ্য থেকে 'প্রাণের স্পন্দন' লাভে ধন্য হয়ে মানব সম্প্রদায়ের শুভ আগমন ঘটেছে। একা পৃথিবীতেই এখন প্রায় ৬০০ কোটি মানুষের উপস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে, যারা এ পর্যায়ে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটায়ে মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরমাণু সৃষ্টির মাধ্যমে মহাবিশ্ব গড়ার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও পূর্বেই সৃষ্টি হওয়া প্রায় শূন্য ওজনের 'নিউট্রিনো'গুলো (Neutrinos) কিন্তু প্রায় আলোর গতিতে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী কেবলই ছুটে বেড়াতে থাকে। এখনও সে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মহাশূন্যের মাঝে প্রতি বর্গমিটারে 'নিউট্রিনোর' সংখ্যা হচ্ছে কয়েক হাজার মিলিয়ন। প্রতি সেকেন্ডে একজন মানুষের শরীরে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার স্থান দিয়ে প্রায় একশত পঞ্চাশ (১৫০) মিলিয়ন 'নিউট্রিনো' (Neutrino) অতিক্রম করে (ভেদ করে) চলে যাচ্ছে (In fact more than 150 million neutrinos pass through every square centimeter of human body in every second)। 'নিউট্রিনো' কণিকাসমূহ অন্যান্য পদার্থের সাথে কোন প্রকার মিথস্ক্রিয়া (Interact) করে না বিধায় আমরা উপলব্ধি করতে পারি না এবং কারো কোন প্রকার ক্ষতিও হয় না। প্রতিটি নক্ষত্রেও অনবরত 'প্রোটন-প্রোটন চেইন রি-এ্যাকশানে' (Proton-Proton Chain Reaction) ব্যাপকভাবে উক্ত 'নিউট্রিনো' নামক ওজনশূন্য প্রায় পদার্থ কণিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

'নিউট্রিনো' (Neutrino) মহাকাশে আলোর গতিতে ভ্রমণকালে 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে থাকে। তবে 'নিউট্রিনো' গুলো 'লো এনার্জি' (Low Energy Particles) পার্টিক্যালস। এই গ্রুপের মধ্যে 'সাব এ্যাটমিক পার্টিক্যালস' (Sub Atomic Particles) হিসেবে 'ইলেকট্রন' ও 'মাউন' (Electron and Moun) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic-Ray) হচ্ছে সাধারণ পদার্থ কণা হিসেবে 'প্রোটন' ও 'ইলেকট্রন' কণিকা এবং মাঝে মাঝে ভারী পদার্থের (হিলিয়াম) 'নিউক্লি' (Nuclei)-র আলোর গতিতে চলমান রূপ। এদেরকে 'হাই এনার্জি কসমিক রে' (High Energy Cosmic Ray) নামে চিহ্নিত করা হয়। এদেরও উৎস হচ্ছে- 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang), 'নক্ষত্রসমূহ' (Stars) এবং মহাবিশ্বের গভীরে সৃষ্ট 'গামা-রে বার্ষ্ট' (Gamma-Ray Burst).

এছাড়াও মহাকাশে বিচরণশীল আরেক প্রকার 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) আবিস্কৃত হয়েছে, যা সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি (Highest Energetic Cosmic Ray) হিসেবে পরিচিত এবং যা 'গামা-রে' (Gamma-Ray) এর 'ফোটন' (Photon) কণিকা অপেক্ষাও বহু বহুগুণে শক্তি সম্পন্ন (More more Energetic), প্রায় ১০০ বিলিয়ন গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট সম্পন্ন (Approximately 100 Billion GeV), এদের উৎপত্তিস্থল প্রধানতঃ 'বিগ-ব্যাংগ' ও 'গামা-রে বার্ষ্ট', যেখানে সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন পদার্থ কণা (Highest Energetic Particles) সৃষ্টি হয়ে 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) নামে আগমন করে থাকে এবং মহাবিশ্বের প্রান্তে নতুন নতুন পদার্থ কণিকার জন্ম দিয়ে থাকে (Highest energetic cosmic ray were a form of electromagnetic radiation more energetic than Gamma-ray comes from Big Bang and Gamma-ray burst and was the 'birth cry' of new matter being created at the edge of the Universe)।

উল্লেখিত মহাজাগতিক রশ্মিগুলো মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত আলোর গতিতে ভ্রমণ করছে এবং পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে সংঘর্ষের (Collision) মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নিম্ন বা কম শক্তি সম্পন্ন পদার্থ কণার (Low Energy Particles যেমন ইলেকট্রন, নিউট্রিনো, ও মাউন) কসমিক-রে-তে রূপান্তরিত হচ্ছে। উক্ত কম শক্তি সম্পন্ন পদার্থ কণার সমষ্টি (Low Energy Particles) আমাদের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় ১০০ বিলিয়ন পরিমাণ অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। শুধু মানুষ নয় বরং পৃথিবীর সকল প্রকার বস্তুকেই ভেদ করে চলে যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে, কারো সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interact) না করায় তাদের এ কাজে তেমন কোন বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না। উক্ত পদার্থ কণাগুলো শুধুমাত্র 'উইক ফোর্স' (Weak Force)-র সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interact) করে থাকে। কিন্তু 'উইক ফোর্স' খুবই দূর্বল হওয়ার কারণে তেমন ভূমিকা গ্রহণ

করতে পারে না বলে উল্লেখিতভাবে একতরফা সুযোগ পেয়ে মহাবিশ্বে সকল প্রকার পদার্থ ও বস্তুকে নীরবে ভেদ করে চলে যাচ্ছে. (Approximately 100 billion such particles are passing through our body every second. Because these particles interact through the Weak force and because the Weak force is very weak, they pass right through all types of matter with essentially no effect)।

আমাদের চোখের দৃষ্টিতে 'মহাজাগতির রশ্মি' (Cosmic Ray) দেখা না যাওয়ার কারণ হলো উল্লেখিত মহাসূক্ষ্ম 'উপ-আনবিক পদার্থ কণাগুলো' (Sub Atomic Particles) আমাদের চোখে 'রেটিনা' (Retina)-র সেলগুলোর মধ্যকার দূরত্বের চেয়ে ক্ষুদ্র বিধায় কোন প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি করে না, ফলে চোখ তাদেরকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমরা আর দেখতে পাই না। তবে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে তাদের উপস্থিতি এবং চরিত্র প্রমাণিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিজ্ঞান বিশ্ব 'MAXIMA' এবং 'BOOMERANG' নামে দুটি উপযুক্ত গবেষক দলের মাধ্যমে আমাদেরকে আরও অবহিত করতে সক্ষম হয়েছে যে, ওপরে উল্লেখিত 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর থেকেই মহাকাশে বিচরণ করে চলেছে। ('Maxima' and 'Boomerang' two Competent research team tell us that the cosmic rays, that means radiation has been journing through space for billions of years.)

আলোচিত মহাজাগতিক রশ্মির উপাদানসমূহ (Cosmic-Ray Element's) মূলতঃ দু'ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। যেমন তার একটি হচ্ছে 'বেরিওনিক মেটার' (Baryonic Matter) এবং অপরটি হচ্ছে 'নন্ বেরিওনিক মেটার' (Non Baryonic Matter)।

Baryonic Matter হচ্ছে 'Protons' এবং 'Neutrons'. এই পদার্থ কণিকাগুলো সবসময় 'সবল পারমানবিক শক্তি' (Strong Nuclear Force)র মাধ্যমে কর্মক্ষম থাকে বলে এদেরকে এ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা সবসময় অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় (Interact) অংশ গ্রহণ করে।
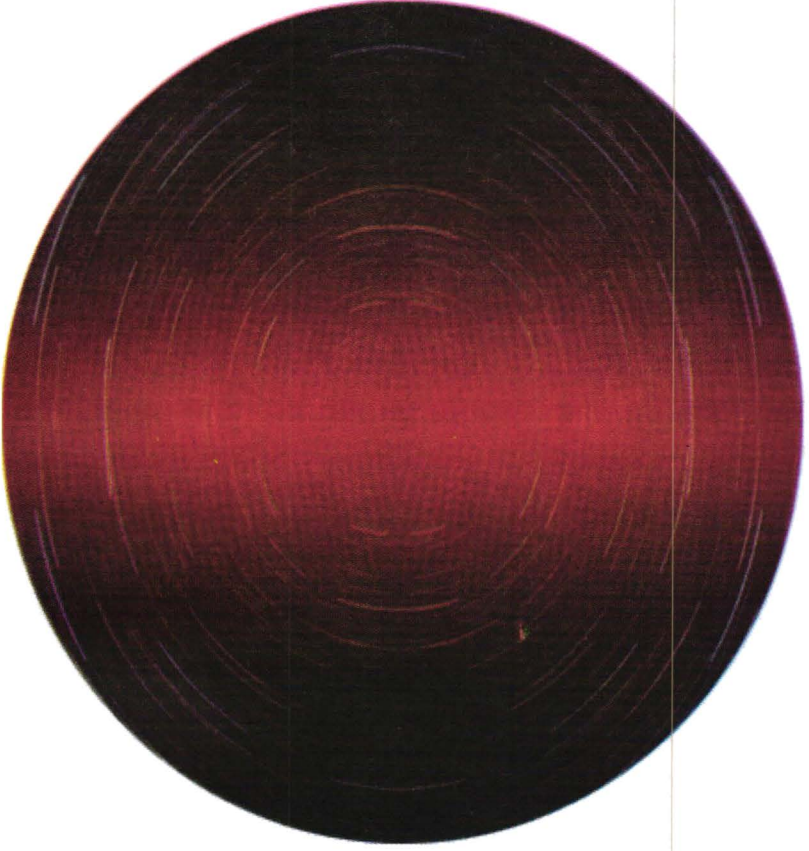
চিত্র -৪৫

" তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে ?" (৪০ ঃ ৮১)

--- আমাদের এই মহাবিশ্ব অসংখ্য মহাজাগতিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে আবিস্কৃত প্রায় একশতেরও বেশি উপ-আনবিক মহাসুক্ষ্ম কণিকা গুলো (Sub-Atomic Particles) অন্যতম। 'নিউট্রিনো' (Neutrinos) নামক মহাসুক্ষ্ম ও প্রায় ওজন শূন্য কণিকা সমূহ সমগ্র মহাবিশটি ভর্তি হয়ে আছে, তবে এরা আলোর গতিতে সর্বদা ভ্রমণে নিরত। অন্যকোন বস্তু বা শক্তির সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interact) করে না বিধায় এরা নীরবে মহাবিশ্বে সকল পদার্থকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। মহাবিশ্বে প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গা দিয়ে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন 'নিউট্রিনো' প্রতি সেকেণ্ডে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এদের সৃষ্টির পিছনে মূলতঃ কি উদ্দেশ্য নিহীত রয়েছে বিজ্ঞান এখনও তা জানে না। কুরআন দাবী করছে এ জাতিয় নিদর্শন বিশ্ব 'প্রভু'কে নীরবে উপস্থাপন করে মাত্র।

আবার 'নিউট্রিনো' (Neutrinos) এবং 'উইমপস' (WIMPS) কখনো অন্য কোন পদার্থের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় (Interact) অংশ নেয় না বলে এদেরকে 'নন বেরিওনিক মেটার' (Non Baryonic Matter) বলা হয়।

এরপর বর্তমান সর্বশেষ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার পরিবেশে বিজ্ঞান Big Bang Model-র আলোকে আমাদেরকে আরও অবহিত করছে যে, আমরা মহাবিশ্বে মহাশূন্য (Empty Space) নামে যা কিছু বাহ্য দৃষ্টিতে দর্শন করছি, তা কিন্তু কখনোই শূন্য নয় বরং সকল প্রকার 'শক্তি' (Energy) দিয়ে ভরপুর হয়ে আছে (Empty Space is not empty what we call a vacum is actually seething with all kinds of energy fields). এই শক্তিগুলোর মধ্যে মৌলিক ৪টি শক্তি বিভিন্ন প্রকার মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) এবং ডার্ক মেটার (Dark Matters) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আছে দৃশ্যমান হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং অসংখ্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সমাহার।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানের বড় ধরনের উদ্‌ঘাটন হচ্ছে 'ডার্ক মেটার' (Dark Matter) আবিষ্কার। বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমাদের এই মহাবিশ্বে মওজুদকৃত 'শক্তির' (Energy) প্রায় সত্তর ভাগ-ই (৭০%) ডার্ক মেটার (Dart Matter), যা দেখা যায় না এবং অন্য পদার্থের সাথে কোন প্রকার মিথস্ক্রিয়ায় (Interact) অংশ গ্রহণও করে না। আর সে কারণে তাদেরকে স্বাভাবিক দর্শনসীমায় বন্দী করা সম্ভব হচ্ছে না। সোজা কথায় বলতে গেলে বিজ্ঞান জগত এই 'ডার্ক মেটার'-এর বড় ধরনের রহস্য এখনও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। তবে তারা হালও ছাড়েন নি। আশা করা যায় একদিন তারা সফল হবেন এবং নিত্য-নতুন ও বিস্ময়কর তথ্য সরবরাহ করে আমাদেরকে ধন্য করবেন। তখন মহাবিশ্বকে আরও ব্যাপকভাবে বোধগম্যের সীমায় পাওয়া আমাদের জন্য সহজ হবে।
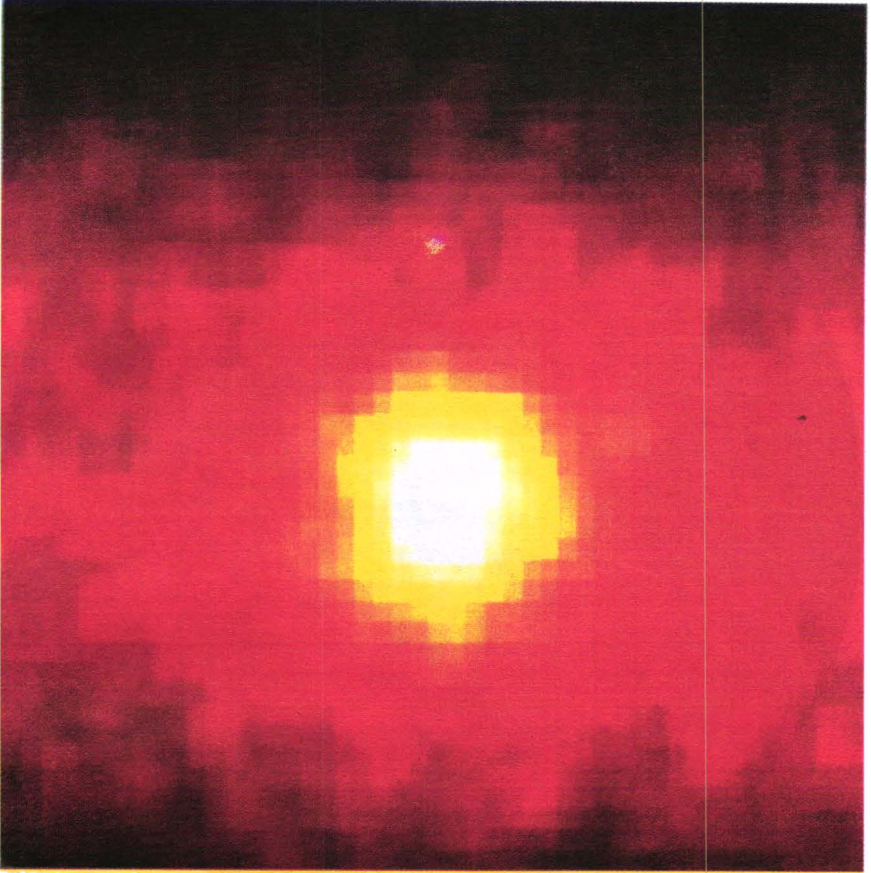
চিত্র -৪৬

" তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বা অদৃশ্য বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" (২৭ ঃ ৭৫) --- এই মহাবিশ্বে দৃশ্য বস্তুর চেয়ে অদৃশ্য বস্তুর সংখ্যাই বেশী। বর্তমান বিজ্ঞানের সাফল্যজনক অগ্রযাত্রায় পর-পর বহু সংখ্যক অদৃশ্য বস্তু সনাক্ত ও প্রমানিত হয়ে আবিস্কৃত হওয়ায় মানব সমাজ হালে পূর্বের তুলনায় অদৃশ্য জগতের বাস্তবতার প্রতি অনেক বেশি বিশ্বাসী এবং আস্থাশীল হয়ে পড়ছে। ওপরে ছবিতে প্রতি মুহূর্তে আমাদের সূর্যের মধ্যে Proton-Proton Chain Reaction-এ ব্যাপকভাবে যে 'নিউট্রিনো' সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখানো হয়েছে। অবশ্য খালি চোখে এদেরকে মহাসূক্ষ্মতার কারণে কখনই দেখা সম্ভব হয় না।

প্রায় ১০০ **বিলিয়ন** পরিমাণ 'নিউট্রিনো' (Neutrinos) কণিকা প্রতিটি মুহূর্তে একজন মানুষের শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে। আল্লাহ্ সময়ে সময়ে বিজ্ঞানের মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ করেন শুধু তাঁকে স্বীকার করার জন্য।
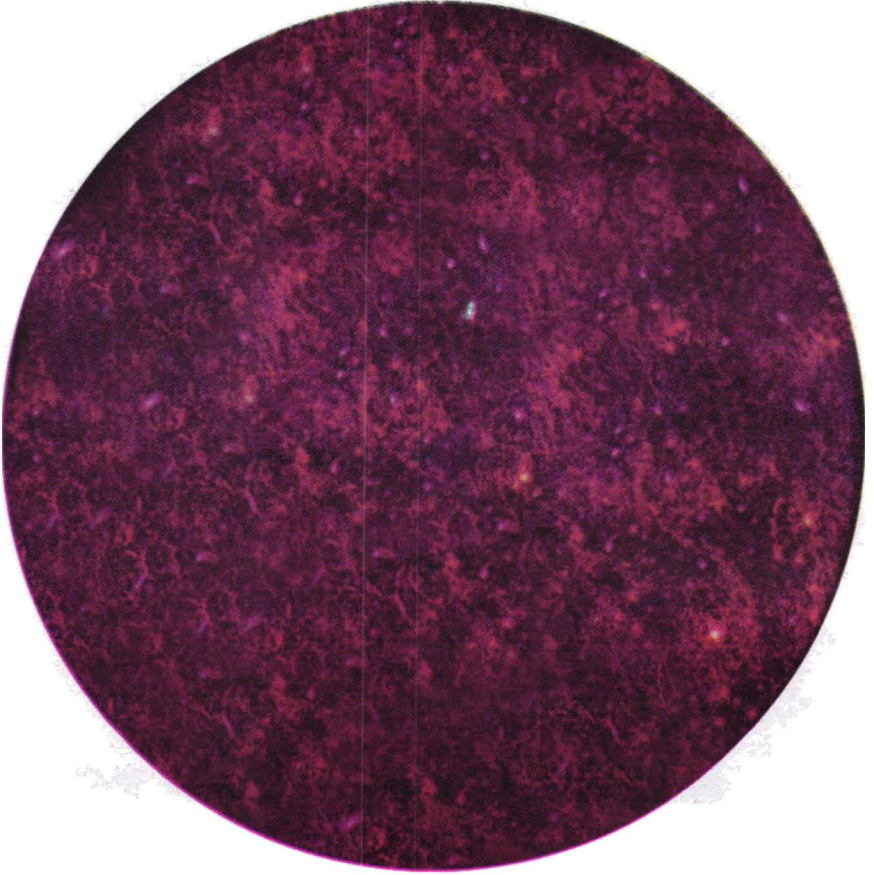
চিত্র -৪৭

" আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সকল অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত আছি এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন কর আমি তাহাও জানি।" (২ ঃ ৩৩)

--- প্রায় ওজন শূন্য মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণিকা নিউট্রিনো (Neutrinos) গুলো Big Bang, Gamma-ray burst ও নক্ষত্রের ভেতর সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে আলোর গতিতে, ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়েও বেশি গতিতে সকল প্রকার বস্তুকে ভেদ করে মহাবিশ্বব্যাপী পরিভ্রমণে নিরত রয়েছে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরের ভিতর দিয়ে প্রতিটি সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ বিলিয়ন পরিমাণ নিউট্রিনো কণিকা ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এই কণিকাগুলো কারো সাথেই মিথস্ক্রিয়া (Interact) করেনা বিধায় আমরা টের পাই না। মহাবিশ্বে উক্ত কণিকা সমুহের নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিজ্ঞান জগত এখনও কোন তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি, যদিও বা উপস্থিতি সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে।

'কুরআন' দাবী করছে এগুলো যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এদের সার্বিক অবস্থা জানেন। অতএব তাঁর উপস্থিতি মেনে নেয়া উচিৎ।
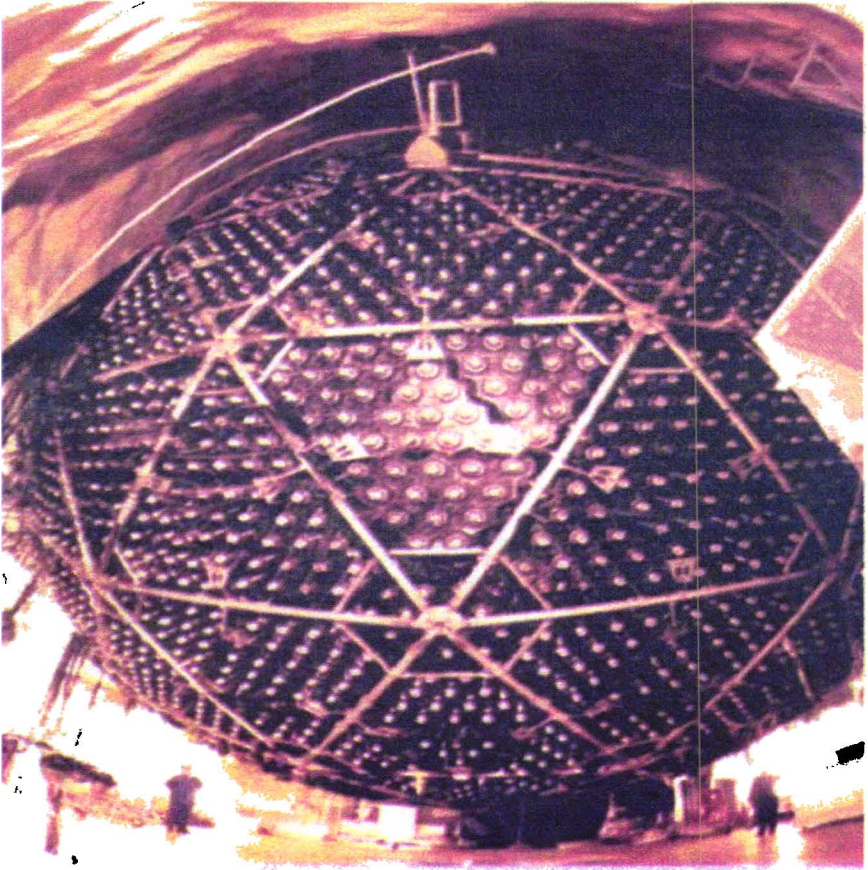
চিত্র -৪৮

" তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) যাহা কিছু আছে সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য করিয়াছেন আয়ত্তাধীন। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে অনেক শিক্ষনীয় নিদর্শন।" (৪৫ ঃ ১৩)

--- প্রায় ওজন শূন্য ও চার্জবিহীন অদৃশ্য মহাসুক্ষ্ম বস্তু কণিকা 'নিউট্রিনোগুলো' ব্যাপকভাবে সমগ্র মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তুকে ভেদ করে যে প্রতিটি মূহুর্তে আলোর গতিতে চলে যাচ্ছে, তা প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানীগণ প্রায় দু'হাজার মিটার মাটির নীচে বার মিটার ব্যস সম্পন্ন গোলাকার 'ডিটেকটর' স্থাপন করে তাতে 'হেভী ওয়াটার' পূর্ণ করে বাইরের দিকে 'লাইট ডিটেকটর' স্থাপন করেন। প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী আলোর গতিতে ভ্রমনকারী 'নিউট্রিনোগুলো' পৃথিবী ভেদ করে চলে যাওয়ার সময় পানির 'অণূর' সাথে মিথস্ক্রিয়ায় নীলাভো আলোর ঝলক সৃষ্টি করে, 'লাইট ডিটেকটর'গুলোতে তা প্রতিফলিত হওয়ায় 'নিউট্রিনোর' উপস্থিতি প্রমানীত হয়। ছবিতে 'Sudbury Neutrino Detector' দেখানো হয়েছে। কুরআন দাবী করছে মানুষ এদের রহস্য উন্মোচনে সফল হবে। কিন্তু কথা থেকে যাচ্ছে-এরই ভেতর দিয়ে একটি বড় রহস্য উন্মোচিত হয়ে 'আল্লাহ'কে যে দেখা যাচ্ছে তা-কি তারা দর্শন লাভে ধন্য হবে না ?
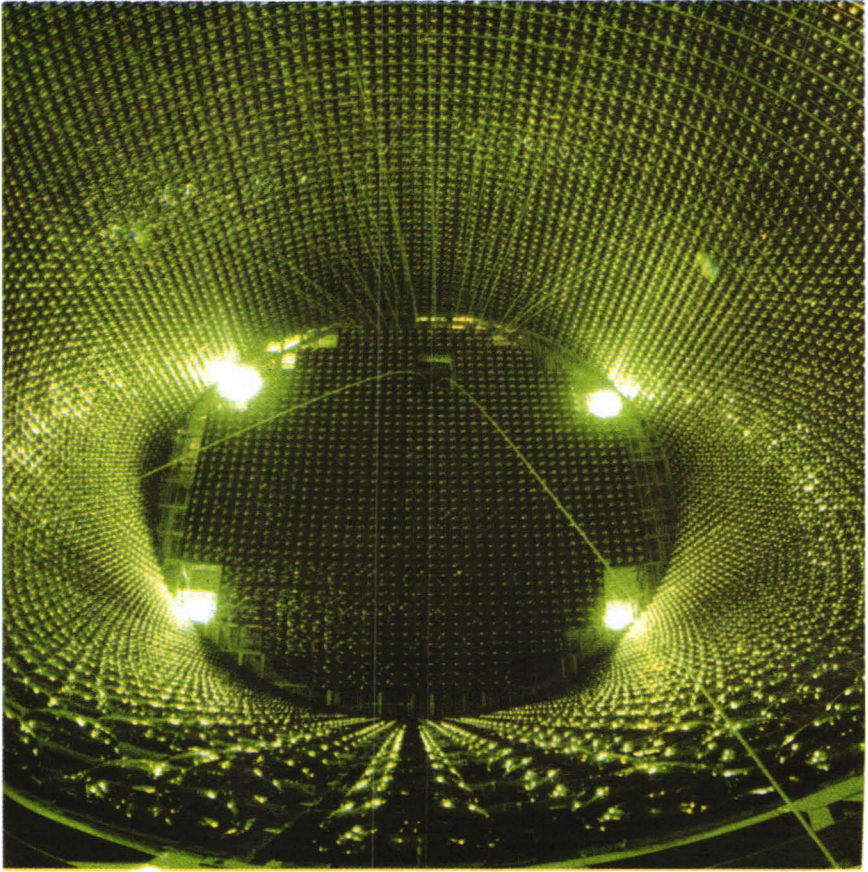
চিত্র -৪৯

" এতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষন শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭)

--- ওপরের ছবিতে জাপানে নির্মিত বৃহৎ 'Super KamioKande Detector' কে দেখা যাচ্ছে। এখানে প্রায় ৪০ মিটার ব্যাস সম্পন্ন 'Stainless Steel Vessel' টিতে ১৩,০০০ Photomultiplier Tubes (যা প্রায় ৫০ সে. মি. ব্যাস সম্পন্ন) চতুর্দিকে স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় ৫০ হাজার টন 'বিশুদ্ধ পানি' ভর্তি করা হয়েছে। প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর প্রতিটি মুহূর্তে ব্যাপকভাবে আলোর গতিতে সকল প্রকার পদার্থকে ভেদ করে গমনকারী 'নিউট্রিনো'গুলো রক্ষিত পানির অণুর সাথে মিথষ্ক্রিয়া (Interact) ঘটিয়ে প্রস্থান করার সময় 'নীলাভো আলোর ঝলক' (Blue Flashes of Light) নির্গত করায় প্রমান হয়েছে এ মহাবিশ্বে অদৃশ্য নিউট্রিনো'-র উপস্থিতি বাস্তবে সত্য ঘটনা এবং এরা আলোর গতিতে সমস্ত কিছুকে ভেদ করে পরিভ্রমন করছে।

এ সকল নিদর্শন কি জ্ঞানী সমাজকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট করে না? এ সবই কি নিজ থেকে অযথা সৃষ্টি হয়েছে?
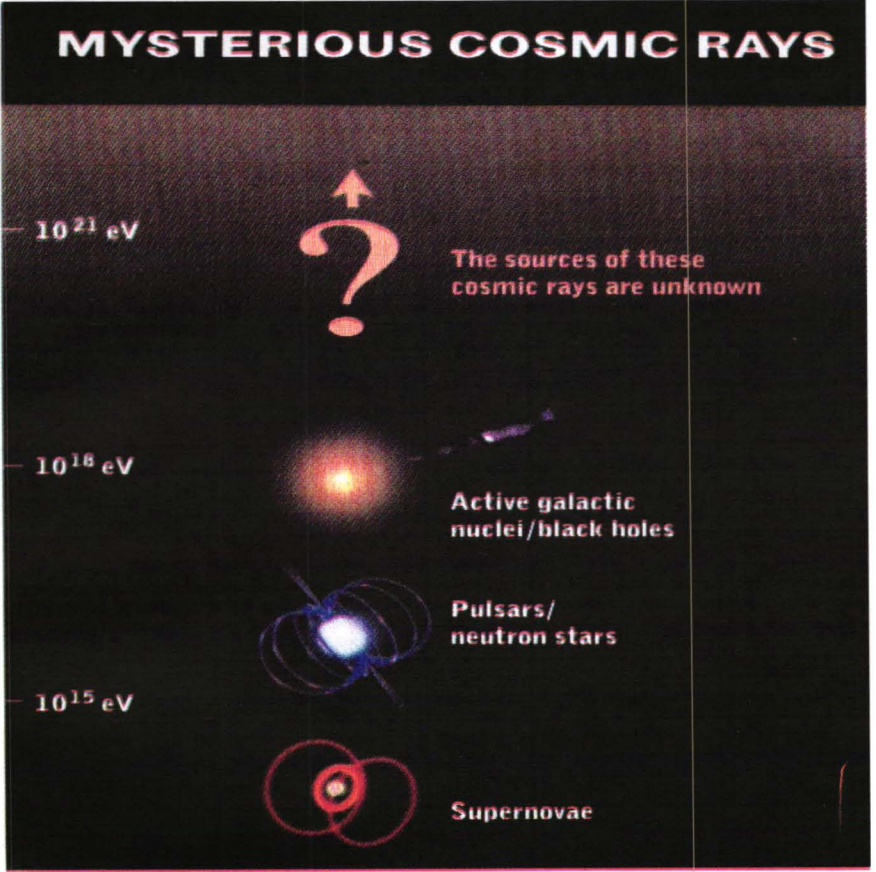
চিত্র -৫০

" আমি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের অন্তরবর্তী কোন কিছুই অযথা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।" (৪৪ ঃ ৩৮)

--- ওপরে ছবিতে মহাজাগতিক আলোক রশ্মির কয়েক প্রকারের উৎসস্থল দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শক্তি সম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মির রহস্যপূর্ণ উৎস সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞান বিশ্ব সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেনা। এছাড়া অন্যান্য উৎসস্থল মোটামুটিভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। যেমন উক্ত ছবিতে মহাকাশে বিরাজমান Black Hole, Neutron Star ও সুপার নোভা ইত্যাদি থেকেও বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic-Ray) নির্গত হয়ে মহাশূণ্য পরিপুর্ণ করে রেখেছে তা দেখানো হয়েছে। এগুলি মানুষের নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ বাইরে। মহাকাশের মহাশূন্যতা উল্লেখিত তেজস্ক্রিয়তার কারণে প্রাণীজগতের জন্য কখনই নিরাপদস্থল নয় বরং ভয়ানক বিপদসঙ্কুল এলাকা। তবে মহাকাশে কসমিক-রে থেকে অনবরত পদার্থ কণা সৃষ্টি হচ্ছে। 'মহাজাগতিক রশ্মি' পদার্থ কণা সৃষ্টি করে প্রমাণ করেছে কুরআন সত্য গ্রন্থ, যে গ্রন্থ দাবী করেছে কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি হয়নি।
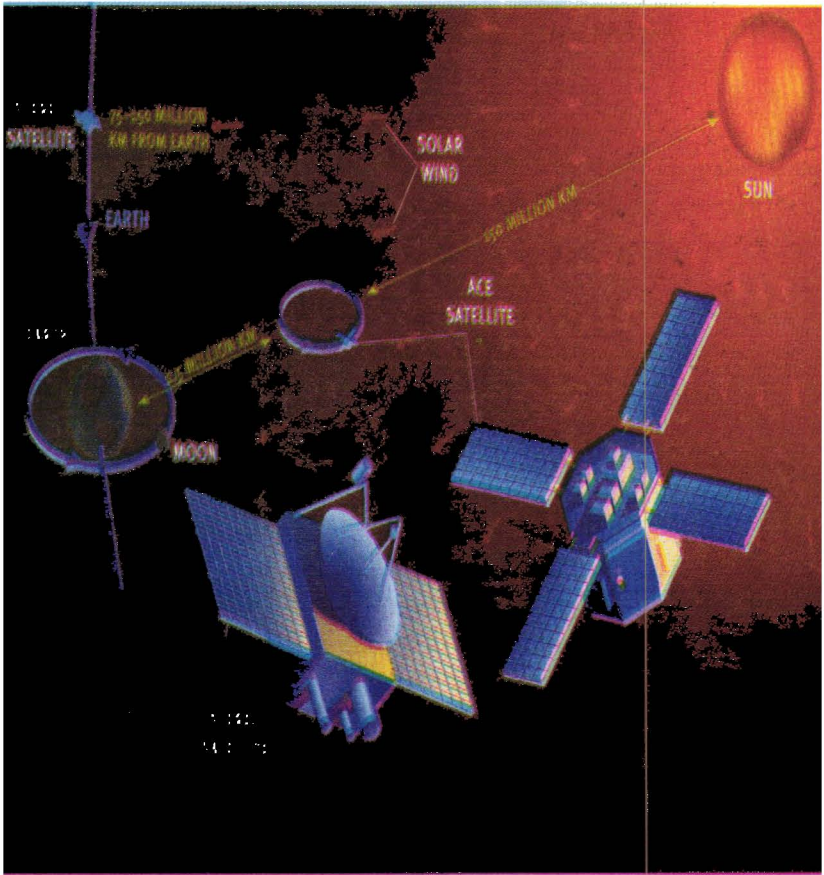
চিত্র -৫২

" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন আর উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন অন্ধকার ও আলোর " (৬ ঃ ১)

--- Big Bang, মহাবিস্ফোরণের পরে গ্যালাক্সী সমূহের মধ্যে আলোর উৎস হিসেবে 'নক্ষত্র' গুলোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে প্রতিটি নক্ষত্রের ভেতর Proton Proton-Chain reaction এ তেজস্ক্রিয়তার সাথে বিভিন্ন প্রকার মহাজাগতিক রশ্মি ও (Cosmic Ray) সৃষ্টি হয়ে থাকে যে রশ্মি গুলো সৌরজগতের ভেতর ব্যাপকভাবে আলোর গতিতে পরিভ্রমন করে থাকে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়ে বিভিন্ন প্রকার ক্ষনস্থায়ী উপ-আনবিক কণিকায় রূপান্তরিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে ওপরে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সাটেলাইটের মাধ্যমেও 'কসমিক রে' সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

কুরআন প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্বেই দাবী করেছে যে আল্লাহ্ নিজ থেকেই 'নক্ষত্র' সৃষ্টি করে আলো আধারের ব্যবস্থা করেছেন। এ কৃতিত্ব সম্পুর্ণরূপে একমাত্র তাঁরই। অতএব একমাত্র তাঁরই গোলামী হওয়া উচিত

চিত্র -৫৩

" আমি মানুষের (বুঝার) জন্য এই সকল (দৃশ্য-অদৃশ্য) দৃষ্টান্ত (জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে) প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)

--- ওপরের ছবিতে মহাকাশের মহাশূণ্যতা থেকে গামা-রে, ইনফ্রারেড-রে সহ অসংখ্য মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে। দিবা-রাত্র প্রতিনিয়ত এভাবে ব্যাপকহারে মহাজাগতিক রশ্মি মহাবিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণে নিরত রয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এ ব্যাপারে পৃথিবীকে এদের হাত থেকে রক্ষাকল্পে 'ওজোন' লেয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে 'ঢাল' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে মহাজাগতিক রশ্মিগুলো তাদের ভয়ংকর রূপ নিয়ে আর ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে না। 'ওজোন লেয়ারে' অধিক শক্তি (High Energy) শোষিত হয়ে বিভিন্ন কমশক্তি (Low Energy) সম্পন্ন পদার্থকণার রূপ ধারণ করে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়গুলো শুধুমাত্র জ্ঞানীজনই অনুধাবন করতে পারে এবং এর পেছনে একজন মহান সত্ত্বার যে হস্ত ক্রিয়াশীল তাও উপলব্দি করতে সক্ষম হয়।

চিত্র -৫৪

" আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বস্তুকে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ভিতর দিয়ে) প্রকাশ করিয়া থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)

--- প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে মহাবিশ্বে মহাবিস্ময়কর মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic ray) সম্পর্কে মানব সম্প্রদায় প্রাথমিক ধারণা লাভে সক্ষম হলেও প্রকৃত পক্ষে ১৯৯৩ সালের পূর্বে খুব বেশি একটা জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়নি। Big Bang, মহাবিস্ফোরণ এবং 'গামা-রে বার্স্ট'-এর প্রমাণ হাতে আসার পরও বিজ্ঞানীগণ খুবই 'উচ্চক্ষমতা' (Highly Energetic) সম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মির অদৃশ্য উৎস সর্ম্পকে এখনও সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত রশ্মি পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে ওপরের অংশে প্রবেশ করে পারমাণবিক সংঘর্ষে (Nuclear Collisions) জড়িয়ে পড়ে দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী বহু সংখ্যক পদার্থ কণিকার ও রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন- Positive pion, Negative pion, Neutral pion, Gamma ray, Electron, Positron, Nucleus of Atoms, Neutron, Proton, Neutrino, Muon ও Anti-Muon ইত্যাদি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে মানব জাতি বর্তমানে এ সকল তথ্য অবহিত হচ্ছে। এ সব কিছুই এক আল্লাহ্কে প্রধান 'কর্তা' রূপে উপস্থাপন করছে মাত্র। যেখানে মানুষের কোন হাত নেই।
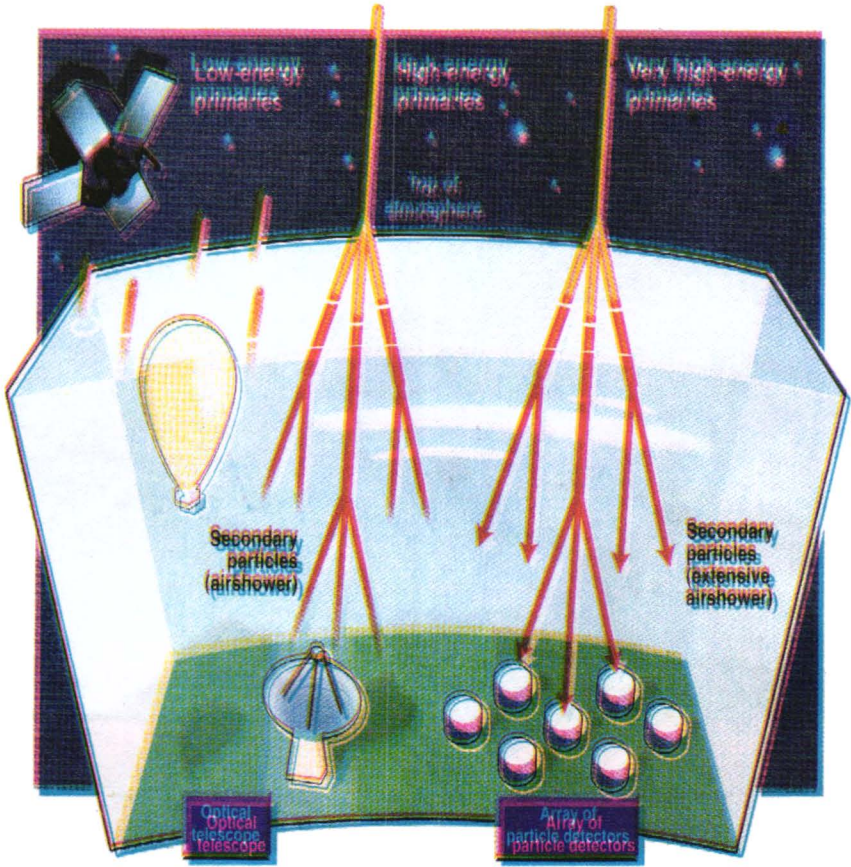
চিত্র -৫৫

" নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কে) উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

--- ওপরের ছবিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশে নিঃশোষিত Low Energy particles Cosmic ray-এর উপস্থিতি 'বেলুন' এবং 'স্যাটেলাইটের' মাধ্যমে বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছে। এরপর Highly Energetic Cosmic ray -এর সামগ্রিক কার্যকলাপ Ground Base Optical Telescope দিয়ে সনাক্ত করছে। আবার Highly Energetic Cosmic ray -ভূ-পৃষ্ঠে তৈরী অসংখ্য 'Particles Detector' এর মাধ্যমে পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ের জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপন করে মহাবিশ্বে মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি এই মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানরাজ্যকে বৃদ্ধি করে চলেছে। মূলতঃ 'Big Bang' একটি মাত্র বিস্ফোরণ-ই, অথচ এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মহাজ্ঞানের সাগরকে লক্ষ কোটি বছর ধরেও আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানব সমাজ চূড়ান্তভাবে সুরাহা করতে সক্ষম হবে না। অতএব মহাজ্ঞানী সত্ত্বার সম্মুখে অবনত হওয়াই শ্রেয়।
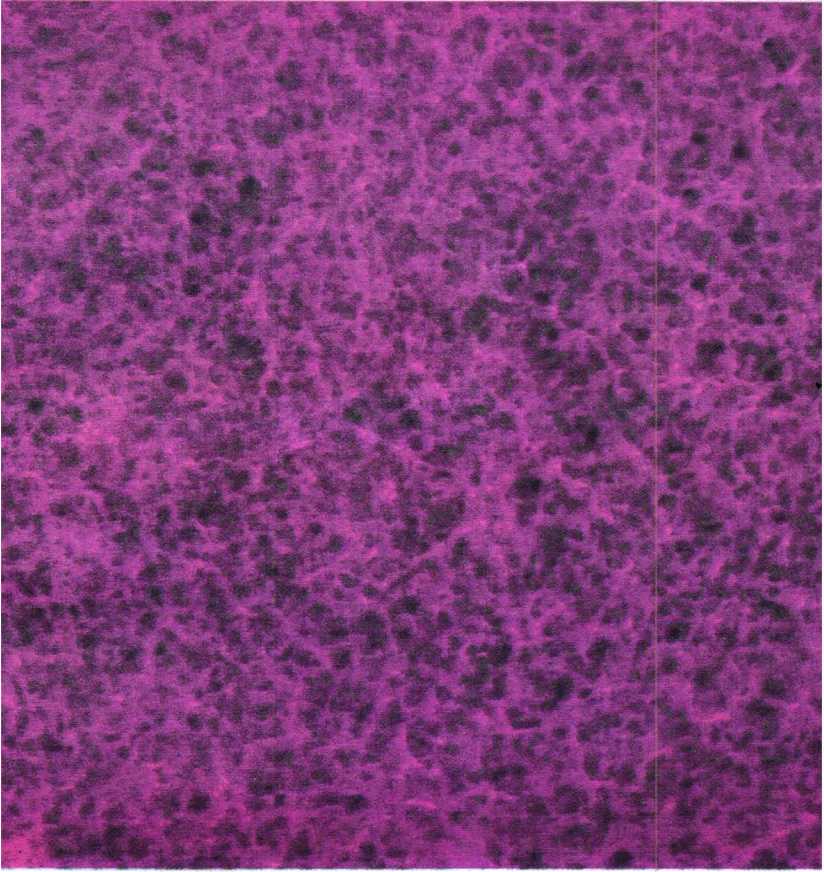
চিত্র -৫৬

" তিনি যানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যাহা তাহা হইতে উদগত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহা কিছু আকাশে উত্থীত হয়।" (৩৪ ঃ ২)

--- সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান তার সাফল্যময় ও উৎকর্ষতার অগ্রযাত্রায় বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে এই মহাবিশ্বে শূন্য স্থান বলতে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমগ্র মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকার শক্তি, তেজস্ক্রিয়তা এবং পদার্থ কণিকা দিয়ে ভর্তি (ঠাসা) হয়ে আছে যদিও আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না ঐ সকল শক্তি ও বস্তুকণিকা সমূহকে। এই না দেখার কারণ হলো মহাবিশ্বে বিরাজমান শক্তি ও বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ এবং তেজস্ক্রিয়তার চলার ঢেউ (Wave) এতই ক্ষুদ্র যে এরা আমাদের চোখের রেটিনায় কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি না করেই আমাদের চতুর্দিকে আলোর গতিতে পরিভ্রমণে নিরত হওয়ায় আমরা এদের দেখতে পাইনা। আমাদের চতুর্দিকে বিরাজমান শক্তি ও বস্তুকে অদৃশ্য থাকার পরও যদি অস্বীকার করা না যায়, তাহলে অদৃশ্য প্রভু-আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা হবে কোন যুক্তিতে?

চিত্র -৫৮

" তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের ভিতর) এমন কোন (মহাসুক্ষ্ম, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ) কিছুর সংবাদ দিতে চাহ, যাহা তিনি অবগত নহেন? নিশ্চয় তিনি (সকল প্রকার) অজ্ঞানতা হইতে পবিত্র।" (১০ ঃ ১৮)

--- মহাবিশ্বের সর্বত্র 'রঞ্জন-রশ্মি' (X-Ray) ছেয়ে আছে। তেজস্ক্রিয়তার পরিবেশে এরাও বেশি ভয়ানক। দৃশ্যমান আলোর (Visible light) 'ফোটন' কণিকার শক্তির চাইতে 'এক্স-রে'- এর 'ফোটন' কণিকাসমূহ প্রায় ১০,০০০ গুন বেশি শক্তিসম্পন্ন। 'তেজস্ক্রিয়তা যতবেশি শক্তি সম্পন্ন হবে, ওদের চলার ঢেউ-এর উচ্চতা তত ছোট হবে। অর্থাৎ ওরা Short Wave Lenght সম্পন্ন হবে। এতে ওদের গতিপথে ক্ষিপ্রতা বেড়ে যাবে। বিভিন্ন প্রকার স্যাটেলাইটের (Satellite) মাধ্যমে সমগ্র মহাকাশব্যাপী 'এক্স-রে'-এর উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা পড়েছে। আমাদের মাথার ওপর প্রায় ১২ মাইল উর্দ্ধে 'Ozon' লেয়ারের কারণে আমরা এদের সরাসরি আক্রমন থেকে রক্ষা পাচ্ছি। উল্লেখিত অদৃশ্য বস্তুকে অদৃশ্য এক মহান সত্ত্বা-ই সৃষ্টি করেছেন। এতে অবিশ্বাস করার কি যুক্তি আছে ?
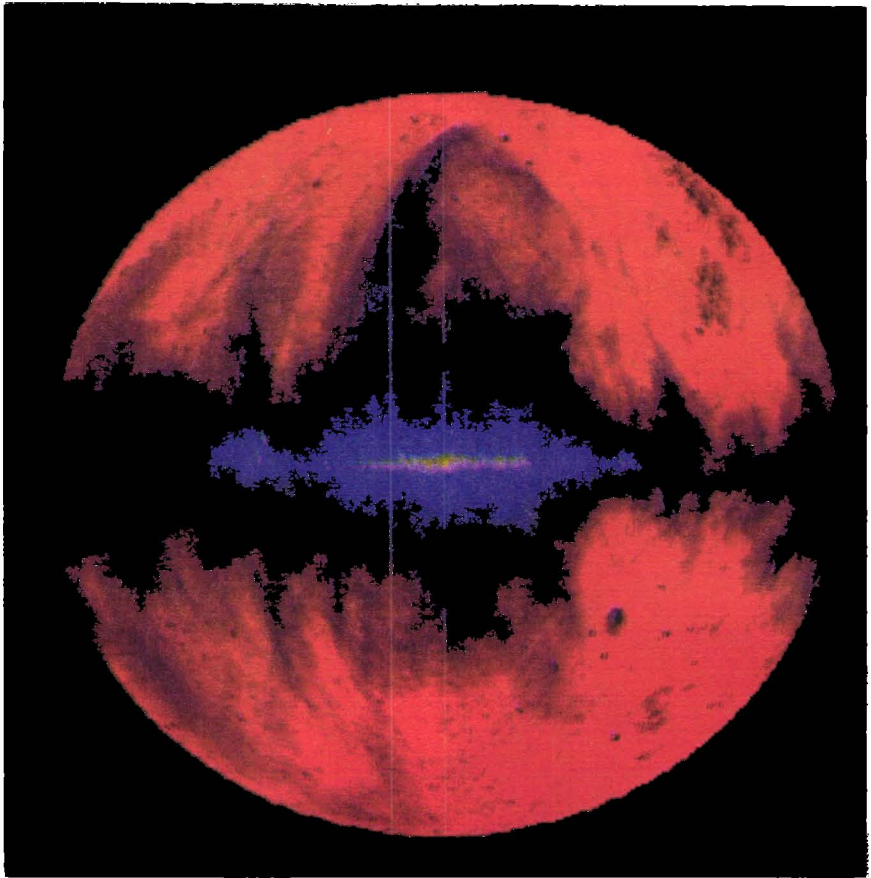
চিত্র -৫৯

" তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের ভিতর) লুকায়িত বিষয় কিংবা অদৃশ্য বস্তুকে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে) প্রকাশিত করিয়া থাকেন " (২৭ : ২৫)

--- বর্তমান বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার কারণে দৃশ্য-অদৃশ্য অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে মানব সমাজের জ্ঞানের রাজ্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য অথচ বাস্তবভাবে বিরাজমান অতি-বেগুনী রশ্মি (Ultra-Violet Ray) ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হয়ে প্রমাণ করেছে এরাও মহাকাশের মহাশূন্যতায় অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তার ন্যায় অদৃশ্যবস্তুরূপে ব্যাপকভাবে বিচরণ করছে। এদের আক্রমনেও প্রাণীজগতের কোষসমূহ পুড়ে যায় এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করে। সকল প্রকার তেজস্ক্রিয়তার (Radiation) উৎস স্থল হচ্ছে-Big Bang, Gamma-Ray burst, Stars (নক্ষত্র), Supar Nova (নক্ষত্র বিস্ফোরণ), Black Hole (ব্ল্যাক হোল), Neutron Star ইত্যাদি। 'অদৃশ্য সৃষ্টিকে মানা হবে, কিন্তু অদৃশ্য স্রষ্টাকে মানা হবেনা'- এ যেন মূর্খ-পণ্ডিতের কথা।'

চিত্র -৩৬

"তিনি পৃথিবীর ভেতর ও পৃষ্ঠদেশে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" ২ : ২৯।
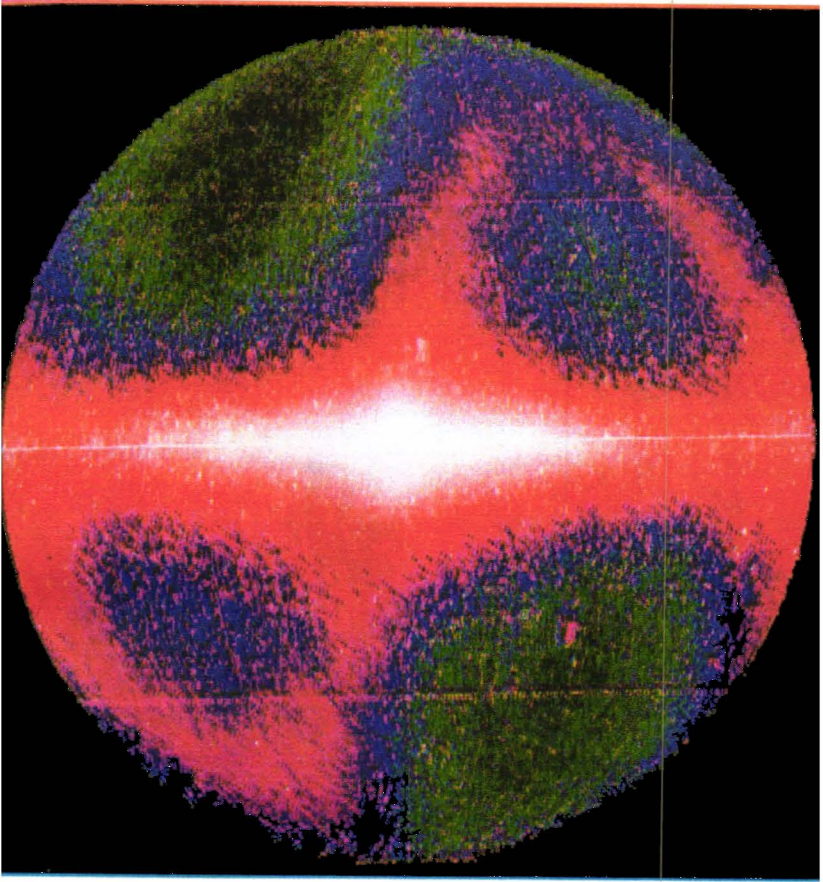
--- ওপরে স্যাটেলাইট (Satellite) কর্তৃক মহাবিশ্বে Infrared Ray এর ওপর তৈরী ছবি দেখানো হয়েছে। Infrared-Ray-মূলতঃ তাপশক্তি, আমরা আমাদের দৈহিক পরিবেশে যে তাপীয় অবস্থা অনুভব করে থাকি, ঐ তাপ-ই হচ্ছে-Infrared-Ray। ভূ-পৃষ্ঠে বিশেষ করে সকল প্রকার প্রাণের স্পন্দন নিয়মিত জারি রাখার জন্য উক্ত তাপশক্তি অত্যন্ত জরুরী। এর অভাব ঘটলে প্রাণময় জগত সমূহের স্পন্দন থেমে গিয়ে জমাট বরফে রূপান্তরিত হবে। সূর্য থেকে সৃষ্ট 'গামা-রে' পৃথিবীতে আগমন পথে বিভিন্ন কারণে কিয়দাংশ রূপান্তরিত হয়ে প্রথমে এক্স-রে পরে অতি বেগুনী রশ্মিতে এবং শেষের দিকে Infrared-Ray তে পরিণত হয়। জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত এ পর্যায় সৌর শক্তিকে তাপ আকারে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।

এই অদৃশ্য বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়ে তাদের অদৃশ্য প্রভুর-ই উপস্থিতি প্রমাণ করছে। সমাজের জ্ঞানীদের অন্তরচক্ষু এবার খুলবে কি ?
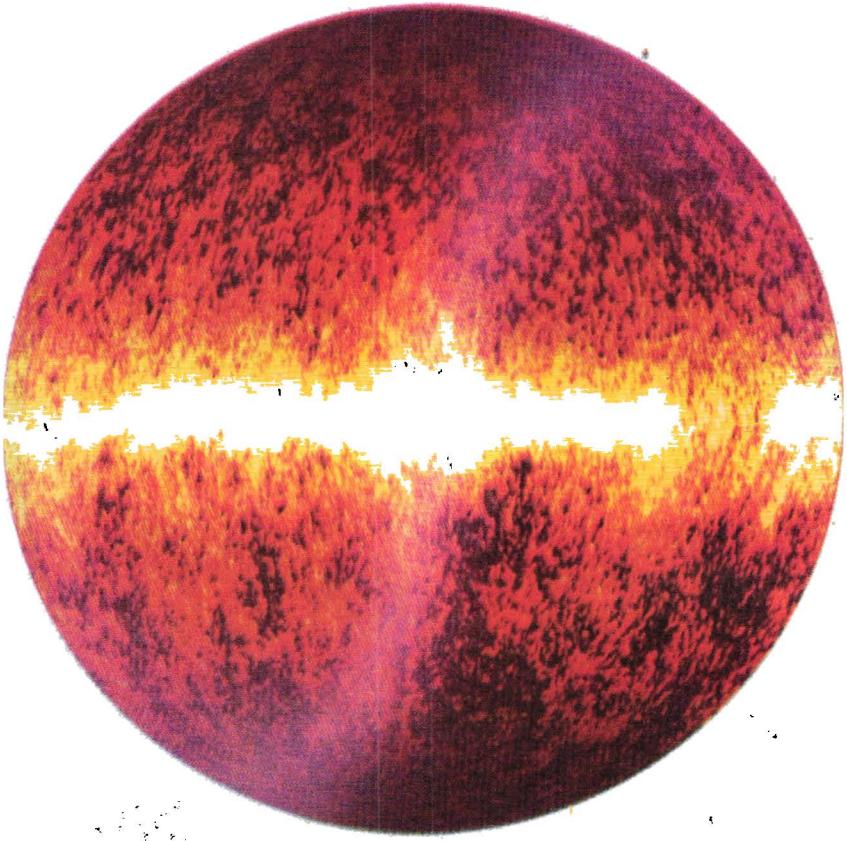
চিত্র -৬১

" আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) যাহা কিছু দৃষ্টির অগম্য (মহাসূক্ষ্মতার কারণে) তাহা সকলই আল্লাহর।" (১১ ঃ ১২৩)

--- মহাবিশ্বের জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ঘটে চলেছে ব্যাপক থেকে ব্যাপক উৎকর্ষতা। পিঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত জ্ঞানের জগতে ও যেন 'শেষ' বলতে কিছু নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎকর্ষতার ধারাবাহিক সংশ্লিষ্টতা জ্ঞানীদের চিন্তার রাজ্যকে দুলিয়ে তুলেছে, ওপরে 'Radio-Energy'-র ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। মহাবিশ্বের সর্বত্র উক্ত তেজস্ক্রিয়তা ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তার সাথে বিদ্যামান আছে বলে বিজ্ঞান বিশ্ব নিশ্চিত হয়েছে। 'Radio Wave'-ও এক প্রকার তাপীয় অবস্থা যার গতি আলোর গতির সমান। তবে এর 'ফোটন' কণিকা তুলনামূলকভাবে কম শক্তি (Low Energetic) সম্পন্ন হওয়ায় Long Wave-এ থাকে। Radio Energy-ভূ-পৃষ্ঠে মানব সম্প্রদায়ের বহুবিধ কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

মানুষ এই অদৃশ্য বিষয়গুলোর আবিষ্কারক মাত্র, স্রষ্টা নয়। তাই অদৃশ্য বস্তুর সাথে অদৃষ্ট স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেয়া অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
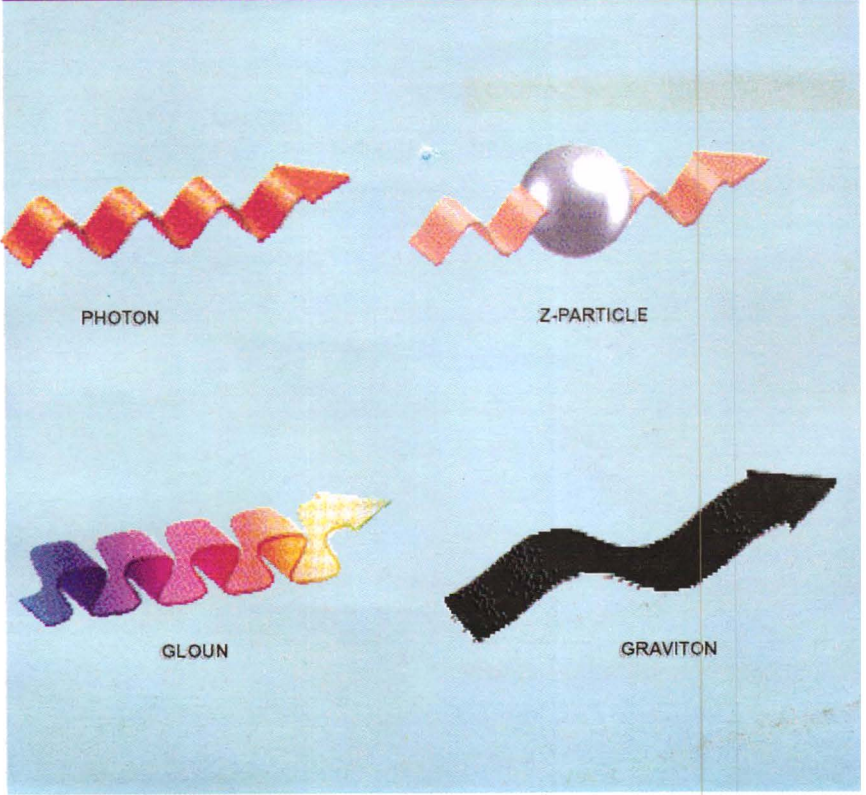
চিত্র -৬২

" আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বে) এবং উহাদের মধ্যবর্তী (দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু ও শক্তির) সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" (৪৬ ঃ ৩)

--- বর্তমান বিশ্বের নামকরা বড় বড় বিজ্ঞানী বিগত একশ বছর ধরে প্রথমে ভাবতে ছিলেন এই বিশাল মহাবিশ্ব কিভাবে কোটি কোটি বিষয়ের সমাহার নিয়ে একই সঙ্গে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? শত বছরের চেষ্টা সাধনায় অবশেষে বিজ্ঞানী সমাজ সফলভাবে উদঘাটন করতে সক্ষম হন যে, মৌলিক ৪টি শক্তি-ই এই মহাবিশ্বের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার পিছনে সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল আছে। মহাবিশ্বের বিন্দু পরিমাণ স্থানও এদের আওতামুক্ত নয়। এই মূল ৪টি শক্তি হচ্ছে যথাক্রমে-Gravitational Force, Strong Nuclear Force, Electromagnetic Force এবং Weak Force। এদের মহাসুক্ষ্ম 'দূত' কণিকাসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে- "Graviton, Gluon, Photon এবং W^+,W^- ও Z^0 উক্ত মহাসুক্ষ্ম কণিকাগুলোই মহাবিশ্বের সর্বত্র আলোর গতিতে ক্ষেত্র বিশেষে আরও কয়েকগুণ তীব্র গতিতে পরিভ্রমণের মাধ্যমে সক্রিয় থেকে বর্ণিত ৪টি মৌলিক শক্তিরূপে কাজ করছে। এখানে অদৃশ্য শক্তির পেছনে অদৃশ্য মহান সত্ত্বা' সক্রিয়ভাবে যে আছেন তা কি অস্বীকার করা যায় ?
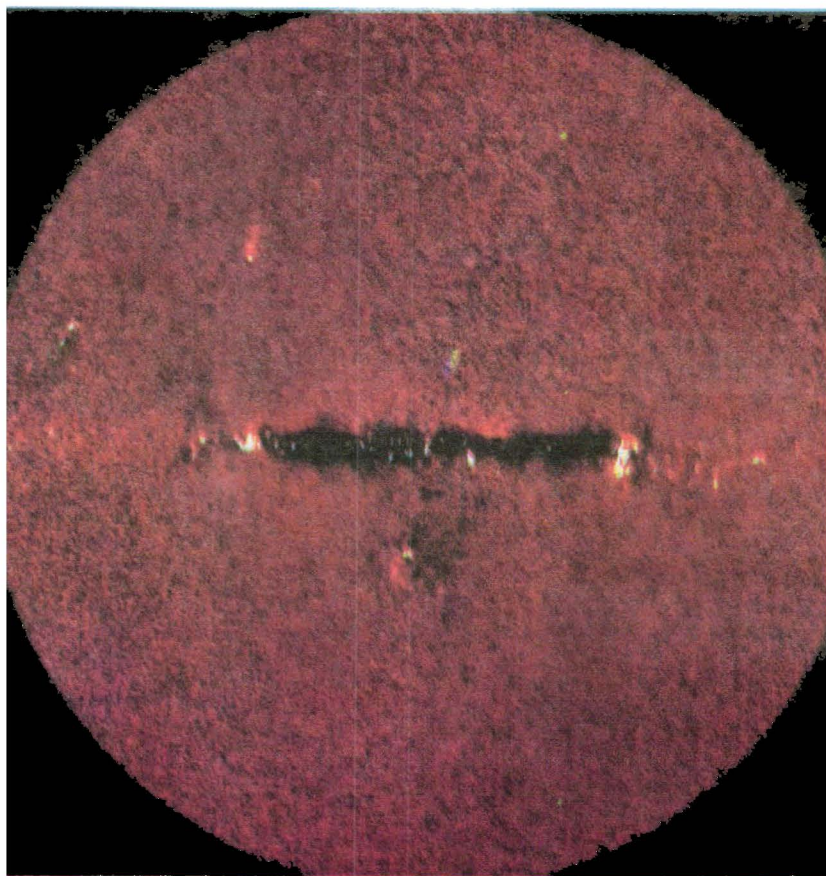
চিত্র -৬৩

"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই" (১৫ ঃ ৮৫)

--- Big Bang মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন 'আলোক শক্তি' (Highest Energetic Radiation) পর্যায়ক্রমে ৬টি ধাপ অতিক্রম করে মহাবিশ্বে প্রথম 'স্থায়ী পদার্থ' (Stable Atom) হিসাবে মৌলিক পদার্থ 'হাইড্রোজেন'-ই প্রথম আবির্ভূত হয়েছে। পরে এই হাইড্রোজেন থেকেই ধারাবাহিক পদ্ধতিতে অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান মহাবিশ্বে শতকরা ৭৫ ভাগ পদার্থ-ই হচ্ছে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন সমৃদ্ধ এই হাইড্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থ। প্রতিটি নক্ষত্রের ভেতর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মূলতঃ এই হাইড্রোজেন। সমগ্র মহাবিশ্বটি হাইড্রোজেনের মহাসূক্ষ্ম পরমাণুতে ভর্তি হয়ে আছে

অদৃশ্য 'হাইড্রোজেন' পরমাণুতে মহাবিশ্ব পূর্ণ হয়ে আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, অথচ অদৃশ্য হাইড্রোজেনের স্রষ্টাকে অদৃশ্যের অজুহাত দিয়ে বিশ্বাস করতে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছি। এটা অবশ্যই জ্ঞানের আঙ্গিকে নিন্দনীয় কাজ। সত্য নয় কী?

চিত্র -৬৪

" আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই।" (১৬ঃ ৭৭)

--- 'আলোক শক্তি' (Radiant Energy) থেকে মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করে বিবর্তন ধারায় পদার্থরূপ ধারণ করে তারপরই- দৃশ্যযোগ্য এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ক্ষমান্বয়ে গড়ে তুলেছে। ধূলির (Dust) আকার ধারণকারী পদার্থ কণাই একবার ধারাবাহিক পরিক্রমার মধ্য দিয়ে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে আবার ঐ মহাজাগতিক বস্তু সমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে ধূলি (Dust) বা পদার্থ কণারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ বার ক্রমাগত পরিক্রমন (Cycle) পদ্ধতিতে মহাজাগতিক বস্তু সৃষ্টি ও ধ্বংসের ভেতর দিয়ে এক পর্যায়ে নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যায়। সমগ্র মহাবিশ্ব ধূলা-বালিতে পরিপূর্ন বিধায় এর এক নাম হচ্ছে- 'ধূলির জগত' (Dusty Universe)। মহাসূক্ষ্মতায় বিরাজ করে বিধায় আমরা তা দেখতে পাইনা।

সুতরাং আল্লাহ মহাসুক্ষ্মতার আবরণে বিরাজমান বিধায় তিনিও অদৃশ্য, আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। আর সে কারনে তাঁকে অস্বীকার করাও সম্পূর্ণরূপেই অনুচিত।

চিত্র -৬৫

" আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অণু-পরমাণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং উহা অপেক্ষা ও ক্ষুদ্রতর (মহাসূক্ষ্ম কণিকা) অথবা বৃহত্তর (Macro) কিছুই নাই যাহা সুষ্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নাই " (১০ ঃ ৬১)

--- ওপরের ছবিতে বড় করে দেখানো ক্ষুদ্র জগতের ধুলা-বালির সংমিশ্রণেই আমাদের দেহসত্ত্বা তৈরী হয়েছে। বালি ও বালি থেকে মহাসূক্ষ্ম এই বস্তু কণিকা (Dust) দের দেখা যায় না। সমগ্র মহাবিশ্ব এ জাতীয় ধুলা-বালিতে পরিপূর্ণ। বর্তমান পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানীদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন মহাশূন্য থেকে প্রায় ১০০ টন ধুলা-বালি (Dust) গ্রহণ করছে। মহাবিশ্বের মহাশূণ্য থেকে আগত ঐ সকল ধুলা-বালিতে (Dust) আছে নিত্য নতুন রোগ-জীবাণু ও ভাইরাস যা পৃথিবীতে নতুন নতুন রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি উদঘাটিত ইউরোপের 'মেড কাউ রোগ' (*Mad cow desease*) এ জাতির একটি ঘটনা বলে বিজ্ঞান বিশ্ব ধারণা পোষণ করছে কেননা পূর্বে এ ধরনের কোন রোগের জীবাণু পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'অদৃশ্য কর্মকাণ্ড স্বীকার করে নিয়ে অদৃশ্য স্রষ্টাকে অস্বীকার করা সত্যিকার অর্থেই এক হাস্যকর ব্যাপার'।

চিত্র -৬৬

" দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে (মহাবিশ্বে) তুমি কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। তুমি আবার তাকাইয়া দেখ কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি ?" (৬৭ ঃ ৩)

-- মহাজ্ঞানের সমাহারে ধন্য এ মহাবিশ্বের এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও শক্তি কণিকা এবং বস্তু কণিকার উপস্থিতি ছাড়া খালি পাওয়া যাবে না এ কথা যেমন নিরেট সত্য, তেমনি উক্ত শক্তি কণিকাসমূহ এবং কোন কোন বস্তু কণিকা প্রতিটি মুহূর্তে বিরতিহীনভাবে সমগ্র মহাবিশ্বের সকল প্রকার পদার্থকে ভেদ করে আলোর গতিতে পরিভ্রমণ করছে। এদের উক্ত গতিতে চলার পথ সর্বদা অপ্রতিরোধ্য। ক্ষেত্র বিশেষে ৪টি মৌলিক কণিকার 'দূত' কণিকা ও কোন কোন তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) এবং বস্তু কণিকা বর্তমান আলোর গতির তুলনায় আরও কয়েকগুণ অধিক গতিতে সমগ্র মহাবিশ্বের ভেতর প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ জারি রেখেছে। আলোর গতি কিংবা তার কয়েকগুণ বেশি গতিতে শক্তি কণিকাসমূহ মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান থাকায় মহাবিশ্বটি সুষমভাবেই এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। কোন প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না। উল্লেখিত অদৃশ্য বিশাল কর্মকাণ্ডটির পেছনে যে একজন মহান স্রষ্টা কর্মরত রয়েছেন, এটা জ্ঞানীজনের ভাবনার বিষয় নয় কি ?

চিত্র -৬৭

"আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাপ" (১৩:৮)
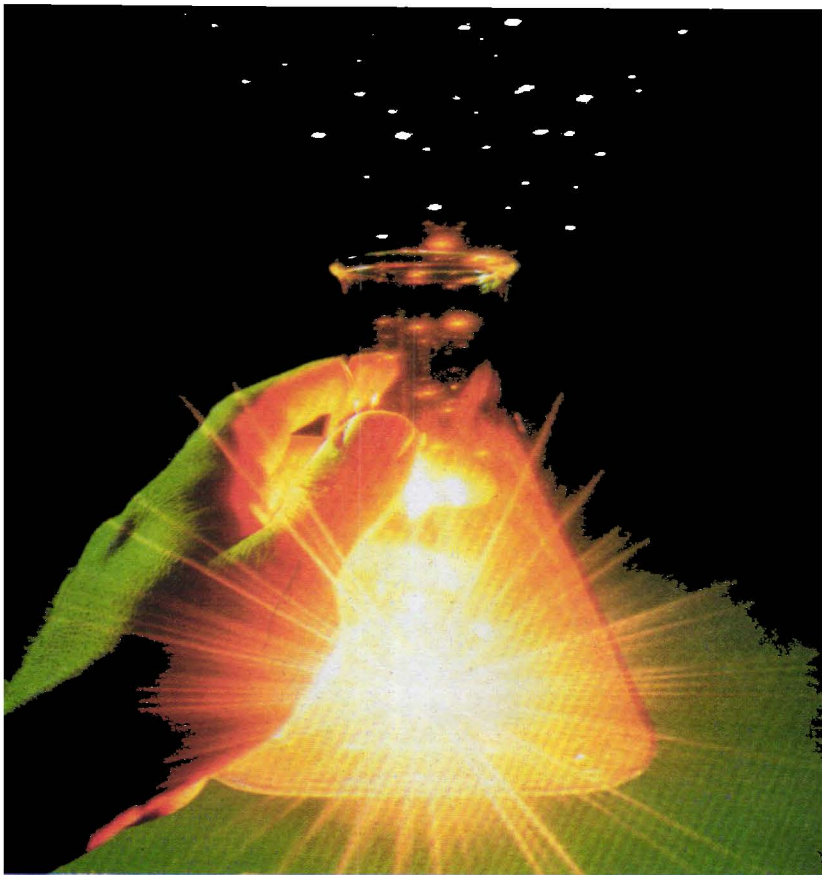
--- মহাবিশ্বের সর্বত্র মৌলিক ৪টি শক্তি নিজেদের উপস্থিতি ও প্রভাব নিশ্চিত করার কারণেই মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটন-ই ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। মহাবিশ্বের সর্বত্র যদি শক্তি কণিকাসমূহ বিরাজমান না থাকতো, তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থের পারমাণবিক স্তরে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হতো না। কেননা বস্তুর পরমাণু জগতে ৪টি মৌলিক শক্তির সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ মহাজাগতিক নিয়মে একান্তই প্রয়োজন।

সুতরাং মহাবিশ্বের কোথাও 'শূণ্য' বলতে কোন স্থান নেই। কার্যতঃ সর্বত্র শক্তি, তেজস্ক্রিয়তা ও মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকা দিয়ে ভরপুর হয়ে আছে। দৃষ্টি শক্তির আওতা বহির্ভূত বলে আমরা এদের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হই না। তাই বলা যায়- আমাদের মহাবিশ্বটি শৃংখলাবদ্ধ শক্তিসমৃদ্ধ এক সুষম মহাবিশ্ব (Our Universe is the Energetic fine tunned Universe)। মানুষ যদি এই অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা গড়তে না পারে, তাহলে অদৃশ্য যে মহান সত্তা এগুলি গড়েছেন এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁকে কেন মানা হবে না? এর কি কোন যুক্তি আছে?
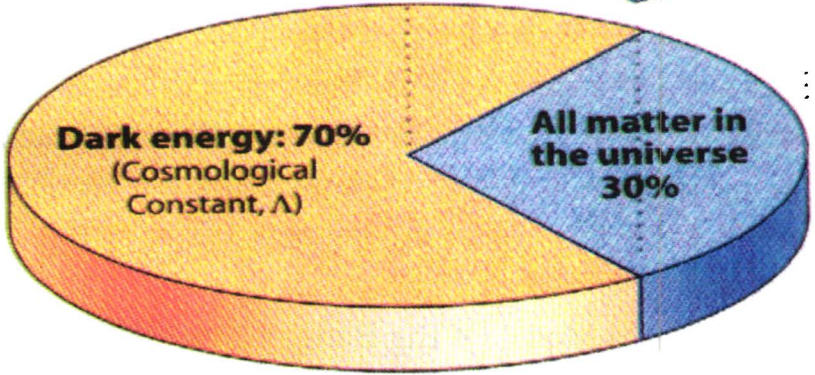
চিত্র -৬৮

" তিনি (আল্লাহ্) যথাযথ ভাবে (সুক্ষ্ম পরিমাপমিতির ওপর) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন।" (১৬ ঃ ৩)
"উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের অন্তরবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে (নির্ধারিত পরিমাপে) এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।" (৩০ ঃ ৮)
---বিংশ শতাব্দীতে এসেই মানব সম্প্রদায় বিজ্ঞানের বড় ধরনের অগ্রগতির মাধ্যমে কেবল এই মহাবিশ্বের মহাজাগতিক বস্তু সমূহ গঠনের পেছনে ব্যবহৃত পদার্থের আনুপাতিক হিসাব উদঘাটন করতে সক্ষম হয়। এতে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনের অগ্রিম তথ্য বাস্তবতার উজ্জ্বল আলোতে প্রমানিত হয়ে সমাজের জ্ঞানীদের তীক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে পদার্থের (Mass) আনুপাতিক অদৃশ্য ব্যবস্থিত হারের সাথে অদৃশ্য প্রভুর উপস্থিতিও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। 'প্রভুর' অস্তিত্ব সত্য না হলে কুরআন কিভাবে এত জটিল তথ্য এত অগ্রিম সরবরাহ করতে পারে? সমাজে জ্ঞানীদের জ্ঞানরাজ্যে এখনও কি তালা ঝুলবে?
কুরআন' দাবী করছে এগুলো যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এদের সার্বিক অবস্থা জানেন। অতএব তাঁর উপস্থিতি মেনে নেয়া উচিৎ।

যাই হোক, বর্তমান বিজ্ঞানময় পরিবেশে আমরা সতর্কতার সাথেই অবহিত হতে পেরেছি যে, আমাদের চতুর্দিকে শূন্য বলতে কিছুই নেই, মাত্র এক ইঞ্চি জায়গাও খালি পাওয়া যাবে না। সবই বিভিন্ন প্রকার 'শক্তি' (Energy) দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তাই মহাবিশ্বটিকে শৃংখলাবদ্ধ শক্তিসমৃদ্ধ এক সুষম মহাবিশ্ব, (Energetic Fine Tuned Universe) বলা-ই যুক্তিযুক্ত। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ Big Bang Model থেকে জানতে পেরেছেন যে, মহাবিশ্বটির প্রায় $১০^{৯৩}$ টি এলাকার (Region) সর্বত্র এই 'শক্তির' ঘনত্ব (Density) সুষম বন্টনের নীতিতে (Fine Tuned) সমতা বজায় রেখে ব্যবস্থিত হয়ে আছে। কোথাও কোন বড় ধরনের তারতম্য নেই। একইভাবে মহাবিশ্বে তাপমাত্রার ব্যাপারটাও যে সকল সময় সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী সুষমবস্থায় (Fine Tuned) বিরাজ করেছে এবং এখনও করছে তাও বিজ্ঞান ইতোমধ্যেই প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৬৫ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী মহাবিশ্বের সর্বত্র Back Ground Radiation 2.73k. আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে 'COBE' স্যাটেলাইটের মাধ্যমেও মহাশূন্যে তল্লাশি চালিয়ে বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে সত্যতা প্রমাণ করেন।

এতে 'Standard Model Of Big Bang' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের নিকট একটি বড় ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসে, যা 'Pre-Big Bang' নামে একটি সময়কালকে (Period) সমর্থন করে। বিষয়টি হচ্ছে 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে মহাবিশ্বটির প্রায় $১০^{৯৩}$ এলাকায় (10^{93} Rigion) তাপমাত্রা সকল সময় সুষমভাবে সমতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে বলে যখন প্রমাণিত হচ্ছে, তখন একথা মেনে নেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, বিস্ফোরণ ঘটার পূর্ব মুহূর্তেও (Pre Big Bang Era) অনুরূপভাবে শক্তির আধারটিতে (ঘনায়নকৃত বিন্দুতে) শক্তির 'ঘনত্ব ও তাপমাত্রা' (Density And Temperature) সুষমভাবে বন্টিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকবে।

নতুবা বিস্ফোরণের পরে সর্বত্র সমতা বজায় না থেকে বরং ভিন্নতা-ই প্রকট হয়ে দেখা দিত।

এখন যেহেতু মহাবিশ্বের সর্বত্র 'শক্তির' ঘনত্ব (Density) ও তাপমাত্রা (Temperature) পূর্ণরূপে সমতা নির্দেশ করছে, তাই 'Big Bang' বিস্ফোরণ থেকেই যে মহাবিশ্বের 'শুরু' (Beginning) তা কিন্তু প্রতিষ্ঠা পায় না, কারণ তার পূর্বেও 'Pre-Big Bang' ব্যবস্থাপনা হিসেবে কিছু কিছু কাজের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এতে করে 'শুরু' (Beginning) আরও পূর্ব থেকেই যে ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এরপর বিজ্ঞানীগন আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, 'বিগ-ব্যাংগ' বিস্ফোরণটি যখন ঘটেছিল তখন সময় ছিল $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড, যা মুলতঃ পূর্ণরূপে 'শূন্যসময়' (Time 'O') বুঝায় না। বরং শূন্য সময় থেকে যাত্রা করার পরেই উল্লেখিত অবস্থা বা 'সময়' ($১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড) এসেছে এবং ঐ 'সময়'-ই বিস্ফোরণটি বাস্তবভাবে ঘটেছে। তাই প্রকৃত পক্ষে স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হবে যে 'বিগ-ব্যাংগ' বিস্ফোরণটি এই মহাবিশ্বে 'সময়' শুরু হওয়া থেকে বেশ একটু পরেই ঘটেছে (Far From Being The Beginning Of Time) যা বাস্তবতার আলোকে অস্বীকার করা যায় না। উক্ত 'সময়ের' তারতম্য বর্তমান পরিবেশে আমাদের নিকট গুরুত্বহীন বা মহাসূক্ষ্ম হিসেবে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য কথা তো এই যে, তার চেয়েও আরও মহাসূক্ষ্ম সময়ের সন্ধিক্ষণে বিরাট বিরাট কর্মকান্ড ঘটে গিয়ে রীতিমত বিজ্ঞানের রূপকথাকেও (Science Fiction) হার মানিয়ে 'আলো' (Radiation) থেকে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে।

সুতরাং 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বিস্ফোরণ একদম 'শূন্য' সময়ে ঘটেনি এবং মহাবিশ্বের যাত্রাও ঐ বিস্ফোরণমুহূর্ত থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরুও হয়নি, বরং আরও পূর্ব হতে শুরু হয়েছিল।

তারপর যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্মুখে আসছে তা হলো- 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বিস্ফোরণ যখন ঘটে তখন বর্তমান মহাবিশ্বটি এর তাবৎ বস্তুভর সমেত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঘনীভূত হয়ে জমেছিল, যার আয়তন ছিল ১০$^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার। অতএব, উক্ত আয়তন বিশিষ্ট শক্তির ঘনীভূত আধারটি প্রকৃতপক্ষে একদম 'শূন্যের কোঠায়' বিরাজমান ছিলনা বলে মূলতঃ 'এককত্ব' (Singularity)-এর পূর্ণ উদ্ভবও ঘটেনি। মহাসূক্ষ্মতার স্কেলে এ এক মহাসত্য কথা। যা জ্ঞানী সমাজের চিন্তার রাজ্যে অবশ্যই দোলা দিয়ে যায়।

অতএব, মহাবিশ্ব একদম 'শূন্যবস্থা' থেকে যাত্রা শুরু করেনি এবং আদি শক্তির আধার 'শূন্যবস্থায়' পৌঁছতেও পারেনি। বিষয়টি এতই মহাসূক্ষ্মতায় পৌঁছেছে যে বাস্তবে তা অনুমান দুঃসাধ্য বলে আমরা 'শূন্যবস্থা' বা 'এককত্ব' (Singularity) বলে চালিয়ে দিচ্ছি।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে 'বিগ-ব্যাংগ' বিস্ফোরণ ঘটার মুহূর্তে মহাবিশ্বটি 'শক্তির আধার' রূপে প্রচন্ড ঘনায়নের মাধ্যমে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায় সেখানে সর্বোচ্চ বক্রতা (Maximum Curvature), সর্বোচ্চ চাপ (Maximum Pressure) ও সর্বোচ্চ তাপীয় অবস্থা (Maximum Temperature) বিরাজমান ছিল। পরবর্তীতে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়ে ক্রমান্বয়ে সময়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে বক্রতা, চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে ঘটেছে এবং ঐ পর্যায়সমূহে (Period-এ) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়ে মহাবিশ্বটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তাই বলা যায় বর্তমান মহাবিশ্বটি এর সব রকমের বস্তুসম্ভার নিয়ে এভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করার জন্য ঐরূপ সর্বোচ্চ বক্রতা, চাপ ও তাপমাত্রার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল, নতুবা মহাবিশ্বটিকে বর্তমান আকৃতিতে আমরা দেখতে পেতাম না। আর সেই অকল্পনীয় কাজটি অবশ্যই Black hole ব্যবস্থায় ঘটে থাকবে।

অতি সম্প্রতি (মার্চ-২০, ২০০১ সাল) আমেরিকান NASA হেড কোয়ার্টার-এ জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ (Astronomers) সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে, আকাশ পর্যবেক্ষণকারি 'CHANDRA X-ray

Observatory'-এর মাধ্যমে X-ray কে ব্যবহার করে মহাবিশ্বের গভীরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা বিলিয়ন-বিলিয়ন 'ব্ল্যাক হোল'র অস্তিত্ব ও ধ্বংসাবশেষ যথার্থভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। তাদের সিদ্ধান্তনুযায়ী 'বিগ-ব্যাংগ' বিস্ফোরণ ঘটার পর নবীন মহাবিশ্বে প্রাথমিকভাবে যা বিরাজমান ছিল, তা হলো শুধু 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole), ব্ল্যাক হোল (Black hole) আর ব্ল্যাক হোল (Black hole)। যার সংখ্যা প্রায় ৩০০ বিলিয়ন হবে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু তাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। (They may have been as many as 300 billion Black holes in the entire Sky, when the Universe was young, Scientist said at a briefing at NASA head quarter)

এখানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) বিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন Highest Energetic Radiation-এর 'ফোটন' (Photon) কণিকাসমূহের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের (Collision) মাধ্যমে প্রথমে 'কোয়ার্ক' নামক মহাসূক্ষ্ম পদার্থ কণিকা সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে 'অটল পরমাণুতে' (Stable Atoms) ক্রমান্বয়ে রূপ নিচ্ছিল তখন ঐ পরিবেশেই পাশাপাশি মহাবিশ্বে অসংখ্য, অগণিত 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) এর আগমন ঘটেছিল। মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ যেখানে মাত্র এক বিলিয়ন (একশ কোটি) গ্যালাক্সীর সন্ধান পেয়েছেন সেখানে একই পরিবেশে ইতোমধ্যেই প্রায় ৩০০ বিলিয়ন 'ব্ল্যাক হোলের' (Black hole) সন্ধান লাভে সক্ষম হয়েছেন। এতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপারের দিকে 'টার্ন' নিয়েছে, যা হাল্‌কাভাবে চিন্তা করার কোন প্রকার সুযোগ নেই। প্রায় ৩০০ বিলিয়ন 'ব্ল্যাক হোল' সৃষ্টি হওয়া তাও আবার নবীন মহাবিশ্বে, অবশ্যই এর পিছনে এক মহাপরিকল্পনা এবং কর্মকান্ড লুকিয়ে আছে, যা কেবল সত্য-সঠিক গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। একটু পরে আমাদের আলোচনায় আমরা তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ্।

আমরা ইতোমধ্যে অবহিত হয়েছি যে, বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'ল মেইটর' কর্তৃক ১৯৩৩ সালে সরকারীভাবে প্রকাশিত ও প্রস্তাবকৃত 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) সৃষ্টিতত্ত্বঃ ১৯৬৫ সালে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানীর মাধ্যমে বিগ-ব্যাংগের বিস্ফোরণজাত উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back Ground Radiation 2.73k) ২.৭৩ কেলভীন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় ৩০টি বৎসর ধরে Big Bang Model-এর ওপর বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালিয়ে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (Cosmology) সম্পর্কীয় তথ্য ব্যাপক হারে উদ্ঘাটনে সমর্থ হলেও 'মূলতত্ত্ব' (Origin) সম্পর্কে এতদিন খুব বেশী একটা অগ্রসর হতে পারেননি।

মহাবিশ্বটি 'Big Bang' থেকে যাত্রা শুরু করে অস্তিত্ব লাভ করে থাকলে মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তুভরের (Mass) মূল উৎস কোথায়? কিংবা 'Big Bang' বিস্ফোরণের পূর্বে কি ঘটেছিল? 'Big Bang' চূড়ান্ত বিস্ফোরণমূখ অবস্থা লাভ করেছিল কোন পদ্ধতিতে? এ জাতীয় অসংখ্য বাস্তব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীগণ প্রথমদিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীতে গবেষণা করে এতটুকু সমাধান পেশ করেন যে, 'Big Bang'-এর পূর্বে অজ্ঞাত উৎস থেকে ব্যাপক পরিমাণ শক্তি কোথাও স্থিতিশীল অবস্থায় তথা 'Static Energy' রূপে বিরাজমান ছিল। দীর্ঘ সময় পরে হঠাৎ করে ঐ নিশ্চল শক্তির ভিতর 'চঞ্চলতা' (Fluctuation) সৃষ্টি হয়ে 'Static Energy' (স্থিতিশক্তি) 'গতিশক্তিতে' (Kinetic Energy) রূপান্তরিত হয় এবং চঞ্চলতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে এক পর্যায়ে কেন্দ্রমূখী টান পড়ায় প্রচন্ড ঘনায়নের সৃষ্টি করে সমগ্র শক্তি ঘনীভূত হয়ে একটি 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দু'তে উপনীত হয়ে 'এককত্ব' (Singularity) ধারণ করে। ফলে প্রচন্ড চাপ ও তাপে ঐ মহাসূক্ষ্ম বিন্দু নামক 'শক্তির' আধারটি আর স্থির

থাকতে না পেরে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বর্তমান মহাবিশ্বের আবির্ভাব ঘটায় এবং বিস্ফোরণটি 'Big Bang' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ঐ সময় যারা 'Big Bang' কে নিরেট বাস্তবতার কারণে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ বিস্ফোরণকেই মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু (Beginning) হিসেবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন এবং 'বিগ-ব্যাংগ'র পূর্বে কোন কিছু ছিল বলে মানতে চাননি, তাদের মধ্যে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানী নিউটনের চেয়ারে বর্তমানে আসন গ্রহণকারী পদার্থ বিজ্ঞানী ও 'ব্ল্যাক হোল' বিশেষজ্ঞ (Expert) 'মিঃ ষ্টিফেন হকিংস' হচ্ছেন অন্যতম। তিনি 'বিগ-ব্যাংগ'র পূর্বে সকল কিছুকে অস্বীকার করে বলেন, 'What's North after the North Pole' (উত্তর মেরুর পরে উত্তর বলতে কিছু আছে কি?), 'Nothing happend before the Big Bang' (বিগ-ব্যাংগ-র পূর্বে কিছুই ঘটেনি)। 'বিগ-ব্যাংগ' হচ্ছে একেবারে শুরু (The Big Bang, the idea goes, was the ultimate beginning), 'সময়' এবং 'মহাশূন্য' (Time and Space) এর পর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অতএব, এর 'পূর্ব' বলতে কিছুই নেই (There was no before)। তার সাথে তখন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীও সুর মিলিয়ে বললেন, মহাবিশ্বটি বিস্ফোরণ মুহূর্ত থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। যেখানে পদার্থ, শক্তি, বিকীরণ (Matter, Energy, Radiation) এবং প্রাকৃতিক মৌলিক ৪টি শক্তি (The basic four forces of nature) সহ সকল কিছুই একই সাথে সৃষ্টি হয়ে বর্তমান পর্যায়ে আগমন করেছে। যেহেতু 'সময়'ও তখন থেকেই শুরু তাই এ প্রশ্ন করাই অর্থহীন যে মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কি ঘটেছিল (The Universe began in the 'Big Bang' where everything matter, energy, radiation and the forces of nature all come into being at the same time. Time also began with the Big Bang. So it is meaningless to ask what happend before the Universe was born).

চিত্র -৬৯

" তাহারা (অবিশ্বাসীরা) কি লক্ষ্য করেনা কিভাবে আল্লাহ আদিতে (শুরু থেকে) সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন?" (২৯ ঃ ১৯)

--- ইংল্যান্ডের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী 'মিঃ ষ্টিফেন হকিংস' বর্তমানে ক্যামব্রিজ ইউনির্ভাসিটিতে প্রাক্তন বিজ্ঞানী 'নিউটনের' চেয়ারে অধিষ্টিত আছেন। তিনি 'সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'ব্লাক হোল' সম্পর্কে ইতোমধ্যে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কে মিঃ ষ্টিফেন হকিংস একজন বিজ্ঞ ব্যাক্তি হিসেবে পরিচিত হওয়ার পর ও কেন জানি 'Big Bang' কেই একেবারে প্রাথমিক আদি শুরু হিসেবে দেখতে চান। এর পূর্বে কোন কিছু আছে বলে তিনি মানতে চান না, অথচ কার্যকারণ নীতিতে বিশ্বাসী বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে তার এ আচরণ রীতিমত ছেলে খেলায় পরিনত হয়েছে, যা মোটেই শোভনীয় নয়।তিনি একজন মর্ডাণ বিজ্ঞানী হওয়ার পরও কেন বোঝেন না যে, প্রাক প্রস্তুতি মূলক কোন প্রকার কর্মকাণ্ড না থাকলে হঠাৎ করে বিশাল এ মহাবিশ্বের তাবৎ 'বস্তুভর ও শক্তি' মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (প্রায় 10^{-33} cm) এসে জড়ো হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে 'কুরআন' তাকে বিষয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিচ্ছে।

এভাবে প্রায় ৩০টি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত প্রায় ৫/৬ বৎসর থেকে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী 'কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী' (Particle Physicists)) ও 'Standard Model of Big Bang' গবেষণাকারী কয়েকজন বিজ্ঞানী বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে 'কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী' (Particle Physicist) 'মিঃ জিব্রিল ভেনেজিয়ানো' (Mr Gabriele Venegiano of CERN, The European Labratory for Particle Physics near Geneva) এবং 'কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী মিঃ গার্ডন কেনে (Mr. Gardon kane, particle Physicist at the University of Michigan U.S.A.) সবেচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে এসেছেন।

মিঃ জিব্রিল ভেনেজিয়ানো ওপরে উল্লেখিত মূল প্রশ্নগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ এমন সঠিক উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছেন যে, তাতে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় জাগে এই মহাবিশ্বটি 'Big Bang' বিস্ফোরণ হতে ধারণাতীত বহু পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছিল (The Universe began an Unimaginably long time before the Big Bang)।

তিনি তার 'যুক্তি ও তথ্য' দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরে দাবী করেন যে, 'Big Bang' বিস্ফোরণ কখনই 'শুরু' (Beginning) হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না; বরং তা এক গুরুত্বপূর্ণ 'পরিবর্তনের সূচনাকাল' (সন্ধিক্ষণ) এই মহাবিশ্বের ইতিহাসে (The Big Bang emerges not as the begining but an important turning point in the history of the Universe).

একইভাবে 'মিঃ গার্ডন কেনে'ও তার ভাষ্যে দাবী করেন ' Big Bang ' প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে একটি 'পরবর্তী পর্যায়কাল' বা পরে ঘটিত ব্যাপার' (The Big Bang is indeed a later stage of the Universe) উল্লেখিত প্রখ্যাত কণা-পদার্থ (Partical Physicist) বিজ্ঞানীদের দাবীর পিছনে যে সকল মজবুত দলিল ও যুক্তি
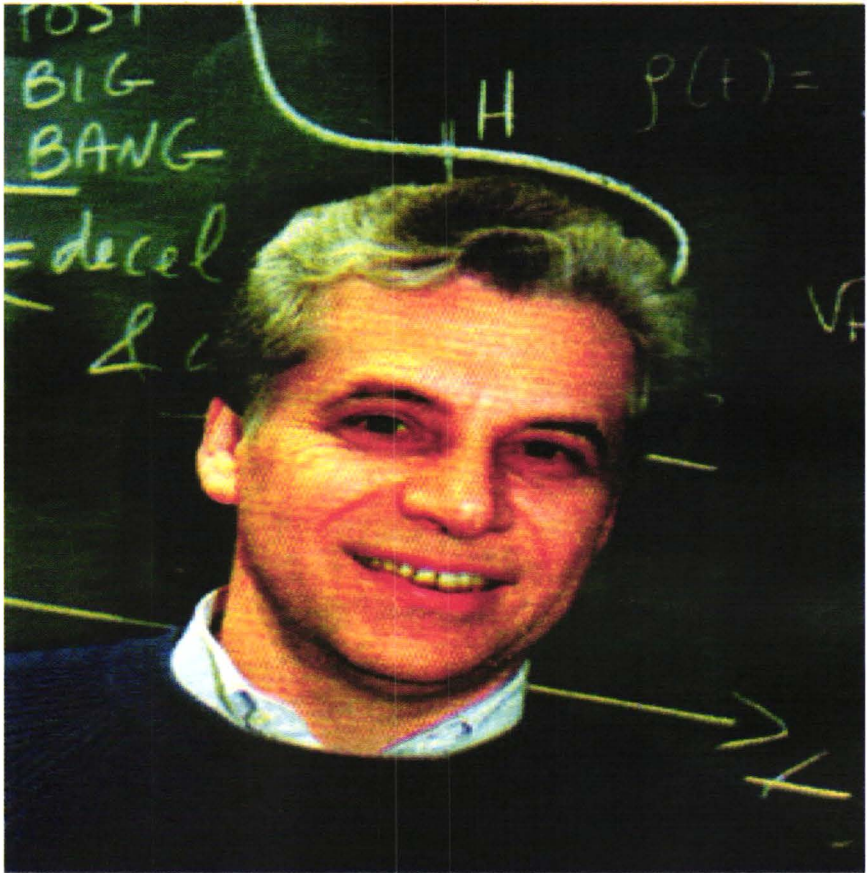
চিত্র -৭০

" বল! পৃথিবীতে (তোমরা) সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, আল্লাহ্ কেমন করিয়া (একেবারে) প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন!" (২৯ : ২০)

--- ইতিলিয় স্বনামধন্য 'কণা পদার্থ' বিজ্ঞানী (Particle Physicist) মিঃ জিব্রিল ভেনিজিয়ানো এই দৃশ্য-অদৃশ্য মিলে তৈরী মহাবিশ্বের আদি সুচনা উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে বিষয়ের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করার কারনে বিজ্ঞানী মিঃ ষ্টিফেন হকিংস সহ অনুরূপ অনেকের 'Big Bang' সীমানা অতিক্রম করে বিশাল এক পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড এবং এর উৎস শক্তির ওপর থেকে আবরণ সরিয়ে বর্তমান দিক পাল হারা বিজ্ঞান বিশ্বকে সমগ্র মহাবিশ্ব বিষয়ক একেবারে নিরেট সত্য তথ্য ও পথটি প্রদর্শন করে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তার এই আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন মহাবিশ্বের একমাত্র মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহকে সরাসরি জ্ঞানী পাঠক কুলের সন্মুখে উপস্থাপন করেছে, যা নিরপেক্ষ মন মানসিকতা সম্পন্ন ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব কোন ভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না। 'সত্য' এভাবেই ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

তৈরী হয়েছে, আমরা এখন এক এক করে সেগুলি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। যেমন ঃ

(১) Standard Big Bang Model হতে জানা যায় 'এককত্ব' ১ (Singularity) হচ্ছে ইটের দেয়ালের ভূমিকার মত, যেখানে পিঠ্ ঠেকে গেলে আর পিছনের দিকে যাওয়ার মত সুযোগ থাকে না, (In the standard model of the Big Bang the singularity acts like a brick wall). কেউ যদি কল্পনা করে যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ থেমে গিয়ে সিনেমার ফিতার মত উল্টো পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে, তাহলে প্রচন্ড ঘনায়নের কারণে ঘনত্ব (Density) এবং তাপমাত্রা (Temperature) বৃদ্ধি ঘটবে চরম পর্যায়ে, যতক্ষন পর্যন্ত মহাবিশ্বটি আকাশে প্রজ্জ্বলিত 'হাউইবাজীর' মত অনন্ত-অসীম শূন্যতায় মিলিয়ে না যায়। উক্ত অনন্ত-অসীম শূন্যতার মূহুর্তটি-ই হচ্ছে 'এককত্ব' (Singularity)।

(If any body imagine the expansion of the Universe runniag back wards like a movie in reverse, The Density and Temperature incrase remorselessly until they Skyrockct to infinity. This infinite point known as a Singularity).

এই 'এককত্ব' (Singularity) Big Bang Model-এর বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানীদের (Physicists) জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কেননা 'এককত্ব' যে ধারণা দেয়, তাতে আমাদের মহাবিশ্ব সম্পকীর্য় ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের 'থিউরি অফ গ্রেভিটি' বা 'সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব' নবীন মহাবিশ্বের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। (The Singularity tells us that our description of the universe Einstine theory of gravity or general relativity is not applicable in The earlist moment of the Universe). যেহেতু-Big Bang Model-এ 'শূন্য সময়ে' (Time zero) যে 'এককত্ব' (Singularity) প্রদর্শিত হয়েছে, বাস্তবে কিন্তু তখনও মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণভাবে 'শূন্যবস্থায়'

পৌঁছায়নি, এবং সাথে সাথে সময়ও 'শূন্য' মান পাওয়ার মত অবস্থা প্রদর্শন করেনি। তাই Big Bang Model-এ 'বিস্ফোরণ' মূহুর্তে যে 'সময়' $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড, এবং যে 'আয়তন' $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার, প্রদর্শিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে- সময়ের দ্রুত গতির সাথে ঘনায়ন তখনও চলতেছিল, একদম 'শূন্য সময়' এবং একদম 'শূন্য আয়তন' সৃষ্টি না হওয়ায় তখন কোন অবস্থাতেই 'প্রকৃত এককত্ব'-এর উদ্ভব ঘটেনি (Because the Universe still shrinks as Time runs backwards but it never reaches zero volume, so the Singularity never arises).

অতএব, 'কণা পদার্থ' (Physicists) বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে 'Big Bang' সংঘটিত হওয়ার পূর্বে (Pre- Big Bang-Era) প্রচুর 'সময়' দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) অবশ্যই বর্তমানে এক উন্নততর পদার্থ বিদ্যায় প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেছে। এটা Standard Model of the Big Bang-এর বড় ধরণের অগ্রগতি বলা চলে।

ওপরে উল্লেখিত নিরেট বাস্তবতাকে মেনে নিলে বর্তমান জ্যোতিবিজ্ঞানীগণও স্বস্তি বোধ করেন। কারণ, তাতে মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিতত্ত্বের' (Cosmology-র) সাথে সাথে মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্বের' (Origin of the Universe) যেমনি উদ্‌ঘাটনে পথ তৈরী হয়, তেমনি 'Big Bang Model' ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে অপারগ হয়ে ভেংগে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে-'Big Bang ' এই মহাবিশ্বের 'শুরু' ছিল না, বরং তার পূর্বে এক নাতি-দীর্ঘ প্রাক-ইতিহাস অগ্রবর্তী হয়ে আছে (The Big Bang was not the beginning of the Universe, but a long prehistory preceded it).

(২) 'Standard Model of the Big Bang' থেকে বর্তমান বিজ্ঞানীগণের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে এই মহাবিশ্বটি প্রায় $১০^{৯৩}$ টি এলাকায় (Rigion-এ) বিভক্ত। 'Big Bang' বিস্ফোরণ ঘটার পূর্বেই
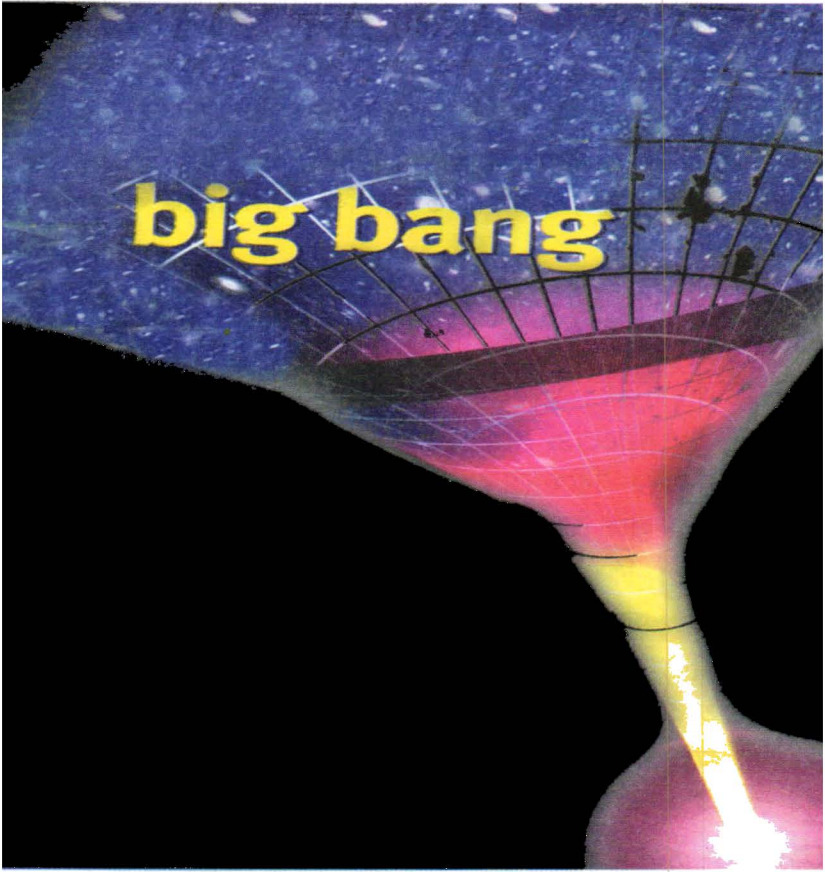
চিত্র ৭১

"তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।" (১৫ : ৮৬)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।" (৬ : ৬৭)

--- ১৯৬৪ সালে মহাবিস্ফোরণে অবশিষ্ট বস্তুকণার উদ্ভূত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back Ground Radiation) 2.7 K আবিষ্কৃত হওয়ায় 'Big Bang' সৃষ্টিতত্ত্ব বিতর্ক প্রত্যেকটি বিজ্ঞানী বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। তখন প্রাথমিক পর্যায়ে 'Big Bang' মহাবিস্ফোরণ মুহূর্তে সময়কে 'শূন্য' মানে এবং মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটির অবস্থানকে 'একত্ব' (Singularity) হিসাবে ধরা শূন্যমান দেখানো হলেও বর্তমানে সময়ের আবর্তনে মানব সম্প্রদায় তাদের জ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষতার বদৌলতে আর তা মেনে নিতে পারছে না। এখন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে 'সময় এবং স্থান' (Time and Space) ঐ মুহূর্ত থেকেই যাত্রা শুরু করেনি, বরং সময়   ও স্থান প্রমাণ করছে মহাবিস্ফোরণ ঘটার বহু পূর্ব থেকেই মূলতঃ যাত্রার সূচনা ঘটেছে। মহাজ্ঞানী সৃষ্টির মহাপরিকল্পনার তৈরী এক সুনিপুণ কৌশল সমাজের জ্ঞানীদের সম্মুখে তাঁকে আবারও এক মহাস্রষ্টা রূপে তুলে ধরেছে। যা বস্তুবাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

উল্লেখিত ১০^{৯৩} এলাকায় (Rigion) 'শক্তির' ঘনত্ব (Density) ও তাপমাত্রা (Temperature) সমভাবে বন্টিত হয়ে সমতা রক্ষা করে ব্যবস্থিত ছিল। ফলে এত বড় বিস্ফোরণ ঘটে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার পরও এর সর্বত্র ঘনত্ব ও তাপমাত্রা এখনও সমভাবেই বিরাজ করছে। অতি সম্প্রতি বিষয়টির সত্যতা উদ্‌ঘাটিত হয়ে বিজ্ঞানী সমাজকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

যারা 'Big Bang'-র পূর্বে কিছু ছিল বলে অস্বীকার করতে চান, তারা এ ব্যাপারে দাবী করছিলেন যে, 'Big Bang Point'–এ কোন প্রকার প্রাক-প্রস্তুতি ছাড়াই একটা 'অস্বাভাবিক বিশেষ অবস্থায়' (Extra Ordinarily Special State) ঘনীভূত 'বিন্দু' নামক শক্তির আধারটি আত্মপ্রকাশ করে 'বিস্ফোরণ'র মাধ্যমে মহাসম্প্রসারণে ছড়িয়ে পড়ে। 'বিশেষ অবস্থা' প্রাপ্ত ছিল বিধায় এর সর্বত্র ঘনত্ব ও তাপমাত্রা সমতা রক্ষা করারই কথা। কিন্তু বর্তমানে 'Big Bang Model' এর ওপর গবেষণাকারী অগ্রসর বিজ্ঞানীগণ এবং 'কণা-পদার্থ (Particle Physicists) বিজ্ঞানীগণ' কোন প্রকার কারন ছাড়াই বিশেষ অবস্থাকে মেনে নিতে রাজি নন। কেননা ইতোমধ্যেই তারা বিভিন্নভাবে মহাবিশ্বকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে মহাবিশ্বটি 'Big Bang' বিস্ফোরণ ঘটার পূর্ব থেকেই খুবই সাদা-সিদে ও সহজ অবস্থার ভিতর দিয়েই আবর্তন (Evolve) শুরু করেছিল। পরে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

সুতরাং 'Big Bang'-র পূর্বে প্রাক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম ছাড়া হঠাৎ করেই 'বিশেষ অবস্থা' প্রাপ্ত হওয়া বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশে এক অবান্তর প্রস্তাব, যা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। অপরদিকে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ভিতর দিয়েই আদি মহাবিশ্বটি বা শক্তির আধারটি ঘনত্ব (Density) ও তাপমাত্রার (Temperature) যদি সমতা আনতে ব্যর্থ হতো তাহলে 'Big Bang' বিস্ফোরণের পর বর্তমান সময়ে আমরা মহাবিশ্বের প্রায় ১০^{৯৩} টি এলাকায় (Rigion-এ) ঘনত্ব ও তাপমাত্রার অবশ্যই ভিন্নতা দেখতে পেতাম। এখন যেহেতু ঘনত্ব ও

তাপমাত্রার কোন প্রকার ভিন্নতা এত বিশাল মহাবিশ্বটির কোথাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, তাতে প্রতীয়মান হয় বিস্ফোরণের পূর্বে নিশ্চয় 'শক্তির' আধারটির ১০^{৯০} এলাকায় ঘনত্ব ও তাপমাত্রা (Density & Temperature) সমভাবে বন্টিত হয়ে সমতা রক্ষা করেছিল। আর তা করেছিল নিঃসন্দেহে ধারাবাহিক কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমেই।

অতএব, 'Big Bang' বিস্ফোরণ মহাবিশ্বের 'শুরু' (Beginning) হতে পারে না। তার পূর্বে অবশ্যই আছে প্রস্তুতিমূলক এক আদি ইতিহাস।

(There would be planty of time before the plank time for the Densities and Temperatures in 10^{93} rigions to be equalised).

যেখানে 'প্লাঙ্ক টাইম' বা 'টাইম জিরো'-র পূর্বে যথেষ্ট পরিমানে সময় ছিল মহাবিশ্বের প্রায় ১০^{৯৩} টি এলাকায় সমভাবে ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বন্টিত হয়ে সমতা বজায় রাখার জন্য।

(৩) 'Standard Model of the Big Bang' হতে আমরা অবহিত হয়েছি যে, ঘনায়নকৃত ও সঙ্কুচিত ১০$^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার বিন্দুতে 'শক্তির আধারটি' বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলা শুরু করার পূর্ব মূহুর্তে এই মহাবিশ্বে সর্বোচ্চ বক্রতা (Maximum Curvature), সর্বোচ্চ ঘনত্ব (Maximum Density), ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (Maximum Temperature), বিরাজিত ছিল।

'Big Bang Model'-এর উক্ত তথ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে, উক্ত চরম অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে নিশ্চয় মহাবিশ্বটি একই অবস্থায় ছিল না, অন্য কোন অবস্থায় বিরাজমান ছিল এবং সে অবস্থা থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে আবর্তন (Evolve) করে চূড়ান্ত ঐ পর্যায়ে পৌঁছাবার পরই শর্ত পূরণ হয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে মহাবিশ্বটি আত্মপ্রকাশ করে।

সত্যি কথা হলো 'Big Bang'-কে এখন আমরা বর্তমান পর্যায়ে এক নতুন আলোতে অবলোকন করছি। আর তাতে একথাটিই বেশি উদ্ভাসিত হচ্ছে যে, 'বিগ- ব্যাংগ' সময়টি মূলতঃই 'স্ফীতকরণ' (Inflation) থেকে 'সম্প্রসারণে' (Expansion) পরিবর্তন, যা আমাদের চতুর্দিকে অনুমিত
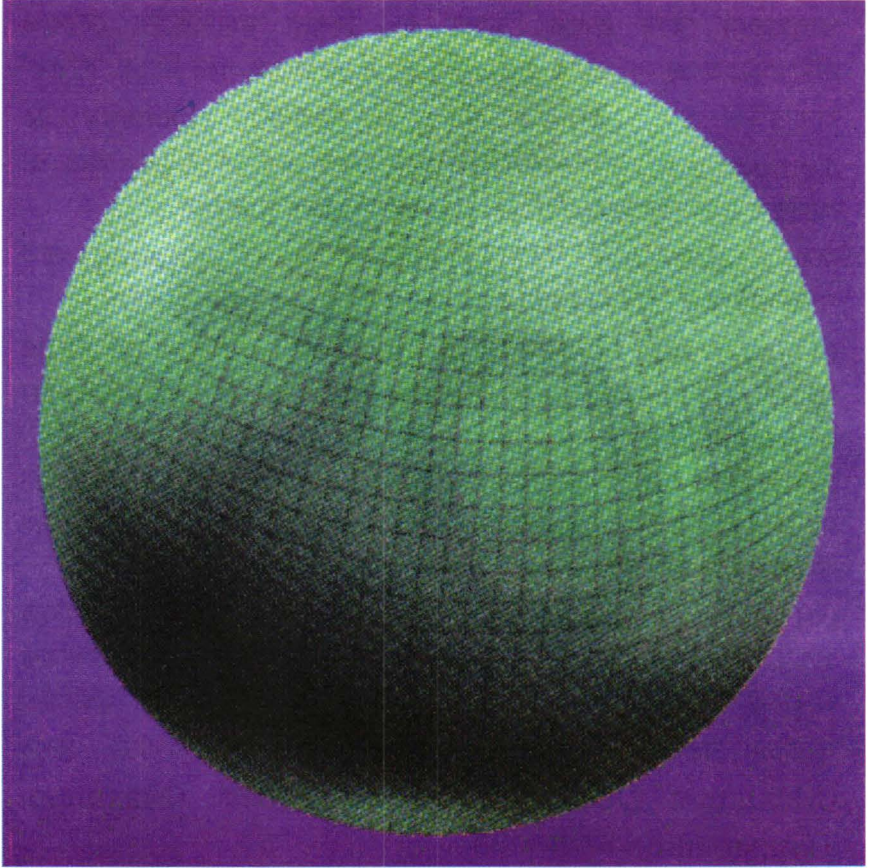
চিত্র -৭২

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) অনেক নিদর্শন রহিয়াছে (তাহাদের প্রভুর উপস্থিতি বুঝার জন্য) তাহারা সমস্তই প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তাহারা উদাসীন (মনে হয় যেন ঐসব এমনি-এমনিতেই ঘটেছে)।" (১২ ঃ ১০৫)

--- বর্তমান চরম অগ্রগতি সম্পন্ন বিজ্ঞান বিশ্ব এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার 'স্যাটেলাইট' এবং একই সাথে 'কম্পিউটার সিমুলেশ্যানের' মাধ্যমে মহাবিশ্বের সর্বমোট বিভক্তিত এলাকার পরিমান যে 10^{93} region তা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হন। Boomerang ও Maxima প্রজেক্ট এবং COBE Satillite এর মাধ্যমে উক্ত 10^{93} region এ শক্তির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা যে সুষমভাবে বন্টিত ও বিরাজিত আছে এখনও, তা আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন যে, Big Bang মহাবিস্ফোরণ ঘটার পূর্বেই আদি প্রস্তুতিমূলক মহাবিশ্বের সর্বত্র-ই শক্তির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা অবশ্যই সমতা এনেছিল। নতুবা বিস্ফোরণের পর এই সমতা সৃষ্টি হতো না, প্রতিটি এলাকায় এলোমেলোভাবে শক্তির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বিরাজমান থাকতো। সুতরাং Big Bang is not the beginning, but a later stage or turning point in the Universe. মহান স্রষ্টাকে জানা ও পাওয়ার জন্য এটা একটা বড় নিদর্শন নয় কি ?

হচ্ছে (Now we see the Big Bang in a new light It was the time of transition from inflation to the expansion we see around us today).

অতএব, এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে 'Big Bang' চূড়ান্তভাবে-বক্রতা (Curvature), তাপমাত্রা (Temperature) ও ঘনত্ব (Density) লাভ করার জন্য অবশ্যই 'প্রাক-প্রস্তুতিমূলক' পর্যায়টি (Pre-Arrangement Stage) অতিক্রম করে থাকবে যেখানে উল্লেখিত অবস্থাগুলোকে ডিঙ্গিয়ে 'Big Bang' বিষ্ফোরণকে প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই, 'Big Bang' 'শুরু' হিসাবে যাত্রা করেনি; বরং মহাবিশ্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ 'পরিবর্তনীয়' সময়কাল বা মূহুর্তমাত্র (So the Big Bang emerges not as the beginning but an important turning point in the history of Universe).

(৪) 'কণা-পদার্থ বিজ্ঞানীগণের' (Particle Physicists) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণা 'ইলেকট্রন' (Electron) 'পজিট্রন' (Positron) ও 'ফোটন' (Photon) সমূহ মহাশূন্যের জ্যামিতিক চঞ্চলতার কারণে 'গতি শক্তি' (Kinetic Energy) হতে যাদুর মত খুব দ্রুত অস্তিত্ব লাভ করে আবির্ভূত হয়ে থাকে। ফলে মহাবিশ্ব উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ফলে মহাবিশ্ব উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এখানে মূলতঃ 'কোয়ান্টাম ফিজিক্স' আগমন করে তার ভূমিকা প্রয়োগ করে থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে- উল্লেখিত কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে অবশ্যই 'Strong Electric Field' কার্যরত থাকতে হবে। আবার উক্ত Electric Field সৃষ্টির জন্য প্রচন্ড পরিবর্তনশীল 'মধ্যাকর্ষন ক্ষেত্র' (Gravitational force field) প্রয়োজন তাহলেই কেবল সকল প্রকার পদার্থ কণা 'কোয়ান্টাম' প্রডাকশান হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে (According to the particle physicists, particles such as electron, positron, and photons are conjured into

existance from energy by fluctuations in the geometry of space, as a result the Universe gradually warms up. This is where quantum physics come into play. Jast as strong electric fields can creat electron positron pairs, strongly varying gravitational field lead to quantum production of all shorts of particles).

উল্লেখিত বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিষয়টি 'Standard Big Bang Picture'-এর সাথেও তুলনা করে দেখা যেতে পারে, যেখানে 'স্ফীতকরণ' (Inflation) সময়কালের শেষ পর্যায়ে একইজাতীয় বস্তকণা সৃষ্টি হয়েছিল এবং উত্তপ্ত ও হয়েছিল (This can be contrasted with the standard Big Bang picture in which the particles are produced and heated up after the end of inflation).

'কণা পদার্থ বিজ্ঞানীদের' (Particle Physicists) উক্ত সরবরাহকৃত তথ্যানুযায়ী এ কথা বুঝে নিতে আমাদের জন্য সহজ হয়ে পড়েছে যে, মহাবিশ্বটি 'Big Bang' বিস্ফোরণ ঘটার পর্যায়ে আগমন করার অনেক আগে 'মধ্যাকর্ষণজনিত চঞ্চলতা ও ঢেউ" (Gravitational Fluctuation and Waves) দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সেই চঞ্চলতা ও ঢেউয়ের কারণে 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy)-তে রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে একই চঞ্চলতায় 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy) হতে 'ইলেকট্রন', 'পজিট্রন' ও 'ফোটন' কণিকাসমূহ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে প্রশ্ন হতে পারে 'মধ্যাকর্ষণজনিত চঞ্চলতা ও ঢেউ' আগমন করলো কোথা থেকে? উত্তর হচ্ছে-যে, বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে সমর্থিত 'ষ্ট্রীং (String) থিউরি' অনুযায়ী প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ কণাসমূহ অসম্ভব রকমের ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে থাকে, যেগুলি মহাশূন্যের মাঝে 'নয়' রকমের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে স্পন্দিত হয়ে থাকে। তবে তিনটি পরিমাপের মাধ্যমে স্পন্দিত হয়ে 'পরমানুর' (Atom) চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করে থাকে। (According to the
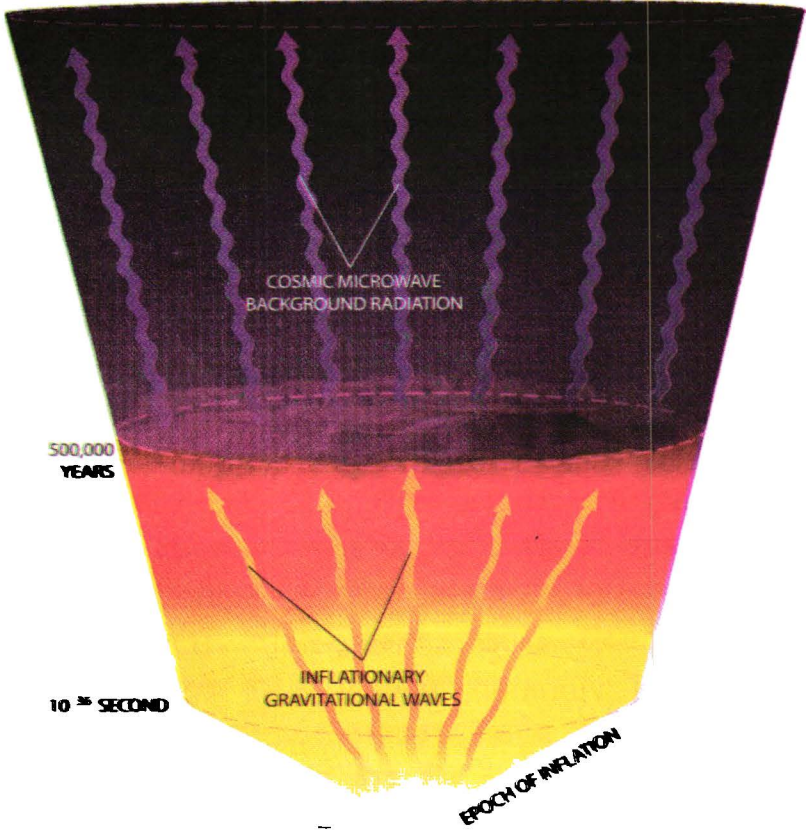
চিত্র -৭৩

" নিশ্চয় এতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য" (১৫ ঃ ৭৫)

--- 'Big Bang Model' গবেষনায় নিয়োজিত বর্তমান বিজ্ঞানীদের ভাষ্য হচ্ছে-Big Bang থেকে পরবর্তী সম্পূর্ন অবস্থাটি হচ্ছে মূলতঃই স্ফীতকরণ (Inflation) থেকে সম্প্রসারণ (Expansion)। সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলো এখানে সন্নিবেশিত নেই। সম্পুর্ণ ঘটনার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায় (Secondary Stage) মাত্র। বিশাল শক্তির আধার হতে Big Bang মহাসুক্ষ্ম বিন্দুটি যে পদ্ধতিতে 10^{-33} cm. প্রায় পর্যায়ে ঘনীভূত হতে পেরেছে। সেই প্রাক প্রস্তুতি মূলক পদ্ধতিটি-ই হচ্ছে প্রথম পর্যায় (Primary Stage)। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী স্রষ্টা আল্লাহ্ নিদর্শন করে রাখার জন্য কল্পনাতীত মহাসুক্ষ্ম সময়ের স্কেলে বিষয়গুলোকে পরিচালিত করেছেন, যেন জ্ঞানী সমাজ মহাবিস্ময়কর এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে তাদের প্রভুর উপস্থিতিকে স্বীকার করে মেনে নিয়ে ধন্য হতে পারে।

string theory the fundamental particles of nature are impossibly tiny 'string' vibrating in a space of nine diamensions with all but three diamensions 'Rolled up' smaller than the atoms.)

এই অবস্থায় ঐ প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ কণার মধ্যে 'একটি মৌলিক স্পন্দন বা চঞ্চলতা' (এদিক-ওদিক নড়াচড়ার) প্রণালী সক্রিয় হওয়ায় 'গ্র্যাভিটন' (Graviton) নামক এক প্রকার ওজন শূন্য প্রায় পদার্থ কণা আবির্ভূত হয়ে 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Foree) রূপে কাজ শুরু করে। (One of the fundamental vibration modes turns out to be a massless particles that looks Just like the hypothetical carrier of the gravitational force the 'Graviton').

এখন সহজভাবে বিষয়টি গুছিয়ে উপস্থাপন করলে এই দাড়ায় যে- 'আদিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা 'স্থিতিশক্তি (Static Energy)-তে হঠাৎ করে 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতি' (One of the fundamental vibration modes) সক্রিয় হওয়ার মধ্য দিয়ে 'গ্র্যাভিটন' নামক ক্ষুদ্র কনিকা আত্বপ্রকাশ করে পরবর্তীতে 'মহাকর্ষ বল' (Gravitlational Force) সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক চঞ্চলতা ও ঢেউয়ের (Fluctuations and Waves) মাধ্যমে 'স্থিতিশক্তিকে' গতিশক্তিতে পরিবর্তীত করে। একই সময় চঞ্চলতা ও মহাকর্ষ জনিত ঢেউয়ের কারণে 'দৃঢ় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র' (Strong Electric Field) তৈরী হয়ে 'কোয়ান্টাম মেসিনকে' (Quantum Machine) সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে 'গতিশক্তি' হতে 'ইলেকট্রন' 'পজিট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকা জোড় ও 'ফোটন' কণিকা সৃষ্টি হয়ে সমগ্র পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তোলে।

এখানে একটি বড় আকারে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতিটির সূত্র বা উৎস কি ছিল? এর উত্তর আমরা অধ্যায়ের শেষের দিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

ইতোপূর্বে আমরা মোটা কথায় অবহিত হয়েছিলাম যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শুরুতে এক জায়গায় শুধুমাত্র 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) ছড়িয়ে ছিল। পরবর্তীতে সেই 'স্থিতিশক্তি'(Statie Energy)'গতিশক্তিতে' (Kinetic Energy) পরিবর্তীত হয়ে এক পর্যায়ে 'ঘনায়ন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচন্ড চাপে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হয়· এবং পরক্ষণে 'Big Bang' নামে মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়ে এই মহাবিশ্বের সূচনা করে। এই মোটা কথাটিকে পর্যায়ক্রমে ভেংগে-ভেংগে এতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত তথ্যের বাস্তবতার আলোকে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে ঘটে যাওয়া আমাদের প্রিয় এই মহাবিশ্বটির প্রকৃত সত্য ঘটনাগুলো যুক্তিনির্ভর তথ্য হিসেবে আমাদের বোধগম্য হতে পারে। তবে 'Pre-Big Bang Era' এর শেষ পর্যায়ে যে ভয়ংকর পদ্ধতি সক্রিয় হয়ে 'Big Bang' ঘটার শর্তগুলো পূর্ণরূপে পূরণ করেছিল (অনুমানকৃত' তবে দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার আলামত ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীদের হাতে এসে পৌঁছেছে) তা বর্ণিত হয়নি। এখন আমরা আমাদের আলোচনাকে সেদিকেই নিয়ে যাবো।

'Pre-Big Bang Scenario'-তে যে প্রকৃত পক্ষে কি ঘটে থাকতে পারে, যার পরিণতিতে এই মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য তাবৎ বস্তুভর একটি মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে(10^{-33} cm.) জমে গিয়ে শর্তসমূহ পূরণ করে প্রচন্ড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে মহাসম্প্রসারণে ছড়িয়ে পড়ে আজকের এই বিশাল মহাবিশ্বে রূপ নিয়েছে, আমরা এখন সে বিষয়ের শেষ পর্যায়ের তথ্য বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানীদের বক্তব্যে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

'কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী (Particle Physicist) 'মিঃ জিব্রিল ভেনেজিয়ানো'-র মতে প্রাথমিক পর্যায়ের সাদা-সিদে মহাবিশ্বটির অবস্থা ছিল- অনন্ত, অসীমভাবে বিস্তৃত, যা 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy)-তে পূর্ণছিল। মহাবিশ্বটি ছিল ঠান্ডা এবং সামান্য বক্রতা সম্পন্ন (Very Low Curvature)। তিনি দাবী করেন যে এই সামান্য বক্রতা মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না। মহাবিশ্বটি

চিত্র -৭৪

" তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন এবং আদেশ করেন 'হও' অমনি তাহা হইয়া যায়" (৬ ঃ ৭৩)

--- বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে অগ্রসরমান 'কণা পদার্থ' বিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযারী আদি স্থিতিশীল শক্তি (Static Energy) আবর্তিত হয়ে গতিশক্তিতে (Kinetic Energy) রূপান্তরীত হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এগিয়ে গিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে। 'স্থিতিশীল শক্তি' গতিশীল শক্তিতে রূপান্তর ঘটার জন্য তাদের দৃষ্টিতে 'মহাকর্ষীয় চঞ্চলতা' (Gravitational Fluctuation) আদি শক্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই চঞ্চলতা (Fluctuation) সৃষ্টির জন্য দায়ী হচ্ছে 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতি' (One of the Fundemental Vibration mode), যে স্পন্দনের আগমন সম্পর্কে সঠিক কোন উত্তর তারা পেশ করতে পারেনি। আল্ কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে-সেই 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতিটি' হচ্ছে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্‌র, পক্ষ থেকে আদি শক্তিতে (আল্লাহর 'নূর'-এ) একটি পবিত্র আদেশ 'হও' শব্দটি। যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় আদি শক্তি স্পন্দিত' হয়ে উঠে এবং ব্যাপক চঞ্চলতা সৃষ্টি করে এগিয়ে যায়। 'কুরআন' এবং সঠিক 'বিজ্ঞানের' মাঝে কোন ব্যবধান আছে কি?"

চিত্র -৭৫

"ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।" (২৬ ঃ ১০৩)

--বিজ্ঞান বিশ্বে বর্তমান String Theory বিজ্ঞানকে যুগ-উপযোগী করে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। প্রচলিত বিজ্ঞান যে সকল সুক্ষ্ম বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না,' স্ট্রীং থিউরি' সেখানে আগমন করে সম্পূর্ণ বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করছে। এই প্রস্তাব মতে String (তার) গুলো মহাশূন্যে আমাদের পরিচিত ৩টি পরিমাপের স্থলে মোট ৯টি পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে দুলতে থাকে। যে কারণে মৌলিক স্পন্দনের মাধ্যমে দুলতে গিয়ে গ্রাভিটন, (Graviton) নামক 'মহাসুক্ষ্ম কণিকা সৃষ্টি হয়। ফলে এই কণিকার মাধ্যমে 'মহাকর্ষ বল' আত্মপ্রকাশ করে আদিশক্তিকে মহাকর্ষীয় চঞ্চলতায় ঝাঁকিয়ে তোলে। কুরআন এবং বিজ্ঞানের অভিন্ন বক্তব্য অবশ্যই জ্ঞানীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকে। জ্ঞানী সমাজ এগিয়ে আসবেন কি?

চিত্র -৭৬

"তাহারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী।" (২২ ঃ ৭৪)

--ওপরের ছবিতে আদি মহাবিশ্বে সৃষ্ট চুম্বকীয় ক্ষেত্র (Magnetic Field) দেখানো হয়েছে, যা মহাকর্ষীয় ব্যাপক চঞ্চলতার (Fluctuation) কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, চুম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি ও পরে উহার চঞ্চলতার প্রভাবে দৃঢ় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের (Electric Field) প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে Quantum Machine সক্রিয় হয়ে Production স্বরূপ প্রথমবারের মত Electron, Positron ও Photon কণিকাসমূহের আবির্ভাব ঘটায়। এতে আদি মহাবিশ্ব পদার্থকণিকা ও শক্তি এবং মহাকর্ষীয় ব্যাপক চঞ্চলতার কারণে গতিপ্রাপ্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

কুরআন দাবী করছে উল্লেখিত বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড মানবীয় চিন্তা-ধারায় এবং শক্তিতে কখনও সম্ভব নয়, একমাত্র মহাক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী এক মহান সত্ত্বার পক্ষেই কেবল সম্ভব। তাই তাঁকে জ্ঞানের মাপকাঠিতে মেনে নেয়াই হচ্ছে জ্ঞানীদের করণীয়।
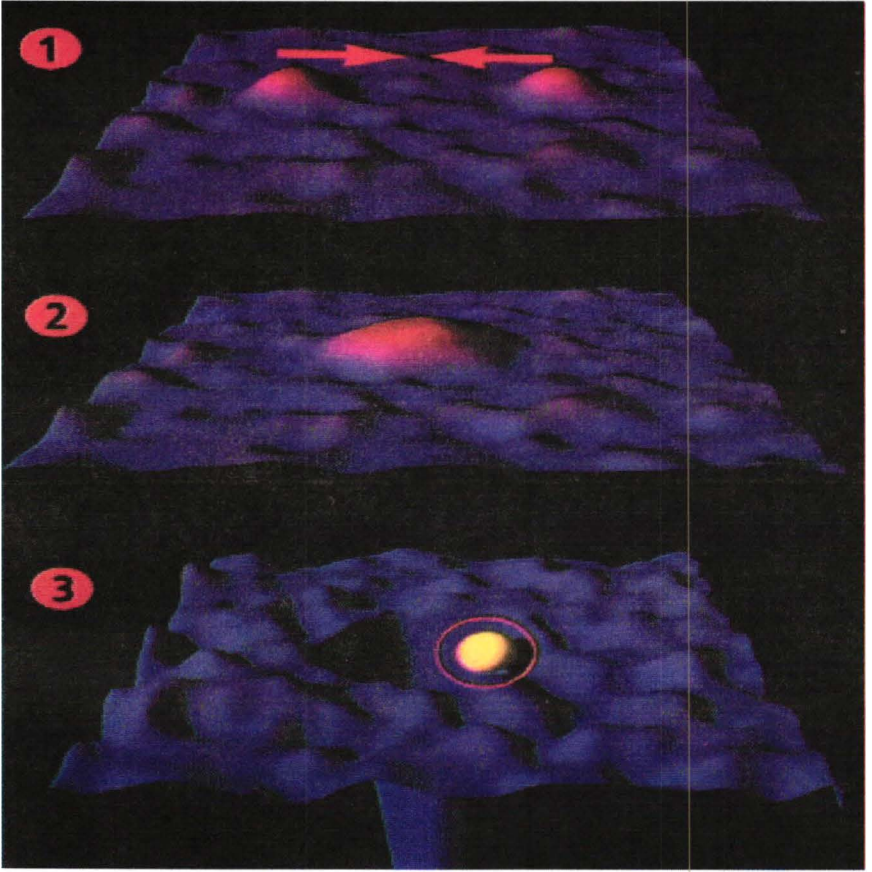
চিত্র -৭৭

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) আল্লাহর 'নূর'-এ উদ্ভাসিত।" (২৪ ঃ ৩৫)

--অতি সম্প্রতি বিজ্ঞান বিশ্ব ওপরের ছবিটি প্রদর্শন করেছে। বিজ্ঞানী মহল এই মহাবিশ্বের আদি উৎস হিসেবে একটি স্থিতিশক্তিকে (Static Energy) সনাক্ত করেছে, যে শক্তিটি মহাবিশ্বের কোথাও অবস্থান করছিল। 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতি' তাতে আঘাত করলে ধাক্কা লাগে এবং নড়া-চড়া করে উঠায় 'স্ট্রীংসমূহ' দুলে উঠে। এতে 'মহাকর্ষ বল' সৃষ্টি হয়ে আদিশক্তির ভেতর ব্যাপকভাবে চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। ফলে পর্যায়ক্রমে চুম্বকীয় ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এবং গতির সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যায়।

কুরআন এই আদি শক্তিকেই আল্লাহ তা'আলার 'নূর' (Radiant Energy) হিসেবে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই পৃথিবীবাসীকে অবহিত করেছে। বিষয়টি আশ্চর্য হওয়ার মত নয় কি? অস্বীকার করার আর কোন পথ আছে কি? তাই বলা যায সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। আর মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।
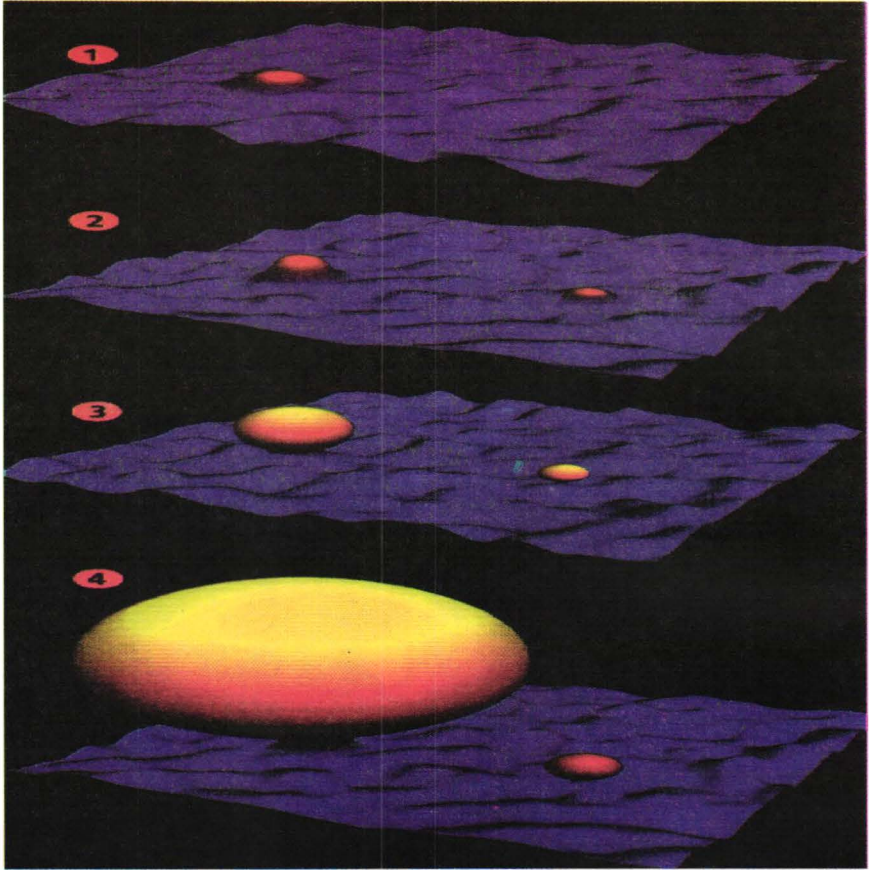
চিত্র - ৭৮

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী। (২ঃ২২৮)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে) অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সমস্ত (জ্ঞানের মাধ্যমে) প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাহারা এই সকল (জ্ঞানময়) বিষয়ের প্রতি উদাসীন। (১২ঃ১০৫)

--প্রথমদিকে বিজ্ঞান বিশ্ব Big Bang কেই মহাবিশ্বের একেবারে প্রথম শুরু হিসেবে চিহ্নিত করলেও বর্তমানে জ্ঞানের উন্নততর পরিবেশে Big Bang-এর পূর্বে আদি স্থিতিশক্তিকেও খুঁজে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ঐ আদি শক্তি পর্যায়ক্রমে পদ্ধতিগতভাবে আরও অগ্রসর হয়ে গতিশক্তি লাভ করার মাধ্যমে কার্যকরভাবে একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে যে খুব দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে সে সকল তথ্যও বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করে চলেছে। এই যে অকল্পনীয় জ্ঞানের সমাহারে ধন্য এক একটি ধাপ প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়েছে, এর প্রত্যেকটি বড় বড় নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলো একটু ভেবে দেখতে গেলেই তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়। দেখার জন্য কেউ আছে কি?

পুরোপুরি সমতল হলে, আজকে আমরা এখানে এই অবস্থায় আগমন করতে সক্ষম হতাম না।

যাই হোক তিনি যুক্তি দেখান যে,একটি 'মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতির' (One of the Fundamental Vibrating Modes) মাধ্যমে 'Electric Field' ও 'Quantum Production' সৃষ্টি হওয়ার এবং সাথে সাথে সৃষ্ট 'Gravitational Classical Fluctuation' ও 'Waves-এর কারণেও ব্যাপকভাবে স্পন্দন ও চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে গতিশক্তির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা পূর্বের গড় ঘনত্বের ও তাপমাত্রার চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force) চতুর্দিক হতে কেন্দ্রের দিকে মিলিত হয়ে শক্তির প্রবল টান সৃষ্টি করায় মহাবিশ্বটি পূর্ণরূপে বক্রতা (Complite Curvature) লাভ করে এবং কেন্দ্রের দিকে ঘনায়ন পদ্ধতি শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ এক 'ব্ল্যাক-হোলে'’র (Black hole) সৃষ্টি করে। ফলে 'মহাকর্ষ বল' প্রবল গতিতে চতুর্দিক হতে 'শক্তিকে' কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত করতে থাকায় এক পর্যায়ে 'ব্ল্যাক-হোল'টি বর্ণনাতীত প্রকান্ড রূপ পরিগ্রহ করে। (There was an opportunity for classical fluctuations to creat region that had a greater energy densty than evarage. As is todays universe, there fluctuations could become pronounced enough to give birth of Black hole). পরবর্তীতে ব্ল্যাক হোলটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকহারে 'শক্তিকে' (Energy) গলাধঃকরণ করে করে প্রচন্ড ঘনায়নের মাধ্যমে একটি মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (১০$^{-৩৩}$ সেঃ মিঃ প্রায়) আটকিয়ে

দেয় এবং সে কারণে তখন ভয়ানক চাপ ও তাপমাত্রায় (১০^{৩২}K.) শক্তির আধারটি নিজকে স্থির রাখতে না পেরে এক মহা বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে কল্পনাতীত মহাসম্প্রসারণে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে এই মহাবিশ্বের মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টিতে এগিয়ে যায়। ঐ বিষ্ফোরণটি প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পর বর্তমান পৃথিবী নামক গ্রহের মানবমন্ডলীর নিকট 'Big Bang' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

'Big Bang' বিষ্ফোরণের প্রচন্ডতায় আদি প্রকান্ড Black hole টি তখন ছিন্নভিন্ন ও টুকরো-টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়ায় পরবর্তীতে নবীন মহাবিশ্বে ঐ প্রচন্ড ঘুর্নন গতিসম্পন্ন টুকরোগুলো 'গতি জড়তার' কারণে আবারও নতুনভাবে অসংখ্য-অগণিত 'ব্ল্যাক হোলের' (Black hole) রূপ নিয়ে মহাবিশ্বটিকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে যে 'ব্ল্যাক হোল' গুলোর অধিকাংশই ধ্বংসবাশেষে পরিনত হয় এবং একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা মহাবিশ্বে বৃহৎ সংগঠন গ্যালাক্সীসমূহের মধ্যে এখনও প্রচন্ড প্রতাপে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে 'massive Black hole' রূপে বিরাজ করছে। ইতোমধ্যেই বাস্তব ছবি সহ Black hole-এর বর্ণিত রহস্য বিজ্ঞানীগণের হাতে প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছে।

১৪ই মার্চ, ২০০১ সাল, NASA-র মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ 'Chandra X-ray Observatory' স্যাটেলাইট থেকে 'এক্স- রে' (X-ray) দিয়ে তোলা মহাবিশ্বের ছবিতে প্রমাণ করে দেখান যে, আমাদের এই মহাবিশ্বের শৈশবকালে একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল সৃষ্ট বিলিয়ন-বিলিয়ন 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) গুলো, নবীন মহাবিশ্বে তখনকার সময়ের যদি এটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বলতে বলা হয়, তাহলে বলা যায়- বিষয়টি হচ্ছে-'ব্ল্যাক হোল' 'ব্ল্যাক হোল' আর 'ব্ল্যাক হোল' যার সংখ্যা তখন প্রায় ৩০০ বিলিয়নের ওপর ছিল। কল্পনা করতেও গা-শিউরে উঠে। বিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী সময়ের সাথে পরিবেশগত কারণে এদের অধিক সংখ্যক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এখনও প্রায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

চিত্র -৭৯

" আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্র পতনস্থানের (Black hole), অবশ্যই ইহা এক গুরুতর মহাশপথ। যদি তোমরা জানিতে পারিতে!" (৫৬ ঃ ৭৫,৭৬)

-- আমাদের চতুর্দিকে দৃশ্য-অদৃশ্য মিলে যে বিশাল মহাবিশ্ব বিরাজমান এর তাবৎ বস্তুভর (Mass) ও শক্তি একত্রে মিশে প্রায় 10^{-33} cm. মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে অবিশ্বাস্যরূপে ঘনীভূত ছিল। Big Bang নামক মহাবিস্ফোরণ ঘটার পর বিন্দুটি খুলে গিয়ে মহাসম্প্রসারণের কারণে আজকে এই বিশাল রূপ ধারণ করেছে। এত বিশাল বস্তুভর ও শক্তিকে ঘনায়ন প্রক্রিয়ায় সঙ্কুচিত করে 10^{-33} cm. বিন্দুতে ঘনীভূত করা যে একমাত্র Black hole ব্যবস্তা ছাড়া অন্যকোন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, সে কথা বিজ্ঞান বিশ্ব একবাক্যে স্বীকার করছে। 'কুরআন' Black hole-এর এই অদ্বিতীয় কর্মকাণ্ড এর দিকে ইশারা করে 'গুরুতর' বলে বর্ণনা করেছে বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে। এতে কি প্রমাণ হয় না যে, এক আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই Big Bang-এর পূর্বে Black hole-এর মধ্যে তাঁর 'নূর'-শক্তিকে ঘনীভূত করে পরে বিস্ফোরণ ঘটায়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন? জ্ঞানীদের নিকট বিষয়টি কি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে নি?

Black Holes once ruled universe : astronomers

WASHINGTON (Rts) March,2001.
ASTRONOMERS looking back in time reported Truesday that the early universe was probably dominated by three things: "Black holes, black holes and black holes."
There may have been as many as 300 billion black holes in the entire sky when the universe was young, scientists said at a briefing at NASA headquarters.
Using the orbiting Chandra X-Ray Observatory, astronomers focused on the X-Ray glow, a sort of blur in the background of images of galaxies, stars and other cosmic features.
They made what amounts to a "core sample" of the sky, looking at a tiny patch of the heavens about one-quarter the size of the full moon. They looked very deeply so they "saw" objects as they may have appeared 12 billion years ago, or when the universe was about one-tenth of its current age.
"We're learned that there's some diversity to these individual objects which make up the X-Ray glow, but if you had to name the three most important componets, they would be black holes, black holes and black holes." Bruce Margon, an astronomy professor at the University of Washington, in Seattle, said.
Astronomers have taken previous "core samples" using the Hubble Space Telescope, but that could only "see" things in visible light. Chandra takes pictures of objects using the X-Ray they emit instead of the light they give off.
This lets scientists "see" strange phenomena like black holes, those giant matter-sucking drains in space that have so much gravitational pull that nothing, not even light, can escape.

But material swirling around the black holes creates a disk that gives off X-rays - extremely faint X-rays because of their extreme distance or small size in some cases, but still enough to determine that a black hole is probably at the heart of it. The range of black holes includes those with the mass of our Sun, all the way up to those super massive types with the mass of 100 billion suns. There are also extremely exotic star-like objects that are visible in X-rays, including so-called buried quasars

Decades ago, astronomers defined quasars as the acronym for "quasi-stellar radio sources" in space. Now quasars are thought to represent giant black holes at the center of galaxies. The high energy they emit- about 10 trillion times the energy per second as the Sun - comes from the force of enormous energy released by matter that falls into black holes.

Buried quasars are those that "hide" from earthly view in the dust and gas that light cannot penetrate, according to Riccardo Giacconi, President of Asociated universities of Washingto, D.C., and Johns Hopkins University in Baltimore.

These shy quasars can be plainly seen by Chandra, which sees through the dust to the X-rays they give off, Giacconi, said.

The total images of Chandra's deep views of patches of the northern and southern sky look about the same as the night sky would to a person looking up. But though the bright dots might look like stars, they are in fact the X-rays emitted by galaxies and in many cases black holes and their accretion disks.

In the south the Chandra Deep Field image trainded its instruments on the constellation Fornas; in the north, it captured X-ray images of an area around the Big Dipper (Ursa Major).

প্রতিটি গ্যালাক্সীর মধ্যে প্রচন্ড প্রতাপে বিরাজ করে মহাবিশ্বে মহাজাগতিক ভয়ংকর বস্তুরূপে গ্যালাক্সীসমূহের ধ্বংসের ব্যাপারে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে (দেখুন 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২, কিয়ামাত অধ্যায়)।

সুতরাং 'কণা পদার্থ' বিজ্ঞানীদের দাবী হচ্ছে-'Big Bang' নামক চূড়ান্ত পরিস্থিতি লাভ করার জন্য মহাসঙ্কোচন একমাত্র Black hole-র মধ্যেই সম্ভব বিধায় এবং ইতোমধ্যে নবীন মহাবিশ্বে জন্ম নেয়া প্রায় ৩০০ বিলিয়ন 'ব্ল্যাক হোলের' (Black hole) অস্তিত্ব বাস্তবভাবে 'Chandra X-ray Observatory' স্যাটেলাইট কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ায় 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) কে একদম 'শুরু' (Beginning) বলার সকল প্রকার আয়োজন নিজ থেকেই বানচাল হয়ে গেছে। যেহেতু এখন বাস্তব প্রমাণ হাতে এসে গেছে তাই বলা যায় 'Big Bang' একদম 'শুরু' নয় বরং পূর্ব থেকে চলে আসা ধারাবাহিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য 'পরিবর্তীত পর্যায়কাল' (Turning Point) বা 'পরবর্তী ধাপ' (Later Stage) মাত্র।

কণা-পদার্থ বিজ্ঞানীগণ (Particle Physicists) আশা করছেন আগামী প্রজন্ম তাদের 'Detector' দিয়ে Big Bang বিস্ফোরণ পরবর্তী 'Afterglow' পর্যবেক্ষণের সময় Cosmic Microwave Back Ground-এর Power Spectrum-এ ওপরে বর্ণিত 'Pre-Big Bang scenario' -এর কর্মকান্ডের চিহ্নসমূহ সনাক্ত করতে সক্ষম হতে পারে। তারা আরও দাবী করেন যে, November-২০০০ সালে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত আমেরিকান 'MAP Satellite'-এর মাধ্যমে অথবা ২০০১ সালে ইউরোপীয়ান 'Plank Prob' Satellite'-দিয়ে ও ঐ সকল প্রমাণ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে।

কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী 'মিঃ জিব্রিল ভেনেজিয়ানো' প্রসঙ্গক্রমে সন্তুষ্টির সাথে ঘোষণা করেন 'Testable (at least in principle) models about before the Big Bang physics is now good

চিত্র -৮১

" আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ কর। নির্দেশনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ ঃ ১০১)

-- বর্তমান বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্বের পরতে পরতে সকল কিছুর প্রতি লক্ষ্য করতে গিয়ে বিগত ২০০০ সালে মহাবিশ্বের গভীরে বিস্মিত-ভীতিপদ এক ভয়ংকর দৃশ্য উদঘাটন করেছেন। Chandra x-ray Observatory-কর্তৃক x-ray দিয়ে তোলা মহাকাশের ছবিতে অগনিত অসংখ্য Black hole-এর ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করে প্রমাণ করেছেন Big Bang-এর পরবর্তী নবীন মহাবিশ্বে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন Black hole সৃষ্টি হয়েছিল। Pre-Big Bang era - তে যে Black hole টি সমস্ত বস্তুভরকে 10^{-33} cm.-এ ঘনীভূত করেছিল, Big Bang মহাবিস্ফোরণে সেই বৃহৎ Black hole টি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন টুকরো হয়ে যায়। পরবর্তীতে গতিজড়তার কারণে আবার নবীন মহাবিশ্বে সেই খণ্ডগুলোই নতুন Black hole রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। সুতরাং Big Bang সম্পর্কে কুরআনের 'তথ্য' সত্যে পরিণত হয়েছে। এরপরও কি 'আল্লাহ' সম্পর্কে মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ আছে?

চিত্র -৮২

"শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।" (২১ ঃ ৩৭)

"যে ব্যাক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দেখিতে পাইয়াও তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে হইবে?" (৩২ ঃ ২২)

-- চরম উৎকর্ষীয় বিজ্ঞানের প্রতিদিনের আবিষ্কার আর উদঘাটন দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদামত এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তন ধারার অগনিত বাস্তব ও সত্য নিদর্শন আমাদেরকে ইতোমধ্যেই প্রদর্শন করেছেন। যে কারণে বিজ্ঞানী সমাজ এখন মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' বিষয়ক যে সকল 'তথ্য ও তত্ত্ব' সরবরাহ করেছেন তা হুবহু প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই আল্-কুরআন মানব জাতির জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে। এতে করে স্পষ্টভাবেই প্রমানিত হচ্ছে আল্-কুরআন সত্য সঠিক ঐশী গ্রন্থ এবং এর রচয়িতা ও প্রেরণকারী হিসেবে 'আল্লাহ্ তায়ালা'ও অদৃশ্যে বিরাজমান থাকলেও মহাসত্যতার আসনে তিনি উপবিষ্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাস্তব নির্দশন পৌঁছে যাওয়ার পরও নেহায়েত সংকীর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন জ্ঞানীজনই কেবল মহান আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারে।
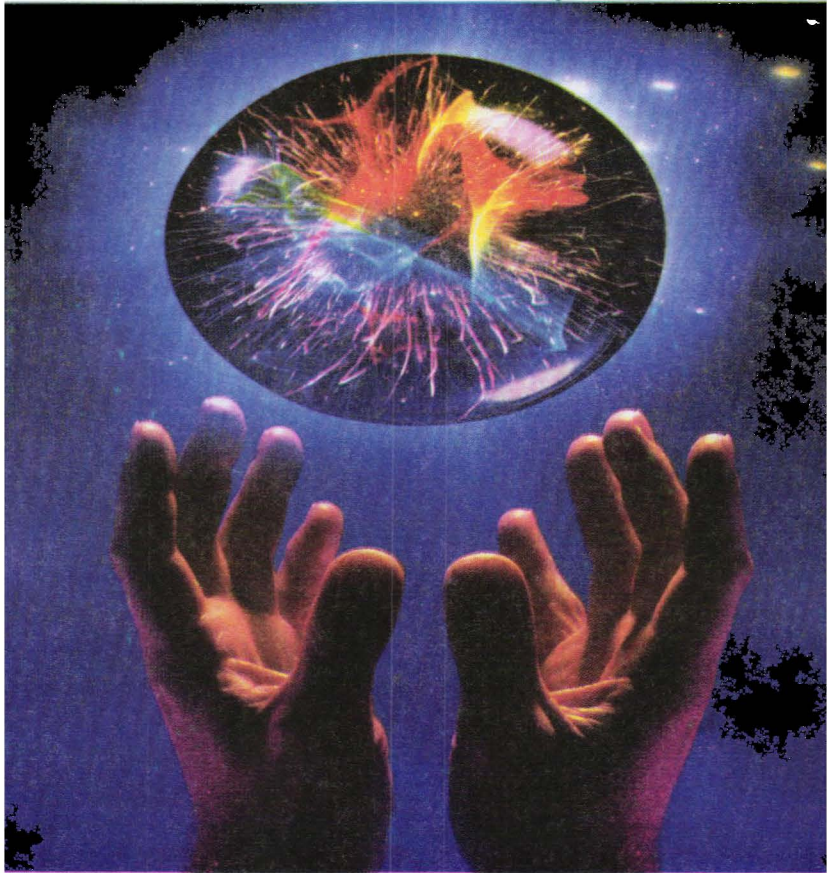
চি-৮৩

"[illegible]"

" এই গুলিই (মহাবিশ্বের অসংখ্য প্রতিটি নিদর্শনই) প্রমাণ যে আল্লাহ (সকল অবস্থায় ও সকল প্রকার মানদণ্ডে) সত্য।" (৩১ : ৩০)

--১৯৩৩ সালের প্রস্তাবকৃত [illegible] (Big Bang) এর সপক্ষে ১৯৬৫ সালে Back Ground Radiation 2.73 K. আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে 'বিজ্ঞান বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অথচ Big Bang যে সত্যিকার অর্থেই এ মহাবিশ্বের একেবারে প্রথম শুরু নয়, বরং 'পরবর্তী একটি দশা' (Later Stage) মাত্র এবং Big Bang বহু পূর্বে একটি শক্তির উৎসের (Source of Energy) হতে যাত্রার প্রথম সূচনা যে ঘটেছিল, তা একবিংশ শতাব্দীতে এসে আবরণ মুক্ত হতে পেরেছে। আল-কুরআন গুরুত্বপূর্ণ এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টিকে একটি সহজ, সুন্দর ও বোধগম্য উপমা 'নূর' দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন দ্বারে সংকেত করে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে সূরা 'নূর'-এ (৩৫ নং আয়াতে) মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ সময় পর বিজ্ঞান তার আবিষ্কৃত 'তথ্য ও তত্ত্ব' নিয়ে হুবহু কুরআন-এর পথ ধরে এগিয়ে আওয়াজ 'আল্লাহ' সম্পর্কে সকল প্রকার সন্দেহ, সংশয়ের বাঁধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গুড়িয়ে গেল। প্রমাণিত হল 'আল্লাহ' সত্য এবং 'তিনিই এই মহাবিশ্বের একমাত্র প্রভু'।
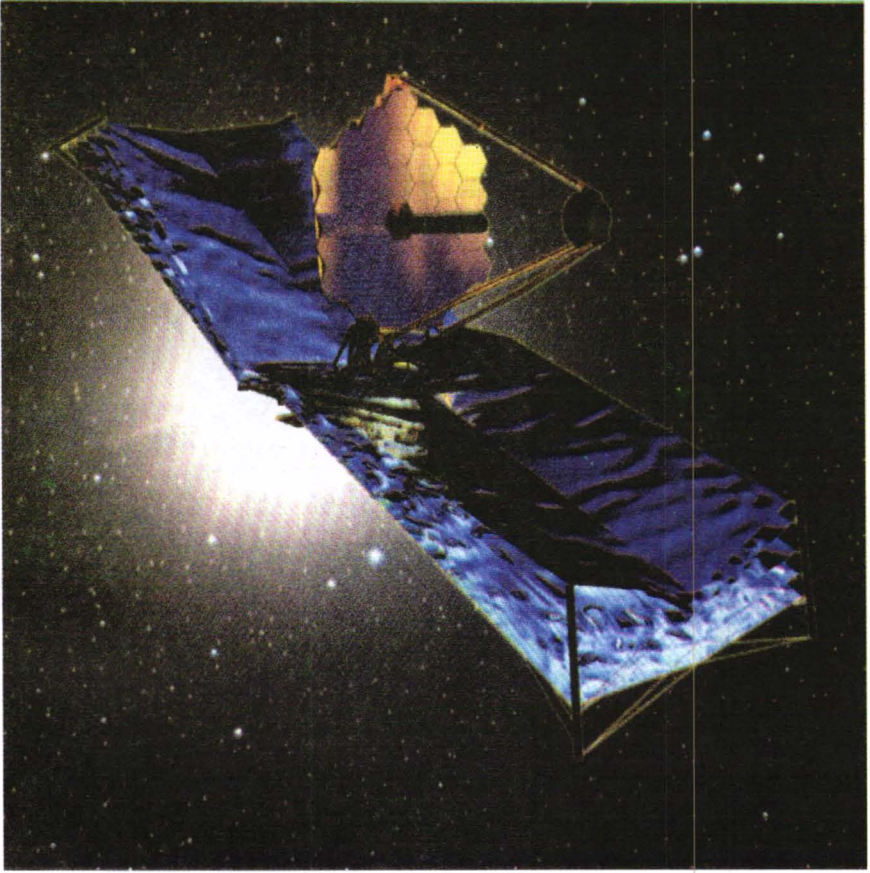
চিত্র -৮৪

"তাঁহার (আল্লাহর উপস্থিতির) অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (তাঁহার 'নূর' থেকে সমগ্র মহাবিশ্বের) সৃষ্টি।" (৪২ঃ২৯)

"বল! পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং (বিভিন্নভাবে) অনুসন্ধান কর আল্লাহ্ কেমন করিয়া কিভাবে সৃষ্টি কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন? (ভালো করিয়া জানিয়া রাখ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (২৯ঃ২০)

--ওপরের ছবিতে আগামী প্রজন্মেরর জন্য তৈরী হতে যাচ্ছে যে Generation Space Telescope তার অগ্রিম ছবি দেখানো হয়েছে। যা চালু হলে Pre-Big Bang Scenario এর চিহ্ন ওর Power Spectrum এ সনাক্ত করা যেতে পারে বলে বর্তমান 'কণাপদার্থ' বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেছেন। ইতোমধ্যেই বিজ্ঞান অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' বা আলোকশক্তি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যা স্থিতিশক্তি (Static Energy) রূপে চিহ্নিত করেছে। এ ক্ষেত্রে কুরআন আরও অনুসন্ধান ও গবেষণার তাগিদ করেছে। এরই প্রেক্ষাপটে বলা যায় আগামী দিনগুলোতে নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে 'এক আল্লাহর' উপস্থিতি আরও স্পষ্ট আলোতে প্রকাশিত হবে।

চিত্র -৮৫

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) গৌরব-গরীমা তাঁহারই (আল্লাহর) এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪৫:৩৭)

--ইতোমধ্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত Satellite -এর মাধ্যমেও Pre Big Bang Scenario-র অর্থাৎ, Big Bang -এর প্রাক প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ডের চিহ্নসমূহ ধরা পড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ আশা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইতোমধ্যেই অসংখ্য যুক্তিনির্ভর তথ্যে এবং মহাকাশে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন Balck Hole-র ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হওয়ায় Pre Big Bang Scenario এক মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

'কুরআন' এ সম্পর্কে দীর্ঘ সময় পূর্বেই যে সকল তথ্য প্রকাশ করেছিল এবং বর্তমানে বিজ্ঞান যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে, এদের উভয় তথ্য একই মালায় গাঁথা ফুলের মত অভিন্নতা প্রদর্শন করে একাত্মতা ঘোষণা করায় মহাবিশ্বব্যাপী এক আল্লাহর গৌরব-গরীমা আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়ছে এক নতুন আলোর ঝিল্‌কানিতে।

physics and this is a big improvement on the standard Big Bang'।

এখন আমরা আমাদের এই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the Universe) সম্পর্কে উপস্থাপিত আলোচনায় বর্তমান বিজ্ঞানের নতুন আলোতে এক নতুন পরিবেশে বাস্তবতা ও যুক্তি-নির্ভর যে সকল তথ্য বলিষ্ঠভাবে আগমন করেছে, তা পদ্ধতিগতভাবে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে নিচ্ছিঃ-

(১) আদি স্থিতিশক্তি(Static Energy) সমতল ছিল এবং তুলনামূলক ঠান্ডা (Cool) ছিল।

(২) 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy)-র অভ্যন্তরে হঠাৎ করে 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতি' (One of the fundamental vibration modes) ক্রিয়াশীল হওয়ায় ব্যাপকভাবে 'চঞ্চলতা' (এদিক-ওদিক নড়া-চড়া) সৃষ্টি হয়ে 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy) -তে রূপান্তরিত হয়।

(৩) একই সাথে ব্যাপক 'চঞ্চলতার' (Fluctuation) কারণে 'গ্রেভিটন' (Graviton) নামক প্রায় ওজনশূন্য মহাসুক্ষ্ম পদার্থ কণিকা সৃষ্টি হয়ে 'মহাকর্ষ বলের' (Gravitational Force) সূচনা ঘটায়। ফলে 'মহাকর্ষ বলের' সর্বোচ্চ কেন্দ্রমূখী টানের প্রবণতায় 'গতিশক্তি' সম্পন্ন এলাকাটি চতুর্দিক থেকে বক্রতা (Curvature) লাভ করে।

(৪) একই সময়ে 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy) সম্পন্ন 'বক্রতা' (Curvature) লাভকারি স্থানে ব্যাপক 'Gravitational Classical Fluctuations ও Waves' -এর কারণে 'দৃঢ় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রেরও (Strong Electric Field) আর্বিভাব ঘটে।

(৫) 'Strong Electric Field' তৈরী হওয়ায় প্রথম বারের মত 'কোয়ান্টাম মেশিন' (Quantum Machine) সক্রিয় হয়ে 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy) থেকে ব্যাপক হারে 'ইলেকট্রন-পজিট্রন' (Electron-Positron) জোড় ও 'ফোটন' (Photon) নামক মহা সুক্ষ্ম বস্তু কণিকাসমূহের আর্বিভাব ঘটায়।

(৬) কেন্দ্রমূখী প্রবল 'মধ্যাকর্ষণ বলের' (Gravitational Force) কারণে শক্তির এলাকাটির 'বক্রতা' (Curvature) পূর্ণতা লাভ করে এবং

এ কারণে ক্রমান্বয়ে শক্তির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা (Density and Temperature) বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

(৭) 'পূর্ণ বক্রতা' লাভ করায় এর অভ্যন্তরে প্রায় ১০^{৯৩} টি এলাকায় (Region) ঘনত্ব ও তাপমাত্রা (Density And Temperature) সুষম বন্টনের মাধ্যমে 'গতিশক্তির' সর্বত্র 'সমতা' (Equalised) আনয়ন করে।

(৮) 'মধ্যাকর্ষণ বলের' (Gravitational Force)-র প্রবল থেকে প্রবল কেন্দ্রমূখী টানে একপর্যায়ে কেন্দ্রে 'ঘনায়ন' প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং চতুর্দিক হতে শক্তিকে ঘনীভূত করে করে নিজ আকৃতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে এক সময় ঘনায়ন পদ্ধতিটি 'ব্ল্যাক হোল' -এ রূপ নেয়। ফলে ঘনীভূত শক্তির ঘনত্ব, চাপ ও তাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগুতে থাকে।

(৯) 'সর্বোচ্চ বক্রতা' (Maximum Curvature) লাভকারি স্থানটিতে 'ব্ল্যাক হোল' (Black-hole) তার সর্বোচ্চ শক্তিতে থাবা বিস্তার করে ব্যাপকহারে 'শক্তিকে' মহাসঙ্কোচনের সুড়ঙ্গে (Tunnel-এ) প্রচন্ড চাপে ঘনীভূত করে প্রায় ১০$^{-৩৩}$ সেঃ মিঃ এক 'মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে' (Singularity) উপনীত করে। এতে করে সঙ্কুচিত শক্তির ঘনত্ব, চাপ এবং তাপমাত্রা (১০^{৩২}K. প্রায়) সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

(১০) 'সর্বোচ্চ বক্রতা' (Maximum Curvature), 'সর্বোচ্চ ঘনত্ব' (Maximum Density) ও 'সর্বোচ্চ তাপমাত্রা' (Maximum Temperature) প্রাপ্ত এবং ঘনীভূত 'শক্তির আঁধার'টি আর স্থির থাকতে না পেরে প্রায় ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড, সময়ে প্রচন্ড শব্দে মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্বের মহাসঙ্কোচণের বিপরীতে মহাসম্প্রসারণেই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। চারটি মৌলিক শক্তি (Basic Four Forecs) এই সময় একত্রিত অবস্থায় (Unified) বিরাজমান ছিল। বিন্দুবত শক্তির আধারটি 'সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন অগ্নিগোলকে' (Highest Energetic Fire Ball) রূপ নিয়ে বর্ধিত হতে থাকে, তখন সর্বত্র শুধু 'আলো আর আলোর' (Radiation and Radiation) খেলা।

(১১) সময় গড়িয়ে ১০$^{-৩২}$ সেকেন্ড, তখন নরম অগ্নি-গোলকের (Soft Fire Ball) আয়তন ১০$^{-২৪}$ সেঃ মিঃ হতে পরক্ষণে কমলালেবুর আকার ধারন করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force) পৃথক হয়ে যায়। তাপমাত্রা ১০^{২৮}K. রেডিয়েশানের (Radiation) 'ফোটন' কণিকাসমূহ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ (colliding) বাঁধিয়ে পদার্থের মহাসুক্ষ্ম মৌলিক কণিকা 'কোয়ার্ক' ও 'এ্যান্টি কোয়ার্কের' (Quark and Anti-Quark) জন্ম দেয়। মহাবিশ্ব তখনও সর্বোচ্চ বিকিরনে (Highest Energetic Radiation) ভরপুর।

(১২) সময় গড়িয়ে ১০$^{-৬}$ সেকেন্ড, নরম অগ্নিগোলক (Soft Fire Ball) আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের বর্তমান সৌরজগতের প্রায় সমান আকৃতি ধারন করে। ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে ১০^{১৩}K.-এ নেমে আসে। 'সবল পারমানবিক শক্তি' '(Strong Nuclear Force)' পৃথক হয়ে যায়। এ পর্যায়ে 'কোয়ার্ক' এবং 'এ্যান্টিকোয়ার্কের' মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। মহাবিশ্বের সর্বত্র আলোর (Radiation) ঢেউ।

(১৩) সময় আরও গড়িয়ে যখন পূর্ণ 'এক সেকেন্ড', তখন অগ্নিগোলক আরও বৃদ্ধি পেয়ে কয়েকটি সৌরজগতের রূপ ধারণ করে। তাপমাত্রা আরও হ্রাস পেয়ে ১০^{১০} K. এ দাড়ায়। সংঘর্ষে উদ্বৃত্ত 'কোর্য়াক' প্রতি তিন-তিনটি বিভিন্ন কায়দায় মিলিত হয়ে 'প্রোটন' (Proton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) নামক পারমানবিক পদার্থ কণিকা গঠন করতে থাকে। 'বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি' (Electro Magnetic Force) এই সময় পৃথক হয়ে যায়। পদার্থ কণিকাসমূহ (Particles) তেজষ্ক্রিয়তার (Radiation) সাথে মিশ্রিত হয়ে 'ঘন কুয়াশার' (Dense-Fog) জন্ম দেয় এবং নবীন মহাবিশ্ব ভরে দেয়।

(১৪) সময় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে যখন পূর্ণ 'তিন মিনিট' তখন অগ্নিগোলক অর্থাৎ, নবীন মহাবিশ্ব চতুর্দিকে কয়েক 'আলোকবর্ষ' পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তাপমাত্রা আরও হ্রাস পেয়ে ১০^{৯} K-এ দাড়ায়। প্রথম বারের মত 'প্রোটন' (Proton) ও নিউট্রন (Neutron) মিলিত হয়ে

'এ্যাটমিক নিউক্লি (Atomic Nuclei) গঠন করতে শুরু করে। 'বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি' (Electro Magnetic Force) এবং 'দূর্বল নিউক্লিয় শক্তি' (Weak Nuclear Force) পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।

(১৫) সময় আরও যখন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় 'তিন লক্ষ' (৩,০০,০০০) বৎসর তখন মহাবিশ্বটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাপমাত্রা অনেক কমে গিয়ে ৩০০০ K. নেমে আসে। এবার পরিবেশ অনুকুলে আসায় 'এ্যাট্মিক নিউক্লি' (Atomic Nuclei) 'ইলেকট্রন' (Electron) নামক মহাসুক্ষ্ম পদার্থ কণিকাকে ধারণ করে সর্বপ্রথম মহাবিশ্বে 'অটল বা স্থায়ী পরমানু' (Stable Atom) গঠন করতে শুরু করে। তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) থেকে পদার্থ কণিকাসমূহ পৃথক হয়ে পড়ায় 'ঘন কুয়াশা' (Dense Fog) দূরীভূত হয়, তবে সৃষ্ট 'অটল পরমানু' (Stable Atoms) নামক পদার্থ কণার ঘনত্বের কারণে ধুঁয়ার (Gas Cloudy) অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব আবার পূর্ণ হয়ে যায়।

(১৬) অতঃপর এভাবে সময় গড়িয়ে যখন প্রায় 'বিলিয়ন বৎসর' তখন মহাবিশ্ব আয়তনে আরও বৃদ্ধি ঘটায় তাপমাত্রাও কমে গিয়ে মাত্র ২০K .এ পৌঁছে। সমগ্র মহাবিশ্ব ব্যাপী 'মধ্যাকর্ষণ বলের'(Gravitational Force) প্রভাবে ধূঁয়ার (Cloudy) আকারে ছড়িয়ে থাকা 'পদার্থ কণা' থেকে গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হতে থাকে এবং ধূঁয়ার পরিবেশ দূর হতে থাকে।

(১৭) সময় আরও পেরিয়ে যখন (আজকের পরিবেশে) প্রায় '১৫ বিলিয়ন বছর' (১৫০০ কোটি বছর), তখন মহাবিশ্বটি প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ পযর্ন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তাপমাত্রা কমতে কমতে প্রায় ৩ K. এ আগমন করেছে। সার্বিক আবাসযাগ্যতা সৃষ্টি হওয়ায় মানুষরূপে আমাদের আগমন ঘটেছে এবং আমরা মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ লাভ করেছি।

মোটামুটি এই হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানের সর্বশেষ চরম উৎকর্ষতায় উদ্‌ঘাটিত আমাদের সুন্দর এই মহাবিশ্বটির 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the

Universe) যা মূল স্থিতিশক্তি (Static Energy) থেকে যাত্রা শুরু করে মাঝপথে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (Cosmology)-এর 'পরিবর্তীত অবস্থা' (Turning Point) 'Big Bang' পাড়ি দিয়ে বর্তমান পরিবেশে আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আগামী দিনে বিষয়টি যে আরও স্বচ্ছ হয়ে মানবজ্ঞানে ধরা দিবে, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীগন অনেকটা আশাবাদী।

❋ ❋ ❋

মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the Universe) বিষয়ক অধ্যায়টির বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিকভাবে যে কয়টি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা এখন তা নিরসনের চেষ্টা করতে চাই।

(১) বর্তমান 'বিজ্ঞান' এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলে 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) রূপে যে শক্তিকে মেনে নিচ্ছে, সে শক্তির আগমন ঘটলো কোথা থেকে?

- বিজ্ঞান বিশ্ব বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় একটি মতের ওপরই দাড়িয়ে ছিল, আর তা হচ্ছে মহাবিশ্বের সৃষ্টি-ই হয়নি। অনন্তকাল থেকেই এইভাবে আছে আবার অনাদিকাল পর্যন্তও অনুরূপভাবেই চলবে (Steady State Theory)। পরে ১৯৬৫ সালে 'Back Ground Radiation 2.73k' উদ্ঘাটিত হয়ে ১৯৩৩ সালের প্রস্তাবকৃত 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) থিউরি প্রমাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে বিজ্ঞান বিশ্ব নীতিগত কারণেই 'Steady State Theory' কে প্রত্যাখ্যান করে এবং 'Big Bang' কে মেনে নেয়। তবে বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকাল পর্যন্ত 'Big Bang'-এর পূর্বে কিছু ছিল, এমন কিছু মানতে পুরোপুরি অস্বীকার করে। বলতে থাকে মহাবিশ্বের যাত্রার একদম 'শুরু' (Beginning) হচ্ছে 'Big Bang' এবং এর পূর্বে কিছুই নেই (Big Bang is the beginning of the Universe, nothing happen before the Big Bang)।

এই অবস্থায় কিছুদিন কাটার পর বিজ্ঞানী সমাজে একটি দল ব্যাপক পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালিয়ে 'Big Bang' কে 'শুরু' বা 'Beginning' হিসেবে অন্ধভাবে মেনে নিতে আপত্তি তোলেন এবং বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, প্রাক 'Big Bang' প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড (Pre-Big Bang Scenario) ছাড়া হঠাৎ করেই একদম 'শূন্য' থেকে হাজারো-লক্ষ গুণে সমৃদ্ধ 'Big Bang' আত্মপ্রকাশ লাভ করতে পারে না। এর জন্য অবশ্যই কোন 'প্রাক-প্রস্তুতিমূলক' কর্মকান্ড থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের চতুর্দিকে একবার তাকালেই আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'মোটর গাড়ীর' প্রধান ইঞ্জিনকে ঘুরাবার জন্য (Start দেওয়ার জন্য) প্রথমে 'ইগনিশান সুইচ' দিয়ে 'সেল্‌ফ ষ্টারটারকে' (Self Starter) ঘুরিয়ে থাকি। ফলে ঐ 'সেল্‌ফ ষ্টারটার' ইঞ্জিনকে শক্ত হাতে ঘুরিয়ে রানিং কন্ডিশন প্রাপ্তিতে সাহায্য করে থাকে। পরক্ষণে মোটর গাড়ী তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রাস্তার ওপর দৌড়াতে থাকে।

একইভাবে আমরা আরও দেখি যে, গ্যাসের 'চুলা' বা গ্যাসের 'টর্চ'কে প্রজ্জলিত করার জন্য প্রথমে একটি 'লাইটার' (Lighter) দিয়ে 'স্পার্ক' (Spark) সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর ঐ 'স্পার্ক' বা 'স্ফুলিঙ্গের' কারণে গ্যাসের 'চুলা' বা 'টর্চ' জ্বলে উঠে এবং নির্দিষ্ট কাজ সমাধা হয়ে থাকে।

শুধু কি তাই! আমাদের বাড়ী ঘরেও একটি 'কপি বাতি' বা 'হ্যারিকেন' প্রজ্জ্বলিত করার জন্যও প্রথমে দিয়াশলাইর বারুদমাখা কাঠিটি আমরা জ্বালিয়ে থাকি। তাই 'Pre-Big Bang' হিসেবে অবশ্যই কিছু একটা ব্যবস্থা থাকাটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়। উল্লেখিত ধরনের অকাট্য যুক্তির কারণে বিগত কয়টি বছরের প্রথমদিকে বিজ্ঞান 'Big Bang' থেকে একটু পিছনে যেতে সম্মত হয়েছে এবং এতটুকুই মেনে নিয়েছে যে, 'Big Bang'-এর পূর্বে যা ছিল তা হলো 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy) যা মূলতঃ 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) থেকে রূপান্তর ঘটেছে। বাস! উক্ত Static Energy-এর আগমন কোথা থেকে ঘটলো সে রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনও অবগত নয় এবং সে উৎসের ব্যাপারে

চিত্র -৮৬

"তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁহার বাণী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত রহিয়াছেন।" (৬ঃ১১৫)

"বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ঃ৪৬)

বিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী হঠাৎ করে আদি শক্তির ভেতর একটি মৌলিক স্পন্দন সৃষ্টি হলে সমগ্র শক্তির আঁধারটি যে ব্যাপকভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠে ছবিতে সেই স্পন্দন দেখানো হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর যাত্রাক্ষণে উজ্জ্বল আলোতে পথ চলা সাফল্যময় বিজ্ঞান হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক প্রথম মৌলিক যে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল, তা সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। কাজটি ছিল - মূল শক্তির ভেতর একটি স্পন্দন, একটি ধাক্কা, একটি চঞ্চলতা সৃষ্টি হওয়া। আর এটা সৃষ্টি হওয়ার জন্য পেছনে যে মূলতঃই আল্লাহ্ তা'আলার প্রচন্ড প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন 'হও' আদেশটি দৃঢ় ভূমিকা রেখেছিল তা জ্ঞানবান সমাজের উপলব্ধি করতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। বিজ্ঞান 'কর্ম'টিকে স্বীকার করলেও এর পেছনে এখনও 'কর্তা' খুঁজে পাচ্ছে না। কেন কর্তাকে খুঁজে পাচ্ছে না আল্লাহ্ তা'আলা তাও জানিয়ে দিলেন উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতে। বস্তুতঃ সংকীর্ণতামুক্ত বক্ষের অধিকারী হলেই কেবল এক্ষেত্রে মূল 'কর্তা' হিসেবে 'আল্লাহ্'কে দেখা যেতে পারে।

কোন বক্তব্যও প্রদান করছে না। তবে বিভিন্নভাবে তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, হয়তোবা অদূর ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে প্রকৃত সত্য তথ্য বেরিয়ে আসবে। কেননা বিজ্ঞান গতিশীল এবং ইতোমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক ব্যাপারেই বিজ্ঞান প্রথমে 'না' সূচক জওয়াব দিলেও পরক্ষণে নিরেট বাস্তবতার কারণে 'হাঁ'-এর দরওয়াজা খুলতে বাধ্য হয়েছে।

আল্‌-কুরআনের আলোচনায় আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি যে, আদি অবস্থায় যে 'শক্তি' থেকে পদ্ধতিগতভাবে বর্তমান মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা হলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার 'নূর' বা 'আলো' (Highest Energetic Radiation) এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই 'নূর' থেকেই ভিন্ন ভিন্ন তাপে ও পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) আল্‌-কুরআনের পেশকৃত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের 'নূর' বা 'আলোক শক্তি' (Highest Energetic Radiation)ই অধিকতর নিকটবর্তী। (আরও অধিক জানার জন্য দেখুন 'আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স, সিরিজ-১, 'আলো থেকে সৃষ্টি' অধ্যায়)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) আল্লাহ্‌র 'নূর'-এ উদ্ভাসিত।" (২৪ : ৩৫)

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে : 'স্থিতিশক্তি' প্রথমদিকে যে, 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতি' (One of the Fundamental Vibration Modes) লাভ করে আভ্যন্তরীণ চঞ্চলতা সৃষ্টির মাধ্যমে 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy)-হতে পরিবর্তীত হয়ে 'গতিশক্তি' (Kinetic Energy)তে রূপান্তর হওয়ার সুযোগ পেল এবং তখন থেকেই বর্তমান মহাবিশ্ব সৃষ্টির নিমিত্তে যান্ত্রিকতা মোটামুটি কাজ শুরু করলো, সেই 'মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতিটি' (The Fundamental Vibration Mode) মূলতঃই কি ছিল?

উত্তর - 'বিজ্ঞান' হচ্ছে মূলতঃ বাস্তবভাবে প্রমাণসাপেক্ষে উদ্‌ঘাটিত বিষয়ের উপস্থাপনা মাত্র। তাই 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy)-এর ভিতর 'প্রথম স্পন্দন' সৃষ্টির পিছনে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক চিহ্ন

চিত্র -৮৭

"তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে।" (৬ঃ১০৪)
"তিনি যখন কোন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন 'হও' আর অমনি তা হইয়া যায়।" (২ ঃ ১১৭)
--আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওয়াদা- "শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব"- ইতোমধ্যে পূর্ণ করে চলেছেন। তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষে সর্বপ্রথম পবিত্র 'হও' নির্দেশটি প্রদান করার সাথে সাথে তাঁর 'নূর' তথা আলোক শক্তির ভেতর যে মহা তোলপাড়, চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়ে দ্রুত সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়েছে, তা বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। ফলে বিজ্ঞানীগণ এই প্রথম মৌলিক স্পন্দন কর্মপর্যন্ত স্বীকার করে সৃষ্ট এই চঞ্চলতার কারণেই পরবর্তী সময়ে আবর্তিত হয়ে হয়ে শক্তির আঁধারটি বর্তমান মহাবিশ্বে রূপ নিয়েছে। সুতরাং ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ - সকল ব্যাপারেই আল্-কুরআন এবং সত্য-সঠিক বিজ্ঞানের মাঝে কোন বিভেদ নেই। আছে শুধু একাত্মতা, অভিন্নতা, সহযোগিতা এবং সার্বিক বক্তব্যের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণসহ একজন মহান 'সত্ত্বা'কে শুধু উর্ধ্বে তুলে ধরা। জ্ঞানীসমাজ বিষয়টি যত দ্রুত উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, ততই তাদের মঙ্গল হবে।

(Scientific Sign) সনাক্ত করতে এখনও সক্ষম না হওয়ায় তা প্রকাশ করতে পারছে না, কিন্তু 'স্পন্দন' সৃষ্টি হওয়ার কারণেই যে 'স্থিতিশক্তি' পরিবর্তীত হয়ে 'গতিশক্তিতে' রূপান্তরীত হয়েছে, সে কথা একান্ত বাস্ত বতার কারণেই স্বীকার করছে। বিজ্ঞান ভবিষ্যতে এ ব্যাপারটি আরও কত স্বচ্ছভাবে উপস্থাপনে সক্ষম আগামী দিনগুলিই তা বলে দিবে।

আল্-কুরআনের আলোচনায় আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা 'ইচ্ছা' পোষণ করে 'হও' নির্দেশ প্রদান করতেই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যেখানে যা করা দরকার বা হওয়া দরকার তার সবকিছুই প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়ে কাঙ্খিতমানে রূপধারণ করেছে। তাই একথা বুঝতে আর সমস্যা না হওয়ারই কথা যে, মহান স্রষ্টা ও প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা এবং মহাজ্ঞানের মালিক 'আল্লাহ্' তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর পবিত্র নির্দেশ 'হও' (Be) বলতেই 'নূর' তথা 'সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আলো' (Highest Energetic Radiation)-র মধ্যে যে মহা 'স্পন্দন' বা 'তোলপাড়' সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক 'চঞ্চলতার' মধ্যে দিয়ে পরবর্তী কর্মকান্ড এগিয়ে যেতে থাকে, সেই পবিত্র নির্দেশটি-ই ছিল 'মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতি' (The Fundamental Vibration Mode) 'কুরআনের দাবী' অনুযায়ী এবং 'বিজ্ঞানের ভাষ্য' অনুযায়ী সৃষ্টির পিছনে সর্বপ্রথম এটাই গ্রহণযোগ্য কর্মকান্ড ছিল। (প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্-ই ভালো জানেন)।

"আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) উদ্ভাবনকর্তা এবং তিনি যখন কোন কাজ সমাধা করিতে চাহেন, তখন শুধু বলেন 'হও' সাথে সাথে উহা হইয়া যায়।" (২ ঃ ১১৭)

এখানে প্রশ্ন উত্তরের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পেলাম কুরআন এবং বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছে যুক্তিনির্ভর তথ্যের মাধ্যমে।

সুতরাং এতে প্রমান হচ্ছে- 'আল্-কুরআন' সত্য-সঠিক ও সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ মানবজাতির জন্য তাদের একমাত্র প্রভু 'আল্লাহ্'-র পক্ষ থেকে। তাই কেউ এই জ্বলন্ত প্রমাণসহ কুরআনকে অস্বীকার করতে চাইলে তা হবে প্রকৃতপক্ষে সাফল্যময় বর্তমান বিজ্ঞানকেও অস্বীকার করার শামিল।

মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' বিষয়ে আলোচিত সমগ্র বিষয়টি এবার এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

আল-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান ও মহাপরাক্রমশালী।" (২২ ঃ ৭৪) "আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।" (২ ঃ ২২৮) "তিনি ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।" (৩০ ঃ ৫৪)	(১) বর্তমান বিজ্ঞান মহাবিশ্বের মূলতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও এর পরতে পরতে ব্যাপক জ্ঞান ও মেধার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। উক্ত ব্যাপক জ্ঞানের সুশৃংখল সমারোহ ঘটানো যে মানবসম্প্রদায়ের পক্ষে কখনও সম্ভবপর নয়, সে কথাও স্বীকার করছে। তবে 'আল্লাহ্'কে উল্লেখিত কর্মকান্ডের পিছনে সরাসরি মেনে না নিলেও কর্তা হিসেবে সকল কাজের পিছনে অদৃশ্য কোন সত্ত্বার অস্তিত্বকে এখন আর প্রত্যাখ্যান করছে না।
(২) "তাহারা কি লক্ষ্য করে না কীভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন?" (২৯ ঃ ১৯) "বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।" (২৯ ঃ ২০)	(২) আমাদের এই মহাবিশ্বের 'সৃষ্টি' এবং 'মূল' বিষয় নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দি বিজ্ঞান বিশ্ব হিম-শিম খেলেও বিংশ শতাব্দির ক্রান্তিলগ্নটি ছিল মূলতঃ 'স্বর্ণযুগ'। ১৯৩৩ সালে প্রস্তাবকৃত 'Big Bang', ১৯৬৫ সালে প্রমাণিত হয়ে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। প্রমাণ হয় প্রচন্ড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের আবির্ভাব

"তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই।" (৫৯ ঃ ২৪)	ঘটতে থাকে। বর্তমান প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় উদঘাটিত হয়েছে যে একটি মহাশক্তির উৎস থেকে শক্তিকে প্রচন্ড ঘনায়নের মাধ্যমে প্রথমে সঙ্কুচিত করে পরক্ষণে বিষ্ফোরণের মাধ্যমে ব্যাপক সম্প্রসারণের উদ্ভব ঘটায়ে মহাবিশ্বের বর্তমান রূপ দান করা হয়েছে।
(৩) "আমার আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায়, একবার ব্যতীত নহে।" (৫৪ ঃ ৫০) "আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর উদ্ভাবনকর্তা এবং তিনি যখন কোন কাজ সমাধা করিতে চাহেন তখন শুধু বলেন 'হও', সাথে সাথে উহা হইয়া যায়।" (২ ঃ ১১৭)	(৩) বিশাল এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যও এক মহাবিস্ময়ের বিস্ময় হয়ে মানবজ্ঞানে ধরা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যপী বিস্তৃত এই প্রকান্ড মহাবিশ্বটি রীতিমত আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, মহাসূক্ষ্ম সময় মাত্র ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ডে প্রচন্ড বিষ্ফোরণের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময়টি মূলতঃ মাত্র একটি সেকেন্ডকে প্রথমে মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করে পরে তাকে বিলিয়ন দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে ট্রিলিয়ন দিয়ে ভাগ করে সর্বশেষে আবার তাকে জিলিয়ন দিয়ে ভাগ করলে যে 'মহাসূক্ষ্ম' সময়মান পাওয়া যাবে তার সমান মাত্র। যা বুঝবার জন্য 'দৃষ্টির ঝলক'-ই বলা যেতে পারে। এত

	সূক্ষ্ম সময়মানের বাস্তব উপলব্ধি মানুষের বোধগম্যের সম্পূর্ণ বাইরে।
(৪) "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩) "আমি আকাশমন্ডলী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছি শক্তিবলে এবং আমি সম্প্রসারণ করিতেছি।" (৫১ ঃ ৪৭)	(৪) বর্তমান বিজ্ঞান মহাবিশ্বের মূলতত্ত্ব বিষয়ে 'স্থিতিশক্তিকে' (Static Energy) আদি হিসেবে সনাক্ত করতে চায়, যেহেতু 'আল্লাহ্'কে সরাসরি স্বীকার করছে না, তাই এখনও ঐ 'শক্তির' উৎস কোথায় তার হদিসও পাচ্ছে না। মূলতঃ 'শক্তি' থেকে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টিক্ষণ থেকে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত থেকে মহাবিশ্বটি প্রতি মূহুর্তেই যে চতুর্দিকে বৃদ্ধি ঘটছে বিজ্ঞানের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণেও তা প্রমাণিত হয়েছে।
(৫) "আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত (বর্ণনা)।" (২৪ ঃ ৩৪) - অর্থাৎ, এই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the Universe) বিষয়ক প্রকৃত সত্য ঘটনা। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'নূর'-এ উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব)। তাঁহার 'নূরের' উপমা যেন একটি দীপাধার, যাহার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের	(৫) বিগত বেশ কয়েকটি শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (Cosmology) এবং 'মূলতত্ত্ব' (Origin of the Universe) নিয়ে বেশ হতাশায় কাটালেও বিংশ শতাব্দীটি 'স্বর্ণযুগের' অভ্যুদ্বয় ঘটিয়েছে। উক্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হলেও শেষের দিকে ১৯৬৫ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানীর মাধ্যমে 'Back

আবরণটি উজ্জল নক্ষত্র সদৃশ। ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জল আলো দিতেছে।" (২৪ ঃ ৩৫)	Ground Radiation 2.73 k' আবিষ্কারের মাধ্যমে 'Big Bang' প্রমাণিত হওয়ায় অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রকৃত বাস্তবতার কারণে তা মেনে নেন এবং প্রস্তাবটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'Big Bang model'- থেকে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেন এই মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত 'আলো' (Radiation) থেকে পদার্থ (Matter) সৃষ্টি হচ্ছে, আবার পদার্থ থেকে 'আলো'-র উৎপত্তি ঘটছে এবং প্রথম যাত্রা যে আলো (নূর) বা 'Radiation' থেকেই শুরু হয়েছে সে বিষয়ে এখন কেউ দ্বিমত পোষণ করছেন না।
"আলোর উপর আলো, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁহার 'নূর'-এর দিকে।" (২৪ ঃ ৩৫)	প্রথমদিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা জন্মেছিল এই মহাবিশ্বের প্রথম যাত্রা শুরু (Beginning) হয়েছিল 'Big Bang' বিস্ফোরণ থেকেই। কিন্তু কার্য-কারণে সমন্বিত এই মহাবিশ্বে কারণ ছাড়া কিছুই ঘটছে না বিধায় বর্তমানে পূর্বের সীমিত ব্যাখ্যাকে এখন আর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে 'সৃষ্টিতত্ত্বকে' ডিঙ্গিয়ে 'মূলতত্ত্বকে' পর্যবেক্ষণের নাগালে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

"আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্র ধ্বংসপতন স্থানের (Black hole), ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শপথ যদি তোমরা জানিতে।" (৫৬ : ৭৫-৭৬)	বর্তমান নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বিজ্ঞানীগণের ধারণা হচ্ছে যে, আদিতে শুধু 'স্থিতিশক্তি'-ই বিরাজমান ছিল। হঠাৎ করে ঐ শক্তির মধ্যে একটি 'মৌলিক স্পন্দন ক্রিয়া' (One of the Fundamental Vibration Mode) সক্রিয় হয়ে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত কার্যাবলী ঘটাতে থাকে - (ক) ব্যাপক চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়ে 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) 'গতিশক্তিতে' (Kinetic Energy)-তে রূপান্তর ঘটে। (খ) ব্যাপক চঞ্চলতার (Fluctuation) কারণে 'গ্রেভিটন' নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকা সৃষ্টি হয়ে 'মহাকর্ষ' (Gravitational force) সৃষ্টি করে। (গ) 'মহাকর্ষবল' কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ সৃষ্টি করায় 'শক্তির এলাকাটি' পূর্ণবক্রতা (Curvature) লাভ করে। (ঘ) Gravitational Classical Fluctuation ও Waves- এর কারনে Strong Electric Field সৃষ্টি হয় এবং

"অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না (গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধান করিয়া দেখে না) যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) মিশিয়াছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি (আল্লাহ্) উহাদের সবাইকে (প্রচন্ড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে) পৃথক করিয়া দিলাম?

(২১ ঃ ৩০)

তাতে Quantum Particles -এর আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

(ঙ) বক্রতালাভকারী এলাকায় শক্তির কেন্দ্রমুখী প্রবাহে 'ঘনায়ন' প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ঘনত্ব ও তাপমাত্রা (Density and Temperature) বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(চ) সমগ্র এলাকায় (প্রায় $১০^{৯৩}$ এলাকায়) ঘনত্ব ও তাপমাত্রা সমতা (Equalised) আনয়ন করে।

(ছ) 'মহাকর্ষ বলের' (Gravitational force) কেন্দ্রমুখী প্রবল টানে ঘনায়নকৃত কেন্দ্রটি 'Black hole'-এর রূপ নেয়। 'শক্তি' ঘনীভূত হয়ে ঘনত্ব ও তাপ ক্রমান্বয়ে বহুগুনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(জ) Black hole-টি চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র শক্তিকে প্রচন্ড ঘনায়নের মাধ্যমে সঙ্কুচিত করে প্রায় $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটার মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে জমিয়ে দেয়। ফলে সর্বোচ্চ বক্রতা (Maximum Curvature), সর্বোচ্চ ঘনত্ব (Maximum Density) ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় (Maximum Temperature) মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে

	ঘনীভূত শক্তির আধারটি $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডে মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়ে প্রচন্ড শক্তিতে চতুর্দিকে মহাসম্প্রসারণের নেশায় ছিটকে পড়ে। পরবর্তীতে সময়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে মহাবিশ্বের আয়তনও বাড়তে থাকায় তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং এক এক পর্যায়ে তাপমাত্রার এক এক অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থ কণা সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের বাস্তব অস্তিত্ব গড়তে থাকে। মহাবিশ্বটি 'Big Bang'-এর পরবর্তী অবস্থা থেকে বর্তমান রূপ ধারণ করতে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পার হয়ে যায়।
(৬) "আল্লাহ্ মানুষের জন্য 'উপমা' দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (২৪ ঃ ৩৫) - প্রদীপ, দীপাধর, কাঁচপাত্র, নক্ষত্র সদৃশ ব্যাপক আলো, জয়তুন তৈল, এবং 'আলোর ওপর আলো'- ইত্যাদি উপমা প্রদান করে 'আল্লাহ্' মহাবিশ্বের মূলতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বকে একই মালায় গেঁথে সহজভাবে মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন।	(৬) উপমা, কল্পনা, অনুমান, ও ধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিজ্ঞানের নিত্যসঙ্গী। কোন বিষয়ে রূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটনের পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত 'বিজ্ঞান' এই বিষয়গুলোর কাঁধে ভর করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে থাকে। এতে লাভ হচ্ছে এই যে, অতিসহজে প্রকৃত বিষয়কে বোধগম্য করা যায়, খুব দ্রুত আসল ব্যাপারের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং চূড়ান্তভাবে অসম্ভব যে কোন বিষয়কে সম্ভব করে তোলা যায়। উপমা মানুষের কল্যাণেই নিবেদিত।

(৭) তাঁহার মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)	(৭) বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর উন্নতি ঘটায় পূর্বের চেয়ে বর্তমানের আবিষ্কারসমূহ অধিকতর বাস্তবতামন্ডিত এবং প্রকৃত সত্যের খুবই নিকটবর্তী, ফলে নিত্য-নতুন উদ্ঘাটিত বিষয়সমূহ মানবজ্ঞানে যাচাই হয়ে স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হচ্ছে। যদি অন্যকোন সূত্র থেকে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহ বর্তমান উৎকর্ষীত বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত সত্য ও প্রমাণীত তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে যুক্তির দিক থেকে বিজ্ঞান তাও মেনে নিতে বাধ্য। সাথে সাথে ঐ সকল তথ্যের উৎসের অস্তিত্বকেও চরম বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মেনে নেয়ার জন্য বিজ্ঞান এগিয়ে যাবে এটাই এখন সময়ের দাবী। এতেই মানবতার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।
"এই সমস্ত-ই প্রমাণ যে 'আল্লাহ্ সত্য' এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদিগের আহবান করে তাহা মিথ্যা।" (৩১ ঃ ৩০)	
"কুরআন তোমাদিগকে জ্ঞানচক্ষু হিসেবে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, সুতরাং যে ব্যক্তি দেখিতে পাইল, সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করিল।" (৬ ঃ ১০৪)	

সুতরাং, আমাদের এই মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ 'কুরআনে' বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে সুন্দর একটি 'উপমা'-র মাধ্যমে যেভাবে স্বল্পকথায় জ্ঞানপূর্ণ ভাষনের ভিতর দিয়ে মানবসমাজকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন, প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পরে এসে বর্তমান বিজ্ঞানের চরম প্রযুক্তিগত উন্নতির দিনেই কেবল মানবমন্ডলীর পক্ষে সেই একই বিষয়ে লুকায়িত সত্য তথ্যগুলোকে উজ্জল আলোতে বের করে আনতে সক্ষম হওয়ায় আমরা দেখতে পেলাম উভয় বক্তব্যই 'মুল ভিত্তিগত' দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, আর মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ ঃ ৮১)
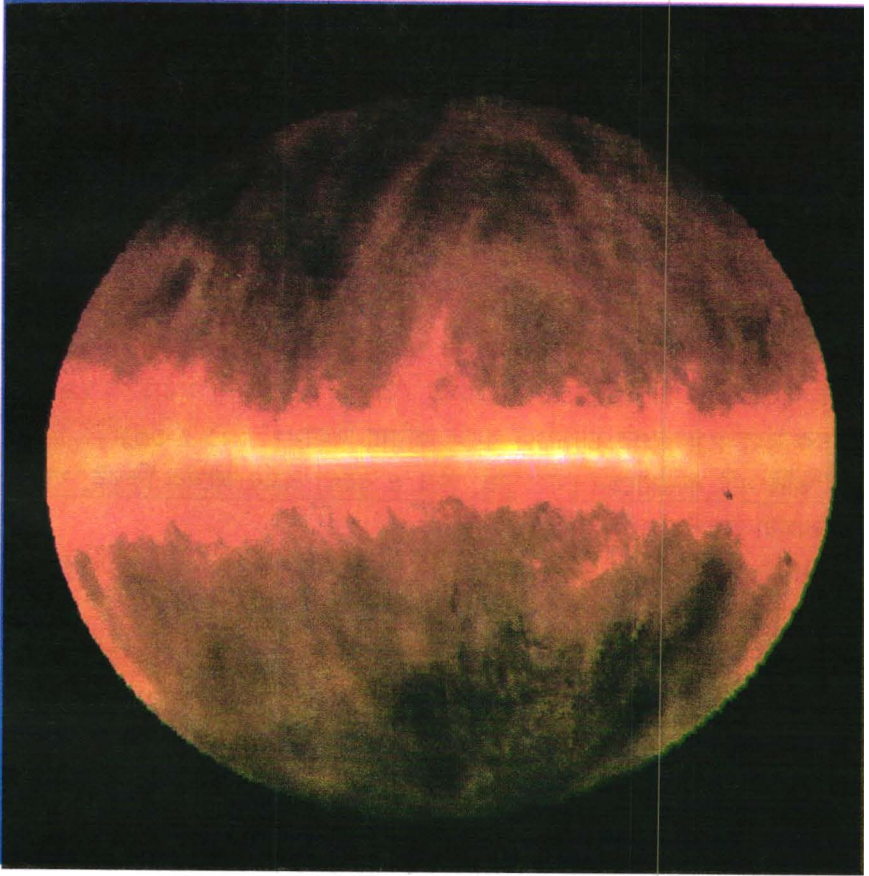
'অনু-পরমানু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর (Micro)
উপ-আনবিক জগত
আল্-কুরআন

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন?" (২৯:১৯)

"বল পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর। আল্লাহ কেমন করিয়া (কি ধরনের মহাসুক্ষ্ম মৌলিক কণিকার মাধ্যমে) প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন? নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (২৯ঃ ২০)

"তোমাদের সত্য প্রতিপালক স্রষ্টা, তিনিই সমুদয় বস্তু (ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ) সৃষ্টি করিয়াছেন সঠিক সমতায়, তিনি যখন আদেশ করেন 'হও' অমনি তাহা হইয়া যায়।" (৬ ঃ ৭৩)

"অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না (গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া দেখে না) যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমিই (আল্লাহ্) উহাদের সবাইকে (প্রচন্ড এক মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে) পৃথক করিয়া দিলাম?" (২১ ঃ ৩০)

"তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (মহাসুক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) এমন অনেক কিছুই, যাহা তোমরা অবগত নও।" (১৬ ঃ ৮)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে শুধুমাত্র আল্লাহ্র-ই। (১৬ ঃ ৭৭)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃষ্টির অগম্য (মহাসুক্ষ্মতার কারণে এবং অকল্পনীয় দূরত্বের কারণে) তাহা সকলই আল্লাহ্ তায়ালার।"
(১১ ঃ ১২৩)

"তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন (মহাসুক্ষ্ম, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ) কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যাহা তিনি অবগত নহেন? নিশ্চয় তিনি (সকল প্রকার) অজ্ঞানতা হইতে অতি পবিত্র।" (১০ ঃ ১৮)

"অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) তাঁহার অগোচরে নাই সুক্ষ্মানু (অনু-পরমানু) পরিমাণ কিংবা

তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র (সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম উপ-আনবিক কণিকা) অথবা বৃহত্তর কিছু, প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে।" (৩৪ ঃ ৩)

"তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যাহা তাহা হইতে উদ্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহা কিছু আকাশে উত্থিত হয়।" (৩৪ ঃ ২)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অনু-পরমানু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং উহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর (Micro) তথা মহাসুক্ষ্ম কণিকাসমূহ) অথবা বৃহত্তর (Macro) কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নাই।"(১০ ঃ ৬১)

"দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে (মহাবিশ্বে) তুমি কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। তুমি আবার তাকাইয়া দেখ। কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?" (৬৭ ঃ ৩)

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বিষয় কিংবা অদৃশ্য বস্তুকে (মহাসুক্ষ্ম কিংবা বৃহৎ) প্রকাশিত করিয়া থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)

"আর এই সকল অদৃশ্য (মহাসুক্ষ্ম কিংবা বৃহৎ) জগতের তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করাইয়াছি যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না কিংবা জানিত না তোমার সম্প্রদায়।" (১১ ঃ ৪৯)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।" (৬ ঃ ৬৭)

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।"

(১০ ঃ ৬৪)

"ওহে মানুষ! তোমাদের কি হইল। তোমরা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যকে কেন স্বীকার করিতেছ না?" (৭১ ঃ ১৩)

আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে এর পূর্ণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বর্তমান বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রযাত্রার কারণে মানব সম্প্রদায়ের নিকট ক্রমান্বয়ে এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন' উক্ত বিস্ময়কর বিষয়সমূহের মূল দিকগুলো স্বল্প কথায় অথচ জ্ঞানপূর্ণভাবে এত সুন্দর করে 'কুরআনের' পাতায় সজ্জিত করেছেন যে, বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের মাধ্যমে আবিস্কৃত তথ্যের সাথে তুলনামূলক

বিচার করতে গেলে উভয় বর্ণনার অভিন্নতা ও সার্বিক মিল দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। ভাবতে অবাক লাগে 'আল্লাহ্ তায়ালা' তাঁর বর্ণনাতীত কৃতিত্বের যৎসামান্য সাক্ষ্যরূপে জ্ঞানের যে নিদর্শন 'কুরআন' নামক ঐশীবাণীতে তুলে ধরেছেন, সেই জ্ঞানময় নিদর্শনমূলক বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলো প্রমাণ করে যথাযথভাবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে বিজ্ঞানের বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত আবিষ্কারের প্রয়োজন পড়েছে। অর্থাৎ, হাল্কা বা অসম্পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা এবং আবিষ্কার দিয়ে 'কুরআনের' সেই প্রস্তাবগুলোর ধারে কাছেও এতদিন পৌছা যায়নি। বিষয়টি একদিকে যেমন অকল্পনীয় জ্ঞানের সমারোহ ও তাঁর জটিল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে-ই আমাদের জন্য বোধগম্য ও সহজ-সরলভাবে কর্ম সম্পাদনার মাধ্যমে প্রমাণ করছে মহাবিশ্বটি স্বতঃস্ফুর্তভাবে কিংবা বিশৃংখলায় অস্তিত্ব ধারণ করেনি, তেমনি এর পিছনে যে সত্যি সত্যি একজন মহান 'সত্ত্বার' কৌশলপূর্ণ হস্ত ক্রিয়াশীল আছে তা বাস্তবতার স্পষ্ট আলোতেই ফুটে উঠেছে।

আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ের বিষয়টি এই মহাবিশ্বের 'ভিত্তিমূলক' এক সাগর জ্ঞানের আধার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা মূল আলোচনার গভীরে প্রবেশ না করলে বোধগম্য হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই প্রথমেই আমরা উদ্ধৃত ঐশীবাণীসমূহের পর্যালোচনায় এগিয়ে যাব এবং পরবর্তীতে কুরআনের সেই বক্তব্যকে বিজ্ঞানের সর্বশেষ উদ্ঘাটিত ও প্রকাশিত রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো। তাতে প্রকৃত বাস্তবতার আলোকে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হবে 'কুরআন' এবং সঠিক 'বিজ্ঞান'-এর মাঝে মিল কতখানি কিংবা অমিল কতখানি নিহীত রয়েছে।

ওপরে উল্লেখিত ঐশীগ্রন্থ 'কুরআনের' বাণীসমূহের ক্রমান্বয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মর্মার্থ হচ্ছে-'আল্লাহ্ তা'আলা' আমাদের এই মহাবিশ্বের একেবারে প্রথম সৃষ্টির সূচনার ব্যাপারে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নাকারে বলেছেন যে, তারা কি চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা এবং অনুসন্ধান করে দেখে না কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কোন প্রকার হেকমত বা কৌশল অবলম্বনে এই আদি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব ধারণ করানো হয়েছে? এত বিশাল বর্ণনাতীত একটি মহাবিশ্বের 'মূলভিত্তি' কিসের ওপর দাঁড় করানো

হয়েছে? এর 'বিল্ডিং ব্লক' নামক উপাদানসমূহ মূলতঃ কি ধরনের? উক্ত উপাদনসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য না কি অদৃশ্য? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের আবিষ্কারে সঠিক তথ্য বেরিয়ে এলে মানব সম্প্রদায় তাদের মহান স্রষ্টার তুলনাহীন কৃতিত্বপূর্ণ সৃষ্টি নৈপুন্যতার যাদুময়ী কর্মকাণ্ড দেখে শুধু অভিভূতই হবে না, সাথে সাথে অকল্পনীয় জ্ঞানের বিস্ময়কর উপস্থিতি এর পিছনে কার্যকর দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হয়ে পড়বে। তখন তাদের একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, তাদের প্রভু 'আল্লাহ্' সকল কিছুর ওপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর পক্ষে কোন কিছু-ই অসম্ভব নয়। তিনি যখন যা কিছু যে মাপে, যে মানে, যে আকৃতিতে, যে রংয়ে এবং যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি করতে চান, তখন শুধু তাঁকে ইচ্ছা পোষণ করে এতটুকু বলতে হয় 'হও' আর অমনি সাথে সাথেই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তা অস্তিত্ব ধারণ করে বাস্তবে রূপ নিয়ে থাকে।

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক ব্যাপারটি লক্ষ্য করলে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা একমাত্র 'আল্লাহ্‌র' নৈপুণ্যেভরা অতুলনীয় কৃতিত্ব সর্বদিক থেকেই দেখতে পেত। বর্তমান দৃশ্যযোগ্য ও অদৃশ্য মিলে যে সৌন্দর্যের ডালি মেলে ধরেছে এই মহাবিশ্বে তা কিন্তু এক সময় এ রকম ছিল না। তখন সকল কিছুই তাদের বর্তমান আকৃতি ও গঠনের বিপরীতে মৌলিকভাবে মূল ভিত্তিগত ও অবিভাজ্য একক উপাদান 'নূর' (আলো) হিসেবে বিরাজমান ছিল। সেই অবস্থা থেকে মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা একমাত্র 'আল্লাহ্' তাঁর 'নূর'কে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পর পর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে একটি চরম পর্যায়ে পৌছানোর মাধ্যমে প্রচন্ড এক মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়ে পরবর্তীতে বিষ্ফোরণজাত উদ্ভূত পরিস্থিতির এক এক ধাপে এক এক ধরনের মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের বস্তুজগত ও পরজগতের ভিত্তিসহ সকল কিছুই ক্রমান্বয়ে গড়ে তুলেছেন। এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর মহাজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে, মানব জ্ঞানে শত বিস্ময়ের বিস্ময় সৃষ্টি করে এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর কিছু কিছু মানব সম্প্রদায় চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম। আবার অনেকগুলো তাদের বোধগম্যের সম্পূর্ণ অসাধ্য ব্যাপার। মানবীয় দৃষ্টিতে 'অদৃশ্য' এমন যে বিষয়গুলো

তিনি মহাবিশ্বে সৃষ্টি করেছেন, সে ব্যাপারে কিন্তু পূর্ণজ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে এবং তিনিই এদের সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, অন্য কারও এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। কোন ক্ষমতাও নেই।

পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যা কিছু আবিষ্কার করেছে এবং যা কিছু এখনো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি, তার সবকুটু-ই তাদের প্রভু 'আল্লাহ্' অবগত আছেন। কেননা তিনিইতো সকল কিছুর একমাত্র মহান 'স্রষ্টা'। তিনি এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে আবিস্কৃত বস্তুসমূহের মৌলিক গঠন উপাদান নামক সুক্ষাতি সুক্ষ্ম 'পরমানু' কিংবা তদাপেক্ষাও ক্ষুদ্র মহাসূক্ষ্ম 'উপ-আনবিক কণিকা' সম্পর্কেও পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল আছেন, বৃহত্তর বস্তু সম্পর্কেতো জ্ঞাত আছে -ই, এদের বিস্তারিত বিবরণ (সৃষ্টি, গঠন, কর্মকাণ্ড ও পরিণতি) সহ সকল কিছুই লিপিবদ্ধ করে পূর্বেই 'লৌহ-মাহফুজে' সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

এই মহাবিশ্বের কোথাও একটি অনুপরিমাণ বস্তুও যদি মাটির ভিতর প্রবেশ করে কিংবা মাটি হতে বহির্গত হয় তাহলেও তিনি তা অবশ্যই জানেন। শুধু তাই নয় যদি আরও মহাসূক্ষ্ম কোন প্রকার 'উপ-আনবিক বস্তু কণিকাও' মহাশূন্য হতে পৃথিবীতে আগমন করে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে মহাশূন্যের দিকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তাও তিনি তাঁর মহাজ্ঞানের মাধ্যমে অবহিত থাকেন। যে কারণে সমগ্র মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ তাঁর অবিশ্বাস্য কুদ্‌রতী হাতের মুঠোয় এমন সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে যে, মানব সম্প্রদায় চেষ্টা করেও এর মাঝে কোন প্রকার ত্রুটির সন্ধান পাবে না। মহাবিশ্বে প্রতিটি অনু, পরমানু ও ভিত্তিগত উপাদান নামক 'অবিভাজ্য মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহ' তাঁর নখদর্পনে সদা বিরাজিত থাকায় তাঁর এই তুলনাবিহীন কৃতিত্ব একচেটিয়া সর্বত্র বিরাজমান।

পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী মহাবিশ্বে 'অদৃশ্য' হিসেবে পরিচিত যা কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে, তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একক স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্‌র' ইচ্ছাতেই সম্ভব হচ্ছে। তিনি যখন যা অদৃশ্য হতে প্রকাশ করতে চান, তখন বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা মানবমন্ডলীয় হস্তগত করে দেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি নিজ থেকেই একটি তালিকা তৈরী করে সে অনুযায়ী

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকটি পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনি যে মানবজ্ঞানের উন্নতি ও পরিপক্কতার সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকে ছাড় দিচ্ছেন, বিগত একশত বৎসরের আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটিত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা বুঝা যায়। যতই দিন যাচ্ছে ততই আবিস্কৃত বিষয়গুলো পূর্বের তুলনায় যে অধিক জ্ঞানগত ও মানগত পর্যায়ের তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিজ মহান 'সত্ত্বাকে' প্রকাশের নিমিত্তে নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠের মানব সম্প্রদায়কে যে সকল তথ্য অবহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে খুব দ্রুতই জানিয়ে দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন এবং বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের ব্যাপক অগ্রগতি তার-ই একটা বড় প্রমাণ বহন করে এগিয়ে চলেছে।

ওপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলোর শেষের দিকের আয়াতে 'আল্লাহ্ তায়ালা' মানবমন্ডলীকে জানিয়ে দিলেন যে, এই মহাবিশ্বের দৃশ্যমান 'অনু-পরমানু' নামক ক্ষুদ্র বস্তুকণার অস্তিত্বকে ডিঙ্গিয়ে একেবারে প্রায় অদৃশ্য আরও অসংখ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার কার্যতঃ অস্তিত্ব যে রয়েছে এবং এরা দেখা না গেলেও মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে 'বিল্ডিং ব্লক' হিসেবে যে কাজ করছে, সেই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, মহাসূক্ষ্ম উপ-আনবিক বস্তুকণা সম্পর্কীয় সরবরাহকৃত তথ্য কিন্তু একশত ভাগই সত্যতায় মন্ডিত। মানব দৃষ্টিতে তা দর্শনযোগ্য নয় বলেই তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। তাদের প্রভূর দৃষ্টিতো ঐ সকল উপ-আনবিক বস্তুকণার ওপর সর্বদা নিবদ্ধ এবং ওদের সৃষ্টিকারী হিসেবে তাঁর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে ওরা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। তাই তাঁর প্রস্তাবিত এই বিজ্ঞান বিষয়ক মহাজ্ঞানের সমারোহে পরিপূর্ণ তথ্যাবলী এতই সত্য যে, তা মিথ্যা প্রমাণ করার কিংবা পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা, কোন যোগ্যতা, কোন সুযোগ কারও নেই। পরীক্ষা-নীরিক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করতে গেলে অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালার সরবরাহকৃত উক্ত তথ্য সকল প্রকার আবরণ সরিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে প্রকাশিত হয়ে প্রমাণ করবে "আল্লাহ্‌র বাণী পরম সত্যতায় উদ্ভাসিত এবং তার কোন পরিবর্তন।" আর ঐ অবস্থায় সত্যপন্থীদের জন্য যে এক মহাসাফল্য অপেক্ষা করছে, সমাজের জ্ঞানীদের তা বুঝে নিতে হবে।

উদ্ধৃত শেষ আয়াতটিতে মানব সমাজকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তায়ালা প্রশ্ন করেছেন এই বলে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থানরত অবস্থায় তারা তাদের প্রভুর অসংখ্য বাণীর বাস্তব নিদর্শন (প্রমাণ ভিত্তিক সত্যতা) স্বহস্তে উদ্‌ঘাটন ও আবিষ্কার করার এবং স্বচক্ষে তা দর্শন লাভ করার পরও কেন তাঁর অসাধারণ ও তুলনাবিহীন কৃতিত্বকে, মাহাত্মকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধান্বিত? এর বাস্তবসম্মত কোন কারণ আছে কি? মহাসত্যকে নিজ জ্ঞানে প্রমাণ করার পরও চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে মানব সমাজ কল্যাণ পাওয়ার আশা করা কি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? সমাজের জ্ঞানবানদের তা ভালোভাবে চিন্ত -ভাবনা করে দেখতে হবে তাদের নিজ স্বার্থেই।

ওপরের আলোচনায় আমাদের সম্মূখে এই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র তথা মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা (যা মূলতঃই অদৃশ্য) সম্পর্কীয় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগমন করেছে এখন আমরা তা পর পর সাজিয়ে নিচ্ছি। যথা ঃ-

(১) 'আল্লাহ' সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ও তাঁর সেই অসীম জ্ঞান দিয়ে তিনি এই মহাবিশ্বের সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(২) তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে, তাঁকে শুধু এতটুকুই বলতে হয়, 'হও', আর অমনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তা যথাযথভাবে সৃষ্টি হয়ে অস্তিত্ব ধারণ করে।

(৩) বর্তমান দৃশ্য-অদৃশ্য মিলিয়ে যে মহাবিশ্ব রয়েছে তা কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে এ রকম গড়নে বা এ রূপে ছিল না, তখন এর সমস্ত বস্তুই তাদের মূল গঠন উপাদান 'নূর' তথা আল্লাহ্‌র বিশেষ 'আলো' রূপেই বিরাজমান ছিল।

(৪) উক্ত মূল শক্তি 'নূর' থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা এক বিশেষ পদ্ধতিতে (যা পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে) এক মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার (Sub Atomic Particles) উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

(৫) ঐ সকল ভিত্তিগত মৌলিক মহাসূক্ষ্ম কণিকা সমূহ 'অনু-পরমানু'-কে ছাড়িয়ে কল্পনাতীত আরও মহাসূক্ষ্মতার এমন এক পর্যায় থেকে শুরু হয়েছে যে, বাস্তবতার নিরীখে ঐ সম্পর্কে সঠিক ও পূর্নরূপ কোন জ্ঞান মানব সমাজের নেই। তবে 'আল্লাহ্' স্রষ্টা হিসেবে ঐ সকল মহাসূক্ষ্ম

কণিকাসমূহের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন।

(৬) মহাবিশ্বের 'বিল্ডিং ব্লক' হিসেবে কার্যরত ঐ সকল মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহ ওদের জগতে অবিশ্বাস্যরূপে সুশৃংখল, নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণকারী এবং আলোর গতিতে ভ্রমণকারী। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার চেয়েও আরও বহুগুণ তীব্র গতিতে পরিভ্রমণে নিরত থেকে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনকারী।

(৭) অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত এক মহাসূক্ষ্ম পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীতে বিরাট-বিশাল বস্তু এবং এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি আল্লাহ্ তায়ালার সুনিপুন মহাকৌশলের ও মহাজ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তৈরী পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোথাও কেউ কোন প্রকার ত্রুটি নির্দেশ করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ সকল প্রকার দূর্বলতা, ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাঁর মহাজ্ঞান সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

(৮) আল্লাহ্ তায়ালা যখন ইচ্ছা করেন কেবল তখনই তিনি ওহীর মাধ্যমে কিংবা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব জাতিকে 'জ্ঞানময়' বিষয়গুলো অবহিত করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছার বাইরে এবং অন্য কোন পন্থায় নিজ থেকে কেউ কখনও কিছুই অবহিত হওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

(৯) মহাবিশ্বের প্রতিটি বিষয়ের সংবাদ মানব মস্তিষ্কে পৌছাবার নিমিত্তে 'আল্লাহ্' নিজের কাছে তালিকা তৈরী করে সে অনুযায়ী ছাড় দিচ্ছেন বলেই মানুষ তার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী সকল কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে না।

(১০) একটা দীর্ঘ সময় পূর্বেই 'ওহী'-র মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া আল্লাহ্র পবিত্র বাণীসম্ভার পরবর্তীতে 'বিজ্ঞানের' মাধ্যমে প্রমাণিত করে তিনি মানবজাতিকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর মহাবাণীর কোন পরিবর্তন নেই, হতে পারে না। সত্যবাদীতার জন্য এটাই বড় সাফল্য।

(১১) 'মহাসত্যকে' মানবসম্প্রদায় হাতে-কলমে প্রমাণ করে এবং তা বাস্তবে দর্শন লাভ করার পরও 'আল্লাহ্'-র কৃতিত্বকে অস্বীকার করে

চলা এক চরম বোকামী ছাড়া আর কি বা বলা যেতে পারে? পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা সম্পন্ন সৎ মানুষের এ জাতীয় আচরণ কখনও শোভনীয় নয়।

আমাদের এই মহাবিশ্বের গোড়া পত্তনের পথে (ভিত্তিমূলক) 'বিল্ডিং ব্লক' রূপে অবিভাজ্য 'মৌলিক মহাসূক্ষ্ম কণিকা' সম্পর্কে 'আল্-কুরআন' থেকে যে অগ্রিম সংবাদ পেলাম, এখন আমরা প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বের সেই অগ্রিম 'বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবকে' বর্তমান 'উপ-আনবিক কণিকা ল্যাবরেটরীতে' (Sub atomic particles labratory-তে) নিয়ে যেতে চাই পরখ করার জন্য। এতে 'কুরআনের' 'মহাসত্যতা' আবারও আমাদের সম্মূখে ভোরের শুভ্রতায় উদীয়মান সূর্যের ন্যায় নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান ঃ

বিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞান মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের দুটি বিস্ময়কর আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটন সম্পন্ন করে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'টেলিস্কোপ' (Telescope) আবিষ্কার এবং এর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তঃসীমানা পর্যন্ত (প্রায় ১৫০০০ মিলিয়ন কিংবা ১৫০০কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত) বিশাল-বিস্তীর্ণ মহাশূণ্য দর্শন লাভ করতে সক্ষম হওয়া। অপরটি হচ্ছে মহাবিশ্বে অতিক্ষুদ্র (Micro) প্রাণীজগত ও অনু-পরমানুর চেয়েও আরও 'মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা' (Sub-Atomic Particles) জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিস্ময়াভূত ও রহস্যপূর্ণ সৃষ্টি নৈপুন্যতার বৈচিত্রময় তথ্যের বহুলাংশ-ই মানব মন্ডলীর জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মূখে তুলে ধরা। এর ফলে সমাজের জ্ঞানীরা একদিকে মহাবিশ্বের কল্পনাতীত বিশালত্বের মহাশূন্যতার বিষয় ভাবতে গিয়ে এবং সাথে সাথে মহাবিশ্বের 'বিল্ডিং ব্লক' রূপী অনুমান অসাধ্য অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকাসমূহের আবির্ভাব ও ওদের রহস্যপূর্ণ আচরণবিধি প্রত্যক্ষ করে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ছে। পুরো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করে শুধু বাহ্যিক আলোচনায় ব্যাপারটি বোধগম্য না-ও

চিত্র -৮৮

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্য বিষয়সমূহকে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে) প্রকাশ করিয়া থাকেন।" (২৭ঃ২৫)

"তিনিই মানুষকে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে ধাপে ধাপে) অবহিত করিয়াছেন ইতোপূর্বে যাহা সে জানিত না।" (৯৬ঃ৫)

- অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ছিল সবচেয়ে বেশি সাফল্যে পরিপূর্ণ। এ সময়ে টেলিস্কোপের আবিষ্কার আর উন্নতির মাধ্যমে একদিকে যেমন মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য-অজ্ঞানা অসংখ্য মহাজাগতিক বস্তু খুঁজে বের করা এবং এদের বিস্তারিত তথ্য অবহিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে, তেমনি অপরদিকে মাইক্রোস্কোপের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র প্রাণীজগত এবং বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ অনু-পরমানুকেও ছাড়িয়ে আরও ক্ষুদ্র-মহাসূক্ষ্ম উপ-আনবিক বস্তুকণার জগত পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও জ্ঞান অর্জন সম্ভব করে তুলেছে। পূর্বে মানবজাতি এতটুকু অগ্রগতির কথা কল্পনাও করতে সমর্থ হয়নি। মানব ইতিহাসে বর্তমান সময়টি তাই সর্বোচ্চ সাফল্যময় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মূলতঃ এ সকল আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে মহাবিশ্বে মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্‌র' মহাজ্ঞান এবং অতুলনীয় কৃতিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, যাতে করে মানবসমাজ মাথা নত করে ধন্য হতে পারে।

হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে ব্যাপক গবেষণামূলক পর্যালোচনার তাই এখন আমরা সে পথেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ের আলোচনা এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের ওপরই মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ রেখে এগিয়ে যাব। বিষয়টি হচ্ছে এই মহাবিশ্বটি বর্তমান আকৃতি ও রূপ নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার পিছনে 'অনু-পরমানু' অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য অথচ বাস্তবে কার্যরত মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ।

বর্তমান সময় পর্যন্ত জানা মতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব থেকেই ভূ-পৃষ্ঠে আগত মানব সম্প্রদায় তাদের চারিপার্শ্বে দৃশ্যমান নয়ন জুড়ানো, মনমাতানো এই বিশ্বভূবন নিয়ে প্রাথমিকভাবে একটু একটু করে ভাবতে শুরু করে। তাদের ভাবনার এই যাত্রাই পরবর্তীতে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের' (Natural Science) সূত্রপাত ঘটাতে পথ নির্দেশ করেছে। সময়ের ঐ পর্যায়ে তাদের বিভিন্ন ভাবনার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাবনা এই ছিল যে দৃশ্যযোগ্য লক্ষ কোটি বৈচিত্রে পরিপূর্ণ বিশাল এই বিশ্ব-প্রকৃতি মূলতঃ কি দিয়ে গঠিত হয়েছে (What is the world made of)। এই প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন সমাজে জ্ঞানের তেমন একটা অগ্রযাত্রা না ঘটায় প্রথমদিকে কোন উত্তর প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হয়নি। পরবর্তীতে ৬০০ পূর্বাব্দে অব্দে প্রথমবারের মত গ্রীক দার্শনিক 'Thales' এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সমগ্র বিশ্ব মূলতঃ 'পানি' (Water) থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। প্রস্তাবটি বেশ বিতর্কিত হয়ে উঠায় পরবর্তীতে অন্য একজন দার্শনিক 'Anaximander' এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন 'আসলেই কিন্তু আমাদের বিশ্বজাহানের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে 'বাতাস' (Air) থেকে। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতে বিখ্যাত দার্শনিক 'পিথাগোরাস' (Pythagoras) ঘোষণা করলেন- 'কারও কথাই ঠিক নয়, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে কতগুলো সংখ্যা (Number) থেকে যে সংখ্যাগুলোই মূলতঃ এই বিশ্বজাহানের ভিত্তি। উক্ত প্রস্তাবের প্রায় ৪০ বৎসর পর গ্রীক দার্শনিক 'হেরাক্লিটাস' (Heraclitus) এসে এক নতুন

প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন এই বলে যে, আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বটি মূলতঃ 'আগুণ' (Fire) থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে।
এইভাবে প্রস্তাব পাল্টা প্রস্তাবের মধ্যে চলতে থাকাবস্থায় খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে উল্লেখিত বিষয়ে নতুনভাবে একাধিক প্রস্তাবের আগমন ঘটে। প্রথম প্রস্তাবটি পেশ করেন দার্শনিক 'এ্যাম্পেডকলস' (Empedocles), তিনি প্রস্তাব করেন প্রধানতঃ চারটি মৌলিক উপাদান থেকেই এই বিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে। মৌলিক উপাদানগুলো হচ্ছে- মাটি (Earth), অগ্নি (Fire), বাতাস (Air) ও পানি (Water)। এই উপাদানগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে নতুন নতুন বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি হয়েছে।
এরপর সমাধানরূপে পরবর্তী যে প্রস্তাবটি আসে, তা উথাপন করেন গ্রীক দার্শনিক 'এ্যানাক্সাগোরাস' (Anaxagoras)। তিনি দাবী করেন যে, বিশ্বজাহানে সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে এক প্রকার 'অদৃশ্য বীজ' (Indivisible Seeds) থেকে। এই 'অদৃশ্য বীজ' নামক বস্তুর অংশগুলো খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ (Ever Small Parts)। এই অবস্থায় একটি শতাব্দী কেটে যায়।
অতঃপর খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 'ডেমোক্রিটাস' (Democritus) আগমন করে তার পূর্বের দার্শনিক 'এ্যানাক্সাগোরাসের' প্রস্তাবকে সমর্থন করে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি পূর্বের ব্যাখ্যাকে আরও সহজ করে বোধগম্য করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই এমন ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে গঠিত যে, এদেরকে আর না বিভক্ত করা যায়, না এদেরকে আর দর্শন লাভ করা যায়। এদের অবস্থাই হচ্ছে Uncuttable এবং Indivisible. 'ডেমোক্রিটাস' বস্তুর ক্ষুদ্রতর এই অদৃশ্য প্রায় অংশগুলোর নামকরণ করেন 'এ্যাটম্‌স' (Atoms), এর অর্থ হচ্ছে যা আর কাটা যায় না বা খন্ডিত করা যায় না। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকদের অধিকাংশই তার এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে পূর্বে ঘোষিত মৌলিক চারটি উপাদানকেই প্রাধান্য দিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থা চলতে থাকাবস্থায় 'প্লুটো' (Ploto) ও 'এরিষ্টোটল' (Aristotle) নামক দু'জন খ্যাতনামা গ্রীক দার্শনিকের আগমন ঘটে, এবং তারাও উক্ত ৪টি মৌলিক
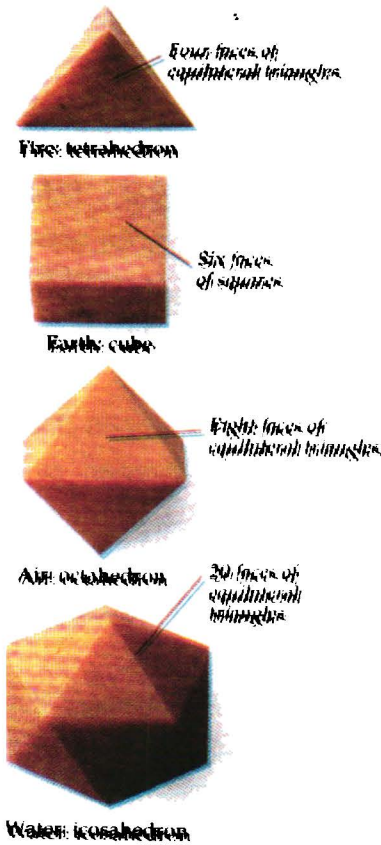
চিত্র -৮৯

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কিভাবে কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (২৯ ঃ ২০)

--আমাদের এ মহাবিশ্ব সত্যিকার অর্থেই যে এক মহাজ্ঞানের সমাহার এবং এর পেছনে যে একজন মহাজ্ঞানী পবিত্র 'সত্ত্বা' সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছেন, তা উপলব্ধির জন্য মহাবিশ্বের প্রতিপালক 'আল্লাহ' পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অনুসন্ধান-পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা জ্ঞানের আঙ্গিনায় প্রবেশ না করে মহাজ্ঞানী 'সত্ত্বাকে' বোধগম্য হওয়া খুবই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার।

বিভিন্ন সময় পৃথিবীর মানবসম্প্রদায় তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছে মহাবিশ্বের সৃষ্টির উপাদান তল্লাসের নিমিত্তে। অতীতে 'এ্যাম্পেডোকলস' (Ampedocles) নামে একজন দার্শনিক এ মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান হিসেবে আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসকে চিহ্নিত করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে জ্ঞানের অগ্রগতির মুখে প্রস্তাবটি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। অনু-পরমানু-র প্রস্তাবটি এসে উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিকেই গুড়িয়ে দেয়।

উপাদানকেই প্রাধ্যান্য দিয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 'এ্যারিষ্টোটল' বরং আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ঐ ৪টি মৌলিক উপাদান (মাটি, পানি, অগ্নি ও বাতাস)-এর সাথে ৫নং আরও একটি উপাদান যোগ করেন। যার নাম দেয়া হয় 'সারাংশ' (The Quintessence), যা দিয়ে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ (সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি দাবী করেন। উক্ত দাবীটি পরবর্তীতে প্রায় পুরো শতাব্দী পর্যন্ত মানব সমাজে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ডেমোক্রিটাসের 'পরমানু' (Atom) প্রস্তাবটি তখন কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের শেষপ্রান্তে এসে আবার মানবীয় চিন্তার জগতে পরিবর্তনের হাওয়া দোল খেতে শুরু করে। ফলে দার্শনিক 'ইপিকুরাস' (Epicurus), দার্শনিক 'ডেমোক্রিটাস'-এর 'পরমানু' (Atom) প্রস্তাবকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পরে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে রোমান দার্শনিক 'লুকরিটিয়াস' (Lucretius) কর্তৃক লিখিত পুস্তক 'De rerum Natura'-এর মাধ্যমে 'পরমানু' (atom)-ই যে বিশ্বজাহান সৃষ্টির পিছনে অদৃশ্য 'বিল্ডিং ব্লক' রূপে মৌলিক উপাদান হিসেবে সক্রিয় রয়েছে, সে তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর ১৭০০ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে ফান্সের দার্শনিক 'গ্যাসেন্ডি' (Gassendi) কর্তৃক ১৬২৪ সালে লিখিত বই 'Excercitations Paradoxicae Adversus Aristotelos' বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৭০০ শতাব্দীতে 'পরমানু' (Atom) প্রস্তাবের পক্ষে দু'টি বড় ধরনের আবিষ্কার সংগঠিত হয়ে বিশ্ব্যাপী মানব সম্প্রদায়কে তাক লাগিয়ে দেয়। ১৬৬৬ সালে ইংল্যান্ডের 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' (Sir Issac Newton) সূর্যের 'আলোকে' বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ পদ্ধতির (Scientific experiment) মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে 'আলো' (Light) মূলতঃ অত্যন্ত গতিশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমষ্টি মাত্র (Light Consist of tiny particles that were travelling at enormus speed)

চিত্র -৯০

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন?" (২৯ ঃ ১৯)

--গ্রীক দার্শনিক 'ডেমোক্রিটাস' (Democritus) তার পূর্বের এক দার্শনিক 'এ্যানাক্সাগোরাস'-এর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন, যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল- এ মহাবিশ্বটি এক প্রকার 'অদৃশ্য বীজ' (Indivisible seeds) থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিক 'ডেমোক্রিটাস' প্রস্তাবটিকে আরও সহজ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেন মূলতঃ মহাবিশ্বটি এমন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে কণিকাসমূহকে আর কাটা যায় না (Uncuttable)। আর ক্ষুদ্রত্বের ঐ পর্যায়ে রয়েছে বলেই ওদের খালি চোখে দেখাও যায় না, তিনি এই ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের নামকরণ করেন 'এ্যাটম' (Atom)। এই 'এ্যাটম' শব্দের অর্থও হচ্ছে- যা আর খন্ডিত করা যায় না বা কাটা যায় না। প্রায় চল্লিশ হাজার এই জাতিয় পরমানুকে (Atoms) একত্রিত করা হলে চিনি বা লবণের সাধারণ একটি ছোট কণার সমান হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মহাজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান হিসেবে যে প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতার মালিক তার বাস্তব প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যেই কল্পনাতীত মহাসূক্ষ্ম 'বিল্ডিং ব্লক' দিয়ে এ মহাবিশ্বের ভীত রচনা করেছেন। সমাজের জ্ঞানীরা বিষয়টি উপলব্ধি করে যেন তাঁর সম্মূখে মস্তককে অবনত করে।

চিত্র -৯১

"তবু তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী" (১৩ ঃ ১৩)

--ওপরের ছবিটি গ্রীক দার্শনিক 'এ্যারিস্টোটল' (Aristotle)-এর। তিনি তার আমলে নামকরা দার্শনিক হিসেবেই সমাজে পরিচিত ছিলেন। মহাবিশ্বের মৌলিক 'বিল্ডিং ব্লক'-এর বিষয়ে পূর্ব েকে প্রস্তাবকৃত বিতর্কে তিনিও অংশগ্রহণ করেন। 'এ্যারিস্টোটল' এ বিষয়ে বিজ্ঞতার ছাপ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়ে 'পরমানু' প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে পূর্বের ৪টি উপাদান অগ্নি, পানি, মাটি ও বাতাস দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্ট বলে উত্থিত প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এ প্রস্তাবটি দীর্ঘদিন সমর্থন লাভে সমর্থ হলেও এক পর্যায়ে এসে দূর্বল ভিত্তির কারণে নির্মূল হয়ে যায়। যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে প্রকৃত 'সত্য' কখনই নিশ্চিহ্ন হয় না, নির্মূল হয় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে সময়ে সময়ে সাময়িকভাবে চাপা পড়ে থাকলেও এক সময় আবার উত্থিত হয়ে আকাশ-বাতাসসহ সমগ্র পরিবেশকে বশীভূত করে নেয়ে। 'পরমানু' প্রস্তাবটির বেলায়ও তা-ই ঘটেছে।

মূলতঃ আল্লাহ্ তায়ালা-ই উল্লেখিত অবস্থার সৃষ্টি করেন পৃথিবীবাসীকে পরীক্ষা করার জন্য।

এবং 'আলো' চলার পথে তরঙ্গাকারে তথা ঢেউয়ের মত এগিয়ে চলে (Light is wave)। উক্ত তথ্য আগমনের ফলে 'পরমানু' (Atom) মতবাদ পূর্বের তুলনায় নিজ ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করে তোলে এবং পরবর্তী ১৮০০ শতাব্দীতেও ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে রাখে। এই সময় অন্য কোন তথ্য-প্রস্তাব মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

উনিশ শতকের শুরুতে তথা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 'জন ডেলটন' (John Delton) নামক এক ইংরেজ আবহাওয়াবিদ (Weatherman) প্রস্তাব করেন যে, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের পৃথক পৃথক নিজস্ব 'পরমানু' (Atom) আছে এবং পরমানুগুলো চিহ্নিতকরণ সম্ভব। একই জাতীয় পরমানুসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে 'উপাদান' (Element) সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ইতালিয়ান 'Amadeo Avogadro' ঐ উপাদানকে 'অনু' (Mol cule) নামে নামকরণ করেন। অতঃপর 'ডেলটন'তার প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমবারের মত পদার্থের 'পারমাণবিক ওজন' (Atomic Weights) নামক একটি তালিকা প্রকাশ করেন, যদিও পরবর্তী সময়ে ঐ তালিকাটি বিভিন্ন কারণে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এই বিতর্কে বিরোধী গ্রুপে নেতৃত্ব দেন একজন ব্রিটিশ রসায়নবিধ 'Sir Humphrey Davy'। এই সৃষ্ট বিতর্ক প্রায় ৬০ বৎসর পর্যন্ত চলতে থাকে।

অতঃপর ১৮৬৯ সালে উল্লেখিত বিতর্কের সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসেন রাশিয়ান ক্যামিষ্ট 'ডিমিত্রি ইভানভিচ ম্যানডেলেয়েভ' (Dimitre Ivanovich Mendeleyev)। তিনি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমানুর' ওজনের ওপর নির্ভর করে 'পিরিয়ডিক টেবল' (Periodic table) নামে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। যেখানে পদার্থের 'পারমাণবিক ওজনের' ওপর নির্ভর করে মৌলিক পদার্থসমূহকে পর পর সাজানো হয়েছে। তিনি এর মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমানু'-র উপস্থিতি শুধু সত্য-ই নয় বরং বস্তুর 'পরমানুর' জগতও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলে এবং তা ঐ 'পরমানু'-র ভিতর অতিসূক্ষ্ম 'ইলেকট্রনের' (Electron) ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। 'ম্যানডেলেয়েভ' তার এই পারমাণবিক ওজন সাপেক্ষে 'পিরিয়ডিক টেব্‌ল'
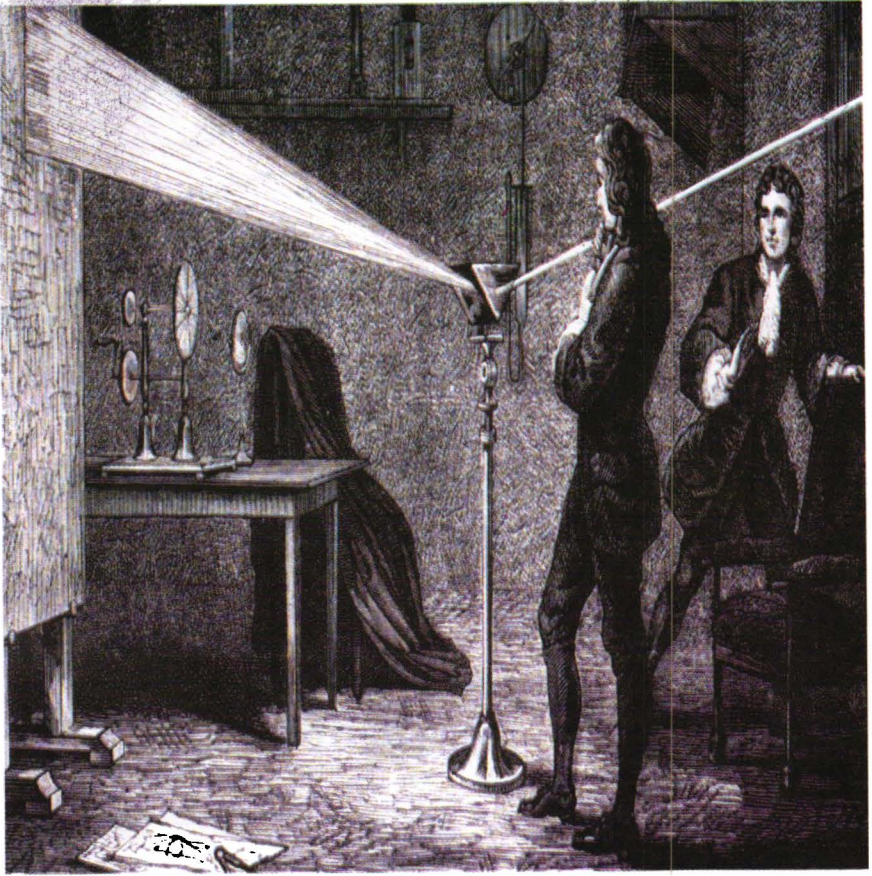
চিত্র -৯২

"আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি।" (২ : ১১৮)

--আমাদের মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অগনিত নিদর্শন। যে নিদর্শনগুলো মহাবিশ্বের সকল ব্যাপারে 'সত্য-সঠিক', তথ্যসমূহ বুকে ধারণ করে আছে। আর এ ব্যবস্থাটি মহাবিশ্বের প্রতিপালক 'আল্লাহ্' নিজ থেকেই সম্পাদন করেছেন, যাতে করে মানবমন্ডলী এ সকল 'সত্যতা' উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে মহাসত্য 'আল্লাহ্ তাআলার' অস্তিত্বকে জ্ঞানের মাপকাঠিতে উদ্‌ঘাটন করতে পারে এবং সফলতা লাভ করতে পারে। ১৭০০ শতাব্দীতে (১৬৬৬সালে) ইংল্যান্ডে তৎকালিন বিজ্ঞানী 'নিউটন' (Newton) সূর্যের আলোকরশ্মিকে (Sun Light) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে 'আলো' (light) মূলতঃ গতিশীল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমষ্টিমাত্র (light Consist of tiny Particles That were travelling at enormus Speed) এবং 'আলো' চলার পথে তরঙ্গাকারে তথা ঢেউয়ের মত করে এগিয়ে চলে (light is wave)।

ওপরের ছবিতে বিজ্ঞানী 'নিউটন'কে সূর্য রশ্মি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যাচ্ছে।

চিত্র -৯৩

"আর বল; প্রশংসা আল্লাহর-ই, তিনি তোমাদিগকে সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন; তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক বে-খবর নহেন।" (২৭ ঃ ৯৩)
--আল্লাহ তায়ালা যে মহাসত্যতার ওপর ভিত্তি করে এ মহাবিশ্বের সকল ব্যাপারের ভীত রচনা করেছেন, তা মানব মন্ডলীর জ্ঞানের সীমায় পৌছাবার নিমিত্তে তিনি নিজ থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যাতে করে ঐ সকল সঠিক 'তথ্য'সমূহ লাভ করার মাধ্যমে মানবজাতি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় যে, এ সকল জ্ঞানময় বিষয়গুলোর পেছনেএকজন সার্বক্ষণিক সক্রিয় 'সত্ত্বা'রূপে একজন আছেন এবং তিনি হচ্ছেন অদৃশ্যে বিরাজমান একমাত্র 'আল্লাহ্'। ওপরের প্রদর্শিত ছবিতে বিজ্ঞানী 'জন ডেলটন' (John Delton) আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে বিছিয়ে রাখা 'নিদর্শণ' সমূহ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে ১৮০৩ সালে বিশ্ববাসীকে হকচকিত করে দেন। তিন প্রমাণ করে দেখান যে, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের পৃথক পৃথক নিজস্ব 'পরমানু' (Atom) আছে এবং পরমানুগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। তিনি এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত 'পারমানকি ওজন' (Atomic Weight) নামক একটি তালিকাও প্রকাশ করেন।

তৈরীর সময় এর মধ্যস্থানে ২৮টি ঘর খালি রেখে যান এবং বলেন যে, শূন্য ঘরগুলোতে যে সকল মৌলিক পদার্থ ওদের পরমানুর পারমাণবিক ওজনের ওপর নির্ভর করে পূরণ করার কথা সেগুলো এখনও আবিস্কৃত হয়নি। যেহেতু 'পরমানু' জগত নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সৃষ্ট, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত তাই একদিন নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হয়ে ঐ ঘরগুলো পূর্ণ করে দিবে। তার মৃত্যুর পর প্রথম পর্যায়ে পর পর তিনটি মৌলিক পদার্থ 'জার্মানিয়াম' (Germanium) 'গেলিয়াম' (Galium) ও 'স্ক্যানডিয়াম' (Scandium) আবিস্কৃত হয়ে শূণ্য তিনটি ঘরকে পূর্ণ করে দেয়। বর্তমানে সব কয়টি ঘর-ই নি নতুন আবিষ্কার দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে এই আবিষ্কার বস্তুর 'পরমানু' জগতে মানব সমাজের পক্ষ থেকে এক বড় ধরনের বিজয় হিসেবে সূচীত হয়।

২০০০ বছর অতীত থেকে এই বিশজাহানের মৌলিক গঠন উপাদান নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, রাশিয়ান রসায়নবিদ 'ম্যানডেলেয়েফ' এসে ঐ সমস্যার প্রকৃত সমাধান 'পিরিয়ডিক টেবল'-এর মাধ্যমে পেশ করেন। এতে করে বিশ্বের গঠন প্রক্রিয়ার পিছনে যে, পরমানু ও তার উপাদান 'প্রোটন, 'নিউট্রন' ও 'ইলেক্ট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহ এবং ওদের জীবন পরিক্রমার সর্বত্র একটি পিরিয়ডিক আইন ও ব্যবস্থাপনা যে প্রকৃত পক্ষেই ক্রিয়াশীল আছে তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ফলে এই সময় পর্যন্ত বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে এতদিনের পরিচিত 'পরমানু'-কে ডিঙ্গিয়ে আরও সূক্ষ্ম বস্তু কণিকার সন্ধান মানবজাতি লাভ করতে সমর্থ হল। এরা হল পরমাণুর-ই উপাদান 'প্রোটন' (Proton), 'নিউট্রন' (Neutron) এবং 'ইলেক্ট্রন' (Electron) নামক অতিক্ষুদ্র কণিকা।

ইতোমধ্যে ১৮৬৪ সালে 'জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল' (James Clerk Maxwell) 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম' (Electromag tism) আবিষ্কার করে বসেন। অপরদিকে ১৮৫০ সালে জার্মান পদার্থবিদ 'ইউজেনি গোল্ডষ্টেইন' (Eugene Goldstein), ১৮৯২ সালে 'ফিলিপ লিনার্ড' (Phillip linard) ও ১৮৯৫ সালে 'উইলহেল্ম কোনরাড রন্টজেন' (Wilhelm Konrad Rontgen) 'এক্স-রে' (X-ray) আবিষ্কার সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে এবং ১৮৮৯ সালে 'মেরিয়া

চিত্র -৯৪

"পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ-অহমিকা করিয়া বেড়ায় (তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে 'সত্য বিষয়' উদ্‌ঘাটিত করিলেও) তাহাদিগের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শণ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসেবে গ্রহণ করিবে। ইহা এই হেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।" (৭ ঃ ১৪৬)

--প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাশিয়ান ক্যামিষ্ট 'দিমিত্রি ইভানভিচ ম্যানডেলেয়েভ' পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমানুর' ওজনের ওপর নির্ভর করে 'পিরিয়ডিক টেবল' (Periodic table) নামে মৌলিক পদার্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তিনি এ কাজের মাধ্যমে দেখাতে চান যে, বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমানু'-র উপস্থিতি-ই শুধু সত্য এবং বাস্তব-ই নয় বরং সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃংখলারও কঠিন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। যে কারণে মহাবিশ্বের সর্বত্র পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এই 'পরমানু' কার্যত অদৃশ্য হলেও একইভাবে একই নিয়মে সার্বক্ষণিক কার্যে নিয়ত আছে।

উল্লেখিত আবিষ্কার সমগ্র মহাবিশ্বে একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান উর্ধ্বতন 'সত্ত্বার' ক্রিয়াশীল অদৃশ্য হস্ত যে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছে তা-কি আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে তুলে ধরে না?
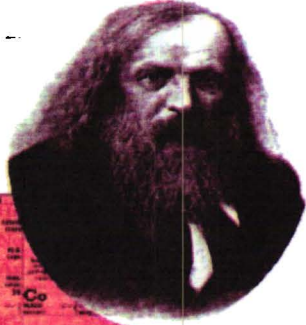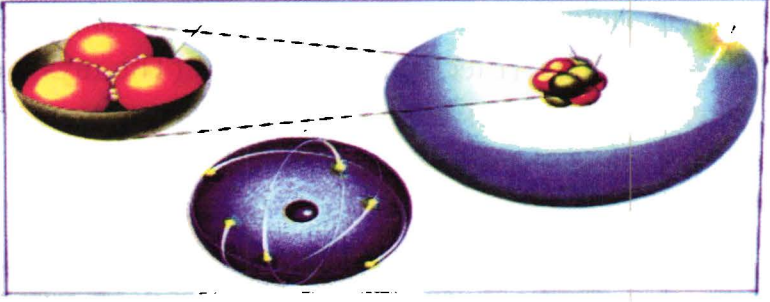
চিত্র -৯৫

"তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

--ওপরের ছবিতে রাশিয়ান ক্যামিষ্ট 'ম্যানডেলেয়েভ'-এর 'পিরিয়ডিক ট্যাবল' দেখানো হয়েছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবিস্কৃত মৌলিক পদার্থের যে 'ট্যাবল' পরমানুর পারমানবিক ওজনের ওপর নির্ভর করে তৈরী করেন, তাতে মাঝখানে হলুদ রংয়ের মোট ২৮টি ঘর অপূর্ণ (খালি) থেকে যায়। ঐ সকল মৌলিক পদার্থ তখনও আবিস্কৃত হয়নি। কিন্তু তিনি পরমানু জগতের শৃংখলায় দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ঘোষণা করে যান যে, এক এক করে ঐ ২৮টি মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হয়ে অবশ্যই একদিন 'ট্যাবলটি' পূর্ণতা লাভ করবে। পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে রীতিমত হতবাক করে দিয়ে ঐ ২৮টি মৌলিক পদার্থ তার কথামত আবিস্কৃত হয়ে বর্তমান পূর্ণতা আণয়ন করে আমাদের সমাজের জ্ঞানীদের কানে কানে যেন বলে যাচ্ছে, হতবাক কিংবা আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা একজন মহাজ্ঞানী কৌশলী এর পেছনে অদৃশ্যভাবে সার্বক্ষণিক সক্রিয় থেকে সব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন, নতুবা এমনি এমনি কি এতসব অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়াভূত কর্মকান্ড নিজ থেকেই ঘটতে পারে?

এসক্লোডোস্‌কা' (Maria sklodowska) ও 'পিরি কুরি' (Pierre Curie) দম্পতি 'রেডিও এ্যাকটিভিটি' (Radio Activity) আবিষ্কারের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেন যে, 'আলোক রশ্মি' মুলতঃই সূক্ষ্ম বস্তুকণা 'ইলেক্ট্রন' (Electron) এর প্রবাহ মাত্র (The rays were a stream of particles Electron)। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ক্ষণে 'জোশেফ জন থম্‌সন' (Joseph John Thomson) ও 'স্যার উইলিয়াম ক্রুক' (Sir William Crooks) বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক টিউবের ভিতর দিয়ে 'কেথ্‌ড-রে' (Cathod Ray) কে প্রবাহিত করে 'ইলেক্ট্রনের' (Electron) উপস্থিতিকে স্বচক্ষে দর্শন লাভ করার ও প্রমাণ করার এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। ফলে বস্তুর অতি ক্ষুদ্র একক 'পরমানুর' উপাদান মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'ইলেক্ট্রন' (Electron) বাস্তবে যে আছে তার উপস্থিতি মানব সমাজের সামনে প্রমাণিত হয়ে ধরা দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর সাথে সাথে পদার্থ বিজ্ঞানেও সূচীত হয় কল্পনাতীত এক অগ্রযাত্রা, পদার্থ বিজ্ঞানের আঙিনায় ঘটে এক মহাবিপ্লব। বিশ্বের বিজ্ঞানাগারসমূহে শুরু হয় 'Heat Radiation' সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা। ফলে বিজ্ঞানী 'ম্যাক্স প্লাঙ্ক' (Max Plank) এবং 'আলবার্ট আইনষ্টাইন' (Albert Einstein) প্রমাণ করে ঘোষণা করেন যে, 'রেডিয়েন্ট এ্যানার্জি' (Radiant Energy)-র বা 'আলোক শক্তির' স্বভাব হচ্ছে 'ফোটন' (Photon) কণিকা নামক একপ্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকার বিচ্ছুরণ (Light behaves like a burst of particles called 'photon')। এই 'ফোটন' (Photon) কণিকার শক্তি নির্ভর করে 'রেডিয়েশন'-এর দোলনের (Frequency) ওপর। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 'রেডিয়েশন'-এর দোলনের ওপর। 'রেডিয়েশন' এর দোলন (Frequency) বেশী হলে 'ফোটন' কণিকার শক্তি (Energy) বেশি হবে। বর্তমান সময় এই বিষয়ে বিজ্ঞান পূর্বের তুলনায় অধিকতর তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা প্রতিদিন যে 'আলোতে' (Visible Light) দেখতে পাই, সেই আলোর
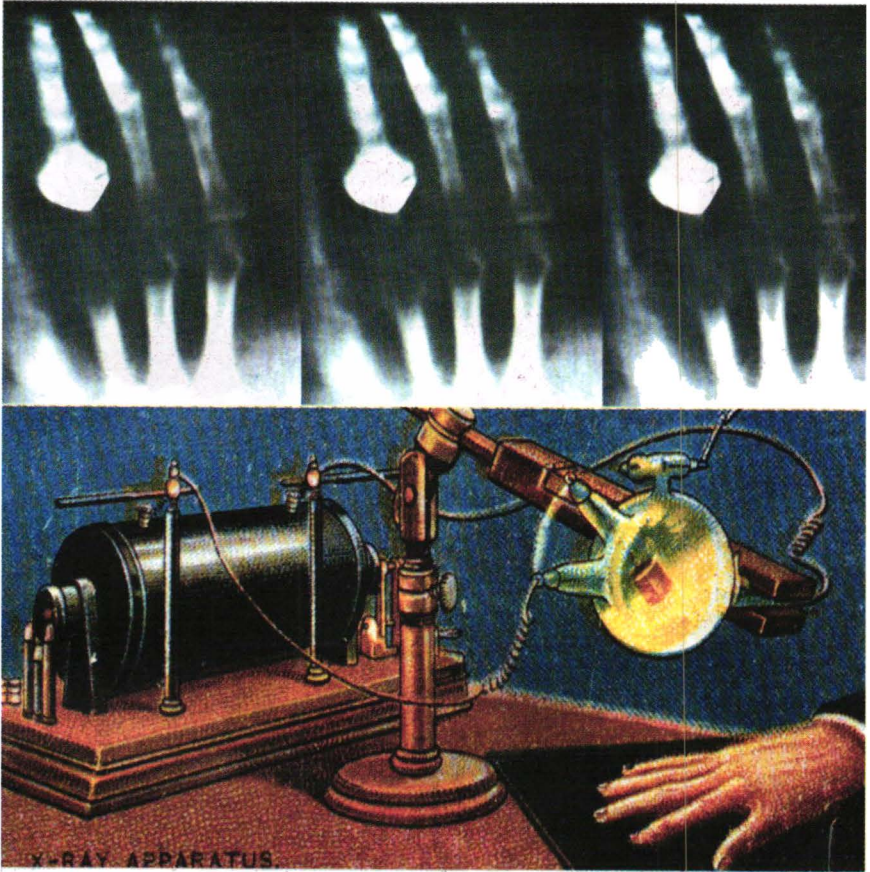
চিত্র -৯৬

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃষ্টির আওতাভূক্ত নয় (অদৃশ্য) তাহা সকলই আল্লাহ্ তায়ালার।" (১১ ঃ ১২৩) --এ মহাবিশ্বে অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণাসমূহ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা না পড়ার কারণে এদের আলোর গতিতে চলমান প্রবাহ তথা অনেক 'আলোক রশ্মির' অস্তিত্বও আমরা দর্শন লাভে বঞ্চিত হচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ 'এক্স-রে' (X-ray)-এর কথা বলা যেতে পারে। ১৮৫০ সালে জার্মান পদার্থবিদ 'Mr. Eugene Goldstein', ১৮৬৪ সালে 'Mr. James Clark Maxwell', এবং ১৮৯২ সালে 'Mr. Phillip linard' এক্স-রে (X-ray) আবিষ্কার করে এই আলোক রশ্মি যে মূলতঃই 'ইলেকট্রন' (Electron) নামক উপ-আনবিক কণিকার (Sub-atomic Particles) একক প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয় তা উদ্‌ঘাটন করেন। বর্তমান সময়ে উক্ত 'এক্স-রে' (X-ray)কে মানবসমাজ মেডিক্যাল সাইন্স সহ নানাবিধ কাজে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। ছবিতে 'এক্স-রে'-এর মাধ্যমে মানব দেহের বিভিন্ন অংগের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য উপস্থাপন করে দেখানো হয়েছে। সুতরাং এক্স-রে (X-ray) এর আবিষ্কারের মধ্য দিয়েও যেমনি প্রমাণ হয়েছে এ মহাবিশ্বে আমাদের দৃষ্টির বাইরে বিশাল জগত পড়ে আছে, তেমনি এ সকল অদৃশ্য জগতের পেছনে সক্রিয় রয়েছেন এক ও একক মহান 'সত্ত্বা' আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তা না হলে মহাবিশ্বব্যাপী এই মহাসূক্ষ্ম 'কোয়ান্টাম জগত' কিভাবে আবির্ভূত হয়ে টিকে থাকতে পারে?
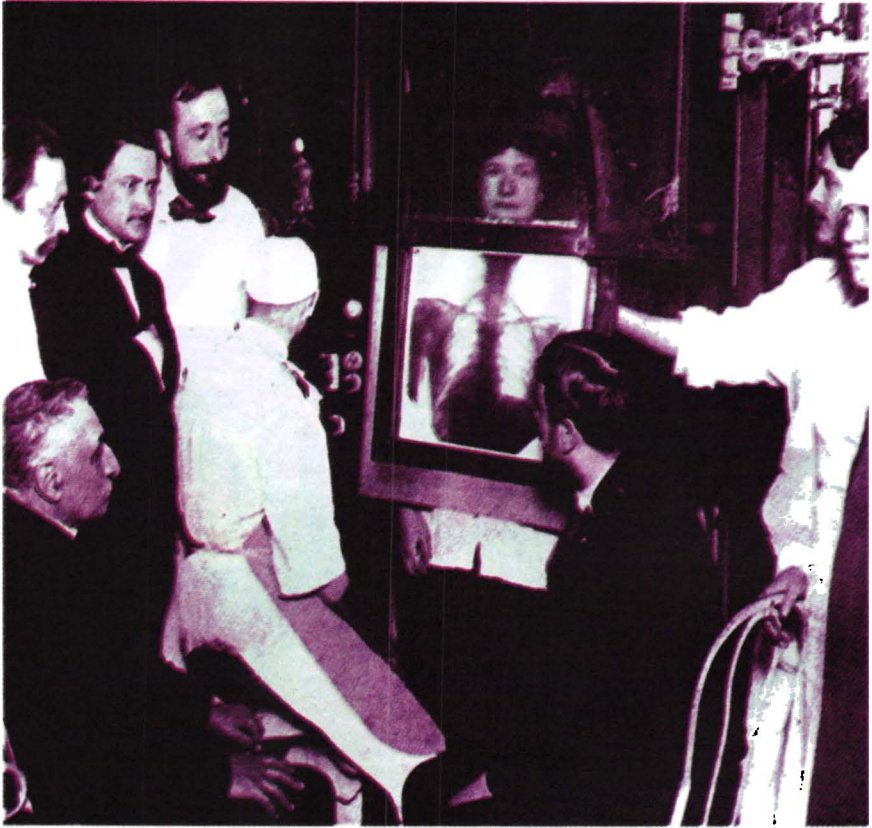
চিত্র -৯৭

"দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে (মহাবিশ্বে) তুমি কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। তুমি আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?" (৬৭ ঃ ৩)

-- বিজ্ঞান জগত আমাদের এ মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত যত কিছু আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে তার প্রত্যেকটি জিনিষই পরবর্তীতে সময়ের আবর্তন ধারায় প্রমাণিত হয়েছে মহাবিশ্বে কোন না কোন কাজে এর প্রয়োজন রয়েছে। অযথা কিংবা বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুই এ মহাবিশ্বে সৃজিত হয় নি। সাথে সাথে ঐ জিনিষের সুক্ষ্ম পরিমানমিতি, রং, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদিসহ সব কিছুই যা যা হওয়া দরকার ছিল তা সবই যেন সংগে নিয়ে এসেছে। মোট কথা সকল কিছুর ব্যাপারে-ই দেখা গেছে সুষম ও সু-সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান আছে। অভিযোগ উঠতে পারে এমন সুযোগ কোথাও রাখা হয়নি, যদি কোথাও অভিযোগ উঠে তাহলে বুঝতে হবে- অভিযোগ দূর হওয়ার জন্য যে যে বিষয় বা অবস্থা প্রয়োজন তা এখনও আবিস্কৃত হয়নি। নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই অনুকুল বিষয় বা অবস্থা আবিস্কৃত হয়ে এক সময় অভিযোগের নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। এ ধরনের হাজারো দৃষ্টান্ত ইতোমধ্যে তৈরী হয়েছে। কুরআনের দাবী অনুযায়ী মানবসমাজ মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগত শুধু উদ্‌ঘাটন-ই করেনি, সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজেও ব্যবহার করছে। ছবিতে শক্তিশালী ইলেকট্রন ও ফোটন কণিকার প্রবাহ তথা এক্স-রে দিয়ে মানবীয় বক্ষ পরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

চিত্র -৯৮

"তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুই নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতেতো রহিয়াছে নিদর্শন" (৪৫ : ১৩)

--১৮৯৮ সালে 'পিরি কুরী' (Pierre Curie) দম্পতি Polonium ও Radium থেকে খুবই শক্তিশালী রেডিও এ্যাকটিভিটি আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করে দেন এই Polonium ও Radium থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তার চাইতে প্রায় ৩০০ থেকে ২ মিলিয়ন গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে উক্ত তেজস্ক্রিয়তাও (Radiation) অনু-পরমানু অপেক্ষাও বহু বহু ক্ষুদ্রস্তরের পদার্থ কণিকা ও শক্তি কণিকার চলমান প্রবাহ মাত্র প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন 'অনু-পরমানু' অপেক্ষাও ক্ষুদ্র তথা মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার যে দাবী তুলেছিল প্রথমবারের মত, বর্তমান বিজ্ঞান তা হাতে কলমে প্রমাণ করেছে সুতরাং আল-কুরআন যে 'সত্যতার' মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং 'আল্লাহর' পবিত্র মহান 'সত্ত্বা' যে মহাসত্যতার ওপর বিরাজমান, তা-কি বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে জ্ঞানের বেলাভূমিতে দাড়িয়ে আর অস্বীকার করা চলে ?

চিত্র -৯৯

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবন, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব; সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।" (২১ ঃ ৩৭)

--১৯০৩ ও ১৯১১ সালে পরপর দুবার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত 'মেরী' (Marrie) বিশ্ববাসীকে সত্যিকারভাবেই অদৃশ্য তেজস্ত্রিয়তার (Radiation) বিরাট নিদর্শন প্রদর্শণ করে গেছেন। তার এ আবিষ্কার সমাজের জ্ঞানীদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানবীয় দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য অথচ বাস্তবভাবে মহাবিশ্বে বিরাজমান ভয়ংকর 'তেজস্ক্রিয়তা' যা মহাসূক্ষ্ম পদার্থকণিকা ও শক্তিশালী আলোর কণিকার দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রবাহের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এদের উপস্থিতি বিজ্ঞান বিশ্বে আর অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘদিন এক নাগাড়ে কাজ করার কারণে 'মেরী' উক্ত তেজস্ক্রিয়তার অদৃশ্য আক্রমনে 'Leukaemia' রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৪ সালে মারা যান। জীবন দিয়ে তিনি এ মহাবিশ্বে অদৃশ্য 'তেজস্ক্রিয়তার' স্বাক্ষী হয়ে রইলেন। আল্লাহ্ তায়ালা 'মেরী'কে দিয়ে তাঁর নিদর্শন মানব সমাজের সম্মুখে পেশ করেছেন। যে মানুষ একটি সৃষ্টিকে (Radio activity কে) তার অস্তিত্ব বিরাজমান থাকার পরও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দেখতে পায় নি, সেই মানুষজাতি কি করে মূল স্রষ্টাকে এ চোখ দিয়ে দর্শণ করার দাবী তুলতে পারে? বড়ই হাস্যকর।

'ফোটন' (Photon) কণিকায় যে পরিমাণ 'শক্তি' (Energy) নিহীত রয়েছে, 'এক্স-রে' (X-ray)-তে বিরাজমান 'ফোটন' (Photon) কণিকায় তার চেয়ে প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি 'শক্তি' নিহীত আছে। এর কারণ 'এক্স-রে' (X-ray) এর দোলন (Friquency) দৃশ্যমান আলোর (Visible light) দোলন অপেক্ষা প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি। আবার একই কারণে দৃশ্যমান আলোর 'ফোটন' কণিকার শক্তির তুলনায় 'গামা-রে' (Gamma-Ray) এর 'ফোটন' (Photon) কনিকা প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন গুণ বেশি 'শক্তি' (Energy) সম্পন্ন। যে কারণে 'গামা-রে' প্রাণীজগতের সংস্পর্শে আসা মাত্রই প্রাণীকোষকে নিমিষে ধ্বংস করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। পরিণতিতে প্রাণীদেহ পঁচে-গলে ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে বিষয়টি বাস্তবভাবে প্রমাণ হওয়ায় যে তথ্যটি সত্যতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে তা হলো- এই সকল উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে মানবজ্ঞানে ধরা পড়েছে 'ইলেক্ট্রন' (Electron), 'প্রোটন' (Proton) ও 'নিউট্রনের' (Neutron) অস্তিত্ব পর্যন্ত-ই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়নি বা ইতি টেনে ফেলেনি; বরং বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা আরও বহুদূর মহাসূক্ষ্মতা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এরপর ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী 'আরনেষ্ট রাদার ফোর্ড' (Ernest Rutherford) তার নিজস্ব তৈরী করা 'Radio wave detector'-এর মাধ্যমে 'alpha particles (alpha ray)' কে পাতলা Gold Foil এর ওপর নিক্ষেপ করে সৃষ্ট নতুন বস্তুকণাকে 'পাতলা গ্লাস বাল্বে' (Thin glass bulb) সংগ্রহ করে পরবর্তীতে তা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মত 'হিলিয়াম নিউক্লি' (Hilium Nuclei) আবিষ্কার করেন এবং সৌরজগতের ন্যায় বস্তুর 'পরমানু' (Atom) জগতও যে একইভাবে আবর্তনশীল তা তুলে ধরেন, যেখানে বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ (Particles) তাদের অস্তিত্ব প্রদর্শন করছে।
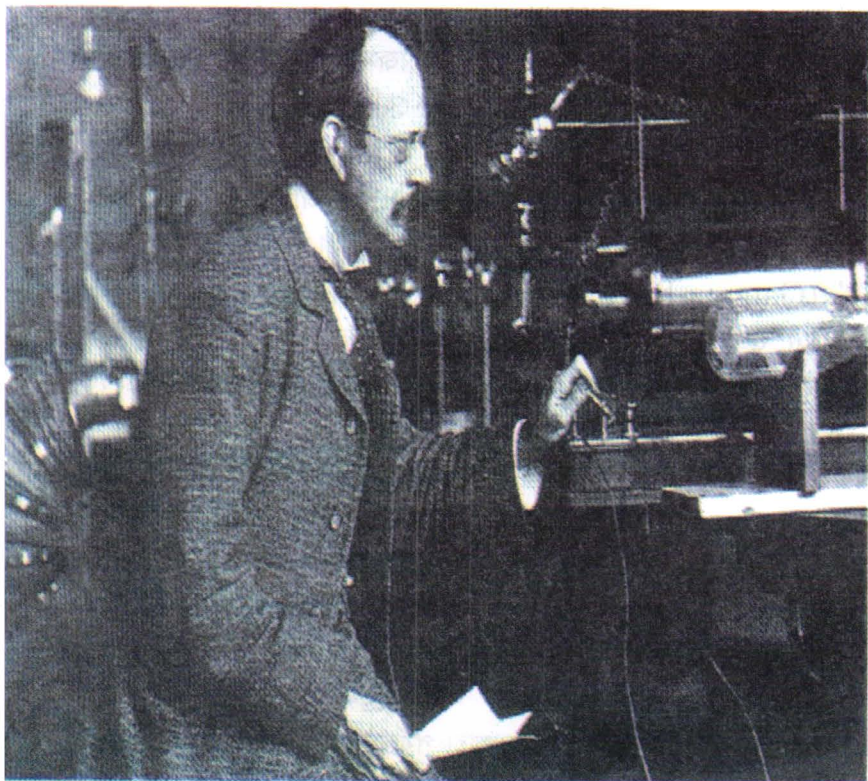
চিত্র -১০০

"উহারাই তাহারা, যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ-এর বিষয়। ফলে উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং কিয়ামাতের দিন উহাদিগের জন্য কোন গুরুত্ব রাখিব না। জাহান্নাম-ই ইহাদিগের প্রতিফল। যেহেতু উহারা কুফরী করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসুলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্রুপের বিষয়রূপে।" (১৮ ঃ ১০৫, ১০৬)

-- ১৮৯৭ সালে J. J. Thomson ল্যাবরেটরীতে Cathod Ray Tube-এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে 'ইলেকট্রন' (Electron) নামক মহাসূক্ষ্ম উপ-আনবিক পদার্থকণার (Sub Atomic Particles) প্রবাহ সৃষ্টি হওয়া এবং তা দর্শন লাভ করার বিরল দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেন। ইতোপূর্বে প্রতিটি পরমানুতে 'ইলেকট্রনের' উপস্থিতি প্রস্তাবাকারে আগমন করলেও বাস্তবে এটাই ছিল প্রথম প্রমাণ। এতে আরও প্রমাণ হলো আমরা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে অনু-পরমানু অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'ইলেকট্রন'কে দেখতে না পেলেও বাস্তবে কিন্তু 'ইলেকট্রন' নামক সেই কণিকা দিয়ে মহাবিশ্ব ভরে আছে।

যে বিজ্ঞানীসমাজ 'ইলেকট্রন' নামক পদার্থকণাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে না, তারা আবার 'ইলেকট্রন'-এর স্রষ্টাকে কিভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখার আবদার করছে?

চিত্র - ২০১

[illegible] ... বিজ্ঞানী [illegible] ... [illegible] সালে [illegible]
[illegible] ... ১৯০৩ সালে [illegible]
হতে [illegible] -এর মাধ্যমে 'ইলেকট্রন'-এর প্রবাহ সৃষ্টি করে [illegible] পাশের টিউবে দৃশ্যমান প্রবাহের অনুরূপ প্রমাণ করে খ্যাতি অর্জন করেন

ভাবতে অবাক লাগে, বিজ্ঞানী সমাজের কেউ কেউ 'অদৃশ্য বস্তু ও শক্তির' অদৃশ্যে উপস্থিতি খুবই সহজভাবে স্বীকার করে নিলেও এ সবের পেছনে সর্বদা সক্রিয় একজন সর্বশক্তিমান অদৃশ্য স্রষ্টাকে মানতে রাজী হচ্ছেন না, অথচ মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজ অদৃশ্য পবিত্র সত্ত্বাকে অস্বীকার না করে উপলব্ধি করার জন্যই মহাবিশ্বে অগণিত বিষয়কে মানবীয় দৃষ্টিতে অদৃশ্য করে রেখেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে 'যা দেখিনা, তা মানিনা' অবিশ্বাসীদের এ দ্বি-মুখী নীতি কি বর্তমান বিজ্ঞান যুগে গ্রহণীয় হতে পারে?

চিত্র -১০২

"কেবল তাহারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহা (নিদর্শন) দেখিতে পাইলে সিজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।" (৩২ ঃ ১৫)

-- ওপরের ছবিতে একটি Glass Globe দেখা যাচ্ছে। এর ভিতর low pressure gas ভর্তি করে এর কেন্দ্রে খুবই শক্তিশালী বিদ্যুৎ (A powerful voltage) সরবরাহ করার ফলে গ্যাসের পরমানুর রূপান্তর ঘটায় তা থেকে অদৃশ্য 'ইলেকট্রন' নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকাগুলো নির্গত হয়ে দৃশ্যমান উজ্জ্বল রেখা আকারে সজ্জিত হয়ে তাদের বাস্তব উপস্থিতির সাক্ষ্য পেশ করছে। আজকের নতুন পরিবেশে বিজ্ঞানাগারগুলো অদৃশ্য বিষয়কে আর বাস্তবতার নতুন আলোতে অস্বীকার করছে না। কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না বলেই তা মানা যাবে না এটা অনুচিত। প্রমাণিত হয়েছে- বিষয়টিকে দৃশ্যযোগ্য করতে সমর্থ হলেই তা অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হবে।

সকল অদৃশ্য বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ নিজেও অদৃশ্যে অবস্থান করছেন। আমরা আমাদের বিশ্বাসের ভীতকে ক্রমান্বয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ় করতে সক্ষম হলে এক সময় তাঁকেও দর্শন লাভে সক্ষম হবো। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?
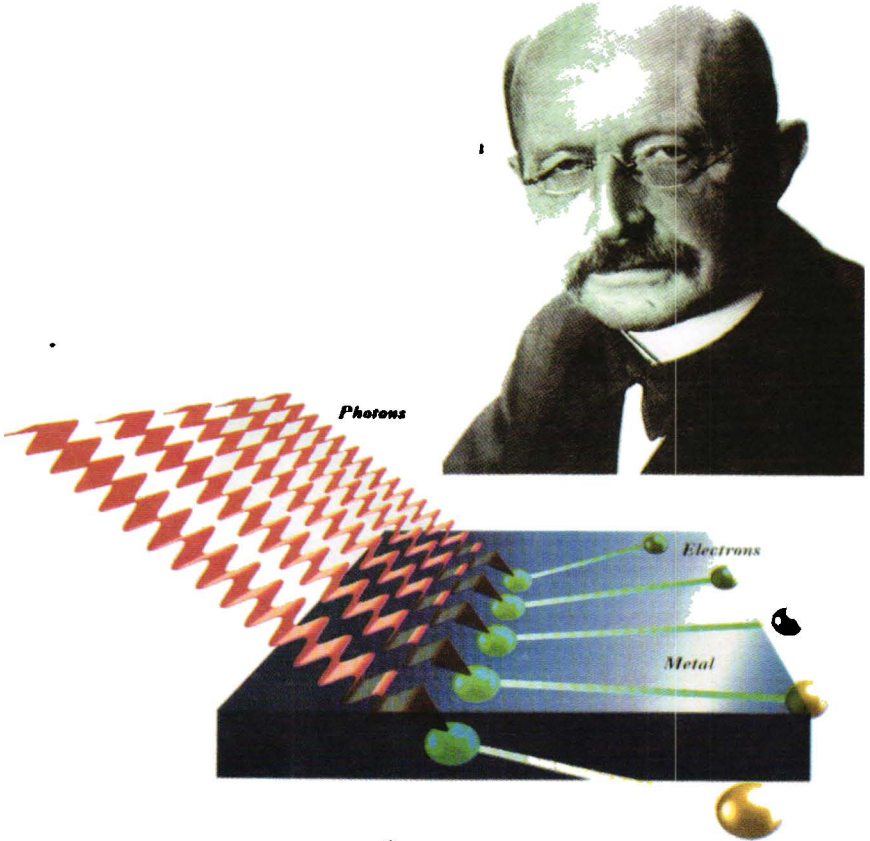
চিত্র -১০৩

"আলোর উপর আলো" (২৪ : ৩৫)

"আমিতো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।" (২৪ : ৪৬)

-- ১৯০০ সালে বিজ্ঞানী 'ম্যাক্স প্লাঙ্ক' (Max Planck) উদ্‌ঘাটন করেন যে 'আলোক শক্তি' (Radiant Energy) সকল সময়ের জন্য একইভাবে অদৃশ্যবস্থায় (divisible) থাকে না। 'আলোক শক্তি' প্রকাশিত হয়ে থাকে মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'ফোটন' বা 'কোয়ান্টা'-র মাধ্যমে। এরাই মূলতঃ শক্তি বহনকারী মাধ্যম। এই 'ফোটন' (Photon) কণিকা বা 'কোয়ান্টা' (Quanta)-র দোলন যত বেশি হবে ওদের মধ্যে নিহীত শক্তির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে তত বেশি হবে। এ আবিষ্কারের জন্য 'ম্যাক্স প্লাঙ্ক' ১৯১৮ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন এবং বিশ্বব্যাপী মানবসমাজ 'অনু-পরমানু' অপেক্ষাও যে মহাবিশ্বে বিরাজমান আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) আরও মহাসূক্ষ্ম স্তরের বাসিন্দা তা অবহিত হওয়ার সুযোগ পেল।

আল্-কুরআন এ গভীর জ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই প্রদান করে বিশ্ববাসীকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার ঐশী বাণীসমূহ যেমন চির সত্য তেমনি তার তথা মহাবিশ্বের অদৃশ্য প্রভুও এক মহাসত্যতায় বিরাজমান। তা না হলে এত অগ্রিম তথ্য প্রদান করা হয় কিভাবে?
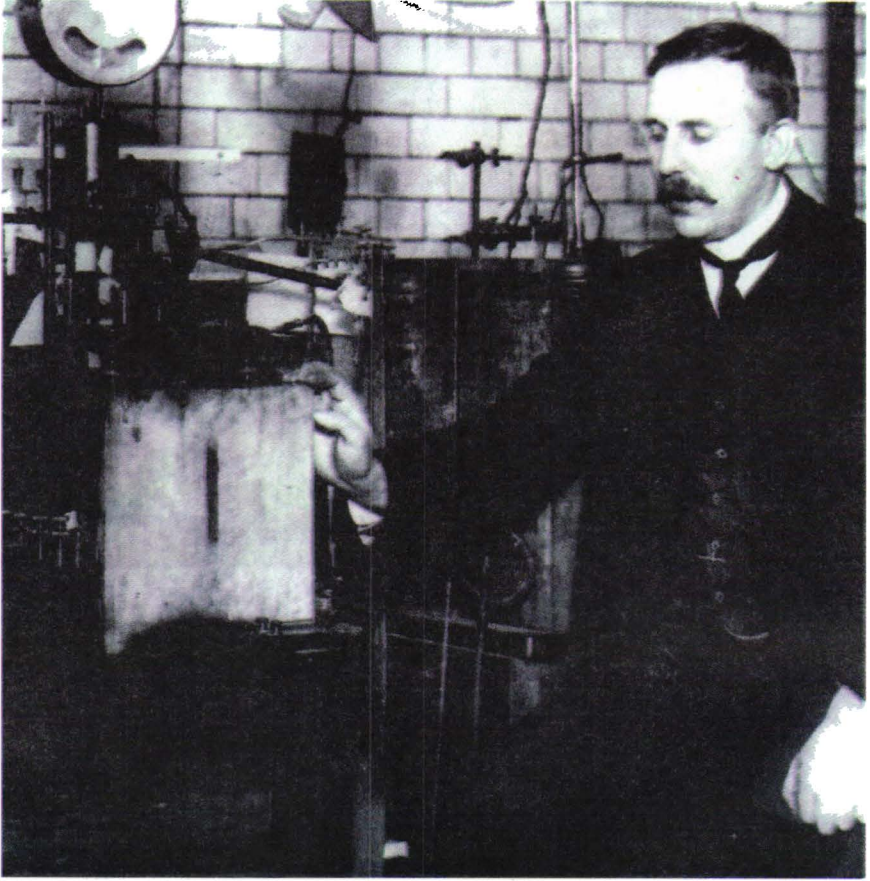
চিত্র -১০৪

"আর বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র-ই, তিনি তোমাদিগকে সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন, তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অবহিত আছেন (বে খবর নহেন)।" (২৭ ঃ ৯৩)

–:- বিজ্ঞানী 'রাদার ফোর্ড' (Ruther Ford) ১৯১১ সালে 'আলফা পার্টিক্যালস' তথা 'হিলিয়াম নিউক্লি'-কে পাতলা গোল্ড ফয়েল (Gold Foil)-এর ওপর নিক্ষেপ করে দেখতে পান বস্তুর পরমানু (atom)-র আভ্যন্তরীণ অংশ অধিকাংশই শূন্য (empty space) সৌর জগতের মত কেন্দ্রেই অধিকাংশ বস্তুভর (mass) 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে জমে আছে। আর গ্রহ-উপগ্রহের ন্যায়, 'ইলেকট্রন' কণিকাসমূহ 'প্রোটন ও নিউট্রন' কণিকাসমৃদ্ধ 'নিউক্লিয়াসের' চতুর্দিকে অনবরত আবর্তন করছে। বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ডের এ আবিষ্কার বিশ্ববাসীর জ্ঞানরাজ্যকে আরেকবার ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিল। তারা ভাবতে লাগলো হাজার হাজার বছর থেকে মানব সম্প্রদায় যেখানে বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ বলতে শুধু 'অনু-পরমানু'কেই বুঝতো, সেখানে বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কারসমূহ কিনা কুরআনের অগ্রিম তথ্য ও প্রস্তাবকেই প্রমাণিত করে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার অদৃশ্য অবস্থা দৃশ্যমান করে উপস্থাপন করছে।
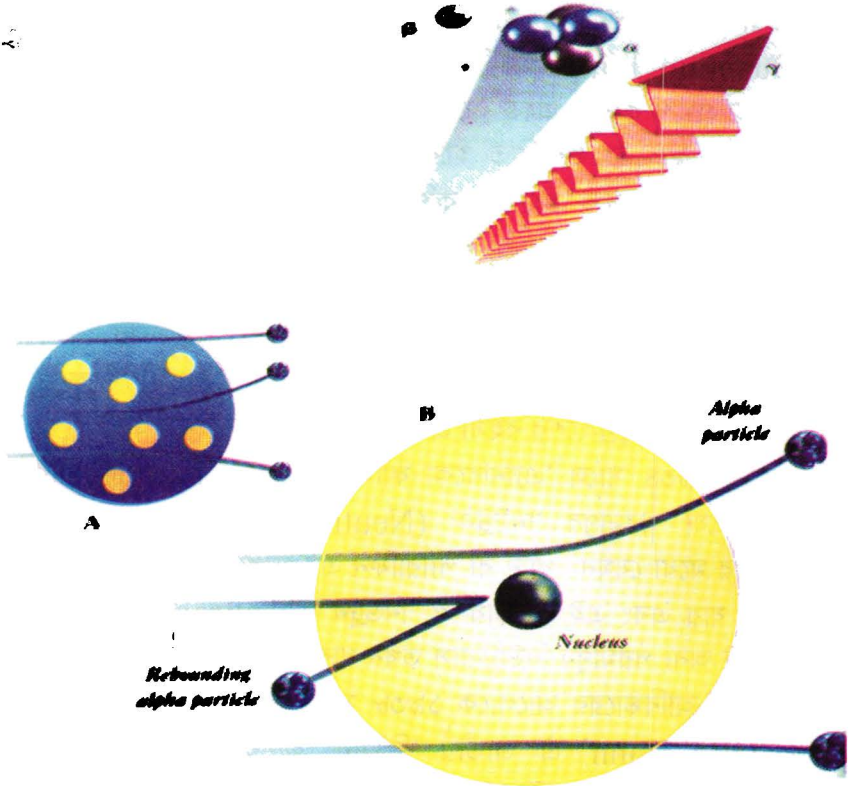
চিত্র -১০৫

"যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদিগের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারবে না- যতক্ষণ না সুঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এইরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিব।" (৭ ঃ ৪০)

-- ছবিতে ওপরের দিকে আলফা, গামা ও বিটা-রে এর ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবির নীচের দিকে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ডের আবিস্কৃত আল্‌ফা পার্টিক্যালস ও পরমানু দেখা যাচ্ছে। তিনি 'আল্‌ফা পার্টিক্যালস' এর সাথে 'বিটা পার্টিক্যালস'ও আবিষ্কার করেন। পরে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী 'পউল ভিলার্ড' (Paul vilard) একই পদ্ধতিতে 'গামা-রে' (Gamma-ray) উদ্‌ঘাটন করেন।

'আল্‌ফা পার্টিক্যালস'-এর কনিকা হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার মিলিতরূপ 'নিউক্লিয়াস'। 'বিটা পার্টিক্যালস'-এর কণিকা হচ্ছে 'ইলেকট্রন'। আর 'গামা-রে'-এর ক্ষুদ্রতম কণিকা হচ্ছে 'ফোটন'। তবে কখনও কখনও গামা-রে 'আল্‌ফা' এবং 'বিটা-রে' ও নির্গত করে থাকে।

উল্লেখিত আবিষ্কারের ভেতর দিয়েও কুরআনের দাবী অনুযায়ী অনু-পরমানু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কণিকাসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। সুতরাং কুরআনের সত্যতা অমান্য করা চলে না।

'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা মিলিত হয়ে 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) তৈরী করছে এবং ইলেকট্রন (Electron) কণিকাসমূহ নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত পরিভ্রমণে রত রয়েছে।

১৯১৩ সালে ডেনিশ পদার্থবিদ 'নীলস্ বোহ্‌র' (Niels Bohr) পারমাণবিক কণিকা 'ইলেকট্রনের' (Electron) কোয়ান্টাম জাম্প (Quantum Jump)-এর মাধ্যমে 'শক্তির' (Energy) যে তারতম্য ঘটে তা প্রমাণ করেন, এতে করে মহাবিশ্বে তাপমাত্রা কেমন করে কিভাবে ওঠা-নামা হয় তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে 'ইলেকট্রন' (Electron) নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকার উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় আরও বাস্তবভাবে প্রকাশিত হয়। 'নীলস বোহ্‌র' উক্ত বিষয়ে ১৯২২ সালে 'নোবেল পুরস্কারে' ভূষিত হন।

এরপর ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী 'Cockcroft' এবং তার সহযোগী 'Ernest Walton' প্রথমবারের মত পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' ভেঙ্গে ওপরে উল্লেখিত বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের রহস্য প্রমাণ করে দেখাতে সক্ষম হন।

তারপর ১৯৩৪ সালে 'এ্যানরিকো ফার্মি' (Enrico Fermi) আবিষ্কার করেন যে, পরমাণুর 'নিউট্রন' (Neutron) কণিকাকে কোন কোন পদার্থের মধ্যে যেমন- পানি বা প্যারাফিন এর মধ্যে ধীর গতি সম্পন্ন করে তোলা যায় এবং এই অবস্থায় ঐ 'নিউট্রন' (Neutron) কণিকাকে খুব সহজেই অন্য পরমাণুর নিউক্লিয়াস তখন ধারণ করতে পারে।

উল্লেখিত আবিষ্কারের আলোকে ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী 'lise Meitner' ও 'Otto Hahn' ঐ জাতীয় 'নিউট্রন' কণিকা দিয়ে 'ইউরেনিয়াম' (Uranium ^{235}) এর নিউক্লিয়াস-কে আঘাত করে ভেঙ্গে দু'টুকরা করা এবং তাতে কল্পনাতীত 'তাপশক্তি' নির্গত হওয়ার বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করেন। পরবর্তীতে এই পদ্ধতিটি 'Fission' পদ্ধতি নামে অভিহিত হয়। এর ভিতর দিয়ে বস্তুর পারমাণবিক মহাসূক্ষ্ম কণিকার বাস্তবতা আবারও প্রমানিত হলো এবং এদের অভাবনীয় ক্ষমতার বিষয়টিও সাথে সাথে পূর্বের তুলনায় ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হলো।

এদিকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একই সাথে বিজ্ঞানী 'C. T. R. Wilson'
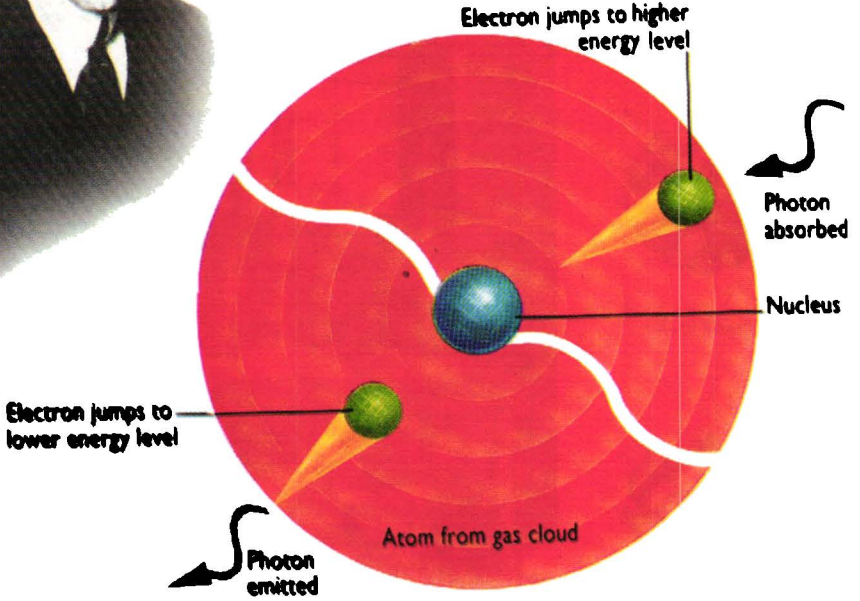
চিত্র -১০৬

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বিষয়সমূহ কিংবা অদৃশ্য বস্তুকে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে) প্রকাশিত করিয়া থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)

-- ১৯১৩ সালে ডেনিশ পদার্থবিদ 'নীলস বোহর' পারমাণবিক কণিকা 'ইলেকট্রন'-এর কোয়ান্টাম জাম্পের (Quantum Jump) মাধ্যমে পরমানুর অভ্যন্তরে কিভাবে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা উদ্‌ঘাটন করেন। ওপরের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। ১৯২২ সালে তিনি এ বিষয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ আবিস্কারের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, পরমানুর অভ্যন্তরে কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে 'ইলেকট্রন' কণিকাসমূহ কক্ষ পথে অনবরত পরিবভ্রমন করতে থাকে। এ অবস্থায় যখন কোন কারনে ভেতরের দিকের কক্ষপথ থেকে 'ইলেকট্রন' কণিকা বাইরের দিকের কক্ষপথে 'জাম্প' করে চলে যায় তখন পরমানু ঐ কক্ষপথ চতুর্দিক হতে 'ফোটন' কণিকা গ্রহণ করে থাকে। যে 'ফোটন' কণিকা হচ্ছে তাপবহনকারী আলোর ক্ষুদ্রাংশ। আবার যখন কোন কারণে 'ইলেকট্রন' কণিকা বাইরের কক্ষপথ থেকে ভেতরের কক্ষপথে ফিরে আসে বা জাম্প করে, তখন পরমানুর ঐ কক্ষপথ থেকে 'ফোটন' কণিকা পৃথক হয়ে পরমানুর বাইরের পরিবেশে চলে আসে। এভাবেই পারমাণবিক জগতে তাপমাত্রা উঠা-নামা করে থাকে।
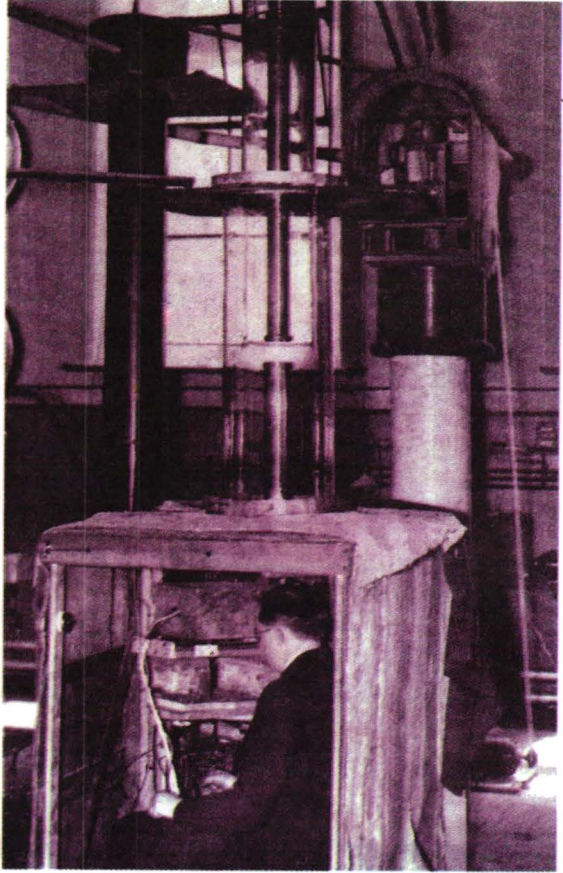
চিত্র -১০৭

"প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন (বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে) তোমার নিকট আসিয়াছিল। তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে এবং অহংকার করিয়াছিলে (অজ্ঞদের মত) আর তুমিতো ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।" (৩৯ ঃ ৫৯)

-- ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী 'Cock croft' এবং তার সহযোগী 'Ernest' প্রথমবারের মত পদার্থের ক্ষুদ্রাংশ পরমানুর 'নিউক্লিয়াস' ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হন। তারা 'লিথিয়াম নিউক্লি'কে পার্টিক্যালস এ্যাকসিলারেটরের মধ্যে ভেঙ্গে 'হিলিয়াম নিউক্লি'তে রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে দেখতে পান যে, এতে করে প্রায় আশি হাজার (৮০,০০০ Volts) ভোল্ট তাপ উৎপাদন হচ্ছে। মানব সম্প্রদায় এ আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে প্রথমবারের মত মহাসূক্ষ্ম পারমাণবিক জগতের অদৃশ্য অথচ বিশাল শক্তির উৎসের এক মহাবিস্ময়কর সন্ধান লাভ করে, যেখানে মানুষ এক সময় পরমানুর 'নিউক্লিয়াস' সম্পর্কেই কোন জ্ঞান রাখতো না। আল্-কুরআনই সর্বপ্রথম এই ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য বিশাল জগতের সন্ধান দিয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও তাঁর পবিত্র বাণী সম্বলিত 'কুরআন'-এর সত্যতার প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় কি?
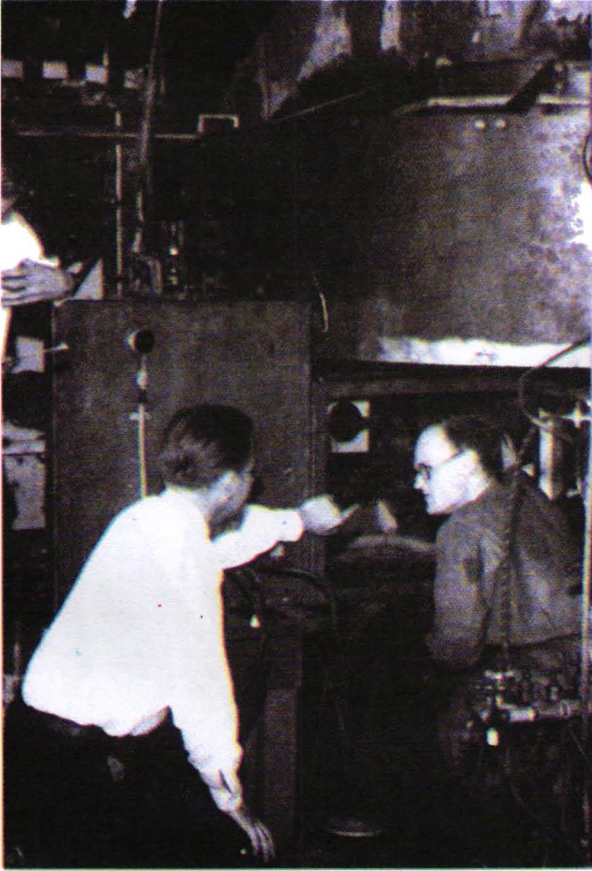
চিত্র -১০৮

"তুমি কি জান না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বের সর্বত্র) যাহা কিছু রহিয়াছে (দৃশ্য-অদৃশ্য, মহাসূক্ষ্ম আর বৃহৎ) আল্লাহ্ তাহা অবগত আছেন? এই সকলই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সহজ (একটি ব্যবস্থা, যে কারনে সমস্ত কিছুই তাঁহার নখদর্পনে)।" (২২ ঃ ৭০)

-- ওপরের ছবিতে একটি ছোট (Mini) আকারের 'Cyclotron' ডানপার্শ্বে দেখা যাচ্ছে। এটি দেখতে খেলনার মত দেখালেও বিশ্বে প্রথম পার্টিক্যাল এ্যাকসিলারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বামপার্শ্বে 340 MeV. সম্পন্ন পার্টিক্যাল এ্যাকসিলেটর দেখানো হয়েছে। এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মেশিন দুটি-ই বিজ্ঞান বিশ্বে লিথিয়াম পরমানুর 'নিউক্লিয়াস'কে ভেংগে 'প্রোটন ও নিউট্রন' নামক উপ-পারমাণবিক কণিকাদের পৃথক করে দিয়ে বিজ্ঞানী সমাজকে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র, মহাসূক্ষ্ম থেকে আরও অদৃশ্যপ্রায় মহাসূক্ষ্মতে প্রবেশ করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার মাহাত্ম ও তুলনাহীন কৃতিত্ব দর্শনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে।

বিজ্ঞান তার আবিষ্কার দিয়ে অন্ধ মানবসমাজকে মূলতঃই কুরআনের পথে হাত ধরে পথ চলতে সাহায্য করছে, কিন্তু মানব সমাজ খুব কমই তা উপলব্ধি করছে।

চিত্র -১০৯

"কেহ আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শন (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল প্রকার মানদন্ডে উত্তীর্ণ চিহ্নসমূহ) প্রত্যাখ্যান করিলে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" (৩ঃ১৯)

-- ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী 'Lise Meitner' ও 'Otto Hahn' 'নিউট্রন' কণিকা দিয়ে 'ইউরেনিয়াম-২৩৫' কে আঘাত করলে ইউরেনিয়াম 'নিউক্লিয়াস' ভেংগে দুখন্ড হয়ে যায়, এতে করে তাতে কল্পনাতীত ও ভয়ংকর রূপে 'তেজস্ক্রিয়তাও' (Radiation) নির্গত হয়। ফলে মানব সম্প্রদায় বুঝতে সক্ষম হলো যে, তাদের অনুমানকৃত বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ অনু-পরমানুরই চূড়ান্ত ক্ষুদ্রত্বে অবস্থান করছে না, বরং আল্-কুরআনের প্রস্তাব অনুযায়ী আরও মহাসূক্ষ্ম থেকে মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় স্তর পর্যন্ত বিরাজ করছে এবং প্রচন্ড ও ভয়াবহ তাপ বিকীরণে প্রমাণ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার মৌলিক 'নূর' (Highest Energetic Radiation) থেকেই এ বস্তুজগতসহ সকল কিছুই সৃষ্টি হয়েছে।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী আজ আর তাই ধর্মকে কটাক্ষ করেন না, সম্ভব হলে ধর্মীয় বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়ে পথ চলতে চেষ্টা করছেন। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ বটে।

চিত্র-১১০

ও 'Theodor Wulf' সহ অনেকেই মহাশূন্য থেকে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ওপরের স্তরে মহাজাগতিক প্রচন্ড শক্তি সম্পন্ন 'বস্তুকণার' (Most Energetic Particles) বা 'Cosmic Ray আগমনের তথ্য আবিষ্কার করেন। 'কসমিক রে' (Cosmic Ray) দু'প্রকার। যথা- (১) Primary Cosmic Rays এবং (২) Secondary Cosmic Rays.

১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীগণ 'কসমিক রে' সম্পর্কে এক বিশেষ জরিপ চালান। উদ্যোগতা হিসেবে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী 'আর্থার কম্পটন' নেতৃত্ব দেন। ফলশ্রুতিতে পাওয়া গেল- 'প্রাইমারী কসমিক রে'তে রয়েছে ৯১% 'প্রোটন' বা 'হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস', ৮% 'আল্‌ফা কনা' বা 'হিলিয়াম নিউক্লিয়াস' (২টি প্রোটন) এবং অবশিষ্ট ১% অন্যান্য অধিকতর ভারী মৌলিক (Heavy Metal) পদার্থের নিউক্লিয়াস (Nucleus), এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'বেরিলিয়াম' (৪টি প্রোটন), 'বোরন' (৫টি প্রোটন), 'অক্সিজেন' (৮টি প্রোটন), লৌহ (২৬টি প্রোটন) এবং আরও ভারী নিউক্লিয়াস।

উক্ত 'প্রাইমারি কসমিক রে' (Primary Cosmic Rays) বায়ুস্তরের ওপর এসে আলোর গতিতে আঘাত হানলে তাতে নতুন-নতুন পদার্থ কণা হিসেবে মহাসূক্ষ্মকণিকা 'মিউওন' (Muon), 'এ্যান্টিমিউওন' (Anti Muon), 'পজিটিভ পাইওন' (Positive Pion), 'নেগেটিভ পাইওন' (Negative Pion), 'নিউট্রাল পাইওন' (Neutral Pion), 'ইলেকট্রন' (Electron), 'নিউট্রন' (Neutron), 'প্রোটন' (Proton) 'পজিট্রন' (Positron) ও 'নিউট্রিনো' (Neutrino) সহ অসংখ্য মহাসূক্ষ্ম কণিকা সৃষ্টি হয়ে 'সেকেন্ডারী কসমিক রে' (Secondary Cosmic Rays) নাম ধারণ করে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করতে করতে এদের কতক ধ্বংস হয়ে যায় এবং কতক পৃথিবীপৃষ্ঠে সকল বস্তুকে আলোর গতিতে ভেদ্‌ করে আবার মহাশূন্যে বেরিয়ে যায়। ১৯৯২ সালের ১২-ই এপ্রিল 'Victor Hess' বেলুনে চড়ে প্রায় ১৭,৫৫০ ফুট ওপরে উঠে এবং ১৯৪৬ সালে 'Carl Anderson' এ্যারোপ্লেনে চড়ে ভ্রমণের সময় 'Cloud

chamber'-এর মাধ্যমে বিষয়টি বাস্তবভাবে প্রমান করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেন।

এছাড়াও 'Under Ground Detector'-এর মাধ্যমেও মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'নিউট্রিনো' (Neutrino)-র উপস্থিতি বর্তমান বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা পড়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা উল্লেখিত 'The high energetic particles of Cosmic Rays' মহাবিশ্বের প্রান্তে সংঘটিত 'গামা-রে বার্ষ্ট' (Gamma-Ray Burst), সুপার নোভা (Super Nova) এবং সূর্য (Sun) ও অন্যান্য নক্ষত্র (Star) থেকে আগমন করে থাকে। 'Victor Hess' উক্ত বিষয়ে অনন্য অবদান রাখার কারণে ১৯৩৬ সালে 'নোবেল' (Nobel) পুরস্কারে ভূষিত হন।

মহাবিশ্বে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ বলতে যে, শুধু 'অনু-পরমানু'-ই বুঝায় তা কিন্তু ঠিক নয়, বরং তার চেয়েও বহু বহু ক্ষুদ্র আরও মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা বাস্তবেই কিন্তু বিরাজমান আছে। ওপরের 'কসমিক-রে' (Cosmic Ray) আলোচনায় তা আরও এক ধাপ উজ্জল আলোতে প্রমানিত হল।

১৯৫০-এর দশকে বিজ্ঞানবিশ্ব বস্তুর মহাক্ষুদ্রতম অংশ সম্পর্কে আরও তথ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। এইগুলি হচ্ছে- Kaons, lambda, Sigma এবং Ksi particles.

বিজ্ঞানী 'কার্ল এ্যান্ডারসন' (Carl Anderson) ১৯৫০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে 'White Mountain'-এর ওপর (প্রায় ৩০০০ মিটার বা ১০,০০০ ফিট ওপর) 'Cloud Chamber'-এ 'Cosmic Rays' ধারণ করে প্রায় ১১,০০০ ছবি তোলে তাতে প্রমান করে দেখান যে, 'সি-লেভেল' (Sea level) থেকে ঐ উচ্চতায় 'কসমিক-রে' (Cosmic Rays) এর পরিমাণ প্রায় ৪০ গুণ বেশি। ঐ সময় তিনি প্রায় ৩৪ ধরনের আরও বিভিন্ন ধরনের মহাসূক্ষ্ম কণিকা আবিষ্কার করতে সমর্থ হন, যেগুলি বর্তমানে 'K-meson' বা 'kaon' নামে পরিচিত। এইগুলি সৃষ্টি হওয়ার পর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমানু'-র পরবর্তী ধাপের মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহের জগত এক বিস্ময়কর ও বৈচিত্রময় রহস্যের পরিপূর্ণ, যা
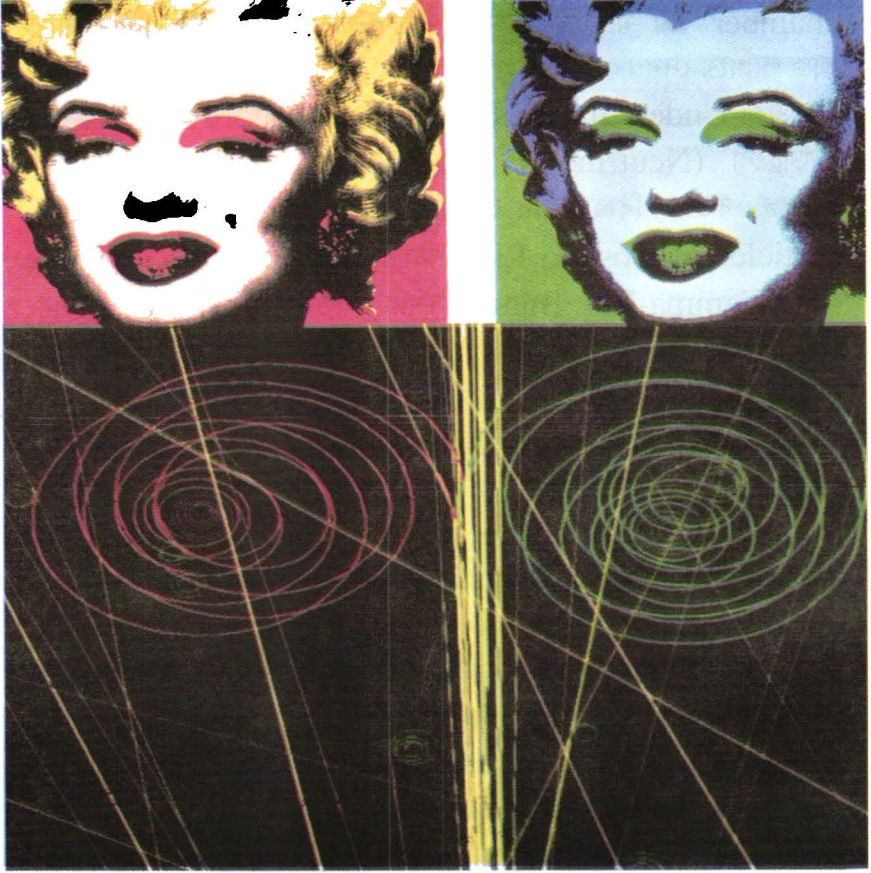
চিত্র -১১১

"তিনি প্রতিটি জিনিষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন।" (৫১ ঃ ৪৯)

-- ১৯৩২ সালে 'কার্ল এ্যান্ডারসন' (Carl Anderson) Secondary Cosmic ray- হতে সৃষ্ট 'ইলেকট্রন' কণিকার প্রতিবস্তু 'পজিট্রন' (Positron) আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানবিশ্ব ইতোমধ্যে অনেক বস্তুর প্রতিবস্তু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। Big Bang Model-গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরুতেও 'কোয়ার্ক' এবং 'এ্যান্টিকোয়ার্ক'রূপে বস্তু-প্রতিবস্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল এ মহাবিশ্বে। বস্তু-প্রতিবস্তু সব সময় একে অপরের বিপরীত স্বভাব ও প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা উভয়ে মুখোমুখী হলে পরস্পর-পরস্পরকে ধ্বংস করে ছাড়ে। এদের পারস্পারিক সংঘর্ষ নতুন নতুন 'পদার্থ' কণিকা এবং 'শক্তি' (Energy)-র উদ্ভদ ঘটে থাকে। ছবিতে 'গামা-রে' (Gamma-Ray) বাষ্ট হতে 'ইলেকট্রন' (সবুজ) এবং প্রতিবস্তু 'পজিট্রন' (লাল) সৃষ্টির কাল্পনিক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সুতরাং অনু-পরমানু অপেক্ষা আরও মহাসূক্ষ্ম কণিকার যে অগ্রিম সংবাদ 'কুরআন' পেশ করেছিল, তা যে শুধু বস্তুর বেলায়ই সত্য, তা-ই নয় বরং প্রতি বস্তুর বেলায়ও তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে প্রতিটি বস্তু বা জিনিষই যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে সে দাবীও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশ্চর্য হওয়ার মত নয় কি?
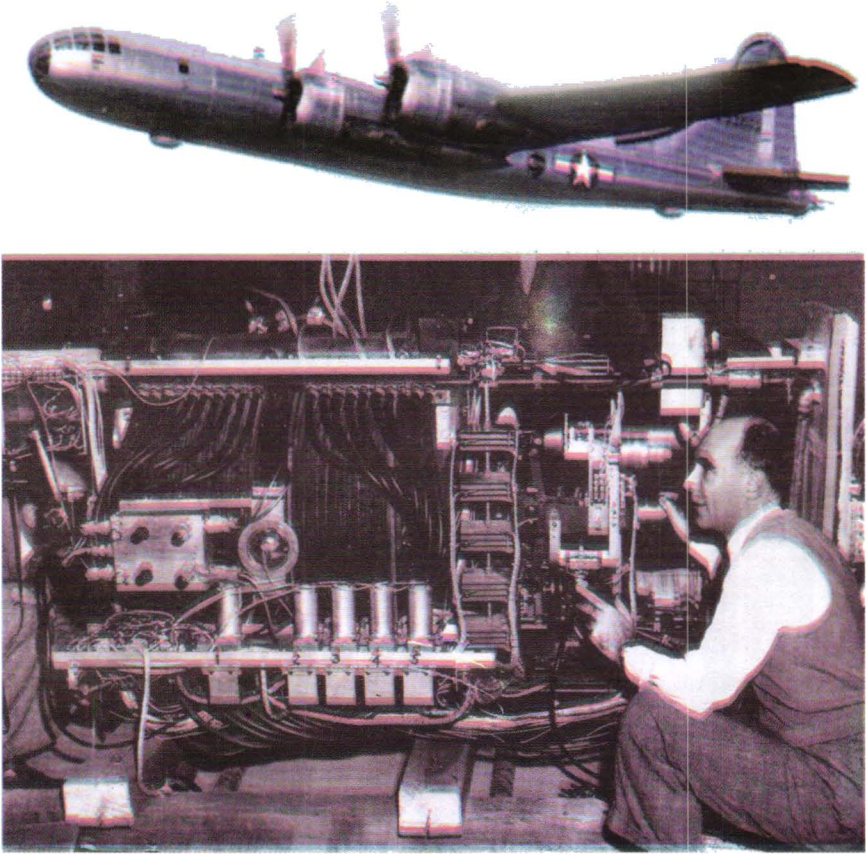
চিত্র -১১২

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ কেমন করিয়া (কি ধরনের মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার সমন্বয়ের মাধ্যমে) প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (২৯ ঃ ২০)
-- ১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী 'কার্ল এ্যান্ডারস' (Carl Anderson) আমেরিকায় 'White Mountain'-এর ওপর (প্রায় ১০,০০০ ফুট ওপর) বিমানের ভেতর 'Cloud chamber' স্থাপন করে আকাশে পরিভ্রমনরতবস্থায় ঐ Cloud chamber-এ Cosmic rays-এর পরীক্ষণের মাধ্যমে তিনি প্রায় ৩৪ প্রকার অস্থিতিশীল (unstable) নতুন মহাসূক্ষ্ম কণিকা সমূহ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হন, যেগুলোকে 'K-meson' বা 'Kaon' বলা হয়। এই কণিকাগুলো সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানী 'কার্ল এ্যান্ডারসন'ও সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এ মহাবিশ্বে বিরাজমান অসংখ্য অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকার সন্ধান পেয়েছেন, যে বিষয়ে একমাত্র 'কুরআন'-ই সর্বপ্রথম মানবজাতিকে একটা দীর্ঘ সময় (প্রায় ১৪০০ বৎসর) পূর্বেই বৈজ্ঞানিক তথ্য আকারে অবহিত করেছে। সুতরাং 'আল্লাহ' সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে কি? তিনি 'সত্য' না হলে এসকল অদৃশ্য তথ্য জানালেন কিভাবে?'
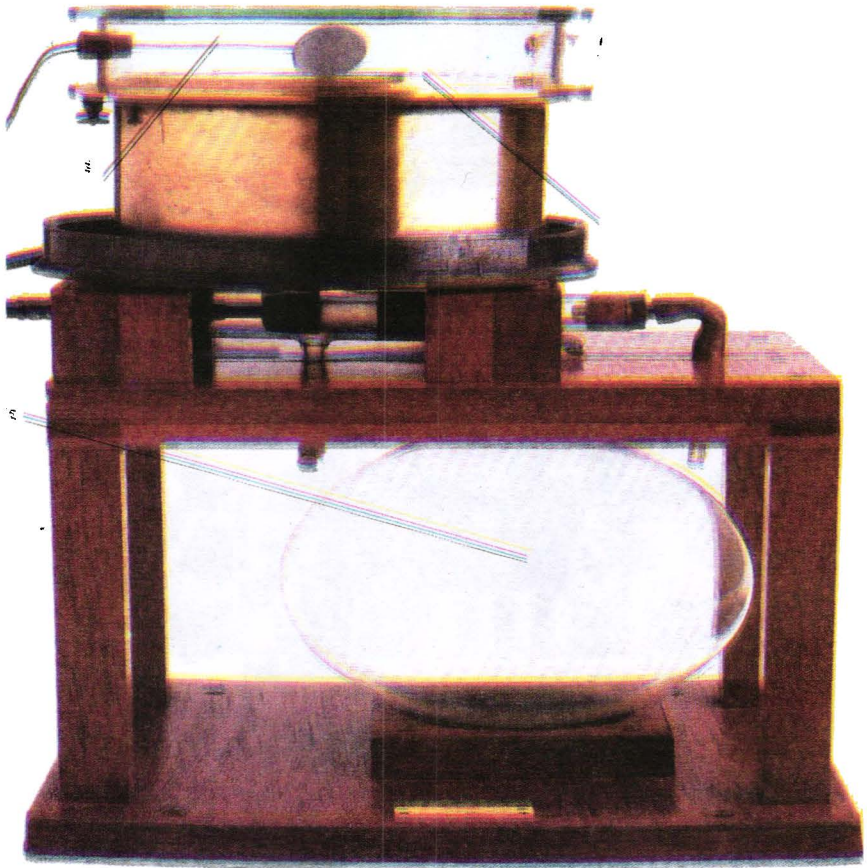
চিত্র -১১৩

"আমিতো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছি, তুমি যদি উহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলিবে, তোমরাতো মিথ্যাবাদী। যাহাদিগের (প্রকৃত-ই) জ্ঞান নাই, আল্লাহ্ এইভাবেই (অজ্ঞানতা দিয়ে) তাহাদিগের অন্তর ঢাকিয়া দেন (ফলে তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়াও প্রকৃত 'সত্য'কে অনুধাবন করিতে পারে না)। (৩০ ঃ ৫৮, ৫৯)

-- পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় তাদের নিজেদের স্বয়ং উপস্থিতি, নিজেদের হাতে তৈরী যন্ত্রপাতি এবং তাদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত-ই এ মহাবিশ্বের অগনিত বিষয়ে নিত্য-নতুন আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের ভিত্তিতে অদৃশ্য ও গোপনীয় তথ্য বের করে উজ্জল আলোতে মেলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে, যে বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই অবিজ্ঞান যুগে আল্-কুরআন পৃথিবীবাসীকে অবহিত করেছে। এতে কি স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় না যে, আল্লাহ যেমন সত্য, তেমনি আল্-কুরআনও 'সত্য'গ্রন্থ এবং যাঁর নিকট কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সেই মহামানবও প্রকৃত 'সত্য' রাসুল? ছবিতে সেই Cloud Chamber দেখা যাচ্ছে, যা আল্লাহর উপস্থিতির অসংখ্য প্রমাণ তুলে ধরেছে।

চিত্র -১১৪

"তিনি পৃথিবীতে তোমাদিগের জন্য অসংখ্য ধরনের বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে (জ্ঞানময়) নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (১৬ ঃ ১৩)

-- ওপরের ছবিতে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে দেখা যাচ্ছে, যারা ১৯৫৩ সালে 'Project Poltergiest'-এর মাধ্যমে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'নিউট্রিনো' (Neutrino)কে সনাক্ত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এ কণিকাসমূহ প্রায় ওজন শূন্য এবং কোন প্রকার চার্জ বহন করে না। যে কারণে স্বভাবতঃই সমগ্র মহাবিশ্ব পরিভ্রমণে নিয়ত থাকার পরও কারো সাথেই মিথস্ক্রিয়া (Interact) করে না। প্রতি ইঞ্চি জায়গা দিয়ে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'নিউট্রিনো' (Neutrino) অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। এদের গতিপথ কেউ-ই রুখতে পারে না। এরা অন্যান্য পদার্থ কণিকা ও শক্তি কণিকার মত সমগ্র মহাবিশ্ব ভরপুর হয়ে আছে।

মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'নিউট্রিনো'কে দেখতে না পেয়েও যদি শুধু উপস্থিতির চিহ্ন দিয়ে বিশ্বাস করা যায়। তাহলে আল্লাহকেও না দেখে তাঁর অনন্য, মহাবিস্ময়কর ও কল্পনাতীত অগনিত জীবন্ত নিদর্শন দর্শন করার পরও (যে কাজগুলো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়) কেন তাঁকে অস্বীকার করা হবে? এর কি কোন যুক্তি আছে?
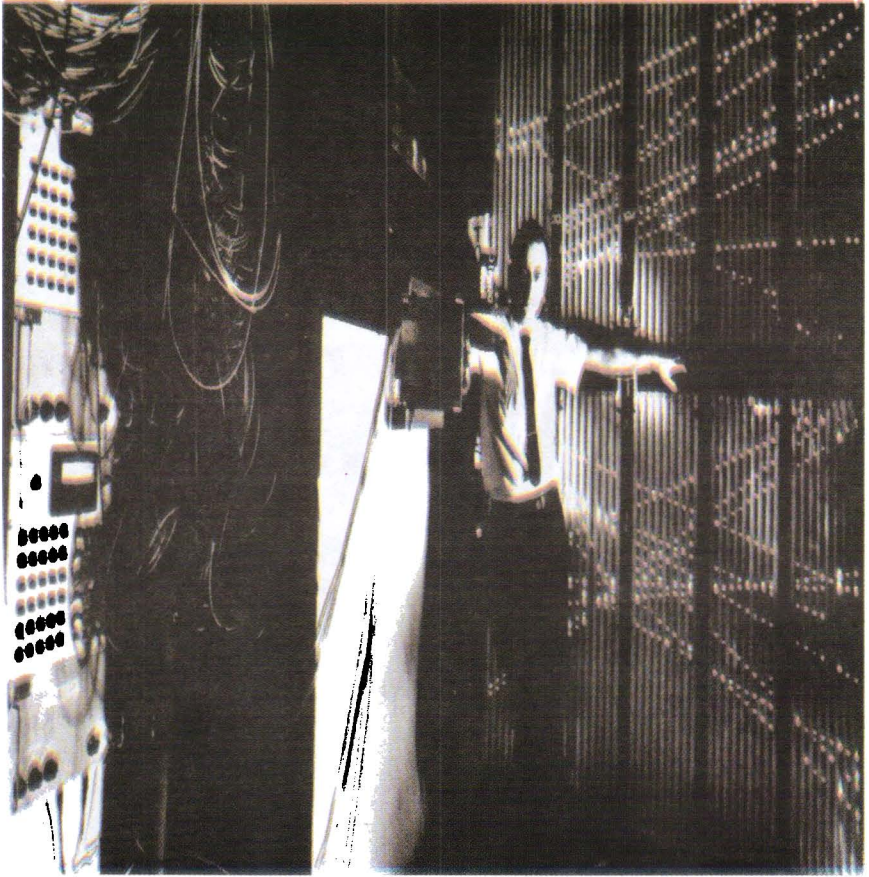
চিত্র -১১৫

"তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে সে উহা দ্বারা নিজেই লাভবান হইবে, আর কেহ (দেখিয়াও) না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।" (৬ ঃ ১০৪)

-- ১৯৬১ ও ৬২ সালে Brook haven-এর Spark Chamber-এ বিজ্ঞানী 'Jack Sleinberger' 'মিউওন নিউট্রিনো' (Muon Neutrino)-র উপস্থিতি প্রমাণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব শত-শত এই জাতীয় মহাসূক্ষ্ম কণিকা ইতোমধ্যে প্রমাণ করে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছে যে কণিকাসমূহ মানবীয় বাহ্য দৃষ্টিতে কখনও-ই দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সনাক্ত করাও যায় না। পূর্বে এ সম্পর্কে মানবজাতি কখনও কল্পনা করতেও পারেনি। শুধুমাত্র আল্-কুরআনই সর্বপ্রথমবারের মত প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাসূক্ষ্ম স্তরের উল্লেখিত বস্তুকণার সংবাদ মানব জাতিকে জানিয়ে যায়। অতএব বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের চতুর্দিকে বিরাজিত অদৃশ্য অথচ বাস্তব জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করায় সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহর' অদৃশ্যে বিরাজমান থাকা জ্ঞানী সমাজের কাছে অবশ্যই স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা বর্তমান বিজ্ঞানের-ই দাবী।
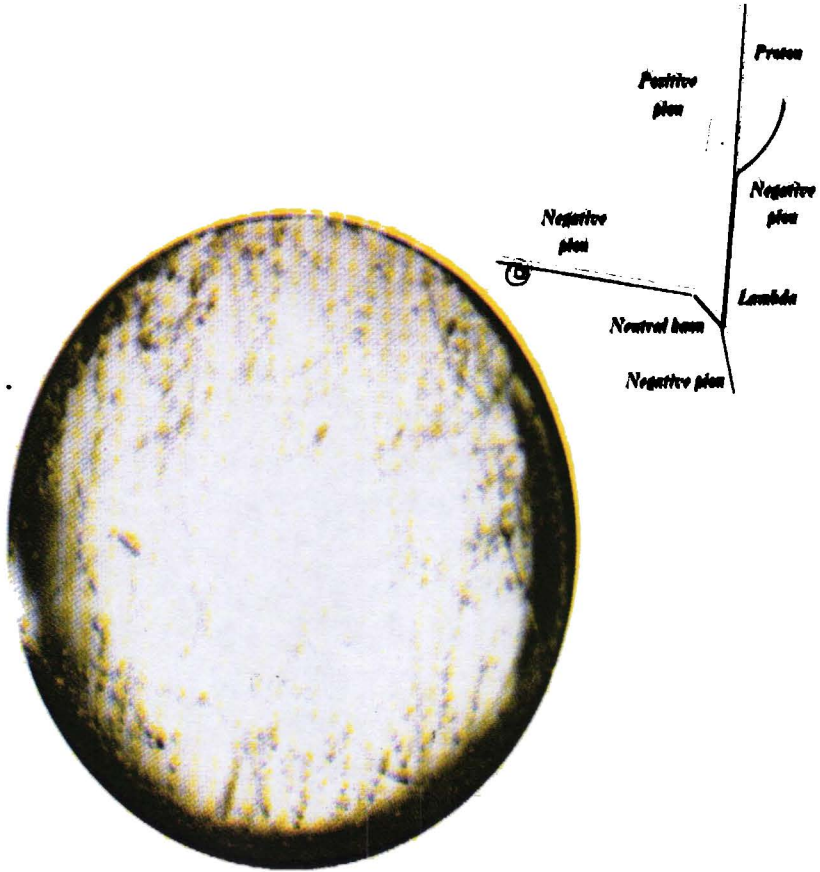
চিত্র -১১৭

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সকল প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাহারা এই সমস্তের প্রতি উদাসীন।" (১২ : ১০৫)

-- ওপরের ছবিতে দৃশ্যমান Bubble Chamberটি ১৯৫২ সালে আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানবিদ 'Mr Donald Glaser' তৈরী করেন মহাসূক্ষ্ম পদার্থ কণিকা নির্ণয়ের জন্য। এটি পূর্বের 'Cloud Chamber' থেকে অনেক উন্নত হিসেবে বিজ্ঞানাগারে স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। Bubble Chamber-এর মাধ্যমে মহাসূক্ষ্ম কণিকা Negative Pion, Neutral Kaon, Lamda, Positive Pion ও Proton ইত্যাদি খুবই সহজভাবে বিজ্ঞানীগণ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে এ মহাবিশ্বে অনু-পরমানু-ই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতরের কণিকা নয়, বরং তার চেয়েও বহু বহু ক্ষুদ্রতরের বাস্তব কণিকাসমূহ দিয়ে মহাবিশ্ব ভরপুর হয়ে আছে। আল্-কুরআন-ই কেবল সে তথ্য সর্বপ্রথম পেশ করেছে। সুতরাং বিশাল অদৃশ্য কণিকাজগত যেমন সত্য, তেমনি সেই বিশাল অদৃশ্য কণিকা জগত সমূহের একমাত্র স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্'ও মহাসত্যতায় অদৃশ্যে বিরাজমান আছেন। তিনিই অদৃশ্যে থেকে সকল কর্মকাণ্ড নীরবে সম্পাদন করে চলেছেন। তিনি যদি না থাকবেন তাহলে কে সমস্ত কিছু যথাযথভাবে সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন?

'বস্তুকণার চিড়িয়াখানা' (Particles Zoo) নামেই অভিহিত হওয়ার দাবী রাখে।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরু থেকেই বস্তুর উল্লেখিত মহাসূক্ষ্ম কণিকাদের পূর্বের তুলনায় আরও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও ওদের যাবতীয় তথ্য উদ্ধারের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তৈরী হতে থাকে 'Powerful Particle accelerator'। আমেরিকা, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানীসহ বিভিন্ন দেশে এ কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়।

এরপর 'সত্তর' দশকের গোড়াতেই বিজ্ঞান জগতে ঘটে এক অবিশ্বাস্য অগ্রগতি। ওপরে আলোচিত উপ-আনবিক বস্তুকণার প্রতিটি বস্তুকণিকা-ই যে মৌলিকভাবে 'কোয়ার্ক' (Quark) নামক তিন-তিনটি মহাসূক্ষ্ম কণিকা দিয়ে গঠিত সে তথ্য সর্বপ্রথম পেশ করেন 'Murray Gell Mann'। প্রথমদিকে তার এই প্রস্তাবকে কেউ সমর্থন না করায় নতুন এই তথ্যটি তেমন একটা সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে Brook Haven-এ তৈরী 'New buble chamber'-এ 'Omega minus' নামে আবিস্কৃত বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে 'Gell Mann'-এর 'কোয়ার্ক' (Quark) প্রস্তাবকে মেনে নিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে। এতে প্রমান হয়, অনু-পরমানু, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন,মেসন, নিউট্রিনো, মিউওন ইত্যাদিসহ প্রায় শতাধিক আবিস্কৃত মহাসূক্ষ্ম কণিকাগুলো মুলতঃ মৌলিক কণিকা নয়, বরং ঐ সকল অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম উপ-আনবিক কণিকাসমূহ (Sub-atomic particles) আবার 'কোয়ার্ক' (Quark) নামক আরও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কণিকা দিয়ে গঠিত। উক্ত বিষয়টি আবিস্কৃত ও প্রমাণিত হয়ে বিজ্ঞান বিশ্বকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়। আবিস্কৃত 'কোয়ার্কের' আবার প্রতিকণিকা 'এ্যান্টি কোয়ার্ক'ও (Anti Quark) রয়েছে। 'কোয়ার্ক' এবং 'এ্যান্টি কোয়ার্ক' মিলিত হয়ে 'Mesons' অর্থাৎ 'Positive Pion' ও 'Negative Pion' সৃষ্টি করে।

'৮০'-র দশকে (১৯৭৪ সালে) প্রফেসর 'Samuel Ting' ও 'Burton Richter' একই সময় পৃথক-পৃথকভাবে 'কোয়ার্ক' পরিবারের ৪র্থ সদস্য

'Charm quark' আবিষ্কার করেন এবং যৌথভাবে উভয়ে তারা ১৯৭৬ সালে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপিত বস্তুর মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহের একটা দীর্ঘ বিবরণ, আমাদেরকে এই 'মহাবিশ্ব' মৌলিকভাবে গঠনের পিছনে 'কণা-পদার্থ বিজ্ঞান' (Particle Physics)-এর যে একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে আমাদেরকে একটা ইংগিত প্রদান করছে। অনু-পরমানুকে ছাড়িয়ে বস্তুকণার মৌলিক উপাদান যে আরও বহু দূর থেকে আরও বহু সূক্ষ্ম তথা মহাসূক্ষ্ম স্তর থেকেই যে যাত্রা শুরু করেছে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানের অবদানে আমরা তা আমাদের জ্ঞানময় দৃষ্টি দিয়ে খুব সহজেই অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেছি। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার কোন অবস্থাতেই মাত্র একশত বছরের বেশী নয়। এই শত বৎসর পূর্বে বর্তমান উদ্‌ঘাটিত 'কনা-পদার্থ বিজ্ঞান' (Practicle physics) সম্পর্কে মানবসমাজ তাদের কল্পনায়ও বিষয়টি স্থান দিতে পারেনি। নিঃসন্দেহে আমাদের এই ভূ-পৃষ্ঠে বস্তুকণার মহাসূক্ষ্মতার বিস্তারিত উদ্‌ঘাটিত তথ্যের এই প্যাকেজটি মানব ইতিহাসে সাফল্যের এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে উল্লেখিত হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞান বর্তমান সময় পর্যন্ত বস্তুকণার মহাসূক্ষ্ম জগতের যতটুকু রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, তাতে মহাবিশ্বের সকল বস্তুর গঠনের পিছনে মৌলিকভাবে '১২টি উপাদান বা 'মৌলিক মহাসূক্ষ্ম কণিকা' ক্রিয়াশীল আছে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬টি হচ্ছে 'কোয়ার্ক' (Quark) যেগুলো 'সবল পারমানবিক শক্তি' (Strong Nuclear Forec)-র সাথে মিথস্ক্রিয়ায় (Interaction) অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং অপর ৬টি হচ্ছে 'লেপটন' (Lepton), যে কণিকাগুলো 'সবল পারমানবিক শক্তির' সাথে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করেনা। উক্ত ১২টি মৌলিক মহাসূক্ষ্ম কণিকা আবার ৩টি পরিবারে বিভক্ত রয়েছে। প্রতি ৪টি মিলে একটি পরিবার, তবে ৪টির ২টি হল 'কোয়ার্ক' এবং অপর ২টি হল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত 'লেপটন' (Lepton).

প্রথম পরিবারের দু'টি 'কোয়ার্ক'-এর একটি হচ্ছে 'আপ-কোয়ার্ক' (Up-quark), এবং অপরটি হচ্ছে 'ডাউন কোয়ার্ক' (Down-quark)।

লেপটনের একটি হচ্ছে 'ইলেকট্রন' (Electron) ও অপরটি হচ্ছে 'ইলেকট্রন নিউট্রিনো' (Electron Neutrino)। উক্ত পরিবারভূক্ত কণিকাসমূহ-ই মূলতঃ সাধারণ বস্তু (Ordinary Matter) সৃষ্টিতে মহাবিশ্বে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। যা প্রতিদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে অনুভব ও দর্শন করছি। 'আপ-কোয়ার্ক' ও 'ডাউন কোয়ার্ক' মিলিত হয়ে 'প্রোটন' (Proton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) কণিকা সৃষ্টি করছে। অতঃপর 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা মিলিত হয়ে তৈরী করছে 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) অর্থাৎ 'এ্যাটমিক নিউক্লি'। পরে উক্ত 'নিউক্লি' চারপাশে 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকা ধারণ করে 'স্থায়ী বা অটল পরমানু' (Stable Atom) সৃষ্টি করছে। আবার সৃষ্ট একাধিক পরমানু মিলিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে 'অনু' (Molicule)। এইভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত আবিস্কৃত ১১২টি মৌলিক পদার্থ চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত মৌলিক পদার্থের একাধিক আবার পরস্পর মিলিত হয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষের ওপর যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়ে দৃশ্যমান এই সুন্দর মনোরম মহাবিশ্ব বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

মৌলিক বস্তুকণার অপর দু'পরিবারের কণিকাসমূহ শুধুমাত্র 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) এবং ল্যাবরেটরীতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় পরিবারের দু'টি কোয়ার্কের একটি হচ্ছে 'ষ্ট্রেঞ্জ' (Strange) এবং অপরটি হচ্ছে- 'চার্ম' (Charm) কোয়ার্ক। লেপটনের একটি হচ্ছে 'মিউওন' (Muon) এবং অপরটি হচ্ছে 'মিউওন নিউট্রিনো' (Muon Neutrino)।

তৃতীয় পরিবারে আছে 'ডাউন-কোয়ার্ক' (Down-Quark), ও 'টপ-কোয়ার্ক' (Top-Quark) নামক দু'টি কোয়ার্ক এবং লেপটনে আছে 'টাউ' (Tau) ও 'টাউ-নিউট্রিনো' (Tau-Neutrino)।

বর্তমান Standard Model- অনুযায়ী এই হচ্ছে বস্তুকণার নিশ্চল (Static) গঠন অবয়ব (Chassis)।

উল্লেখিত বস্তুকণাসমূহ গতিশীলতা লাভ করে থাকে দু'টি স্বাধীন শক্তির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। ঐ শক্তি দু'টি ওদের 'দূত কণিকা' (Messenger
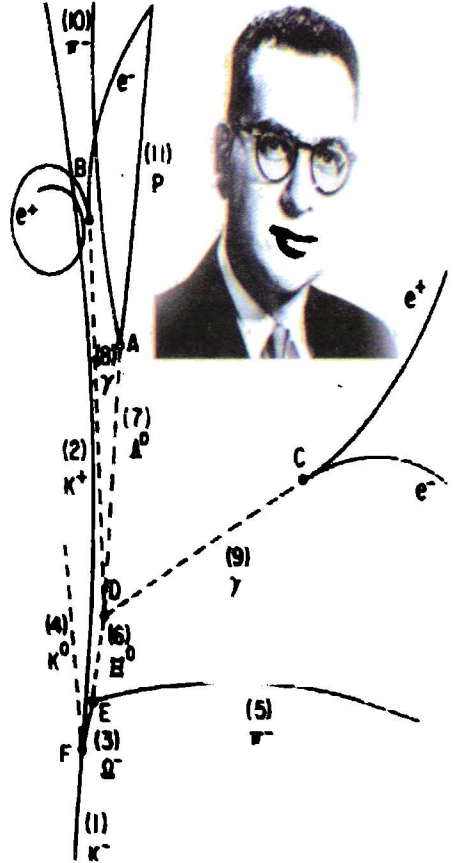
চিত্র -১১৮

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) অনু-পরমানু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং উহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর (Micro তথা মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহ) অথবা বৃহত্তর (Macro) কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নাই।" (১০ ঃ ৬১)

-- ওপরের ছবিতে বিজ্ঞানী 'Gell Mann'-এর ছবি ও 'Omega minus'-এর অঙ্কিত রেখাচিত্র দেখা যাচ্ছে। 'Mr. Murray Gell Mann' ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম 'কোয়ার্ক' (Quark) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যে প্রস্তাবে বলা হয় একমাত্র 'কোয়াক' নামক মহাসূক্ষ্ম মৌলিক কণিকা দিয়েই এ মহাবিশ্বে পর্যায়ক্রমে যাবতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। কোয়ার্কের কোন আন্তঃগঠন কাঠামো নেই। Big Bang Model গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ বলছেন- আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) থেকেই মূলতঃ 'কোয়ার্ক'-এর সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত ছয় প্রকার কোয়ার্ক আবিস্কৃত হয়েছে। Brook haven laboratory-তে Bubbles Chamber-এ Omega Minus নামে বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন উদ্ধৃত ১০ ঃ ৬১ আয়াতটিতে কত সুন্দর, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত ভাবেইনা এই মহাসূক্ষ্ম মৌলিক অদৃশ্য কণিকাসমূহের কথা উপস্থাপন করেছে। 'আল্লাহ্' যে সত্য এটা তার একটি বড় প্রমাণ।
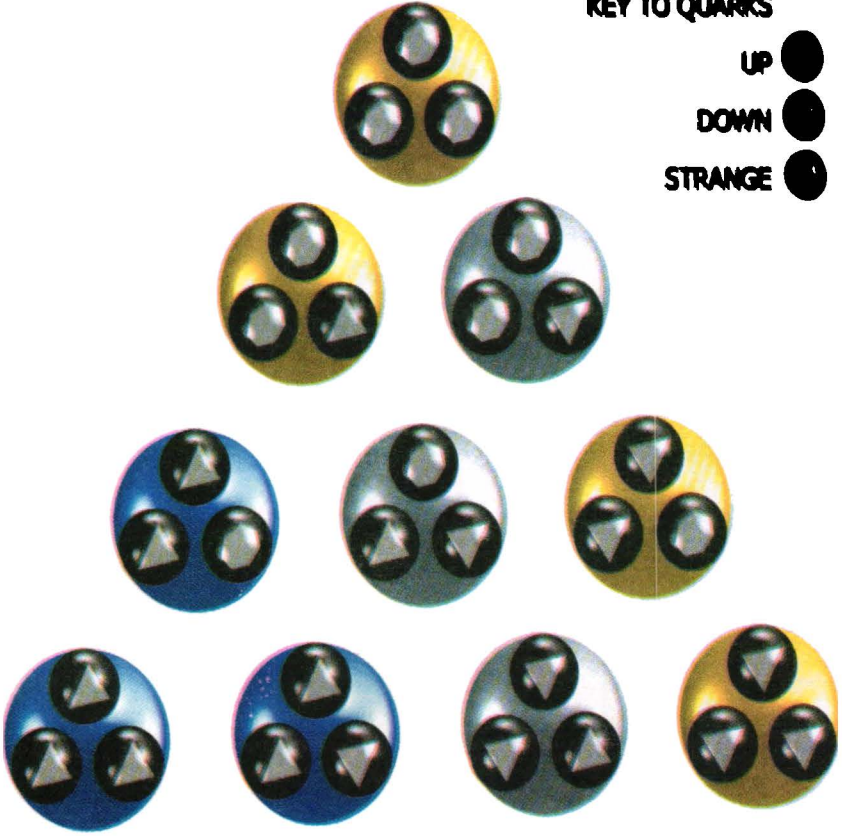
চিত্র -১১৯

"অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) তাঁর অগোচরে নাই সুক্ষ্মাণু (অনু-পরমানু) পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র (মহাসূক্ষ্ম মৌলিক কণিকাসমূহ) অথবা বৃহত্তর কিছু। প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে।" (৩৪ ঃ ৩)

-- ওপরে ছবিতে বিজ্ঞানী 'Mr. Murray Gell Mann'-এর প্রস্তাবকৃত বিল্ডিং ব্লকরূপী মৌলিক পদার্থ কণিকা 'কোয়ার্ক'-এর তৈরী পিরামিড দেখা যাচ্ছে। প্রথমদিকে Gell Mann-এর কোয়ার্ক প্রস্তাব গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু Omega Minus-এর মাধ্যমে অদৃশ্য প্রায় মহাসূক্ষ্ম 'কোয়ার্ক' জগতের ওপর থেকে আবরণ উন্মুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানবিশ্ব বিনাবাক্যে প্রস্তাবটি পরবর্তীতে মেনে নেয় এবং সর্বত্র তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কোয়ার্ক এবং এ্যান্টি কোয়ার্ক মিলিত হয়ে Mesons কণিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আল্-কুরআন একটি মাত্র বাক্যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে (মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য জগত সম্পর্কে) বিজ্ঞানবিশ্ব তা প্রমাণ করে উপস্থাপন করতে প্রায় ২৫০০ বছর সময় নিয়েছে। ব্যাপারটি জ্ঞানীসমাজের জন্য বিস্ময়কর নয় কি? এর পরও কি 'আল্লাহ্' সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে?

চিত্র -১২০

"তোমরা কি (তোমাদের আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে) আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের মাঝে) এমন কোন (মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রায়) কিছুর সংবাদ দিতে চাহ, যাহা তিনি অবগত নহেন? নিশ্চয় তিনি (সকল কিছু সম্পর্কেই পূর্ণরূপে জানেন স্রষ্টা হিসেবে, বরং না জানার) অজ্ঞানতা হইতে অতি পবিত্র।" (১০ ঃ ১৮)

-- ছবিতে দৃশ্যমান এই সেই আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে Standford University সংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত Linear Accelerator Centre, যেখানে প্রায় ৩ কিলোমিটার লম্বা কংক্রিট গ্যালারী সম্পন্ন কেন্দ্রে এ মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লকরূপী আন্তঃগঠনশূন্য মৌলিক কণিকা 'কোয়ার্ক' (Quark) আবিস্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কার সমগ্র পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে গেছে যে, আল্-কুরআন-এর প্রস্তাবই সত্য এবং অদৃশ্য প্রায় মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগতের ধারণার বীজ মানবজ্ঞানে কুরআন-ই বপন করেছিল।

আল্লাহ্ যদি 'সত্য' না হবেন, এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা না হবেন, অদৃশ্যপ্রায় মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক না হবেন, তাহলে কিভাবে তাঁরই উদ্ধৃতিতে সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থে এ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই অগ্রিম স্থান পেয়েছে? বিষয়টি প্রকৃত জ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি অবশ্যই এড়িয়ে যেতে পারে না। নিরপেক্ষ জ্ঞানের ধারক প্রকৃত জ্ঞানীরাই জ্ঞানের মাপকাঠিতে তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়ে পরম তৃপ্তি ও স্বাদের জগতে প্রবেশ করতে পারে। এ এক অনন্য জগত যেখানে বোকা এবং পন্ডিতমূর্খদের কোন স্থান নেই।
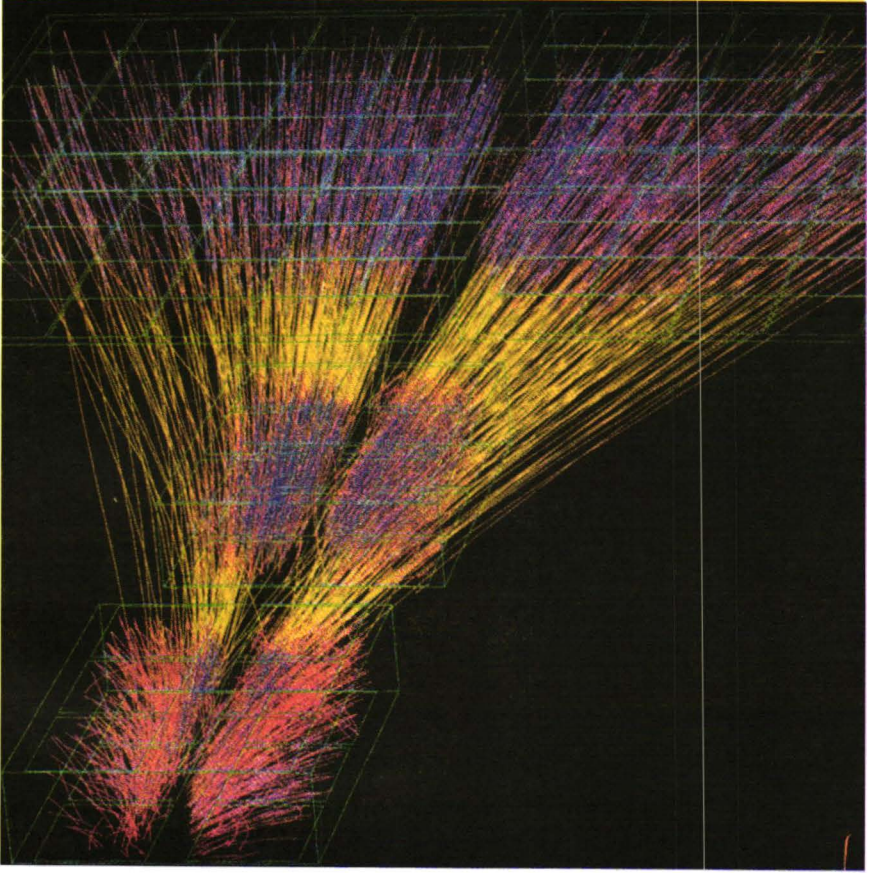
চিত্র -১২১

"তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায়) এমন অনেক কিছুই, যাহা তোমরা অবগত নও।" (১৬ঃ৮)
-- ইউরোপীয় 'Particles Accelerator' যা 'CERN' নামে জেনভা শহরের নিকটে স্থাপিত। অতিসম্প্রতি তাতে দু'টি 'লীড নিউক্লি'র মধ্যে মুকোমুখী সংঘর্ষ ঘটিয়ে বিজ্ঞানীগণ প্রায় ১৬০০ 'কোয়ার্ক' বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে যেতে ডিটেকটরের মাধ্যমে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। ওপরের প্রদর্শিত ছবিতে যা দেখানো হয়েছে। অনু-পরমানু অপেক্ষা মহাসূক্ষ্ম কণিকার বাস্তব উপস্থিতি বিজ্ঞান বিশ্বে আজ আর কল্পকাহিনী নয় বরং অদৃশ্য হলেও তা এক কঠিন বাস্তবতায় বিরাজমান।

বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কারসমূহ সমাজের জ্ঞানীদের চোখে আঙ্গুল রেখে দেখিয়ে দিচ্ছে আল্-কুরআন বিজ্ঞানের কত অগ্রে পদচারণা করছে। যার এক একটি বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব বাস্তবে প্রমাণ করে দেখাতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা ব্যতীত সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি বিজ্ঞান ঐশীগ্রন্থ কুরআনের ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারছে না। এর পর আর এমন কি কথা থাকতে পারে একক স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্'কে মেনে নেয়ার জন্য? আল্লাহতো তাঁকে খুঁজে পাওয়ার জন্য বান্দাহদের সম্মুখে অসংখ্য নিদর্শন (Sign) ইতোমধ্যেই প্রকাশ করেছেন, যা অবশ্যই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচীত। আসলে সমস্যা হচ্ছে সংকীর্ণতা, তাই সকল প্রকার সংকীর্ণতা পরিহার করে তবেই নিদর্শন সমূহ (Sign) দর্শন করতে হবে। আর তখনই 'আল্লাহ'কে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

চিত্র -১২৩

"মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে" (২৯ : ৪৩)

-- ওপরের ছবিতে 'Charm Quark' আবিষ্কারক প্রফেসর 'Samuel Ting' ও তার দলের অন্যান্য সদস্যদের দেখা যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে তারা পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ-এ DESY Electron accelerator-এর ভেতর অসংখ্য কণার সংঘর্ষে সৃষ্ট 'Charm Quark' সনাক্ত করতে ও পরবর্তীতে তা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করতে সমর্থ হন। অন্যদিকে একই সময় আমেরিকান আরেক বিজ্ঞানী 'Burton Richter' ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি এলাকায় নির্মিত Linear Accelerator Centre-এর SPEAR ring-এ উক্ত 'Charm Quark' আবিষ্কার করেন। তারা উভয়ে ১৯৭৬ সালে যৌথভাবে কৃতিত্ব স্বরূপ 'নোবেল পুরস্কারে' ভূষিত হন। প্রফেসর 'মিঃ সামুয়েল টিং ও বিজ্ঞানী মিঃ বার্টন রিচটার' মহাসূক্ষ্ম মৌলিক কণিকা 'চার্ম কোয়ার্ক' আবিষ্কার আর উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে 'কুরআনের' অগ্রিম বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবকেই বাস্তবে প্রমাণ করে সমুন্নত করলেন। কুরআনের দাবী অনুযায়ী অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার উপস্থিতি প্রমাণ করছে আল্লাহ সত্য, কুরআন সত্য এবং সত্য আল্লাহর দূতগণ।
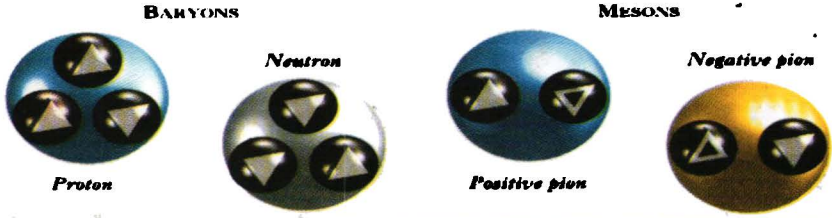
চিত্র -১২৪

"আর যাহারা আমার নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহারা যেন জানিতে পারে (তাহাদের ভালো করিয়াই জানিয়া রাখা প্রয়োজন) যে, তাহাদিগের কোন নিস্কৃতি নাই।" (৪২ ঃ ৩৫)

-- আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ষ্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত তিন কিলোমিটার লম্বা Standford Linear Accelerator Centre-এর একাংশ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করা নিদর্শনগুলোর বেশ কয়েকটা প্রমাণ করে মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থাপনের নীরব স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় যেন সমাজের জ্ঞানীদের নীরবে বলছে- 'হে অহংকারী মানুষ কেন তোমাদের মাঝে মিথ্যে অহমিকা ও গর্ব? কেন আল্লাহ্ সম্পর্কে ভিত্তিহীন বিতর্ক? আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অগ্রিম বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব তোমরা তোমাদের হাতে তৈরী যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে বাস্তবভাবে প্রমাণ করার পরও কেন তোমরা মহাসত্যকে মেনে নিতে দ্বিধান্বীত? এটা তোমাদের জন্য কখনই শোভনীয় নয়।' প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে উদ্ধৃত বাণীসমূহে কত সুন্দর, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত ভাবেই না বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে, যা প্রমাণ করতে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন হয়েছে। 'আল্লাহ্' যে চিরসত্য এটা তার একটা বড় প্রমাণ।
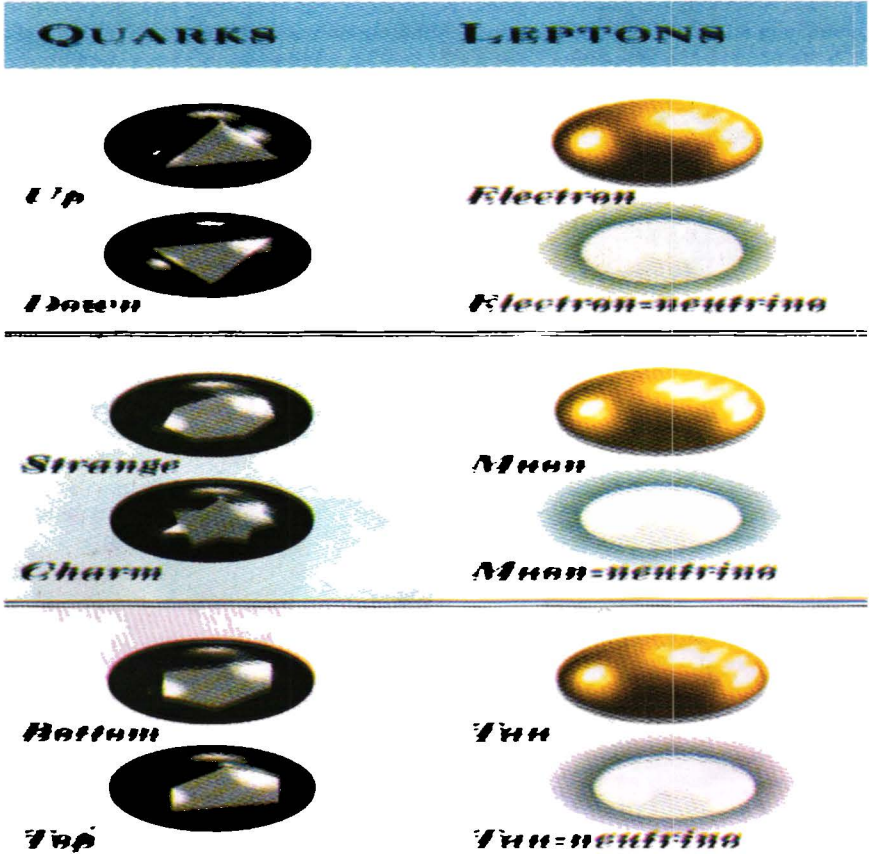
চিত্র -১২৫

"তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহর কোন্ নিদর্শন (Sign)কে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

-- ওপরের ছবিতে Quark Group-এ ছয় প্রকার মৌলিক মহাসূক্ষ্ম 'কোয়ার্ক' কণিকা এবং Lepton Group-এ ছয় ধরনের মহাসূক্ষ্ম 'লেপটন' কণিকা দেখা যাচ্ছে কোয়ার্ক এবং লেপটন-এর প্রথম গ্রুপটি Big Bang মহাবিস্ফোরণের পরমূহুর্তে সৃষ্টি হয়ে এ মহাবিশ্ব গড়ার লক্ষে স্থায়ী পদার্থরূপে সক্রিয় রয়েছে বাকী দু'টি গ্রুপের কোয়ার্ক এবং লেপটন কণিকাসমূহ শুধুমাত্র Cosmic Ray-হতে এবং ল্যাবরেটারীতে সৃষ্টি হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আবার ধ্বংস হয়ে যায়।

'বিজ্ঞানের' বর্তমান পরিবেশে আগমন করে উল্লেখিত চূড়ান্ত তথ্য মেনে ধরতে প্রায় দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর সময় লেগেছে। অথচ আল্-কুরআন এ মহাবিশ্বে অনু-পরমানু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় বস্তুকণার সংবাদ মানবজাতিকে নির্ভূলভাবে শুধু একটি বারের মতই জানিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে- 'আল্-কুরআন বিজ্ঞানময়'। যাদের জ্ঞানরাজ্যে মরিচা ধরেনি, তারা তা ঠিকই বুঝতে পারেন।
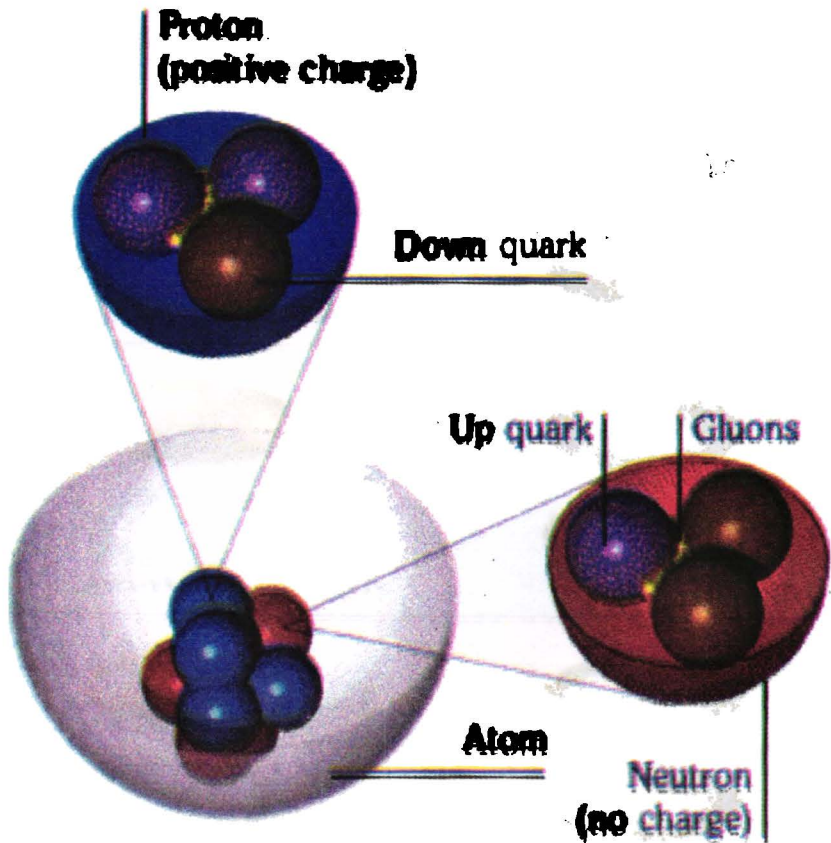
চিত্র -১২৬

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বে) লুকায়িত বিষয় কিংবা (মহাসূক্ষ্মতার কারণে) অদৃশ্য বস্তুকে (বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনের মাধ্যমে) প্রকাশিত করিয়া থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)

-- এ মহাবিশ্বের 'পরমানু' (atom) হচ্ছে প্রতিটি বস্তুর প্রথম ক্ষুদ্র ও স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ ইউনিট। পরমানুর ভেতর প্রধান অংশ হচ্ছে 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus)। এই নিউক্লিয়াস গঠিত হয় 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' নামক উপ-আনবিক সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ দিয়ে। আবার প্রতিটি 'প্রোটন' কণিকা দুটো 'আপ কোয়ার্ক' ও একটি 'ডাউন কোয়ার্ক' দিয়ে সৃষ্ট এবং প্রতিটি 'নিউট্রন' কণিকা দুটো 'ডাউন কোয়ার্ক' ও একটি 'আপ কোয়ার্ক' সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আর 'কোয়ার্ক' নামক মৌলিক মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য কণিকা সৃষ্টি হয়েছে- আলোর কণা 'ফোটন' থেকে। আলোক শক্তির (Radiant Energy) আত্মপ্রকাশ ঘটেছে Big Bang মহা বিস্ফোরণ থেকে। আর হ্যাঁ, এই Big Bang নামক ঘনীভূত (10^{-33}Cm.) বিন্দুটির সৃষ্টি হয়েছে Static Energy রূপে বিরাজমান আল্লাহ্ তায়ালার 'নূর' (Noor) থেকে, 'কুরআন' এবং উৎকর্ষতায়মণ্ডিত 'বিজ্ঞানের' বিস্ময়কর বক্তব্য যৌথভাবে এক ও অভিন্ন বিন্দুতে এসে দাড়িয়েছে। অতএব মানবজাতি এক আল্লাহকে বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে দর্শন করে ধন্য হবে এবং সফলতার পথে এগিয়ে যাবে এটাই যুক্তিসঙ্গত।
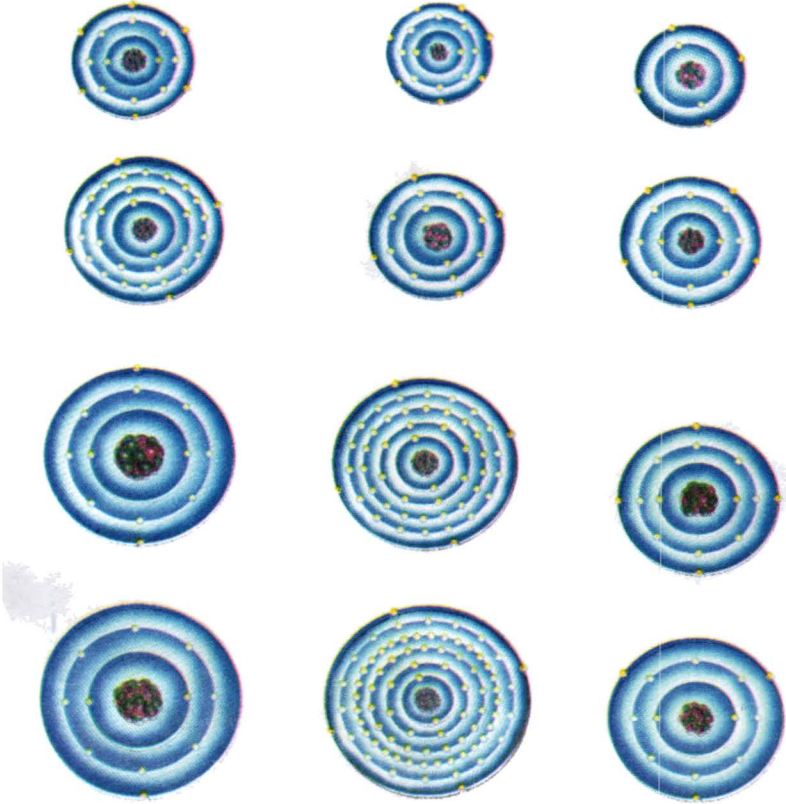
চিত্র -১২৭

"ইহা সেই কিতাব (আল্-কুরআন), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই (চাই তা ইহজাগতিক যে কোন বর্ণনা কিংবা পারলৌকিক যে কোন অগ্রিম সংবাদ-ই হোক না কেন), মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ (ইহজগত ও পরজগত সম্পর্কীয় যে কোন বিষয়ে),যাহারা অদৃশ্যে (অর্থাৎ যাহারা তাহাদের চতুর্দিকে বিরাজমান হাজারো লক্ষ মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য জগতসমূহকে এবং সাথে সাথে তাহাদের অদৃশ্যে বিরাজমান একমাত্র প্রভু 'আল্লাহ'-র প্রতি) ঈমান আনে।" (২ ঃ ২ ও ৩)

-- একটি পরমাণু-তে থাকে তিন ধরনের সূক্ষ্ম উপ-আনবিক কণিকা। 'পজেটিভ' চার্জযুক্ত 'প্রোটিন' কণিকা ও চার্জহীন 'নিউট্রন' কণিকা মিলিত হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রিয় 'নিউক্লিয়াস' সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর 'প্রোটন' কণিকা তার পজেটিভ চার্জের কারণে 'নিউক্লিয়াসের' চতুর্দিকে 'নেগেটিভ' চার্জযুক্ত 'ইলেকট্রন' কণিকাকে আকর্ষনের মাধ্যমে বন্দি করে রেখেছে। আমাদের চতুর্দিকে আলো-বাতাস, মাটি, পানি, আগুনসহ যতপ্রকার বস্তু আছে সমস্ত কিছুই উল্লেখিত অদৃশ্য পরমাণুর সমম্বয়ে গঠিত। অথচ দৃষ্টি দিয়ে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না। তাই কুরআন বলছে-বিশ্বাসী হতে হলে প্রথমে চারপাশে বিরাজমান অদৃশ্যে আগে বিশ্বাসী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহতে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।
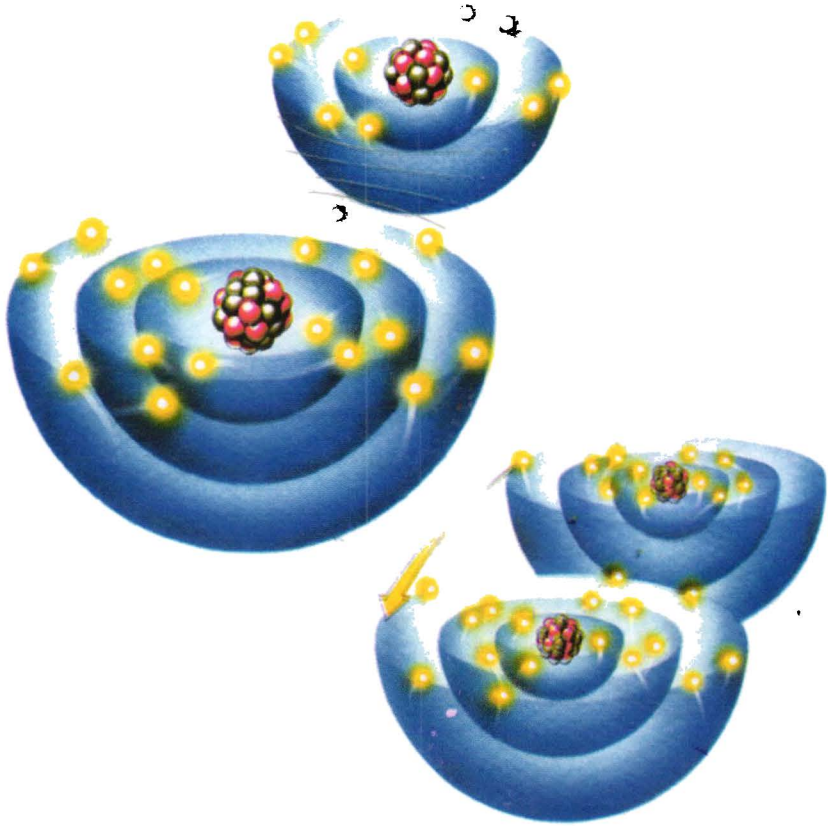
চিত্র -১২৮

"তাহারা কি লক্ষ্য করেনা, কিভাবে আল্লাহ আদিতে সৃষ্টিকে অস্থিত্ব দান করিয়াছেন?" (২৯ ঃ ১৯)
-- স্থায়ী পদার্থরূপে 'পরমানু' (Atom) সৃষ্টির পর বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে কোটি, কোটি, কোটি পরমানু পরস্পর মিলিত হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মী পদার্থের 'অণু' (Molicule) সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, উক্ত 'অণু' পরস্পর মিলিত হয়ে এক একটি মৌলিক পদার্থের আকৃতি লাভ করেছে। পরে একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থ এবং এ মহাবিশ্বের রূপ দান করেছে।
এখন যেহেতু বিজ্ঞান উল্লেখিত কর্ম, পদ্ধতি, ও ফলাফল নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছে, তাই 'কুরআনের' দাবী অনুযায়ী মানবজ্ঞান বর্হিভূত উক্ত বিস্ময়কর কাজগুলো যে মহান পবিত্র 'সত্ত্বা' অদৃশ্যে থেকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে চলেছেন, অদৃশ্যের বাস্তবতা প্রমানিত হওয়ায় তাঁকেও মেনে নিয়ে ধন্য হবে এটাই এখন আশার কথা।
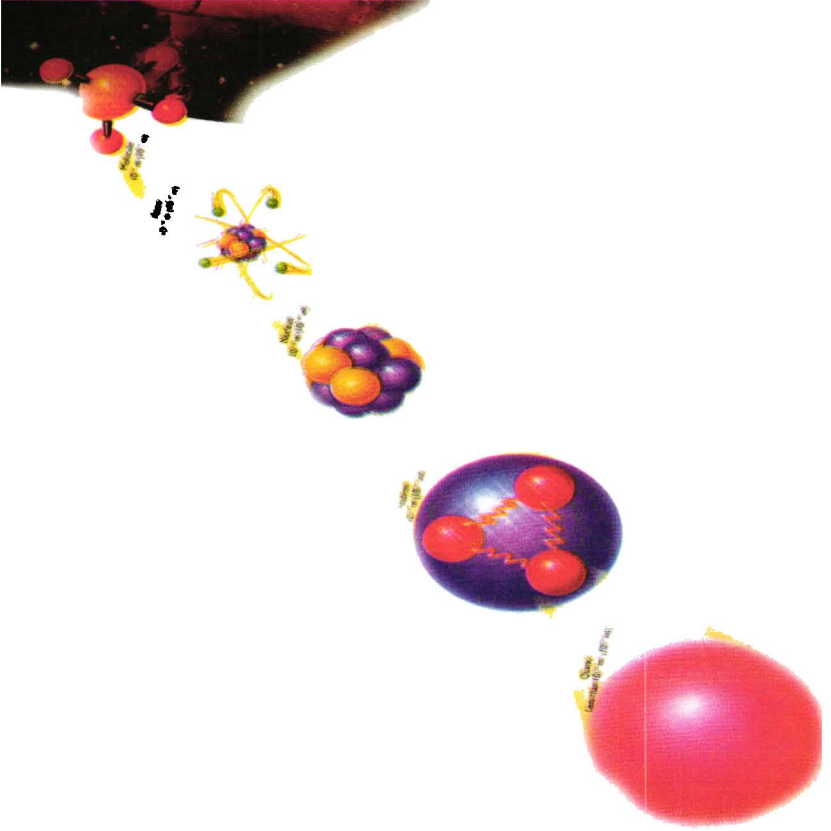
চিত্র -১২৯

" আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মাটির উপাদান হইতে।" (২৩ ঃ ২৯)

" তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সৃষ্টি এবং দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু (মাটির উপাদান-অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও সালফার অণুর সংমিশ্রণে) সৃষ্টি করে ছড়াইয়া দিয়াছেন।" (৪২ ঃ ২৯)

-- এপর্যন্ত ১১২ টি মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হয়েছে। প্রধানতঃ ৫টি মৌলিক পদার্থ-অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও সালফার মিলিত হয়ে মহাবিশ্বব্যাপী প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে আর ৫টি মৌলিক পদার্থই মাটির সাথে মিশে আছে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে। বর্তমান বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অগ্রগতি ও আবিস্কার দিয়ে যখন আমরা মানব সমাজ আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতার পেছনে ৫টি মৌলিক পদার্থের ভূমিকা জেনে গর্বিত হচ্ছি, তখন ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবিজ্ঞান যুগে যে 'আল্লাহ্' সেই মাটি থেকে আমাদের সৃষ্টির কথা জানিয়ে দিলেন, তিনি কি আমাদের স্বীকৃতি লাভের অধিকারী নন? নিরেপেক্ষ জ্ঞান কি বলে?
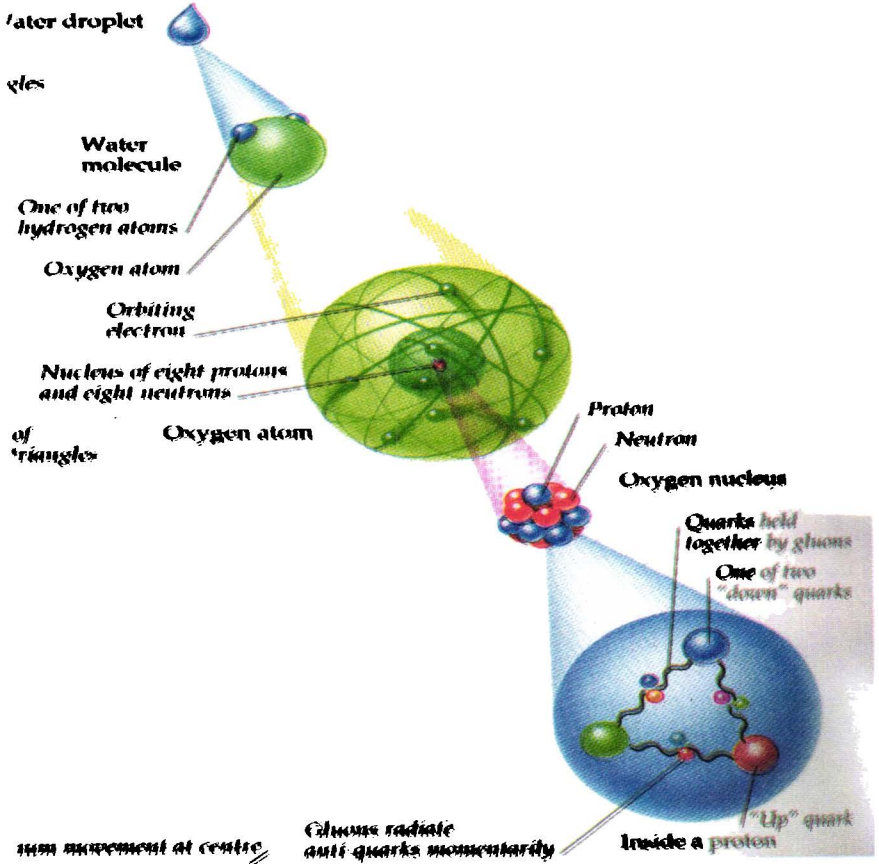
চিত্র -১৩০

" নিদর্শন (Sign) রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষন দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পূর্নর্জিবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।" (৪৫ ঃ ৫)

-- ওপরের ছবিতে একটি পানির ফোটাকে বিশ্লিষ্ট করে পর্যায়ক্রমে 'বিল্ডিং ব্লক' রূপী মৌলিক মহাসুক্ষ্ম কণিকা 'কোয়ার্ক' পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। আমরা সাধারণ চূড়ান্ত রূপ তথা Final product হিসেবে পানির ফোটা দর্শন করে থাকি মাত্র। কিন্তু যখন ল্যাবরেটরীতে পানির ফোটাকে তার মৌলিক উপাদান 'অক্সিজেন' ও 'হাইড্রোজেনে' বিভক্ত করে ফেলা হয়, তখন আর আমরা উহাদের দেখিনা, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পরমানুকে পরবর্তীতে বিভক্ত করে মৌলিক গঠন উপাদান 'কোয়ার্ক' পর্যায়ে নিয়ে গেলে দর্শন লাভ করার প্রশ্নই সম্পূর্ণরূপে অবান্তর হয়ে পড়ে। অথচ বাস্তবে মহাসুক্ষ্মতার 'কোয়ার্ক' জগত সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি যে কোয়ার্ক থেকে, মানবজাতি সেই 'কোয়ার্ক'কেই যেখানে দর্শন লাভ করতে সমর্থ নয়, সেখানে সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে কি করে দেখার জন্য জেদ ধরতে পারে?
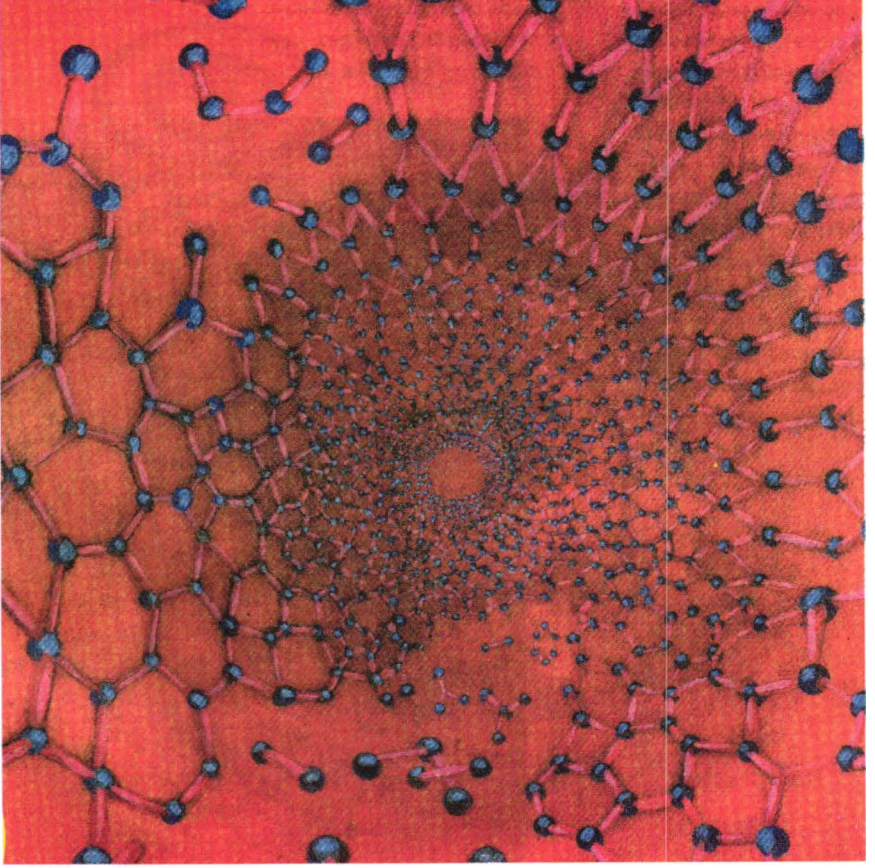
চিত্র -১৩১

" তুমি কি লক্ষ্য করনা উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন (Sign) সম্পকে বির্তক করে (স্পষ্টভাবে তাহারা দর্শন করিয়া বুঝিতে পারে যে এই গুলি মানুষের পক্ষে কক্ষনই সম্ভবপর নয়, তথাপি ও অযোক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেয়) ? কিভাবে ('প্রকৃতি' কিংবা 'নিজ' থেকেই হচ্ছে' এরূপ বিভ্রান্তমূলক উক্তি দ্বারা) উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে? ।" (৪০ : ৬৯)

-- আমাদের এই মহাবিশ্বে মৌলিক পদার্থের একই জাতিয় কোটি, কোটি, কোটি, 'পরমাণু' পরস্পর মিলিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট করা ধারাবাহিক পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে একক মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তার কেমিক্যাল বণ্ডের ছবি ওপরে প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিনা ঠিকই। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে, অদৃশ্য সেই 'পরমানু' জগতে এক মহাজ্ঞানী সত্ত্বার অদৃশ্য উপস্থিতি বিদ্যমান আছে, তা না হলে কিভাবে অদৃশ্য সেই মহাসুক্ষ্ম জগত শৃংখলার এক কঠিন নিয়ম-পদ্ধতি মেনে আশ্চর্য করার মত জ্ঞানময় কর্মকাণ্ড ও প্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছে? কে-ই বা এর পেছনে সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন যথাযথভাবেই সম্পাদন করছেন?

আল-কুরআন এ জাতিয় সকল অদৃশ্যজগত ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি ছোট্ট শব্দেই সকল প্রশ্নের উত্তর পেশ করেছে। ঘোষনা করেছে 'সকল দৃশ্য-অদৃশ্যের পেছনে মূল 'কর্তা' হচ্ছেন একমাত্র 'আল্লাহ্‌'। সুতরাং যারা অদৃশ্য জগতকে মেনে নিচ্ছে তাদের জন্য অদৃশ্য প্রভু 'আল্লাহ' কে মেনে নেয়া খুবই সহজ, মোটেই কষ্টকর নয়!
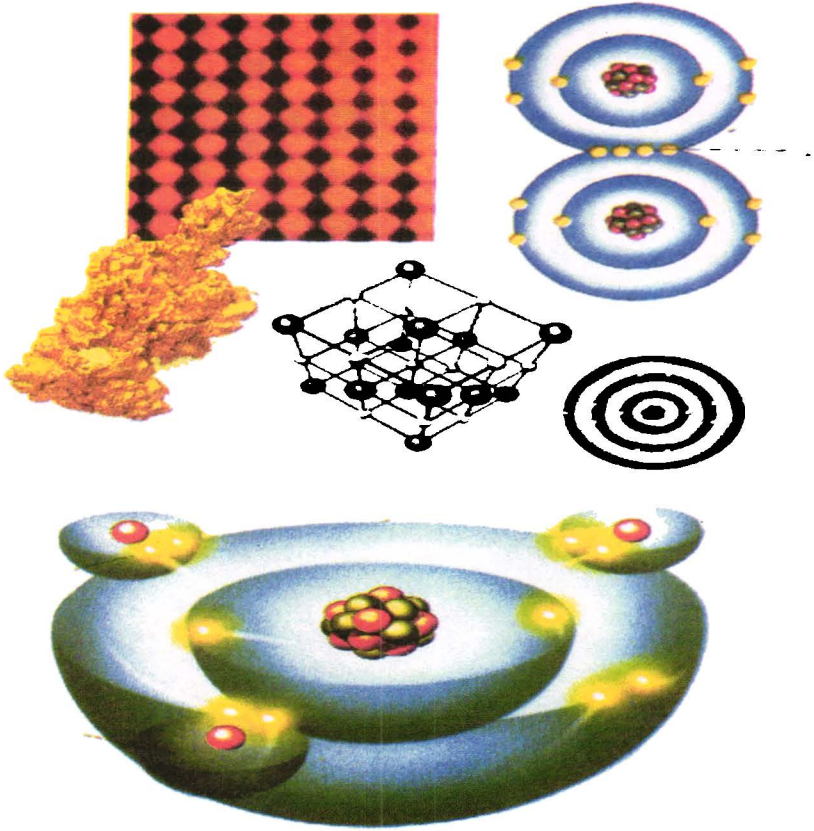
চিত্র -১৩২

" অনেক নিদর্শন রহিয়াছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যাহার উপর তাহারা চলাচল করিয়া থাকে (পায়ের তলার নীচে অনেক নিদর্শন সম্পন্ন বস্তু রহিয়াছে, যেগুলি নীরবে তাদের 'প্রভুর' পরিচয় তুলে ধরে) অথচ তাহারা উহার প্রতি (ঐ সকল নিদর্শনের প্রতি) মনোনিবেশ করে না।" (১২ ঃ ১০৫)

-- আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল প্রকার বস্তু এমনকি পায়ের নীচে মাটি, ধাতব পদার্থ, খনিজ পদার্থসহ সকল কিছুই অসংখ্য পরমানু পরস্পর মিলিত হয় প্রথমে অনু সৃষ্টি, পরে অসংখ্য 'অনু' পরস্পর মিলিত হয়ে বস্তুর আকৃতি ধারণ করেছে। ছবিতে কয়েকটি বস্তুর ঐ জাতিয় খণ্ডিত চিত্র এবং আনবিক কাঠামো (Atomic Structure) দেখানো হয়েছে। মহাবিশ্বে ভিত্তিমুলক অদৃশ্য জগতের 'কোয়ার্ক' পর্যায়ে, এ্যাটমিক নিউক্লি পর্যায়ে, পরমানু পর্যায়ে, এবং অনু পর্যায়ে নিয়ম-শৃংখলা, পদ্ধতি ও ক্রমের যে অতুলনীয় ব্যবস্থা আমরা বিজ্ঞানের অবদানে অবহিত হতে পেরেছি, তা থেকে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কি কখনও এ সিদ্ধান্ত দিতে পারে যে, এগুলো বিশৃংখলার ফল, কিংবা এগুলো এমনিতেই ঘটেছে, এবং ভবিষতেও ঘটবে? অজ্ঞ এবং পণ্ডিতের উত্তর যদি একই মানের হয় তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্যের কি প্রয়োজন পড়েছে?

Particles)-এর মাধ্যমে মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা সমূহকে গতিশীল করে প্রয়োজনীয় স্থানান্তর ঘটিয়ে থাকে। শক্তি দু'টির একটি হচ্ছে 'Electro Weak' যা 'ফোটন' কণিকা সমৃদ্ধ 'Electro magnetism' ও 'W'$^{\pm}$ এবং 'Z' কণিকা সমৃদ্ধ 'Weak force'-এর সমন্বয়। উল্লেখিত কণিকা 'ফোটন' (Photon) ও 'W'$^{\pm}$ এবং 'Z' নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকা-ই 'দূত কণিকা' (messenger particles) হিসেবে বস্তুকণিকা সমূহের স্থানান্তর ঘটিয়ে থাকে। অপর শক্তিটি হচ্ছে- 'কোয়ান্টাম ক্রোমো-ডায়নামিক্স (Quantum Chromodynamics), যা 'গ্লুওন' (Gluons) নামক মহাসূক্ষ্ম 'দূত কণিকা'-র মাধ্যমে শুধুমাত্র 'কোয়ার্ক' জগতেই 'আভ্যন্তরীণ প্রবল শক্তি' (Strong inter-quark force) হিসেবে কর্মতৎপর থাকে।

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ নামক উদ্‌ঘাটিত কণিকা সমূহের গঠনাকৃতি হচ্ছে-

'ফোটন' (Photon) less than quark

'কোয়ার্ক' (Quark) less than 10^{-20} m (10^{-18} in)

'প্রোটন' (Proton) less than 10^{-17} m (10^{-15} in)

'নিউট্রন' (Neutron) less than 10^{-17} m (10^{-15} in)

'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) less than 10^{-16} m (10^{-14} in)

'ইলেকট্রন' (Electron) less than 10^{-13} m (10^{-11} in)

'পরমাণু' (Atom) less than 10^{-10} m (10^{-8} in)

'অনু' (Moleculc) less than 10^{-9} m (10^{-7} in)

এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে আমরা অনু-পরমানুকে ক্ষুদ্র বললেও বাস্তবে কিন্তু তার চেয়েও বহু বহু ক্ষুদ্র বস্তুকনা মহাবিশ্বের ভিত্তিমূলে বিরাজমান আছে এবং ওরা প্রতিনিয়ত-ই কর্মতৎপর ।

সমগ্র মহাবিশ্বে যে ৪টি মূল শক্তি (Basic Four Force) সক্রিয়ভাবে তৎপর থেকে মহাবিশ্বটিকে সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে সুচারুরূপে পরিচালিত হতে সাহায্য করছে, আমরা এখন সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যৎসামান্য করে

হলেও আলোচনায় ব্রতী হতে চাই। কারণ এরাও নিজেদের মহাসুক্ষ্ম কণিকার মাধ্যমে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে চলেছে- যার কিছু কিছু ইতোমধ্যে আলোচনায় এসেছে। উক্ত আলোচনাতেও আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে যে অনু-পরমানু-ই বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ নয়; বরং তার চেয়েও আরও বহু ক্ষুদ্র কণিকা মহাবিশ্বে কর্মতৎপর রয়েছে।

১৯৩২ সাল পর্যন্ত মাত্র ২টি মৌলিক শক্তি (Two Basic Force) সম্পর্কেই মানবজাতি অবহিত হতে পেরেছিল। শক্তি দু'টি হচ্ছে-'মহাকর্ষ বল' (Gravity) এবং 'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি' (Electromagnetism) পরবর্তী সময়ে আরও দু'টি শক্তি আবিস্কৃত হয়ে মোট ৪টি মৌলিক শক্তি (Basic Four Force) আত্মপ্রকাশ লাভ করে। শক্তি চারটি হচ্ছে-

(১) মহাকর্ষ বল (Gravitational force)

(২) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি (Electromagnetic force)

(৩) প্রবল পারমানবিক শক্তি (Strong Nuclear force)

(৪) দূর্বল পারমানবিক শক্তি (Weak Nuclear forec)

'মহাকর্ষ বল' (Gravitational Force)-এর 'দূত কনিকা' (Messenger Particles) হচ্ছে- 'গ্র্যাভিটন' (Graviton), উক্ত মহাসুক্ষ্ম কণিকার মাধ্যমেই 'মহাকর্ষ বল' সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী সকল বস্তুর ওপর তার প্রভাব অক্ষুন্ন রেখে সবাইকে যেন 'মহাকর্ষ সুপের' মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। মহাবিশ্বের কোথাও এতটুকুন স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে 'মহাকর্ষের' প্রভাব নেই। মহাকর্ষ বলের 'গ্র্যাভিটন' নামক মহাসুক্ষ্ম কণিকার মাধ্যমেই প্রতিনিয়ত 'Space' তৈরী হচ্ছে এবং মহাবিশ্বটি চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে বর্ধিত হওয়ার সুযোগ লাভ করছে।

সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে 'অনু-পরমানুকে' বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু 'মহাকর্ষ বলের' দূত কনিকা 'গ্র্যাভিটন' তুলনামূলকভাবে তার চেয়েও বহু বহু গুণে ক্ষুদ্র এবং প্রায় ওজন শূন্য। উক্ত কণিকা সমূহ-ই তাদের তৎপরতার মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বকে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় ভারসাম্য সৃষ্টি করে টিকিয়ে রেখেছে।
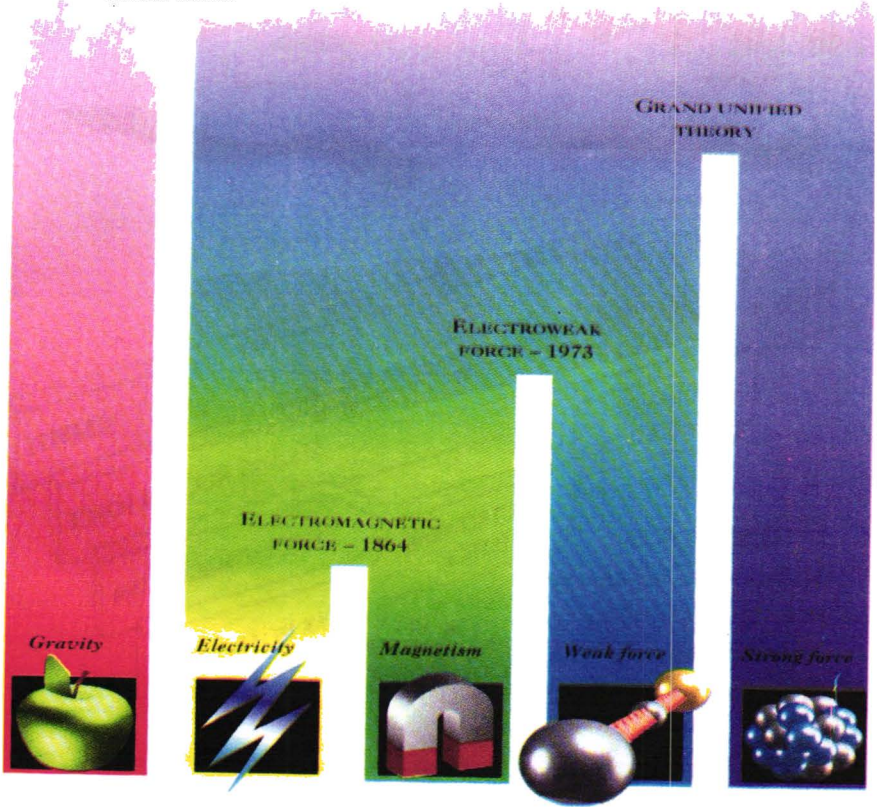
চিত্র -১৩৩

" আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) বাহিনীসমূহ (সকল প্রকার শক্তি) আল্লাহর-ই (অর্থাৎ তিনিই মালিক) এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৪৮ঃ ৪)

-- প্রায় শত বৎসরের চেয়ে বেশি সময় ধরে বিজ্ঞান বিশ্ব অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনা করে মহাবিশ্বব্যাপী ক্রিয়াশীল প্রধানতঃ মোট ৪টি মৌলিক শক্তিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। যে শক্তিগুলোর ওপর মহাবিশ্ব এবং এর সকল প্রকার বস্তুর সৃষ্টি, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, ধ্বংস ও সবার জন্য স্থান তৈরীসহ সব ধরনের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভৌতিক ও রাসায়ণিক বিক্রিয়া সমূহ সম্পূর্নরূপে নির্ভরশীল।

উক্ত ৪টি মৌলিক শক্তির আওতামুক্ত এক ইঞ্চি স্থানও সমগ্র মহাবিশ্বের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পদার্থ এবং উল্লেখিত ৪টি মৌলিক শক্তি দিয়ে মহাবিশ্বটি ঠাসাবস্থায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কুরআন দাবী করেছে মহাবিশ্বে যত প্রকার শক্তি কার্যরত আছে সবই আল্লাহ্ তায়ালার। 'আল্লাহ' যদি সত্য না হবেন তাহলে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই কিভাবে এ বিষয়ে যথার্থভাবে দাবী তুলতে পারেন ?
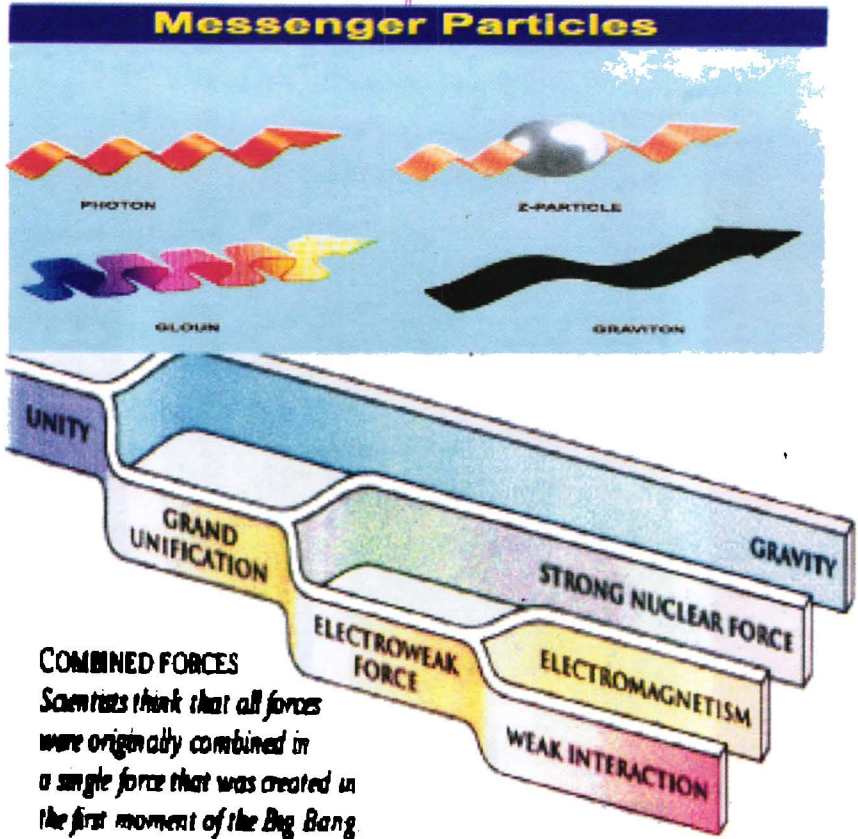
চিত্র -১৩৪

" কেহ শক্তি ক্ষমতা চাইলে সে জানিয়া রাখুক, সকল প্রকার শক্তি-ক্ষমতা তো আল্লাহর-ই (তিনিই সমস্ত শক্তির স্রষ্টা, পরিচালনাকারী ও সুষ্টুভাবে নিয়ন্ত্রনকারী এ মহাবিশ্বে)।" (৩৫ ঃ ১০)

-- বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব মহাবিশ্বের সর্বত্র ক্রিয়াশীল মৌলিক ৪টি শক্তিকে দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত করায় 'মহাসত্যকে' প্রাপ্তির পথে মানবজাতিকে আরও একধাপ অগ্রসর করে দিয়েছে। মৌলিক ৪টি শক্তির চার প্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকা রয়েছে, যে কণিকা গুলো 'দূত' (Messenger) কণিকারূপে মহাবিশ্বের সর্বত্র সার্বক্ষণিক কর্মরত থাকার কারণে শক্তি ৪টি তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে, 'দূত' কণিকা গুলো হচ্ছে- যথাক্রমে- (১) Graviton (২) Photon (৩) Gluon ও (৪) W^+, W^- ও Z Particles.

'আল্-কুরআন' বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই উল্লেখিত সকল শক্তির উৎস যে একমাত্র 'আল্লাহ্' তা পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান তার "Grand Unification" এর মাধ্যমে কি সেই আল্লাহমূখী যাত্রা শুরু করেনি ? এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক।

'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি' (Electromagnetic Force) মহাবিশ্বে ৪টি মৌলিক শক্তির মধ্যে একটি অন্যতম শক্তি। এই শক্তির 'দূত কণিকা' (Messenger Particles) হচ্ছে- 'ফোটন' (Photon) কণিকা। এরা (প্রায়) ওজনশূন্য এবং আলোর গতিতে ভ্রমণ করে। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তিটি বস্তুর পরমাণু জগতে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকাসমূহকে আবদ্ধ করে রাখে। আবার পরমাণুর সাথে পরমাণুর বন্ধন রচনা করে 'অনু' (Molecule)-র সৃষ্টি করে থাকে। যদিও কেউ জানে না বৈদ্যুতিক চার্জ বলতে প্রকৃত পক্ষে কি বুঝায়? (No one knows quite what electrical charge is?) কিন্তু এটা অনুভব করে যে, এই বিষয়ে 'ফোটন' (Photon) কণিকার মূল কাজ হচ্ছে 'শক্তি' (Energy) বহন করা এবং যে কোন চার্জযুক্ত বস্তুর চতুর্দিকে বিদ্যুৎ-চুম্বক 'ক্ষেত্র' সৃষ্টি করা, যেন ঐ বস্তু বা বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

এখানেও আমরা দেখতে পেলাম বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তির (Electromagnetic Force) 'দূত কণিকা' নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'ফোটন' এত ক্ষুদ্র যে, ওর কোন ওজন নেই। আর সে কারণে অনু-পরমানুর সাথে 'ফোটন' কণিকার আকৃতিগত কোন তুলনাই হতে পারে না। ফলে বোঝা গেল 'অনু-পরমানুর' চেয়েও বহু বহু ক্ষুদ্র জগতের বাসিন্দা হচ্ছে 'ফোটন' (Photon) কণিকাসমূহ। বিজ্ঞান জগতের এই তথ্যসমূহ আবিষ্কার সত্যি-ই প্রশংসার দাবী রাখে। পূর্বে এগুলো চিন্তাও করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

'প্রবল পারমাণবিক শক্তি' (Strong Nuclear Force)-র 'দূত কণিকা' হচ্ছে- 'গ্লুওন' (Gluon)। এই 'গ্লুওন' নামক এক প্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহ 'Binding Energy' রূপে তিন-তিনটি 'কোয়ার্ক' (Quark)কে পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করায়ে 'প্রোটন (Proton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) নামক পারমাণবিক কণিকা (Nuclear Particles) সৃষ্টি হতে সাহায্য করে। আবার পরমাণুর ভিতর পজেটিভ

চিত্র -১৩৬

" এবং (শপথ তাহাদের) যাহারা তীব্রগতিতে (মহাবিশ্বব্যাপী) সন্তরন করে" (৭৯ : ৩)

-- Big Bang মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে নবীন মহাবিশ্বে প্রথম আবিভূত হয় সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন আলোর কণা 'ফোটন' (Highest Energetic Radiation Particles 'Photon')। এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'ফোটন' কণিকা থেকে পরবর্তীতে সকল প্রকার পদার্থ কণিকা এবং সকল প্রকার শক্তির 'দূত' কণিকা (Messenger Particles) আত্নপ্রকাশ লাভ করেছে। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তির (Electromagnetic Forc) 'দূত' কণিকাও হচ্ছে- এক প্রকার 'ফোটন' কণিকা তবে তুলনামূলক কম তাপীয় অবস্থা সম্পন্ন। উক্ত 'ফোটন' কণিকা আলোর গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল বেগে কার্য সম্পাদন করে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তির প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছে। মৌলিক ৪টি শক্তির একটি শক্তি হিসেবে এই শক্তিটিও আলোর গতির বিলিয়ন বিলিয়ন গুন বেশি গতিতে সমগ্র মহাবিশ্বে সমভাবে বিরাজমান আছে। এর অনুপস্থিতিতে মহাবিশ্বে সকল বস্তুই অস্থিত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। প্রশ্ন হচ্ছে-সরাসরি চোখে দেখতে না পেয়েও যদি মহাবিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তিকে বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এর স্রষ্টা অদৃশ্য মহান 'আল্লাহ্'কে কেন বিশ্বাস করা যাবে না ?
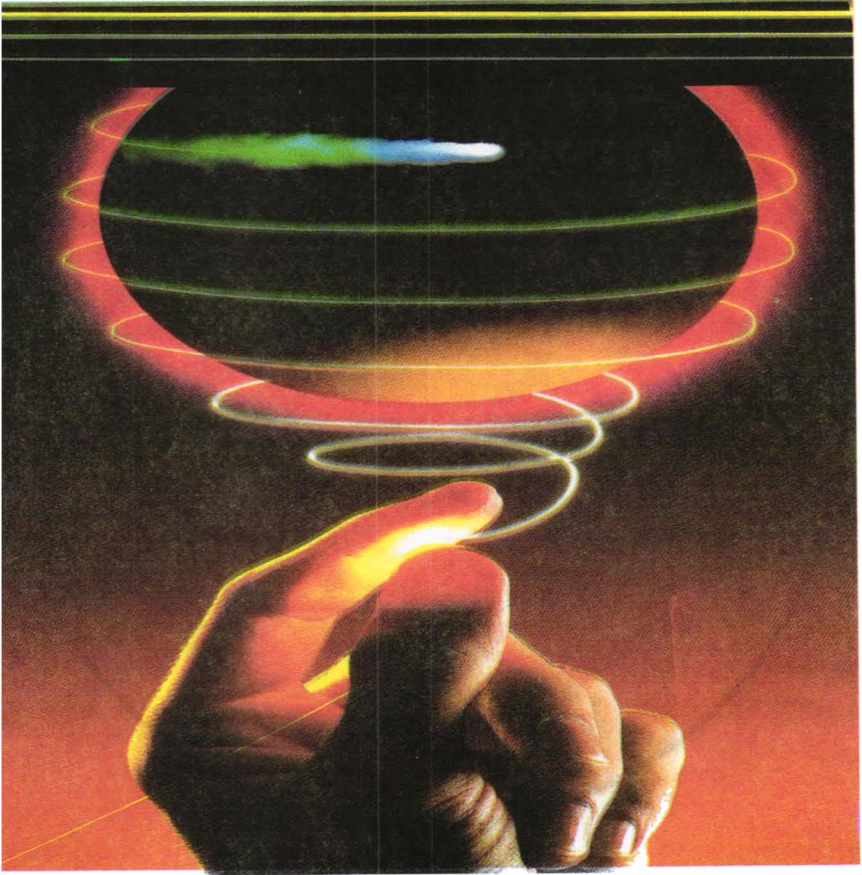
চিত্র -১৩৭

" আমার আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায়, একবার ব্যতীত নহে"। (৫৪ ঃ ৫০)

" এই গুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

-- মৌলিক ৪টি শক্তির অন্যতম শক্তি হচ্ছে 'বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি' (Electromagnetic Force)। এই শক্তিটি সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী শব্দ এবং ছবি বহন করার সাথে সাথে বস্তুর মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগতে বৈদ্যুতিক চার্জ-এর প্রভাব সৃষ্টি করে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি উদ্ভব ঘটায়ে থাকে। পরমানুর অভ্যন্তরে উপ-আনবিক কণিকা 'প্রোটন'কে পজেটিভ চার্জ, 'ইলেকট্রন'কে নেগেটিভ চার্জযুক্ত রাখা এবং পরস্পরকে সে কারনে আকর্ষণ শক্তির মধ্যে বেঁধে রাখা উক্ত শক্তির-ই কাজ। আলোর গতিতে শক্তিটি পরিভ্রমণের কারণে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫,০০০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট এই পৃথিবীকে অন্ততঃ সাতবার প্রদক্ষিণ করে থাকে। যে কারণে পৃথিবীর যে কোন স্থানে শব্দ এবং চবি সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে।

'বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তির' উল্লেখিত দ্রুত গতি সম্পন্ন কণিকাকে না দেখেও যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে আপত্তি থাকবে কেন ?

চার্জযুক্ত একাধিক 'প্রোটন' (Proton) কণিকাদের পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করায়ে পৃথিবীর পদার্থ বিজ্ঞানের আইনকে অমান্য করে প্রবল বিকর্ষণের প্রাদুর্ভার ঘটায়ে যে [illegible] বস্তুর প্রধান অংশ পরমানুর 'নিউক্লিয়াস' গঠনে এক যাদুময়ী অবস্থার সৃষ্টি করে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে অতুলনীয় অবদান রেখে চলেছে।

বিজ্ঞানীগণ মনে করছেন 'গ্লুওন' (Gluon) নামক Colour Force মহাবিশ্বে কোয়ার্কদেরকে এমন মজবুতভাবে বেঁধে রাখে যে, এককভাবে কোয়ার্কদের অবস্থান গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব নয় এবং সে কারণেই অতীতে একক 'কোয়ার্ক'-কে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হয়তোবা সম্ভব হবে না।

১৯৭৯ সালে হংকং এর 'Sau-lan-wu' পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ-এ অবস্থিত 'Electron positron collider'-এ সর্বপ্রথম Three-Jet pattern কে সনাক্ত করে এদের একটি Jet যে Binding Particles হিসেবে 'গ্লুওন' (Gluon) নির্গত হচ্ছে তা আবিষ্কার করেন। ফলে 'গ্লুওন'-এর উপস্থিতি বাস্তবভাবে প্রমানিত হওয়ায় বিজ্ঞান বিশ্ব তা নীতিগতভাবেই মেনে নেয়।

এই আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে আবারও প্রমানীত হল অণু-পরমাণু অপেক্ষাও আরও বহু ক্ষুদ্রজগতের অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বে বিরাজমান আছে।

Nuclear Binding Energy সম্পর্কে আরও একটি প্রস্তাব জাপানে ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী 'Hideki Yukawa' কর্তৃক উত্থাপিত হয়। তার প্রস্তাব অনুযায়ী পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকাদ্বয়ের মাঝে 'Pi-meson বা Pion' নামে একপ্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'দূত কণিকা' (Messenger Particles) রূপে কাজ করছে। এই 'Meson' কণিকাগুলো চার্জযুক্ত হওয়ার কারণে প্রতিমূহূর্তে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনের চার্জ বদল করে ওদেরকে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী 'Cecil Frank Powell' কসমিক বেলুনকে ১১২০০ ফুট ওপরে উঠায়ে পরীক্ষনের মাধ্যমে উক্ত 'Meson' কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। 'মেসন'
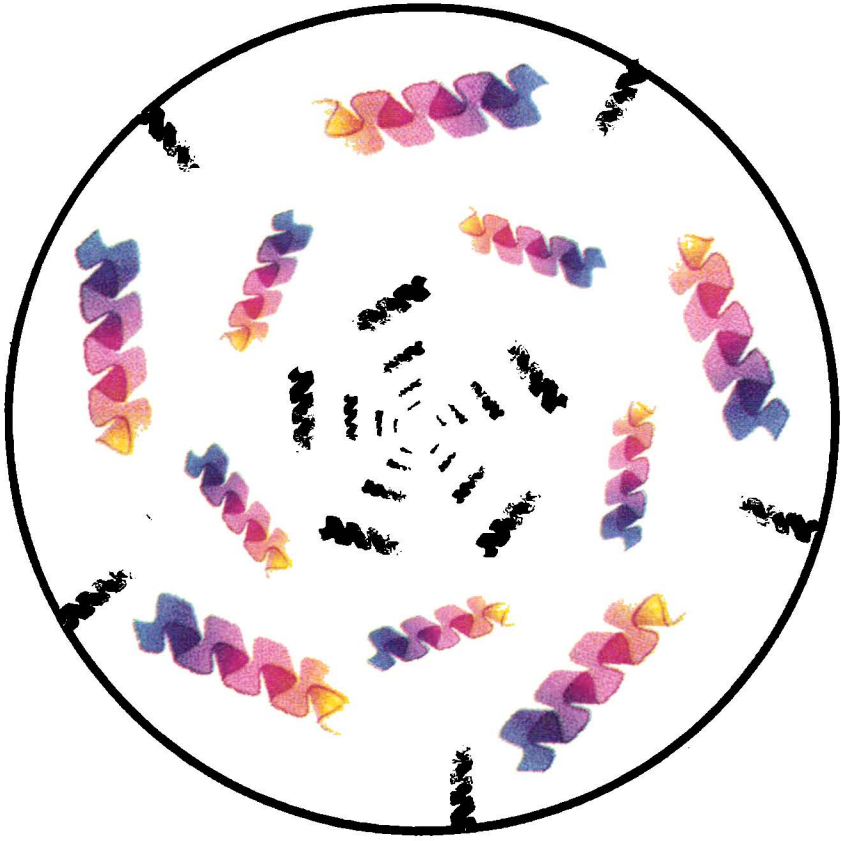
চিত্র -১৩৮

"এবং (শপথ তাহাদের) যাহারা অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় (সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী)।" (৭৯ ঃ ৪)

"প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে।" (৩৯ ঃ ৫৯)

-- আমাদের মহাবিশ্বে মৌলিক প্রধান ৪টি শক্তির মধ্যে 'সবল নিউক্লিয় শক্তি' (Strong Nuclear Force) ও একটি। এ শক্তির 'দূত' কণিকা হচ্ছে 'গ্লুওন' (Gluon) নামক এক প্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকা। এই কণিকাগুলো সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী নূন্যতম আলোর গতিতে এবং প্রয়োজনে মিলিয়ন-মিলিয়ন গুণ বেশি দ্রুত গতিতে বিচরণ করে থাকে। 'গ্লুওন' কণিকার প্রধান কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে- 'কোয়ার্ক' জগত উক্ত কণিকাগুলো একাধিক কোয়ার্কের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়ে জোড়া লাগাবার কাজ করে থাকে। এই কণিকাগুলো রং বদল করে পদার্থের গুণাগুন পরিবর্তন করে থাকে। 'গ্লুওন' কণিকা দৃষ্টি শক্তি দিয়ে দর্শন করা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন পরীক্ষণের ভেতর দিয়ে বিশ্বাস করা হয়। অথচ 'গ্লুওন' (Gloun) কণিকার স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে মহাবিস্ময়কর অসংখ্য কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে অনুভব করা গেলেও শুধুমাত্র অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করা হচ্ছে। এটা মূলতঃই আত্ম প্রবঞ্চনার শামিল নয় কী ?

চিত্র -১৩৯

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে (অনুরূপ যিনি [illegible]) শীঘ্রই, তোমরা অবহিত হইবে।" (৬ : ৬৭) -- ১৯৭৯ সালে হংকং-এর বিজ্ঞানী Sau-lan [illegible] জার্মানীতে অবস্থিত 'Electron-Positron Collider'-এ সর্বপ্রথম Three Jet pattern-কে লক্ষ্য করে এর একটি Jet কে binding particles হিসেবে 'গ্লুওন' (Gluon) চিহ্নিত করেন ও আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেন। এক মুহূর্তের জন্য 'গ্লুওন' কণিকার উপস্থিতি না থাকলে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সকল প্রকার দৃশ্যমান বস্তুই বর্তমান আকৃতির বাইরে চলে যাবে। বাইন্ডিং এজেন্টরূপে 'গ্লুওন' না থাকলে কোয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা অস্তিত্ব হারাবে ফলে পরমাণু (atom) বিপর্যস্ত হবে। ফলে 'অণু'ও থাকবে না। আর 'অণু' না থাকলে মহাবিশ্বে কোন প্রকার বস্তুরও চিহ্ন থাকবে না। অর্থাৎ তখন মহাবিশ্বটি শুধু কোয়ার্ক, ইলেকট্রন ও ফোটন কণার মহাসাগরে পরিণত হবে। বর্তমান অস্তিত্ব থেকে হারিয়ে যাবে মহাবিশ্বটি। উল্লেখিত গ্লুওন-এর আবিষ্কার বিজ্ঞান বিশ্বে একেবারে হঠাৎ করেই ঘটেছে। এতে কুরআনের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে- যেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালাই নিজ ইচ্ছায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অবহিত করেন তাঁর নিদর্শন মানব সমাজকে, যেন এর ভেতর দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। অনুরূপ জ্ঞানের এ সকল সমাহার যেন কেবল তাঁর উপস্থিতি-ই প্রমাণ করে।
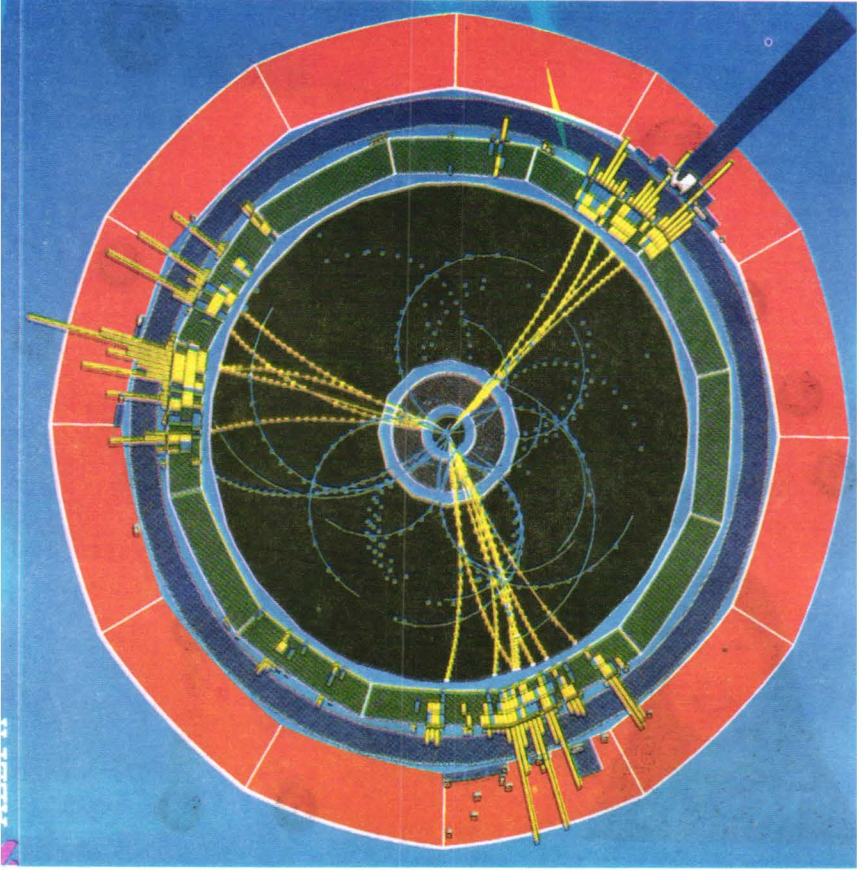
চিত্র -১৪০

"ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে (পরম স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্‌র) প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" (১৪ : ৫)

--ইউরোপীয় Electron-Positron Collider তথা CERN-এর LEP Electron-Positron ring-এ সংঘটিত Collision-এ উৎপন্ন দৃশ্যমান ৩টি জেট-এর একটি হচ্ছে (বামদিকের নিম্নমূখী জেটটি) 'গ্লুওন' পার্টিক্যালস জেট। এতে বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়েছে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে- 'সবল নিউক্লিয় শক্তির' (Strong Nuclear Force) যেমন সত্য তেমনি এই শক্তির দূত কণিকা অদৃশ্য প্রায় 'গ্লুওন' এর অস্তিত্বও সত্য ঘটনা।

সুতরাংএকমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহ্'কে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করে আবার তাঁরই এক 'সৃষ্টি' সবল নিউক্লিয় শক্তি ও তার মহাসূক্ষ্ম কণিকা অদৃশ্য 'গ্লুওন' কে স্বীকার করে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ জ্ঞানীদের জন্য মোটেই শোভনীয় হতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানীদের নিজ স্বার্থেই এ জাতিয় হঠকারীতা পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। 'যা দেখিনা তা মানিনা' অবৈজ্ঞানিক কথা সর্বস্ব সাইনবোর্ডটি বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞান প্রচণ্ড আঘাতে গুড়িয়ে দিয়েছে। জ্ঞানীজন বিষয়টি ভেবে দেখবেন কী?
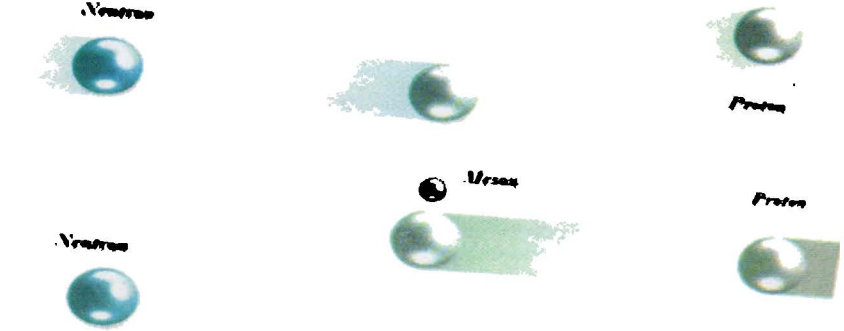
চিত্র -১৪১

" যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বিদ্যমান থাকার চিহ্ন) বিশ্বাস করে না, তাহারাতো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারা নিজেরাই মিথ্যাবাদী।" (১৬ ঃ ১০৫)

-- Nuclear Binding Energy সম্পর্কে পূর্বে ১৯৩৪ সালে জাপানী বিজ্ঞানী 'Hideki Yukawa' উত্থাপন করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেন পরমানুর নিউক্লিয়াসে 'প্রোটন, ও 'নিউট্রন' কণিকাদের মধ্যে একপ্রকার বৈদ্যুতিক চার্জ বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরকে আকর্ষন করে ধরে রেখে 'নিউক্লিয়াস' রূপ দিয়ে থাকে। এই কণিকা গুলোকে তিনি 'Meson' নামে অভিহিত করেন। পরে ১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী 'Cecil Frank Powell' কসমিক বেলুনের মাধ্যমে এই দূত কণিকা 'Meson' এর অস্থিত্ব আবিষ্কার করে প্রমানিত করেন।

-এ ঘটনার মধ্য দিয়েও একই সাথে ২টি বিষয় স্পষ্ট আলোতে বেরিয়ে আসে। একটি হলো কুরআনের দাবী অনুযায়ী অনু-পরমানু অপেক্ষাও মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণা এ মহাবিশ্বে বিরাজমান আছে, যদিও তা অদৃশ্য। অপরটি হচ্ছে-আল্লাহ্‌ অদৃশ্য বলে তাকে অস্বীকার করা যাবে না। প্রমানিত অন্যান্য অদৃশ্য বস্তুর ন্যায় তাঁর পবিত্র 'সত্ত্বার' অদৃশ্য উপস্থিতিকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

চিত্র -১৪২

" যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে (আল্লাহর উপস্থিতির পরোক্ষ চিহ্ন গুলোকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেও) প্রত্যাখ্যান করে ও (এর পরিনতি স্বরূপ) নিজদিগের প্রতি জুলুম করে, তাহাদিগের অবস্থা কত মন্দ।" (৭ ঃ ১৭৭)

-- জাপানী বিজ্ঞানী 'Hideki Yukawa-র প্রস্তাবকৃত 'Meson' তত্ত্ব প্রমাণের নিমিত্তে 'Bristol University'-র পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর (ছবিতে বাম দিক থেকে তৃতীয়) 'Cecil Frank Powell' ১৯৪৭ সালে 'Photographic Plate' তৈরী করে হাইড্রোজেন বেলুনে পুরে প্রায় ১১.২০০ ফুট উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে পাঠিয়ে ছিলেন। Photographic Plate টি Cosmic Particlesএর মধ্যে 'Meson' নামক অদৃশ্য প্রায় মহাসুক্ষ্ম কণিকাসমূহ সনাক্ত করতে সক্ষম হওয়ার পেক্ষাপটে সমগ্র বিজ্ঞান বিশ্ব 'Meson' তত্ত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

উল্লেখিত ঘটনার মধ্য দিয়েও অনু-পরমানু অপেক্ষা আরও বহু বহু গুনে ক্ষুদ্র অদৃশ্য প্রায় মহাসুক্ষ্ম বস্তু কণিকার উপস্থিতি প্রমানিত হয়। সুতরাং প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন এ তথ্য সরবরাহ করে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে এক দিকে যেমন নিজকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্টিত করেছে অপর দিকে এ সব কিছুর পেছনে যে মহান 'আল্লাহ্' মহাসত্যরূপে বিদ্যমান আছেন অন্যান্য অদৃশ্য বস্তুর ন্যায়, সে যুক্তিকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাড় করিয়ে গেছে। বিষয়টি একশতভাগ সত্য নয় কী ?

(Meson) কণিকার কাজই হচ্ছে পরমাণুর অভ্যন্তরে পারমাণবিক কণিকা 'প্রোটন' ও 'নিউট্রনের' মাঝে Binding Energy রূপে কাজ করা। উল্লেখিত আবিষ্কারের ভেতর দিয়েও মহাসূক্ষ্ম কণিকার অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে, যে কণিকাগুলো অনু-পরমানু অপেক্ষা বহু বহু গুণে ক্ষুদ্র।

সুতরাং অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা সম্পর্কে 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞানের' প্রমানিত বক্তব্যের মাঝে কোন অভিন্নতা না থাকায় 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' এক মহাসত্যতায় বিশ্ব-ব্যাপী উজ্জল আলো ছড়িয়ে আজকে উদ্ভাসিত।

'Weak Nuclear Force' সাধারণতঃ খুবই সুক্ষ্মভাবে বস্তুর পারমাণবিক জগতে তথা 'পরমাণুর' অভ্যন্তরে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের স্বল্প পরিসরে নিজ কর্মতৎপরতা চালিয়ে থাকে। এই দূর্বল পারমাণবিক শক্তির দূত কণিকা হিসেবে কাজ করে থাকে দু'ধরনের মহাসূক্ষ্ম কণিকা, যথা (W^+, W^-) ও 'Z' নামক Particles বা কণিকাসমূহ।

'W^{+}' কণিকা কাজ করে Positive Charge যুক্ত পারমাণবিক কণিকার ওপর, 'W^{-}' কণিকা কাজ করে থাকে Negative Charge যুক্ত কণিকার ওপর এবং 'Z' কণিকা কাজ চার্জবিহীন পারমাণবিক কণিকার ওপর।

'দূর্বল ·পারমানবিক শক্তি' (Weak Nuclear Force) পরমাণুর নিউক্লিয়াসে (Necleus) 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকাসমূহের আভ্যন্তরীণ কোয়ার্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে ওদের মূল অস্তিত্ব-ই পরিবর্তন করে ফেলে। যেমন 'নিউট্রন ডিকে'-র (Neutron decay) মাধ্যমে নিউট্রন কণিকাকে বিবর্তন করে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি 'নিউট্রিনো (Neutrino)-তে রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে। এতে মূল 'নিউট্রন' কণিকাটি সম্পুর্ণরূপে বিলোপ সাধন ঘটে থাকে। উল্লেখিত পদ্ধতিতে খুবই স্বল্প পরিসরে এবং খুবই চতুরতার সাথে নীরবে 'দূর্বল পারমাণবিক শক্তি' মহাবিশ্বে বস্তুর ধ্বংস সাধন ঘটিয়ে চলেছে।
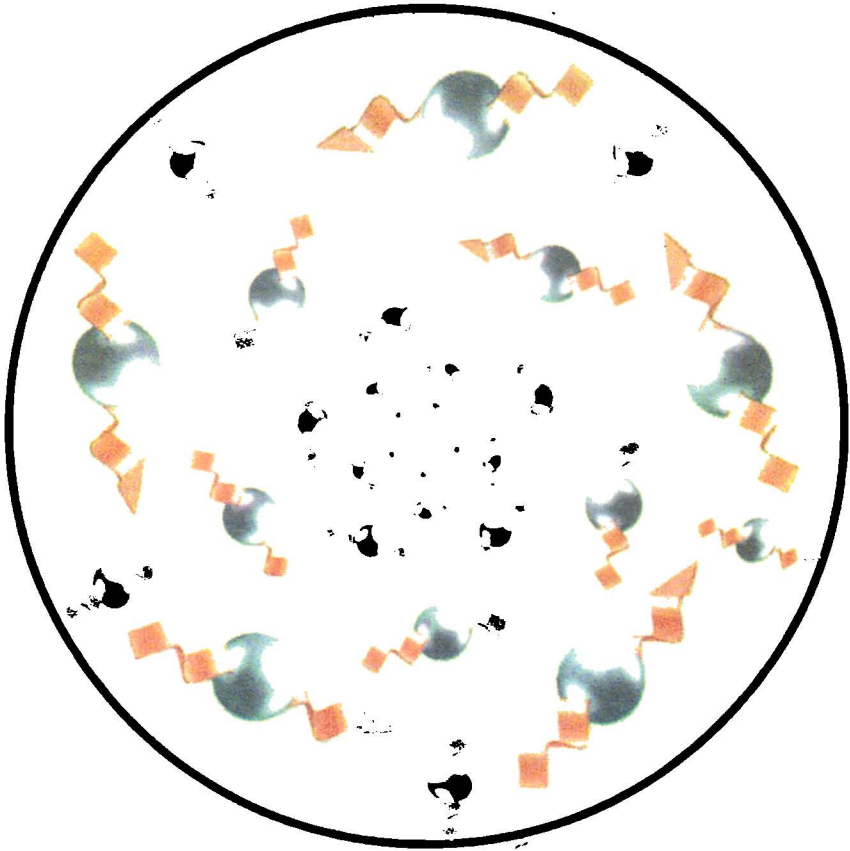
চিত্র -১৪৩

" আমি শপথ করিতেছি তাহাদের, যাহারা (পরমানু ও কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে উপাদান সমূহের) মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়।" (৭৯ ঃ ২)

-- মহাবিশ্বে কার্যরত প্রধান ৪টি মৌলিক শক্তির সর্বশেষ শক্তিটি হচ্ছে-'দূর্বল নিউক্লিও শক্তি' (Weak Nuclear Force)। এর 'দূত' কণিকা হচ্ছে যথাক্রমে- W^+, W^- ও Z. নামক মহাসুক্ষ্ম কণিকা সমূহ। 'দূর্বল' নিউক্লিয় শক্তি' কণিকা সমূহ 'পরমানু' (Atom) জগতে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণিকাদের এবং সেল (Call) জগতে কেন্দ্রিয় নিউক্লিয়াসে ওদের আন্তঃগঠন কাঠামোকে (কোয়ার্ক জগতকে) পরিবর্তন ঘটিয়ে মূল অস্তিত্ব-কেই বিপন্ন ও বিপযস্ত করে তোলে। ফলে পরমাণুর অস্থিত্ব বিপন্ন হয়ে পদার্থের এবং সেল বা কোষের অস্থিত্ব বিপন্ন করে নীরবে প্রানের ধ্বংস সাধন করে থাকে। উল্লেখিত শক্তিটি দূত কণিকার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব জাহানব্যাপী উপস্থিতি বজায় রেখে ধ্বংস সাধন মূলক কাজগুলোকে যথাসময়ে সম্পাদন করে চলেছে। এখন কথা হচ্ছে-'আল্লাহ্' যদি সত্য না হবেন, 'কুরআন' যদি সত্য কিতাব না হবে, তাহলে বিজ্ঞানের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ওপরে উদৃত ঐশী বাণীটি কিভাবে পেশ করে মানবীয় চিন্তার রাজ্যকে দোলা দিয়ে যেতে পারে? এগুলোই প্রমাণ যে, 'আল্লাহ্' সত্য।
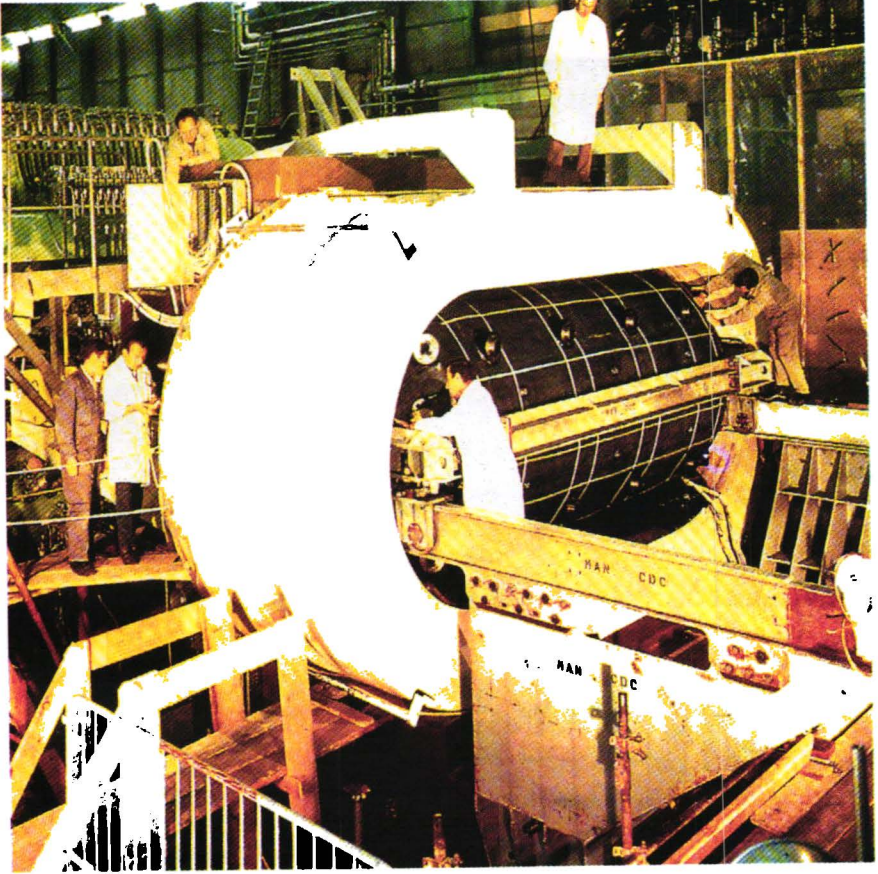
চিত্র -১৪৪

" আর যখনই উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর (যে নিদর্শন গুলোতে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি প্রতীয়মান হয়) কোন নিদর্শন (Sign) উহাদিগের নিকট আসে তখনই উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় (মনে হয় যেন তাহারা উহা দেখে-ই নাই)।" (৩৬ ঃ ৪৬)

-- ১৯৩৪ সালে সর্বপ্রথম Weak Nuclear Force সম্পর্কে মানবজাতি অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। উক্ত মৌলিক শক্তির দূত কণিকাসমূহ হচ্ছে W^+, W^-, ও Z. কণিকা। কণিকাসমূহ তুলনামূলক ভাবে ভারী এবং পরমানুর অভ্যন্তরে স্বল্প দূরত্বের মধ্যেই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। পজেটিভ চার্জযুক্ত শক্তি 'W^+' কণিকার মাধ্যমে 'প্রোটন' কণিকার ওপর কাজ করে থাকে। নেগেটিভ চার্জযুক্ত শক্তি 'W^-' কণিকার মাধ্যমে 'নিউট্রন' কণিকার ওপর কাজ করে থাকে। আর নিউট্রাল চার্জ 'Z' কণিকার মাধ্যমে 'ইলেকট্রন' কণিকার ওপর কাজ করে থাকে। ওপরের ছবিতে ইউরোপীয় Electron-Positron Collider-এর CERN সাইডে একটি বৃহৎ Bubble Chamber প্রস্তুত করতে দেখা যাচ্ছে। চেম্বারটি পাঁচ মিটার লম্বা, পঁচিশ টন ওজন এবং আঠার টন 'তরল ফ্রিওন' ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। এ চেম্বারটিতেই ১৯৭৩ সালে নিউট্রাল কারেন্টের উপস্থিতি এবং এর দূত কণিকা রূপে 'Z' কণিকা আবিষ্কৃত হয়। এতে প্রমাণিত হয় কুরআনের দাবী অনুযারী অনু-পরমানুর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য জগত বিদ্যমান আছে।
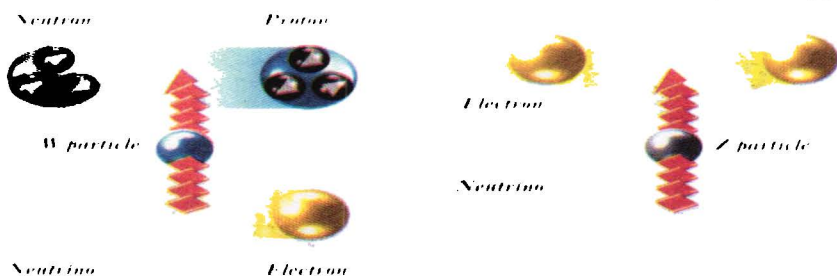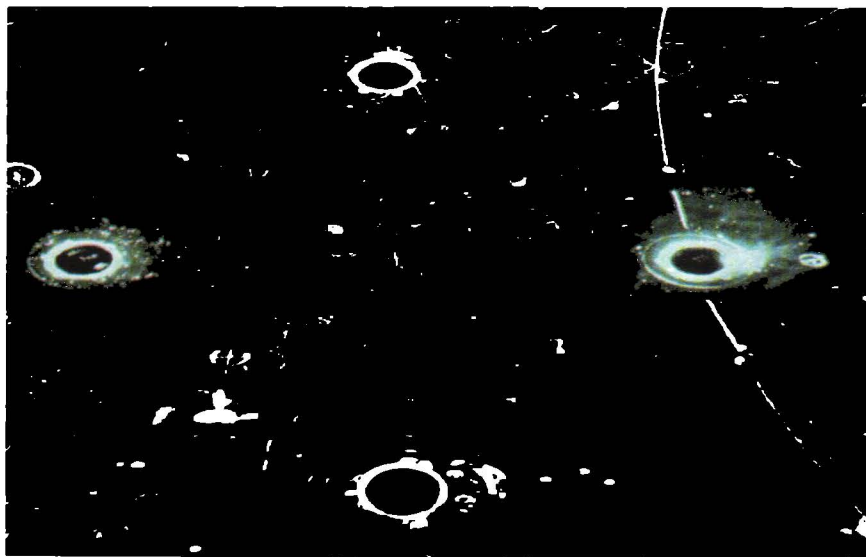
Neutron
Proton
Electron
W particle
Z particle
Neutrino
Neutrino
Electron
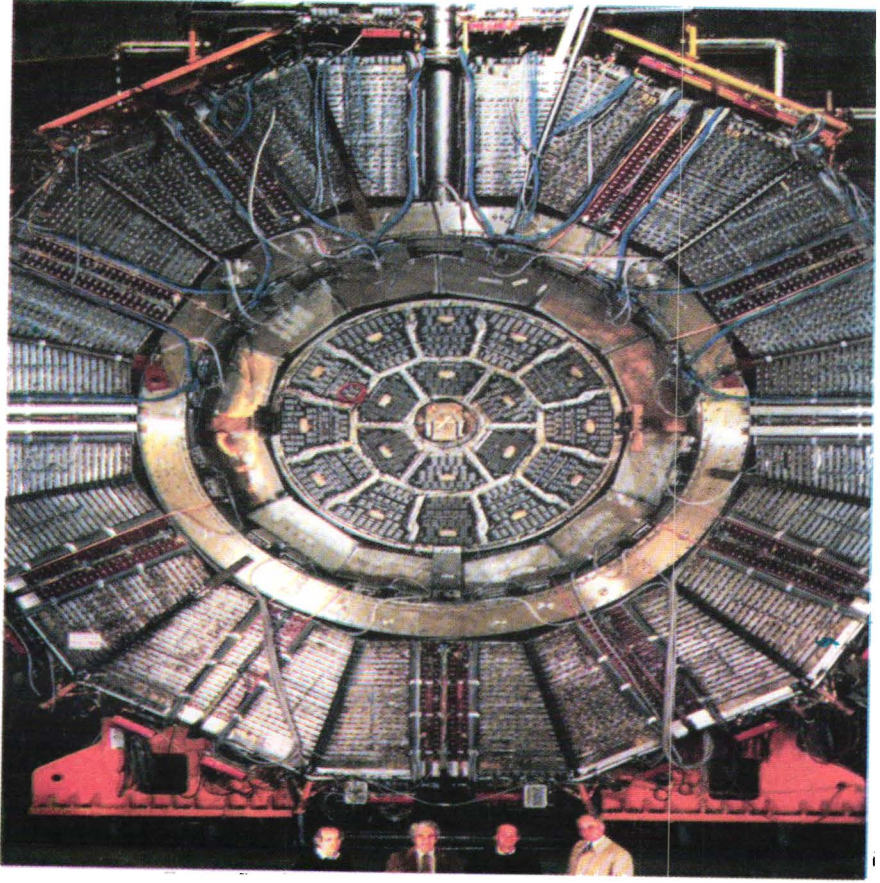
চিত্র -১৪৬

"আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে (স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিবার পরও) তাহারা জানিয়া রাখুক যে তাহাদিগের কোন নিস্কৃত নাই।" (৪২ ঃ ৩৫)

-- ইউরোপীয় Particles Collider-এর 'LEP' সাইডে অবস্থিত 'ALEPH- detector' দেখা যাচ্ছে। যেখানে প্রোটন ও এ্যান্টিপ্রোটনের মাঝে Collision ঘটিয়ে মৌলিক ৪টি শক্তির মহাসূক্ষ্ম দূত কণিকাদের উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ড সনাক্ত করা হয়। বর্তমান সময়ে detectorটি উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠায় স্বল্প সময়ে অনেক তথ্য খুবই সহজভাবে উপস্থাপনে সক্ষম। মূলতঃ বিশ্বব্যাপী 'পার্টিক্যালস্ ডিটেকটর'গুলো অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগতের ওপর থেকে আবরণ সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের' পবিত্র 'সত্ত্বা'কেও অদৃশ্য থেকে উজ্জল আলোকময় পরিবেশে সগৌরবে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তাঁকে না দেখার ভান করে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে এখন আর অস্বীকার করা যাবে না। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করার জন্যই তিনি নিজে অদৃশ্যে অবস্থান গ্রহণ করে মহাবিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অদৃশ্যে স্থাপন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার অর্থ-ই হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করার শামিল।

চিত্র -১৪৭

"আল্লাহরই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) বাহিনীসমূহ (সকল প্রকার শক্তিসমূহ)। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৮ : ৭)

-- ওপরের ছবিতে ১৯৯২ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী 'Georges Charpak'-এর ছবি এবং ALEP-Detector-এ সংঘটিত Proton- Anti Proton collision-এ সৃষ্ট 'Z' Particles -এর উপস্থিতির Electron Computer image দেখানো হয়েছে। ছবির কেন্দ্রে 'Z particles' সৃষ্টি থেকে বিজ্ঞানীগণ ওদের যথাযথভাবে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। কণা পদার্থ বিজ্ঞানী 'জর্জ চারপাক' উল্লেখিত 'Electronic Detector' উদ্ভাবক হিসেবেই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

বর্তমান বিজ্ঞানের সার্বিক অগ্রগতির অবস্থা এবং প্রতিদিনের নিত্য-নতুন আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনের ধরণ ও কৌশল দেখে মনে হচ্ছে যেন- মানবজাতির সম্মুখে বাস্তবভাবে জ্ঞানের ভান্ডার 'আল্লাহর' পবিত্র মহান সত্বাকে হাজির করার সব দায়-দায়িত্ব বিজ্ঞান নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে। আর তাই অদৃশ্য জগত ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো খুবই যত্নের সাথে উপস্থাপন করে চলেছে।
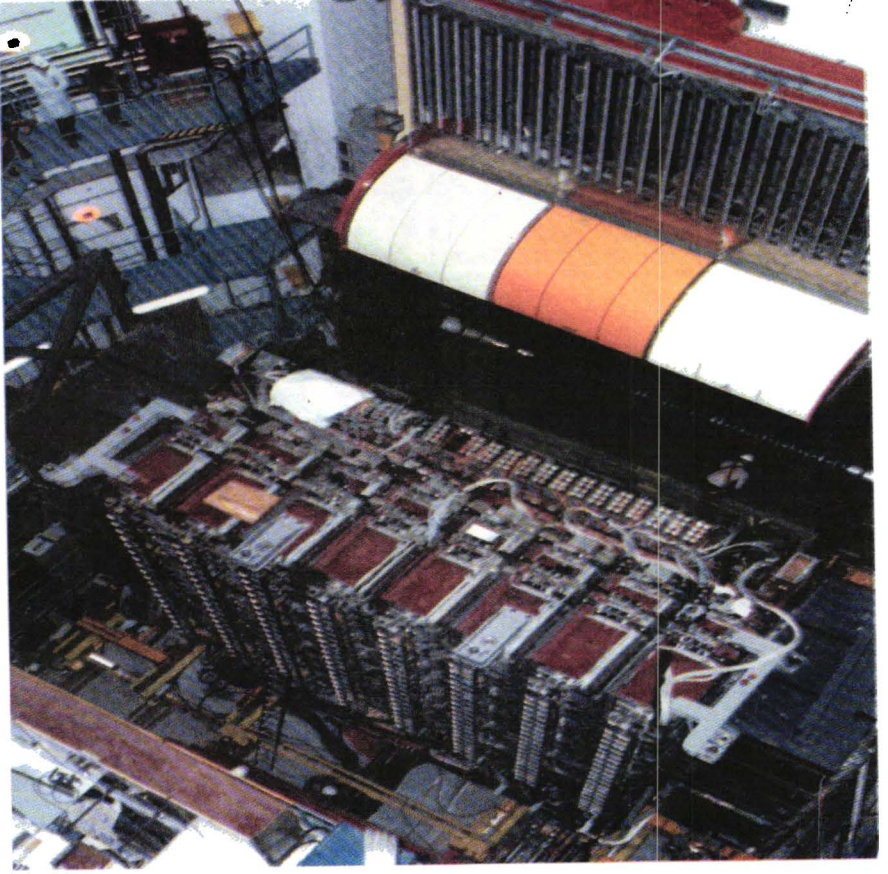
চিত্র -১৪৮

"এবং অন্ধকেও (প্রকৃত জ্ঞান অন্ধকে) পথে আনিতে পারিবে না উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নির্দেশনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে, কারণ তাহারা আত্ম-সমর্পণকারী।" (৩০ ঃ ৫৩)

-- ছবিটি ইউরোপীয় Particles Accelerator- CERN, তথা Proton Anti Proton collider-এর UAI Detector যেখানে প্রোটন ও এ্যান্টি প্রোটনের মাঝে মুখোমুখী সংঘর্ষ বাধিয়ে বিজ্ঞানীগণ Weak Nuclear Force-এর দূত কণিকা 'W' ও Z'কে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ মহাসূক্ষ্ম কণিকাগুলো বাস্তবে অদৃশ্য। এ প্রজেক্টে প্রায় ১৪০ জন বিজ্ঞানী জড়িত ছিলেন।

মানব সম্প্রদায় যে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে মহাবিশ্বের 'স্রষ্টাকে' অস্বীকার করছে, ইউরোপীয় এই collider টি কোন এক মহান সত্ত্বার ইংগিতে যেন 'অদৃশ্য' নামক প্রতারণার দেয়ালকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন প্রভাত, এক নতুন আলোকময় উজ্জল সকালের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে, যেখানে জ্ঞানীজন আগামী দিনে জ্ঞান ও যুক্তির স্বচ্ছ আলোতে তাদের প্রভু 'আল্লাহ্'কে দেখতে পাবে।

চিত্র -১৪৯

"আমি ঐ সব মানুষের জন্য (আমার) নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকি, যাহারা (আমার) স্বরণকারী ও (আমার অদৃশ্যে অবস্থান গ্রহণ সম্পর্কীয় বিষয়ে গভীরভাবে) চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২)

-- ১৯৮৩ সালে প্রায় ২০০০ টন ওজনের UAI Detector-এ প্রোটন ও এ্যান্টি প্রোটনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বিজ্ঞানী 'Carlo Rubbea' এবং 'Van dar Meer' তাতে 'W এবং Z' Particles সৃষ্টি হওয়া সনাক্ত করতে সক্ষম হন, যেভাবে Big Bang মহাবিস্ফোরণের পরমুহূর্তে Weak Nuclear Force-এর দূত কণিকা 'W ও Z' সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে বিজ্ঞানীগণ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন কৃতিত্ব স্বরূপ। ওপরের উদৃত ঐশী বাণীতে আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ঐ সকল জ্ঞানী সমাজের জন্যই উল্লেখিত অদৃশ্য গোপনীয় বিষয়কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোড়কে প্রকাশ করেন, যারা তাঁর অদৃশ্যাবস্থাকে জানার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। এতে করে প্রথমে বস্তুজগতের অদৃশ্য বাস্তবতাকে বুঝতে সক্ষম হলে পরক্ষণে তারা আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্‌র অদৃশ্যবস্থাকেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সুতরাং বিজ্ঞান বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে 'আল্লাহ্'র অদৃশ্য অবস্থাকে এখন আর অস্বীকার করছে না। বিশ্ব মানবতাকেও তাই সে পথে নীরবে ডাক দিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র -১৫০

'যাহারা (চরম বাস্তবতার আলোকে মহাবিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা) আমার নিদর্শন (Sign) ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে (অজ্ঞতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার জন্য) তাহাদিগের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ী তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।" (৭ ঃ ১৪৭)

-- 'দূর্বল পারমাণবিক শক্তি'র (Weak Nuclear Force) দূত কণিকা 'W⁺ ও Z'-এর উপস্থিতি CERN-Particles Collider-এ পর্যবেক্ষনকালে বিজ্ঞানী Rubbia এবং Semon van der Meer-কে দেখা যাচ্ছে। তাদের এই আবিষ্কার মহাবিশ্বব্যাপী বস্তুর ধ্বংস ও প্রানের মৃত্যু বিষয়ে Weak Nuclear Force-যে সরাসরি জড়িত সে বিষয়টি বিশ্বব্যাপী দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'W⁺, W ও Z' কণিকাসমূহ মৌলিক ও অবিভাজ্য মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'কোয়ার্ক' (Quark)কে বিবর্তন করে বস্তুর পরমানুর 'নিউক্লিয়াস' এবং প্রাণীকোষের 'নিউক্লিয়াসকে' ভেংগে দেয়। ফলে বস্তু এবং প্রাণী আর পূর্বের অবস্থায় থাকতে না পেরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

সুতরাং 'কুরআন' এবং সঠিক বিজ্ঞানের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

চিত্র -১৫১

" যাহারা আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে আগত জ্ঞানময় বিষয়বলীর) নিদর্শনে (Sign) বিশ্বাস করে না (নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহন করেনা অর্থাৎ একই ভাবে অদৃশ্য আল্লাহ্‌কে মানতে চায় না) তাহাদিগকে আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না (হাতে কলমে প্রমাণ লাভ করার পরও কৌশলে তাহাদেরকে বিভ্রান্ত করে রাখেন) এবং তাহাদিগের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।" **(১৬ : ১০৪)**

-- আমেরিকার 'শিকাগো'-র নিকটে অবস্থিত 'The Fermi National Accelerator Labratory' ছবিতে দেখা যাচ্ছে। এক সময় মানবসমাজ 'বস্তু ও শক্তির' মহাসূক্ষ্ম কণিকা সম্পর্কে কোন প্রকার জ্ঞান রাখতো না। অনু-পরমানুকেই বস্তুর মৌলিক একক হিসেবে জানতো। এতটুকু জ্ঞান দিয়ে 'আল্লাহ্'কে স্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নয় বলেই আল্লাহ্ নিজে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাসূক্ষ্ম ও অদৃশ্য প্রায় বস্তুকণিকা ও শক্তি-কণিকার বাস্তবতার সংবাদ অগ্রিম প্রদান করেছেন ঐশী গ্রন্থ কুরআনে। যেন মানব সমাজ তাদের চতুর্দিকে বিরাজমান অথচ অদৃশ্য 'আলো' এবং 'মহাসূক্ষ্ম মৌলিক কণিকা জগত' আবিষ্কার করে বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হলে পরবর্তীতে একইভাবে জ্ঞানের উৎকর্ষতার আলোতে অদৃশ্য প্রভু 'আল্লাহ্'কেও মেনে নিতে তাদের জন্য সহজ হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানের বর্তমান এই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার-ই পক্ষ থেকে নেয়া একটি ব্যবস্থা।

চিত্র -১৫২

"তিনি, তোমাদিগকে (তাঁহার পবিত্র 'সত্ত্বার' উপস্থিতির স্বপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ অসংখ্য) নিদর্শন (Sign) দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা (তোমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা) আল্লাহ্‌র কোন কোন নিদর্শনকে (Sign) অস্বীকার করিবে (আছে তোমাদের কাছে এমন কোন জ্ঞানপূর্ণ যুক্তি মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালকের মুকাবিলায়)?" (৪০ ঃ ৮১)

-- বিজ্ঞান বিশ্ব বাস্তবে সত্যি সত্যি বিরাজমান আছে অথচ দেখা যায় না এমন মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা ও শক্তি কণিকা আবিষ্কার করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে 'Large Electron-Positron Collider'। CERN এবং LEP দু'অংশে বিভক্ত Collider টির এক অংশ পড়েছে ফ্রান্সে এবং অপর অংশ পড়েছে ইটালিতে। প্রায় ২৭ কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত এই প্রকল্পটি মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Electron-Positron-Collision ঘটিয়ে Detector-এর মাধ্যমে অসংখ্য মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তুকনা এবং শক্তিকণার বাস্তব উপস্থিতির প্রমাণ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং 'আল্লাহ্‌'র কথাই যে সত্য এবং এর যে কোন পরিবর্তন নেই সে ব্যাপারে বর্তমান বিজ্ঞানই বড় ভূমিকা পালন করছে।
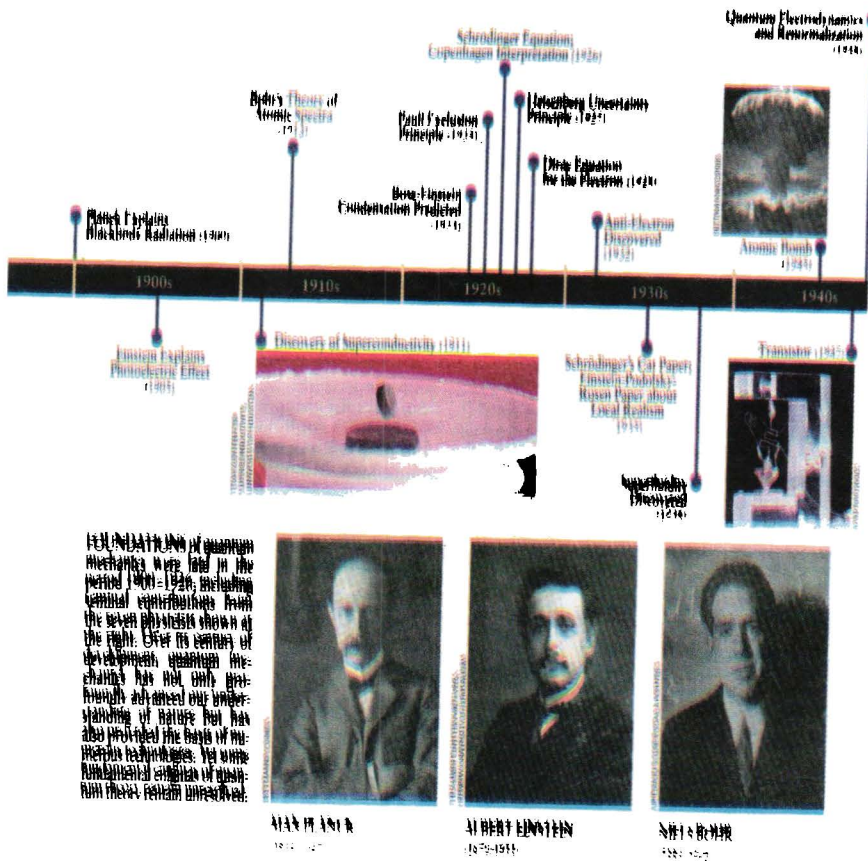
চিত্র -১৫৩

"অদৃশ্যের পরিপূর্ণ জ্ঞান কেবল তাঁহারই, তাঁহার জ্ঞানের নিরূপন কাহারো সাধ্যে নয়।" (৭২ ঃ ২৬)

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই (সকল যুগ ও পরিবেশে একই ফলাফল প্রদান করিতে থাকিবে), এ এক মহা সাফল্য (বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য)।" (১০ ঃ ৬৪)

--বিগত ১০০ বৎসরের সাফল্যময় বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকে মানব ইতিহাসে আগত বড় বড় জ্ঞানী-গুণীজন এ মহাবিশ্বের ভিত্তিমূলক মৌলিক ও অবিভাজ্য মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণার সন্ধান করার যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, বিগত বিংশ শতাব্দিতে এসেই কেবল তা মোটামুটিভাবে পূর্ণতা লাভ করে একদিকে বস্তুর ক্ষুদ্রতম মৌলিক অদৃশ্য কণিকা 'কোয়ার্ক' (Quark) আবিষ্কৃত হয়ে এবং অপরদিকে অসংখ্য মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic-Ray) ও এদের মহাসূক্ষ্ম 'দূত' কণিকাসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে মহাসত্যের পথে বহু দূর এগিয়ে দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোতে এখন অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে কোন বিষয়কে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। প্রমাণিত হয়েছে অদৃশ্য বিষয়কে দৃশ্যযোগ্য করার মত ব্যবস্থা তৈরী হলে অবশ্যই তা দর্শন লাভ করা যাবে। সুতরাং অদৃশ্য আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারটি বর্তমান বিজ্ঞানের-ই একটি দাবীতে পরিণত হয়েছে।
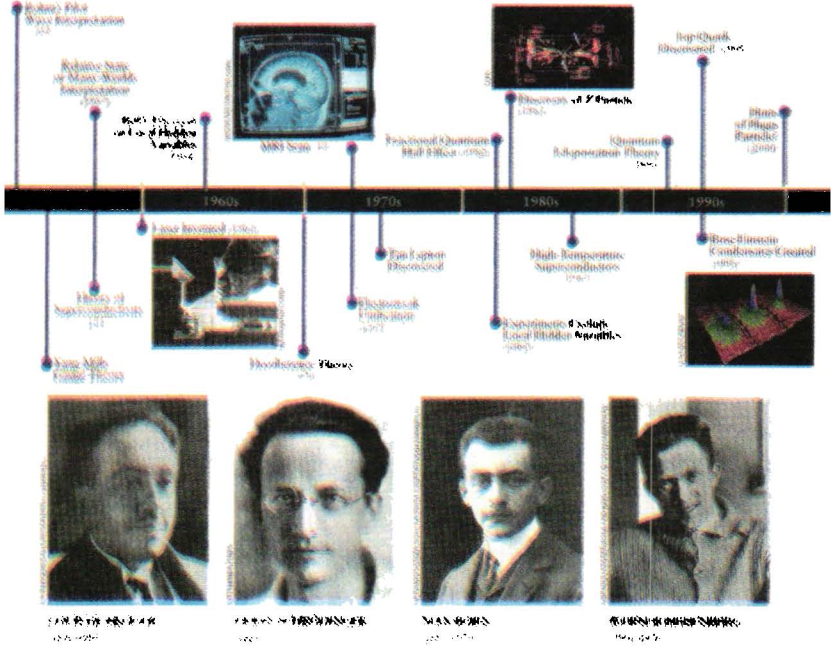
চিত্র -১৫৪

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সঙ্গত। তাঁহার বাণী কেহই (জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি-তর্ক কোন কিছু দিয়ে-ই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না (রবং উল্টো তোমাদের চেষ্টা সাধনায় এক আল্লাহর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম-ই প্রকাশ পাইবে)। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত রহিয়াছেন। (৬ ঃ ১১৫)

"এইগুলিই (শত শত বৎসরে বিজ্ঞানের অর্জিত সাফল্য গুলো-ই) প্রমাণ যে 'আল্লাহ্' সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

"অতএব হে জ্ঞানীসমাজ! (জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত মাপকাঠিতে অসংখ্য বাস্তব নিদর্শনের আলোকে) আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল, যাহাতে (আসন্ন ভয়বাহ বিপদ হইতে) তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পার।" (৫ ঃ ১০০)

-- আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন এ পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ের অদৃশ্যকে অস্বীকার করার দীর্ঘ দিনের মুদ্রা রোগকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করার লক্ষ্যে, মানব সম্প্রদায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বস্তু ও শক্তির ক্ষুদ্রাংশকে মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য স্তর থেকে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ্য আলোতে বের করে এনেছেন। যেন এ দৃশ্য অবলোকন করার পর তারা আর কখনো অদৃশ্য প্রভুকে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করতে না পারে। আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য অগণিত অদৃশ্য বিষয়াবলী বাস্তবে উদ্‌ঘাটন করে তিনি এ পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

সুতরাং এখানেও 'পরমাণু'-র চেয়েও ক্ষুদ্র তথা মহাসূক্ষ্ম কণিকার উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম যা পূর্বে মানবজাতির কল্পনায়ও তা ছিল না।

এবার এই মহাবিশ্বে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে পরিচিত 'অনু-পরমানু' অপেক্ষাও যে আরও বহু বহু গুণে ক্ষুদ্র মহাসুক্ষ্ম উপ-আনবিক কনিকাসমূহের (Sub-Atomic Particles) উদ্‌ঘাটন বর্তমান বিজ্ঞান ইতোমধ্যে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে, সে বিষয়ের এক বিস্তারিত পর্যালোচনার পর মূল পয়েন্টগুলো এখন গুছিয়ে নিতে চাই। যেমনঃ-

১। প্রায় ২৫০০ বছর পূর্ব থেকেই পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় এই দৃশ্যমান জগতের মৌলিক গঠন উপাদান সম্পর্কে একটু একটু করে ভাবতে শুরু করে।

২। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০অব্দে প্রথমবারের মত গ্রীক দার্শনিক 'Thales' অভিমত প্রকাশ করেন যে দৃশ্যমান জগত 'পানি' থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এর মৌলিক গঠন উপাদান হচ্ছে 'পানি'।

৩। এরপর দার্শনিক 'এ্যানাক্সিম্যান্ডার' ঘোষণা করেন আমাদের চারপাশের জগত মূলতঃই 'বাতাস'থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এর মৌলিক উপাদান হচ্ছে 'বাতাস'।

৪। তারপর দার্শনিক 'পিথাগোরাস' এসে বললেন যে, বিশজাহান সৃষ্টি হয়েছে কতগুলো 'সংখ্যা' (Number) থেকে।

৫। এর প্রায় ৪০ বৎসর পর 'হেরাক্লিটাস' এসে প্রস্তাব করলেন সমগ্র বিশ্ব-জাহান 'আগুণ' থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

৬। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে প্রথমে দার্শনিক 'Empedocles' ঘোষণা করলেন বিশ্বজাহান ৪টি মৌলিক উপাদান- 'মাটি' (Earth), 'পানি' (Water), অগ্নি (Fire), ও বাতাস (Air) থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

৭। এরপর দার্শনিক 'এ্যানাক্সগোরাস' দাবী করেন যে সমগ্র বিশ্বজাহান 'অদৃশ্য বীজ' (Indivisible Seeds) থেকে জন্ম নিয়েছে।

৮। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 'ডেমোক্রিটাস' পরমানু (Atom) নামক বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ দিয়ে এই দৃশ্যমান বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রচার করেন।

৯। এরপর আসেন গ্রীক খ্যাতিমান দার্শনিক 'প্লুটো' (Ploto) ও 'এ্যারিষ্টোটল' (Aristotle), তারা দু'জনই পূর্বের ৪টি মৌলিক উপাদান- পানি, মাটি, অগ্নি ও বাতাস-কেই বিশ্বজাহান গঠনের পিছনে মৌলিক উপাদান হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

১০। দার্শনিক 'ইপিকুরাস' (Epicurus) খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের শেষ প্রান্তে আবার 'পরমানু' (Atom) প্রস্তাবকে পূনর্জীবিত করেন এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রস্তাব এককভাবে প্রভাব বিস্তার করে এগিয়ে যেতে থাকে।

১১। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে রোমান দার্শনিক 'লুকরেটিয়াস' (Lucretius) 'De rerum Natura' পুস্তকে 'পরমানু' (Atom) কেই এই বিশ্বজাহানের সৃষ্টির পিছনে মৌলিক একক রূপে সবচেয়ে ক্ষুদ্র 'বিল্ডিং ব্লক' হিসেবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

১২। দীর্ঘ সময় পর ১৬২৪ সালে ফ্রান্সের দার্শনিক 'গ্যাসেন্ডি' (Gassendi) কর্তৃক লিখিত বই 'Excercitation paradoxicane Adversus Aristotelus'-এ বিশ্বজাহান সৃষ্টির পিছনে ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা 'পরমানু' কেই সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাবটিকে আরও মজবুত করে তোলেন।

১৩। ১৬৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী 'স্যার আইজাক নিউটন' প্রমান করেন- আলো হচ্ছে চলমান বস্তুকণা এবং আলো চলার পথে তরঙ্গাকারে তথা ঢেউয়ের মত করে এগিয়ে চলে। এতে 'পরমানু' (Atom) মতবাদ আরও দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যায় এবং এককভাবে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকে।

১৪। ১৮০৩ সালে বিজ্ঞানী 'জন ডেল্টন' প্রতিটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন 'পরমানু' আলাদা করা যে সম্ভব তা প্রমাণ করেন। এই জাতীয় 'পরমানু' একাধিক মিলিত হয়ে যে বস্তুর সৃষ্টি তাও প্রমাণ করেন। তিনি প্রথমবারের মত বস্তুর 'পারমানবিক ওজন' নামক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও প্রকাশ করেন।

১৫। ১৮৬৯ সালে রাশিয়ান ক্যামিষ্ট 'ম্যান্ডেলেয়েফ' পদার্থের আনবিক ওজনের ওপর নির্ভর করে 'পিরিয়ডিক ট্যাবল' (Periodic Table) নামে একটি তালিকা প্রকাশ করে প্রমাণ করেন অদৃশ্য 'পরমানু' জগত শুধু

সত্য-ই নয়, সাথে সাথে পরমানু'-জগত একটি নিদিষ্ট নিয়ম পদ্ধতিও যে মেনে চলে তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

১৬। এদিকে ১৮৬৪ সালে 'জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল' আবিষ্কার করেন 'বৈদ্যুতিক চুম্বকত্ব' (Electromagnetism), তার পূর্বেই ১৮৫০ সালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী 'ইউজেনি গোল্ডষ্টেইন', ১৮৯২ সালে 'ফিলিপ লিনার্ড' ও ১৮৯৫ সালে 'উইল হেল্ম কোনরাও রন্টজেন' এক্স-রে (X-ray) আবিষ্কার করেন। ১৮৮৯ সালে 'পিরি কুরী' দম্পতি 'রেডিও এ্যাকটিভিটি' (Radio activity) আবিষ্কার করেন। এদের সকলের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয় 'আলোক রশ্মি' মূলতঃই মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণা 'ইলেকট্রনের' (Electron) প্রবাহ মাত্র (The rays were a stream of particles electron)।

১৭। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে 'জোসেফ জন থম্সন' ও 'স্যার উইলিয়াম ক্রুক' বৈদ্যুতিক টিউবের ভিতর দিয়ে 'ক্যাথড রে' প্রবাহিত করে 'ইলেকট্রনের' উপস্থিতির প্রমাণ ও তা দর্শন লাভ করার একদুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১৮। বিংশ শতাব্দীর যাত্রার শুভক্ষণে বিজ্ঞানী 'ম্যাক্স প্লাঙ্ক' (Max Plank) এবং 'আলবার্ট আইনষ্টাইন' (Albert Einestine) প্রমাণ করেন- 'রেডিয়েন্ট এনার্জির' তথা 'আলোক শক্তির' ক্ষুদ্রতম কণা হচ্ছে 'ফোটন' (Photon) কণিকা যা প্রায় ওজন শূন্য।

১৯। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী 'রাদার ফোর্ড' (Ruther Ford) পরমানুর উপাদান 'প্রোটন' 'নিউট্রন' ও 'ইলেকট্রন' নামক কণিকার সন্ধান লাভ করেন এবং এরা যে সৌরজগতের ন্যায় পরমানুর ভিতর বিচরণ করছে তা প্রমাণ করেন।

২০। ১৯১৩ সালে ডেনিশ পদার্থবিদ 'নেইলস্ বোহ্র' (Neils Bohr) 'ইলেকট্রন' কনিকার কোয়ান্টাম জাম্প এর কারণে 'পরমানু' জগতে কিভাবে তাপমাত্রার ব্যাপক বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে তা উদ্ঘাটন করেন। ১৯২২ সালে উক্ত বিষয়ে তিনি নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন।

২১। ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী 'Cockcroft' এবং তার সহযোগী 'Ernest Walton' প্রথম বারের মত পরমানুর 'নিউক্লিয়ার্স (Nucleus) ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হন।

২২। ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী 'এ্যানরিকো ফার্মি' নিউট্রন কণিকাকে পানি বা প্যারাফিনের মধ্যে ধীর গতিসম্পন্ন করে ঐ 'নিউট্রন' কে অন্য পরমানুর নিউক্লিয়াসে সংস্থাপন করতে সক্ষম হন।

২৩। ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী 'Lise Mietner' ও 'Otto Hahn ' ঐ জাতীয় 'নিউট্রন' কনিকা দিয়ে 'ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস' (Uranium nucleus-235) কে আঘাত করে ভেঙ্গে দু'টুকরা করতে সক্ষম হন। ফলে এতে কল্পনাতীত 'তাপশক্তি' (Radiation) নির্গত হয়ে পারমানবিক প্রচন্ড ক্ষমতার গোপন রহস্য বাস্তবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পদ্ধতিটি 'Fission' নামে পরিচিতি লাভ করে।

২৪। একই সময় বিংশ শতাব্দির শুরুতে যুগপৎভাবে বিজ্ঞানী 'C. T. R. Wilson' ও 'Theodor Wulf' মহাজাগতিক রশ্মি বা 'Cosmic Ray' আবিষ্কার করেন।

২৫। ১৯৩০ সালে বিজ্ঞানী 'আর্থার কম্পটন'-এর নেতৃত্বে 'Cosmic Ray' এর ওপর জরীপ চালিয়ে বিভিন্ন ভারী পদার্থের নিউক্লিয়াস, মিউওন, এ্যান্টি মিউওন, পজিটিভ পাইওন, নেগেটিভ পাইওন, নিউট্রাল পাইওন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, ও নিউট্রিনো সহ অসংখ্য মহাসুক্ষ্ম কনিকা আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হওয়ায় পরে বিজ্ঞানী 'Victor Hess' নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

২৬। ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী 'কার্ল এ্যান্ডারসন' আরও মহাসুক্ষ্ম কণিকা 'কে-ওন' (Kaon) 'লাম্বডা' (Lambda), 'সিগমা' (Sigma) ইত্যাদি আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন বস্তুর 'অনু-পরমানু-ই' ক্ষুদ্রতম ইউনিট নয়।

২৭। বিংশ শতাব্দীর '৭০' দশকে বিজ্ঞানী 'জেল-মান' (Gell Mann) 'কোয়ার্ক' (Quark) প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি অবহিত করেন যে 'কোয়ার্ক' হচ্ছে সকল প্রকার বস্তুকণার মৌলিক উপাদান, যার কোন

আন্তঃগঠন কাঠামো নেই। 'কোয়ার্ক' দিয়েই সকল প্রকার কণিকা গঠিত। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'Brook heaven'-এর New bubble Chamber-এ Omega minus-এর প্রমাণের মাধ্যমে উক্ত 'কোয়ার্ক' তথ্য স্বীকৃতি লাভ করে।

২৮। '৮০'-এর দশকে (১৯৭৮ সালে) প্রফেসর 'Samuel Ting' ও 'Burton Richter' একত্রে 'কোয়ার্ক' পরিবারের ৪র্থ সদস্য আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

২৯। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বিজ্ঞানবিশ্ব এই মহাবিশ্ব বর্তমান আকৃতিতে অস্তিত্ব ধারণের পিছনে মৌলিকভাবে ১২টি উপাদান বা মৌলিক মহাসুক্ষ্ম কণিকার ভূমিকার ব্যাপারে একমত প্রকাশ করে। 'কোয়ার্ক' ও 'লেপটন' ৩টি পরিবারে বিভক্ত। প্রতি ৪টি মিলে ১টি পরিবার গঠিত।

৩০। বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগেই আবার একশত বৎসরের চেষ্টা-গবেষণার ফসল হিসেবে বিজ্ঞান বিশ্ব এই মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের পিছনে মোট ৪টি মৌলিক শক্তিকে চিহ্নিত করতে এবং তা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে।

(১) 'Gravitational Force' 'দূত কনিকা' হচ্ছে Graviton.

(২) 'Electromagnetic Force' 'দূত কনিকা' হচ্ছে Photon.

(৩) 'Strong Nuclear Force 'দূত কনিকা' হচ্ছে Gluon.

(৪) 'Weak Nuclear Force 'দূত কনিকা' হচ্ছে $W^{\pm}$ এবং Z Particles.

৩১। বিজ্ঞান বিশ্বে বাস্তবতার আঙ্গিকে দৃঢ় আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই মহাবিশ্বে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে অনু-পরমানু-ই শেষ কথা নয় (যা হাজার হাজার বছর থেকে মানব সম্প্রদায় ভেবে আসছিল) বরং এদের চাইতেও আরও বহু বহু সুক্ষ্মস্তরের মহাসুক্ষ্ম কণিকা-ই এই মহাবিশ্বের 'বিল্ডিং ব্লক' রূপে কাজ শুরু করেছে। প্রমানভিত্তিক যে তথ্যগুলো ইতোমধ্যে মানব সমাজের কল্পনাকেও অবিশ্বাস্যরূপে হার মানিয়েছে। বিজ্ঞানের এই কল্পনাতীত আবিষ্কার মহাবিস্ময়ের বিস্ময় হয়ে বর্তমান বিশ্বে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে।

আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ের দু'টি অংশের একটি হচ্ছে- 'অনু-পরমানু' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণিকা সম্পর্কীয় আল্‌-কুরআনের প্রস্তাবিত তথ্য আলোচনা। অপরটি হচ্ছে ঐ একই বিষয়ে বিজ্ঞানের দীর্ঘ সময় ধরে প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবতার আঙ্গিকে প্রমাণ করে তা জনসমক্ষে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা। উভয় আলোচনা থেকে আমরা এই সম্পর্কীয় বক্তব্য পর্যালোচনার পর সারাংশ হিসেবে মূল পয়েন্টগুলোকেও সংক্ষিপ্তাকারে পৃথক করে নিয়েছি। ফলে উভয় বক্তব্যকে আমরা পাশাপাশি রেখে দেখতে পাচ্ছি- মানবজাতি প্রায় আড়াই হাজার বছর (২৫০০) ধরে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র মৌলিক গঠন উপাদান সম্পর্কে জানার যে চেষ্টা শুরু করেছিল এবং যে উদ্যেগের এক পর্যায়ে তারা 'অনু-পরমানুকেই' মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদানরূপে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত গন্য করে নিয়েছিল। সেই উদ্যেগের প্রায় মাঝপথে 'আল্‌-কুরআন' অবতীর্ণ হয়ে মানবজাতিকে সুদৃঢ়ভাবে জানিয়ে গিয়েছিল যে, অনু-পরমানু-ই মহাবিশ্বে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতর বস্তুকণিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে না, বরং তার চাইতে বহু বহু গুণে ক্ষুদ্রস্তরের অদৃশ্য মহাসুক্ষ্ম কণিকাসমূহ এই মহাবিশ্বে বাস্তবে বিরাজমান আছে এবং সেই পরিচিতি মূলতঃ এরাই লাভ করার একমাত্র অধিকারী হতে পারে।

আমরা খুবই আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ৭ম শতাব্দীতে 'কুরআনের' উক্ত প্রস্তাব যখন বিশ্বব্যাপী আলোড়িত হচ্ছিল তখন কেউ এই সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকেই বিজ্ঞান এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে যাত্রা শুরু করেছিল। বিজ্ঞান অধ্যবসায়ের সাথে এগিয়ে যাওয়ার কারণে একটু একটু করে বিষয়টির সফলতার মুখ দেখতে পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এসে 'অনু-পরমানু' জগতকে ছাড়িয়ে মহাসুক্ষ্ম কণিকা জগতের বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে আন্তঃকাঠামো বর্হিভূত মৌলিক বস্তুকণা 'কোয়ার্ক' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। যে 'কোয়ার্ক' নামক মহাসুক্ষ্ম কণিকাসমূহ দিয়েই মহাবিশ্ব সৃষ্টির যাত্রা শুরু হয়েছে বলে বিজ্ঞানীমহল বর্তমানে চরম বাস্তবতার আলোকে একমত পোষণ করছেন।

সুতরাং 'আল্-কুরআন' এই মহাবিশ্বের 'বিল্ডিং ব্লক' রূপী মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে তথ্য বা সংবাদ বিজ্ঞানের জানার প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রদান করেছে, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের চরম প্রযুক্তিগত উন্নতির দিনে সেই বিজ্ঞানসম্মত তথ্য বাস্তবে প্রমাণিত হওয়ায় এখন এক ও একক 'সত্ত্বা' মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতি এবং অদৃশ্যে অবস্থান করে সার্বিকভাবে সমগ্র দৃশ্য-অদৃশ্য এই মহাবিশ্বকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি-অস্বীকার করার আর কোন সুযোগ মানব মন্ডলীর থাকলো না। কুরআনের মাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র বাক্যে বিজ্ঞোচিতভাবে জ্ঞানের এক অপূর্ব নৈপুণ্যতার সমাবেশ ঘটিয়ে যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব জ্ঞানীসমাজের জ্ঞানের আঙ্গিনায় দৃঢ়ভাবে বিছিয়ে গেছে, বিজ্ঞান অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় আড়াই হাজার বছরের এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমার আবর্তন শেষেই কেবল সেই রহস্য উন্মোচনে সফল হয়েছে। এতে সকল প্রকার মিথ্যার আবর্জনা ও অন্ধকারকে দূরীভূত করে 'কুরআনের' মহাসত্যতাও দিবালোকের স্পষ্ট আলোতে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অতএব "এই গুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য"। (৩১ ঃ ৩৪)

"তাঁর ,মহাবাণী অবশ্যই সত্য"। (৬ ঃ ৭৩)

এবার সমগ্র অধ্যায়টিতে আলোচিত কুরআনিক প্রস্তাব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর্যালোচনাকে সংক্ষিপ্তাকারে 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে

আল্‌-কুরআন	বিজ্ঞান
১। "উহারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্‌ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করেন? ইহাতো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯) "বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্‌তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২৯ ঃ ২০)	১। ইতিহাস থেকে জানা যায় এই পৃথিবীর মানবমন্ডলী প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব হতে মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতর মৌলিক গঠন উপাদান নিয়ে ভাবতে শুরু করে। সাথে সাথে মহাবিশ্বটি কিভাবে কোন পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে তাও উদ্ঘাটনে ডঢ়ন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় রত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে সৃষ্টি সম্পর্কীয় বেশ কয়েকটি প্রস্তাত উত্থিত হয়। এর মধ্যে একটি অন্যতম প্রস্তাব পেশ করেছিলেন বেলজিয়াম পদার্থ বিজ্ঞানবিদ 'ল মেইটর'। তিনি ১৯৩৩ সালে ঘোষণা করেন যে, এই মহাবিশ্বটি প্রায় শূন্যাবস্থা থেকে প্রচন্ড এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছে মহাবিস্ফোরণের সময় মহাবিশ্বটির আয়তন ছিল $১০^{-৩৩}$ সেঃ মিঃ এবং তখন সময় মান ছিল $১০^{-৪৩}$ সেঃ এবং তাপমাত্রা ছিল $১০^{৩২}$ K. চল্লিশের দশকে বিজ্ঞানী 'গামো' গাণিতিকভাবে হিসেব করে দেখান যে ঐ মহাবিস্ফোরণ থেকে উদ্ভূত তাপমাত্রা প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসরে কমতে কমতে বর্তমানে প্রায় ৩K. এ পৌঁছে থাকবে, সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটন

"তিনিই যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়। তাঁহার কথা-ই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত" (৬ ঃ ৭৩)।	সম্ভব হলে তা আবিস্কৃত হতে পারে। ১৯৬৪ সালে আমেরিকান 'বেল টেলিফোন' কোম্পানীর নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত এ্যান্টেনায় হঠাৎ করেই ' Radio Static Snow' আকারে ২.৭৩K.তাপমাত্রা ধরা পড়ায় পরবর্তীতে তা 'Background Radiation' হিসেবে সনাক্ত হয় এবং উক্ত কাজে কৃতিত্ব স্বরূপ সংশ্লিষ্ট দু' বিজ্ঞানী 'আর্‌নো পেন্‌জিয়াস' ও 'রবার্ট উইলসন' কে ১৯৭৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এতে সমগ্র বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে যে, এই মহাবিশ্বটি 'Big Bang' নামক এক মহাবিষ্ফোরণ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি মুহূর্তটি ছিল কল্পনাতীত সুক্ষ্ম সময়ের একটি ঝল্‌ক মাত্র।
"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই।" (১৬ ঃ ৭৭)	`Big Bang' মহাবিষ্ফোরণ পরবর্তী সময়ে তখন শুধু নবীন মহাবিশ্বে 'আলো আর আলোর' বন্যা বইতে ছিল। সময়ের সাথে নবীন মহাবিশ্বের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাপমাত্রা কমতে থাকায় এক পর্যায়ে আলোর কণা 'ফোটন' নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়। এতে 'কোয়ার্ক' ও 'এ্যান্টিকোয়ার্ক' নামে প্রথম বস্তু কণিকা জন্ম লাভ করে। তাপমাত্রা আরও কমতে থাকাবস্থায়

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বিষয়ের (পরিপূর্ণ) জ্ঞান আল্লাহর-ই এবং তাঁহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।" (১১ ঃ ১২৩) "তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে নাজিল হয় এবং যাহা কিছু উহা হইতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।" (৩৪ ঃ ২)	এক পর্যায়ে 'কোয়ার্ক ও এ্যান্টিকোয়ার্ক' সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে উদ্বৃত্ত হিসেবে কিছু 'কোয়ার্ক' থেকে যায়। তাপমাত্রা আরো কমতে থাকায় এক সময় ৩টি কোয়ার্ক মিলিত হয়ে ১টি 'প্রোটন' ও ৩টি কোয়ার্ক মিলিত হয়ে ১টি 'নিউট্রন' নামক উপ আনবিক সুক্ষ্ম কণিকা সৃষ্টি হতে থাকে। তাপমাত্রা আরও কমার এক পর্যায়ে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' তৈরী হয়। পরে তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০k এ আগমন করলে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' ওর চতুর্দিকে 'ইলেকট্রন' কণিকাকে ধারন করে প্রথমবারের মত 'অটল বা স্থায়ী পরমানু' (Stable Atom) সৃষ্টি করে। এই পরমানু পর্যন্ত বস্তুর মহাসুক্ষ্ম কণিকাসহ সকল কণিকা পরিবার-ই মানবীয় দৃষ্টিতে অদৃশ্য। বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মানব সম্প্রদায় এ সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। সমগ্র মহাবিশ্ব এ জাতীয় অদৃশ্য কণিকায় ভরপুর হয়ে আছে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যে জানা যায় মোট ৩টি পরিবারে বিভক্ত ১২টি মহাসূক্ষ্ম কণিকার 'কোয়ার্ক' ও 'লেপটন' গ্রুপই এই মহাবিশ্বের ভিত্তি

"তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) তাঁহার অগোচরে নহে অনু পরিমাণ কিছু কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহৎ কিছু, ইহার প্রত্যেকটি লিখিত আছে সুস্পষ্ট কিতাবে (লৌহ মাহফুজে)।" (৩৪ ঃ ৩)	তৈরী করেছে। 'পরমানু' পরস্পর মিলিত হয়ে 'অনু' গঠন করেছে। আবার 'অনু' পরস্পর মিলিত হয়ে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ তৈরী হয়েছে। উল্লেখিত প্রায় শতাধিক মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য কণিকাসমূহের সুশৃংখল কর্মকাণ্ড প্রমান করছে এদের পিছনে নিঃসন্দেহে কোন বৃহৎ শক্তির উৎস সক্রিয়ভাবে তৎপর রয়েছে। এও প্রমান হচ্ছে যে দৃশ্য জগতের তুলনায় অদৃশ্য জগত-ই ব্যাপকভাবে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে।
(২) "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না। তুমি আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?" (৬৭ ঃ ৩)	(২) এই মহাবিশ্বের 'বিল্ডিং ব্লক' রূপী মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগত থেকে শুরু করে (যা মুলতঃ অদৃশ্য) বৃহৎ বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তু গ্যালাক্সী পর্যন্ত সর্বত্র-ই পর্যায় ক্রম পরিলক্ষিত হয়। কোথাও এর কোনরূপ ব্যতিক্রম নজরে পড়ে না। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য করার বিষয় হলো বিজ্ঞান কর্তৃক আবিস্কৃত অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগত। যে জগতের সকল পর্যায়ে নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি ও শৃংখলাবদ্ধ আচরণ মানবজাতির কল্পনার রাজ্যকেও হার মানায়। কি বিস্ময়কর শৃংখলা ও পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে একই সাথে 'ফোটন' কণিকা থেকে 'কোয়ার্ক' ও 'লেপটন', 'কোয়ার্ক'

"অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।" (৬৭ ঃ ৪)	কণিকা থেকে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন', 'প্রোটন ও 'নিউট্রন' কণিকা মিলিত হয়ে আবার নিউক্লিয়াস; 'নিউক্লিয়াস' আবার 'ইলেকট্রন' কণিকা ধারণ করে 'পরমাণু', একাধিক 'পরমানু' মিলে 'অনু', বহু সংখ্যক 'অনু' মিলিত হয়ে 'বস্তু', বহু সংখ্যক 'বস্তু' মিলিত হয়ে 'বিশ্ব', বহু সংখ্যক 'বিশ্ব' মিলিত হয়ে এই 'মহাবিশ্ব' সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র-ই রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম, পদ্ধতি ও শৃংখলার এক অপূর্ব সমন্বয়। যার তুলনা মহাবিশ্ব নিজেই।
(৩) "আল্লাহ্ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫) "এই সমস্ত অদৃশ্য জগতের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায় ও জানিত না।" (১১ ঃ ৪৯) "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নিদিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।" (৬ ঃ ৬৭) "আল্লাহ্র বানীর কোন পরিবর্তন নাই; উহাই মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)	(৩) এই পৃথিবীপৃষ্ঠে মানবমন্ডলীর জ্ঞানের রাজ্য সবসময় একই রকম থাকেনি। অতীত যুগের তুলনায় বর্তমান যুগের মানব মস্তিষ্ক তুলনামূলক বেশী মেধা সম্পন্ন এবং কর্ম তৎপর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মানব মেধা বর্তমান সময়ে মহাবিশ্বের অগণিত অদৃশ্য বিষয়ের যে সকল উদ্‌ঘাটন সম্ভব করে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে, পূর্বে তা মানবীয় কল্পনায়ও স্থান পায়নি। এদিকে কোন কোন বিষয় শত-শত বছর এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে কোন সুরাহা করতে না পারায় এবং কোন কোন বিষয় একেবারেই স্বল্প সময়ে আবিস্কৃত হওয়ায় প্রমাণ করে,

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ন সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁহার বানী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সমস্ত বিষয়-ই অবগত রহিয়াছেন।" (৬ ঃ ১১৫)	আবিষ্কারের বিষয়টি কিংবা অদৃশ্য বিষয় অবহিত হওয়ার বিষয়টি মানব সমাজের হাতে নয়; বরং অন্য কোথাও উচ্চতর শক্তিধর উৎসের নিকট। যে কারণে মানুষ এ ব্যাপারে পূর্বে কিছুই বলতে পারে না।
(৪) "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; উহাই মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)	(৪) বিজ্ঞান বিশ্ব পরিবর্তনশীল। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রতিনিয়তই পরিবর্তনের শিকার হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন অনুকুলেই থাকে। দু'চারটি ব্যাপারে পরিবর্তন প্রতিকুলেও ঘটে থাকে। বিজ্ঞান বিশ্ব নতুন কোন আবিষ্কারকেই নির্দ্বিধায় মেনে নেয় না। আবিস্কৃত বিষয়টি সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীসমাজ কর্তৃক পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হওয়ার পরই কেবল তা স্বীকৃতি লাভ করার পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়ে থাকে। তাই বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে ব্যাবহার করে কোন বিষয়ের সার্বিক 'তথ্য ও তত্ত্ব' আবিষ্কার করার পূর্বেই অন্য কোন 'উৎস' থেকে যদি একই তথ্য প্রস্তাবাকারে উত্থিত হয়ে থাকে, তাহলে বিজ্ঞান সত্যপ্রিয় ও নির্ভীক বিধায় তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে এটাই আশার কথা। এরই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ের
"তোমার প্রভূর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁহার বাণী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সমস্ত বিষয়-ই অবগত রহিয়াছেন। (৬ ঃ ১১৫)	

"এই গুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১:৩০) "এই গুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ : ১) "মূলতঃ গোলামদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।" (৩৫ : ২৮)	যে বিষয়টি (মহাসুক্ষ্ম বস্তু কণিকা) সম্পর্কে বিজ্ঞানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করতে প্রায় ২৫০০ বছর প্রয়োজন পড়েছে। সেই মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকার সংবাদ প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই সঠিকভাবে 'কুরআন' উপস্থাপন করার কারণে বিজ্ঞান অবশ্যই এক ও একক প্রভু 'আল্লাহকে' স্বীকার করে নেয়া এবং 'কুরআন'কে সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হিসেবে মেনে নেয়া কর্তব্য। এ ব্যাপারে সমস্যা যদি থাকে তাহলে তা ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত বিজ্ঞানী মহলের হঠকারিতা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। একক সত্ত্বা মহান স্রষ্টা 'আল্লাহর' অস্তিত্ব স্বীকার করার পিছনে মূলতঃ এরাই বড় অন্তরায়। এই শ্রেণীর জ্ঞানীজন কার্যতঃই মূর্খ পন্ডিত, যারা আল্লাহর গোলামীর অনুপযুক্ত। বাস্তব প্রমাণ হাতে লাভ করার পরও তা স্বীকার না করা অন্ততঃপক্ষে প্রকৃত জ্ঞানীজনের জন্য শোভনীয় হতে পারে না।

"আল-কুরআন বিজ্ঞানময়।" (৩৬ : ২)

তাই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির অসংখ্য রহস্যপূর্ণ গোপন বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা আকারে এই কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে এই পৃথিবীর মানবমন্ডলী পরবর্তী সময়ে জ্ঞানের প্রসারতার সাথে সাথে ১টি ১টি করে বিষয় 'বিজ্ঞান' নামক বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে অবহিত হতে পারে, আর সেই বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার পর মুক্ত মনে গভীর

মনোনিবেশ সহকারে সকল কিছুর পিছনে একজন সক্রিয় 'মহান সত্ত্বাকে' উদ্‌ঘাটন করে তাঁর সম্মূখে যেন একান্ত অনুগত হয়ে মাথা নত করে দিয়ে ধন্য হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীতে (চূড়ান্তভাবে মাত্র ১০০ বৎসরের ভিতর) মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণিকা সম্পর্কে বিজ্ঞান যে তথ্য আবিষ্কার করেছে প্রথমবারের মত, সেই মহাসূক্ষ্ম কণিকা সম্পর্কে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই 'আল্-কুরআন' বিজ্ঞানময়, তথ্য সরবরাহ করে প্রমাণ করেছে-

(১) 'আল্-কুরআন' পরম সত্যতা সহকারে-ই বিশ্বজাহানের একমাত্র প্রভু 'আল্লাহ্ তায়ালার' নিকট হতে মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

(২) মহান সত্ত্বা 'আল্লাহ্' সত্য, তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন। সকল কিছুর মালিক একমাত্র তিনিই।

(৩) এই মহাবিশ্বে মহাসূক্ষ্মতার স্তর থেকে বৃহৎ গ্যালাক্সী পর্যন্ত সমস্ত কিছুই তাঁর বিধানের অধীনে কল্পনাতীত শৃংখলায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যা মানুষের পক্ষে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া এক অসাধ্য ব্যাপার-ই বটে।

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত 'মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা' সম্পর্কে পর্যালোচনায় যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে, এখন সেই প্রশ্নগুলোর এক এক করে উত্তর পেশ করার চেষ্টা করবো।

(১) প্রশ্ন ঃ বর্তমান সময় পর্যন্ত বস্তুর 'মহাসূক্ষ্ম কণিকা' সম্পর্কে ধারাবাহিক আবিস্কৃত 'তথ্য ও তত্ত্ব' কে সর্বশেষ বলা যাবে কি?

উত্তর ঃ এই বিষয়ে আল্-কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে একেবারে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আর তা হলো- এই মহাবিশ্বের এক ও একক স্রষ্টা রূপে, পরিচালনাকারীরূপে, ও নিয়ন্ত্রনসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনকারীরূপে একমাত্র মহান সত্ত্বা হচ্ছেন 'আল্লাহ্ তায়ালা', তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অসংখ্য জিনিস বিভিন্ন উপাদানে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর

মহাজ্ঞান দিয়ে সৃষ্ট অনেক কিছুই আমরা আমাদের তুলনামূলক ক্ষুদ্রজ্ঞান দিয়ে দর্শন করার, অবহিত হওয়ার ও বুঝার মত যোগ্যতা রাখি না। শত চেষ্টা করেও আমরা কোন বিষয়ে পূর্ণরূপে সর্বশেষ তথ্য পর্যন্ত জানার ক্ষমতা রাখি না, যদি না 'আল্লাহ্' অনুগ্রহ করে সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত করে না দেন। "তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এমন অনেক কিছুই যাহা তোমরা অবগত নও" (১৬ ঃ ৮)। এখানে স্পষ্টভাবেই আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছুই মানুষ জানে না। সেটা ক্ষুদ্র হতে পারে আবার বৃহৎও হতে পারে।

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র-ই" (১৬ ঃ ৭৭)। এখানেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল ব্যাপারেই পরিপূর্ণরূপে জ্ঞান রাখেন শুধুমাত্র 'আল্লাহ্'। কেননা তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবার প্রতিপ্রালনকারী। তাই মানুষ উক্ত যোগ্যতার অধিকারী না হওয়ায় কখনো সকল দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ের ব্যাপারে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করার প্রশ্নই আসে না। এই প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সম্প্রদায় যা কিছু উদ্‌ঘাটন করেছে এবং করতে পারছে এই মহাবিশ্বে, তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সম্ভব করে তুলতে পারছে না। এখানে মূলতঃ আবিষ্কারের সকল প্রকার সফলতার পিছনে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র-ই সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তিনি যখন কোন বিষয় মানব সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ করতে চান, তখন সেই বিষয়টি মানব মনে জাগ্রত করে দিয়ে ঐ বিষয়ের পিছনে অধ্যবসায়ের সাথে যেন মানুষ সময় ও সম্পদ নিয়োজিত করতে পারে সে ব্যবস্থা ও তিনি নিজ থেকেই অদৃশ্যভাবে সম্পাদন করে দেন। ফলে সমাজের জ্ঞানীজন গবেষণা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকায় এক সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন কিছু আবিষ্কার করে তারা আমাদের জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মুখে তা তুলে ধরেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মানব সম্প্রদায় আবিষ্কার সম্পন্ন করার পিছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলেও বাস্তবে কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই। কেননা এই আবিষ্কারের পিছনে পূর্ণ সফলতা নির্ভর করছে তাঁর করুণার ওপর। কোন মানুষের কিংবা মানমন্দির অথবা কোন ল্যাবরেটরীর ওপর নয়। থাকলে

অবশ্যই বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কারের পূর্বেই দিন, তারিখ, ও সময় কাঁটায়-কাঁটায় নির্ধারণ করতে সক্ষম হতেন। আবিষ্কারের সোনার হরিণ ধরার আশায় অন্ধকারে হাতড়িয়ে দিন, মাস, বছর এমনকি শতাব্দী পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে দীর্ঘ দিন চেষ্টা সাধনা করার পরও কোন কোন বিষয়ে অবিশ্বাস্যরূপে বিফল হতে হয়েছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে আবিষ্কারের ব্যাপারটি মানবসমাজের হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়; বরং 'আল্লাহ্'র হাতেই এবং তা তাঁর-ই পরিকল্পনানুযায়ী বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মানুষের জ্ঞানের পরিপক্কতার সাথে সঙ্গতি রেখেই তিনি পরিকল্পনা তৈরী করেছেন এবং সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক সামঞ্জস্যতা রক্ষার মাধ্যমে ১টি ১টি করে উচ্চজ্ঞান সম্পন্ন বিষয় আবিষ্কারের পথে মানব সম্প্রদায়কে ছাড় দিচ্ছেন। সেই সুবাদে মানুষ আবিষ্কারে সফল হচ্ছে।

এই বাস্তব সত্য বিষয়টি ফুটে উঠেছে নিম্নে উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঐশী বাণীটিতে- "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের (আবিষ্কারের) নিদির্ষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা (পর্যায়ক্রমে) অবহিত হইবে" (৬ ঃ ৬৭)। এখানেও স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাবিশ্বে প্রতিটি বিষয়ের 'তথ্য ও তত্ত্ব' যতটুকু 'আল্লাহ্' মানুষকে জানিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন, তার প্রত্যেকটির জন্য 'সময়' তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং ঐ নির্দিষ্ট সময় আগমন করার পরই কেবল তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষ আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে সে বিষয়ে ততটুকু অবহিত হতে সক্ষম হবে। এর চেয়ে বেশি কিংবা পূর্বে কখনও কোন কিছু জানতে বা আবিষ্কার করতে মানুষ সক্ষম হবে না, এটা একেবারেই মানব মন্ডলীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। মহাবিশ্বব্যাপী এটাই মৌলিক কথা, কেননা "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহা সাফল্য" (১০ ঃ ৬৪)। পৃথিবী কেন? সমগ্র মহাবিশ্বটি চিরদিনের জন্যই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মহান গৌরব-গরীমা ও মহীয়ান স্রষ্টা, একমাত্র মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিশালী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 'আল্লাহ্'র কথার কোন প্রকার নড়-চড় হতে পারে না। এটা কক্ষনই সম্ভব নয়। কোন বিষয়ের কতটুকু পরিমান তিনি কিভাবে কখন-কখন মানুষকে অবহিত

করবেন, তাও তাঁর নিজ ইচ্ছার ওপর যে নির্ভর করছে নিম্নে উদ্ধৃত ঐশী বাণীতে তা প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। "যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ব (আবিষ্কার কিংবা উদ্‌ঘাটন) করিতে পারে না" (২ ঃ ২৫৬)। এখানে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, এই মহাবিশ্বে যে কোন ব্যাপারে কোন 'তথ্য ও তত্ত্ব'-এর যতটুকু আমাদের এই পৃথিবীর আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা সক্ষম হয়েছি এবং হচ্ছি- তা কেবল 'আল্লাহ্ তায়ালার' ইচ্ছা ও তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকতাকে যতটুকু অনুকুল করে দেয়া হয়েছে এবং ঐ অবস্থায় আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও তৎপরতার একত্রে যতটুকু সমন্বয় ঘটাতে আমরা পেরেছি তার ওপর-ই। বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের অর্জিত জ্ঞানের বাইরে এখনও বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার মানবজাতির অজানা-ই রয়ে গেছে। সে সম্পর্কে 'আল্লাহ্' যখন যতটুকু ইচ্ছা করে ছাড়া দিবেন, তখন ততটুকু-ই আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে অবহিত হতে পারবো। তবে একটি কথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, এই মহাবিশ্বের গোপনীয় অদৃশ্য জ্ঞানের একটা বিরাট অংশ-ই তিনি মানবজাতিকে অবহিত করবেন না। এমনকি সকল নবী-রাসুলগনকেও না। শুধু মাত্র তাঁর পছন্দনুযায়ী কয়েকজন রাসুলকে তিনি অবহিত করবেন। নিম্নে সেই অনন্য ঐশীবানী উদ্ধৃত হল। "অদৃশ্য সম্পর্কে (পরিপূর্ণভাবে) তোমাদিগকে আল্লাহ্ অবহিত করিবার নহেন। তবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুলগণের ওপর ঈমান আন"। (৩ ঃ ১৭৯)

এখানে কুরআনের উদ্ধৃত মাত্র কয়েকটি ঐশীবানীর প্রেক্ষাপটে আমরা অবগত হতে সক্ষম হয়েছি যে, এই মহাবিশ্বের কল্পনাতীত বিশাল জ্ঞান ভান্ডার হতে এই পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি তা এতই নগন্য যে তুলনারও যোগ্য নয়। কিয়ামাতের পূর্ব মূহুর্তপর্যন্ত মানুষ ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী অনেক কিছুই অবহিত হওয়ার পর তখনও নগন্য জ্ঞানের আওতামুক্ত হতে পারবে না। কেননা মূল জ্ঞানের ভান্ডার তথা আল্লাহ্র জ্ঞানের বিশালতা এবং মহাবিশ্বের নানাবিধ কর্মকান্ডে তাঁর

প্রয়োগের ব্যাখ্যা যদি সাগর-সাগর ভর্তি কালি দিয়ে লিখা হয় তবুও তা লিখে কখনও সমাপ্ত করা যাবে না। যার কিছু কিছু নমুনা আমরা ইতোমধ্যেই উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় দর্শন লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি এবং উক্ত বক্তব্যের সত্যতা যে কত দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত তা-ও কিছুটা অনুধাবন করার সুযোগ পাচ্ছি। "বল, আমার প্রতিপালকের (জ্ঞানপূর্ণ) কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, আমি ইহার সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিলেও" (১৮ ঃ ১০৯)।

অতএব বর্তমান সময় পযর্ন্ত আবিষ্কৃত বা উদ্‌ঘাটিত সকল ক্ষেত্রেই 'তথ্য ও তত্ত্ব'কে কখনই সর্বশেষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না বলেই 'কুরআন' আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়ে দিয়েছে। তবে প্রতিটি যুগ বা সময় কালে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের যতটুকু প্রমাণিত হয়ে আগমন ঘটবে, ঐ যুগ বা সময়কালের মানবমন্ডলীর পার্থিব জীবনের দায়-দায়িত্ব ততটুকু সীমার মধ্যেই জবাবদিহিতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। "আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না" (৩ ঃ ২৫)। অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের সময়কালে যে যে বিষয়ের যতটুকু সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হবে শুধু ততটুকু সীমার মধ্যেই তাদের জবাবদিহিতা ঘুরপাক খাবে। এটাই নিরপেক্ষ বিচারের রায়।

সুতরাং তুলনামূলকভাবে অতি নগন্য জ্ঞানের অধিকারী মানবমন্ডলী মহাজ্ঞানের সাগরে ভাসমান এই মহাবিশ্বে তাদের নিজস্ব সময়কালে আবিষ্কৃত কোন 'তথ্য ও তত্ত্ব' কেই সর্বশেষ উদ্‌ঘাটন বলে দাবী করার কোন প্রকার অধিকার রাখে না।

বিজ্ঞানের যাত্রার প্রথম দিন থেকেই বিজ্ঞান একটি বিষয় মানবমন্ডলীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে যাচ্ছে অহরহ যে, এই মহাবিশ্বে আবিষ্কৃত বা উদ্‌ঘাটিত কোন বিষয়ের 'তথ্য ও তত্ত্ব'-ই চূড়ান্ত বা সর্বশেষ বলে বিবেচিত হতে পারে না। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিষয়গুলো প্রতিদিন নিত্য-নতুন তথ্য সরবরাহ করে রীতিমত চমক সৃষ্টি করে চলেছে। এই নিত্য-নতুন তথ্যগুলোর অধিকাংশই পূর্বের সরবরাহকৃত

তথ্যের প্রতিকূলে নয় বরং অনুকূলেই থাকছে। এতে মনে হচ্ছে কোন গোপন একটি উৎস থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো প্রতিনিয়তঃই ক্রমোন্নতি লাভ করে যুগের উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বেরিয়ে আসছে। যুগ যত উন্নত হচ্ছে আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক 'তথ্য ও তত্ত্ব' ততই উচ্চতর জ্ঞান সম্পন্ন নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করছে। বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আইনষ্টাইন' স্থান, সময় ও কালের এই অস্বাভাবিক চরিত্র অবহিত হওয়ার পর-ই ১৯০৫ সালে 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Special Theory of Relativity) এবং ১৯১৬ সালে 'সাধারন আপেক্ষিক তত্ত্ব' (General Theory of Relativity) প্রকাশ করে যুগশ্রেষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে গিয়েছেন এই মহাবিশ্বে 'ষ্টান্ডার্ড সময়' (Standard Time) বলতে কোন 'সময়' এর অস্তিত্ব নেই। সকল 'সময়' ই আপেক্ষিক। অর্থাৎ স্থানের (Space) ওপর নির্ভর করেই সময়ের মান স্থানীয় ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ফলে সকল জগতের নিজস্ব 'সময়' স্কেল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এর ওপর ভিত্তি করেই প্রতিটি জগতের অগ্রগতি ও উন্নতিও এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, মানব সমাজ তাদের স্থানীয় এই পৃথিবীর 'সময়'-এর অগ্রগতির ধাপে ধাপে জ্ঞানের উন্নতির প্রসারতাও একটু একটু করে টেনে আনছে। ফলে এই উন্নতির কারণে পূর্বের উদ্‌ঘাটিত বিষয়ের জ্ঞানের তুলনায় নতুন উদ্‌ঘাটিত বিষয় বা তথ্য অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ও উন্নততর হয়ে ধরা দিচ্ছে। আজকে বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের দিকে তাকালেই এর জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা যায়। এতে করে এই মহাবিশ্বে জ্ঞানের মূল উৎস যে কত ব্যাপক উচ্চতর জ্ঞানময়, কত বিশাল তা অনুমান করাও মানবীয় জ্ঞানে এক অসাধ্য ব্যাপার। যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আইনষ্টাইন' বিশাল সেই জ্ঞান ভান্ডার ও তার গভীরতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাড়িয়ে তিনি দু'একটি বালি-কণা মাত্র নাড়া-চাড়া করে গেলেন। এর বেশী কিছুই করে যেতে পারেননি। অর্থাৎ, তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে মানুষ সম্মিলিতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আবিষ্কার-উদ্‌ঘাটন সম্পন্ন করার পরও মূল জ্ঞান সাগরের তীরে এখনও বালি-কণা সমতুল্য পর্যায়ে রয়েছে। মহাবিশ্বে বিরাজমান জ্ঞান সাগরের সাথে যার কোন প্রকার তুলনা-ই হতে পারে না। উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে

আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, এর ব্যবস্থাপনা, এর পরিচালনা ও এর সার্বিক নিয়ন্ত্রণের পিছনে লুকায়িত বিশাল জ্ঞানের সমাহারের এক বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান বিশ্ব এই পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের যা কিছুই আবিষ্কার করেছে, তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে চূড়ান্ত বিজয় কিংবা সর্বশেষ রহস্র উন্মোচন সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ সবসময়ই সন্দিহান ছিলেন। পূর্বের সেই সন্দেহ যে সঠিক ছিল তা সময়ের আবর্তনে ঐ বিষয়গুলোর আরও নতুন নতুন তথ্য আবিস্কৃত হয়ে বাস্তবে প্রমাণ করছে। বিজ্ঞান বিশ্ব তাই কোন আবিষ্কারকেই ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত সফলতা বলে দাবী করে না। উদাহরণস্বরূপ আমাদের আলোচিত বর্তমান অধ্যায়টি সম্মুখে তুলে আনা যায়। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকে মানব সমাজের জ্ঞানীজন এই দৃশ্যমান জগতের ক্ষুদ্রতর মৌলিক গঠন উপাদান সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে প্রথম প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশ্বজাহান মৌলিকভাবে মাটি, পানি, অগ্নি ও বাতাস নামক ৪টি উপাদান দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে।

পরবর্তীতে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে দার্শনিক 'ডেমোক্রিটাস' আবিষ্কার করেন 'পরমাণু' (Atom) কে। তিনি প্রস্তাব করেন 'আর কাটা যায় না' এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা দিয়েই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে উক্ত প্রস্তাব উনিশ শতকে এসে আরও বিস্তারিতভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। ১৮০৩ সালে বিজ্ঞানী 'জন ডেল্টন' ঘোষণা করেন প্রতিটি বস্তুরই আলাদা আলাদা 'পরমাণু' রয়েছে। একাধিক 'পরমাণু' মিলিত হয়ে 'অণু' এবং একাধিক তথা বহু সংখ্যক 'অণু' মিলিত হয়ে 'বস্তু' গঠিত হয়েছে। এরপর ১৮৬৯ সালে রাশিয়ান ক্যামিষ্ট 'ডিমিত্রি ইভানভিচ ম্যানডেলেয়েফ' পরমাণু সম্পর্কে আরও গভীর রহস্যপূর্ণ তথ্য বিশ্ববাসীকে উপহার দেন। পরমাণুর পারমাণকি ওজনের ওপর ভিত্তি করে একটি 'পিরিয়ডিক ট্যাবল্' (Periodic Table) তৈরী করেন। যে ট্যাবলটিতে বস্তুর পরমাণু জগতের নির্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলা ও পদ্ধতির এক আশ্চর্যজনক রিপোর্ট প্রদর্শিত হয়। ফলে এই পর্যায়ে বিশ্ববাসী 'পরমাণু' জগতের বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ অনেক রহস্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী

অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী 'রাদার ফোর্ড' এসে 'পরমাণু' জগতের নিউক্লিয়াসে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকাদের উদ্‌ঘাটন করেন এবং এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে আবর্তনরত 'ইলেকট্রন' কণিকাদের আচরণকে সৌরজগতের সাথে তুলনা করে প্রমাণ করেন মহাবিশ্বে কোথাও কেউ স্থির নেই, সর্বত্রই চলছে গতির অবর্ণনীয় প্রতিযোগিতা।

১৯১৩ সালে 'নীল বহ্‌র' (Niel Bohr) 'পরমাণুর' অভ্যন্তরে 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকার 'কোয়ান্টাম জাম্প'-এর কারণে যে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে থাকে তা প্রথমবারের মত প্রদর্শন করেন এবং ১৯২২ সালে তিনি এই বিষয়ে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯২৩ সালে বিজ্ঞানী 'Cock Croft' ও তার সহযোগী 'Ernest Walton' পরমানুর নিউক্লিয়াস প্রথমবারের মত ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হন।

১৯৩৪ সালে 'এ্যানরিকো ফার্মি' আবিষ্কার করেন যে, পরমানুর 'নিউট্রন' কণিকাকে পানি বা প্যারাফিনের মধ্যে ধীরগতি সম্পন্ন করে তোলা যায় এবং ঐ অবস্থায় অন্য কোন নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তার সাথে জুড়ে দেয়া যায়।

১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী 'Lise Mietner' ও 'Otto Hahm' ওপরে উল্লেখিত 'নিউট্রন' কণিকাকে 'ইউরেনিয়াম-২৩৫' (Uranium-235)-এর নিউক্লিয়াসে আঘাত করে 'Fission' পদ্ধতিতে পারমানবিক বোমার রহস্য প্রথমবারের মত আবিষ্কার করেন। যেখানে কল্পনাতীত তাপশক্তি (Radiation) নির্গত হয়।

এদিকে বিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞান বিশ্ব 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) আবিষ্কার করে এর থেকে প্রাকৃতিকভাবে নির্গত এবং ল্যাবরেটরীতে আবিস্কৃত সবমিলিয়ে প্রায় শতাধিক 'মহাসুক্ষ্ম বস্তু কণিকার' অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন।

বিংশ শতাব্দীর 'সত্তর' দশকে বিজ্ঞানী 'Gell Mann' পরমানুর ক্ষুদ্র কণিকা (Sub Atomic Particles) 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকাসমুহ

যে আন্তঃগঠন সম্পন্ন এবং 'কোয়ার্ক' নামক মহাসুক্ষ্ম কণিকা দিয়ে গঠিত সে রহস্য উন্মোচন করেন। তিনি 'কোয়ার্ক' কণিকা পরিবারের ৩টি সদস্যকে পৃথকভাবে সনাক্ত করতেও সক্ষম হন (Up Quark, Down Quark, ও Strange Quark)।

এরপর '৮০'-এর দশকে 'Samuel Ting' ও 'Burton Richter' কোয়ার্ক পরিবারের ৪র্থ সদস্যকে (Charm Quark) আবিষ্কার করেন এবং ১৯৭৬ সালে তারা নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞানী 'Sau-lan- Wu' পরমানুর ভিতর কার্যরত 'গ্লুওন' (Gluon) নামক মহাসুক্ষ্ম কণিকা আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন যে এই 'গ্লুওন' (Gluon) কনিকা-ই পর পর ৩টি 'কোয়ার্ক' কে একত্রিত অবস্থায় জোড়া লাগাতে 'Binding Energy' রূপে কাজ করে থাকে। ফলে তাতে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অতি সম্প্রতি 'Big Bang' বিশ্লেষকগণ তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে জানিয়েছেন যে, আবিস্কৃত বস্তুর সর্বশেষ মৌলিক উপাদান 'কোয়ার্ক' (Quark) সৃষ্টি হয়েছে আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) থেকে। Big Bang মহাবিষ্ফোরণ ঘটার পর 'রেডিয়েন্ট' এনার্জি দিয়ে সমগ্র নবীন মহাবিশ্ব ভরপুর হয়ে যায়। তাপমাত্রার নিম্নগতির এক পর্যায়ে 'ফোটন' কণিকাসমূহ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে পরিণতি স্বরূপ 'কোয়ার্ক' কণিকার জন্ম দিয়েছে।

এদিকে 'Big Bang Model '-এর 'কোয়ার্ক' সম্পর্কীয় উক্ত ধারণা যেখানে এসে সমাপ্তি টানতে চাচ্ছে ঠিক সেখান থেকেই আরও বহু ক্ষুদ্র জগতের ধারণা নিয়ে এগিয়ে এসেছে বর্তমান 'String Theory'। এই প্রস্তাবের ধারণা অনুযায়ী 'কোয়ার্ক '(Quark)-ই সর্বশেষ মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকা নয়, বরং তার আগে আরও মহা-মহাসূক্ষ্ম 'ষ্ট্রীং'(Sthing) জগত রয়েছে এবং ঐ প্রস্তাব বিজ্ঞানের অমীমাংসিত প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম (যথাস্থানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)।

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই বিশজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক বস্তুকণার সন্ধান করতে মানব সম্প্রদায় যে যাত্রা শুরু করেছিল, দীর্ঘ সেই

পথ চলার ফাঁকে ফাঁকে এক এক সময় এক এক প্রকার বস্তুকণা আবিস্কৃত হয়ে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। প্রতিবারের প্রতিটি আবিষ্কারের বেলায়-ই মনে হয়েছে এই বুঝি সর্বশেষ তথ্য আৰিস্কৃত হল। এই বুঝি সর্বশেষ রহস্য হাতের মুঠোয় এসে গেল। কিন্তু অল্পদিন পরেই দেখা গেল নতুন আবিষ্কার এসে পূর্বের আবিষ্কারের চাইতে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে আরও উন্নততর জ্ঞানের সমাহার নিয়ে মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এতে তারতম্য ঘটেছে শুধু জ্ঞানগত উন্নততর কাঠামোগত। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের এই জাতীয় ধারাবাহিকতাকে কেউ কেউ পিঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর সাথে তুলনা করেছেন। পিঁয়াজের ওপরের খোসা ছাড়ানোর পর পরবর্তী খোসার সাক্ষাৎ। ঐ খোসা ছাড়াবার পর আরও খোসার সাক্ষাৎ এবং এইভাবে খোসা ছাড়াবার ন্যায় অগ্রযাত্রা বিজ্ঞানবিশ্বে অন্তহীন। তাই বিজ্ঞানের কোন বিষয়ের আবিষ্কারকে ঐ পর্যায়ে সর্বশেষ আবিষ্কার কিংবা সর্বশেষ তথ্য উন্মোচন হিসেবে সনাক্ত করা যাবে না। যেহেতু মহাবিশ্বের জ্ঞানসাগর-এর কুল-কিনারা সম্পর্কে কোন ধারনা বা জ্ঞান মানবজাতি হিসেবে আমাদের নেই। তাই কোন বিষয়ের চলতে থাকা কোন আবিষ্কারকেই আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, এটিই সর্বশেষ আবিষ্কার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সর্বশেষ 'তথ্য ও তত্ত্ব'? অন্তত নগন্য জ্ঞানসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর পক্ষে তা কখনোই সম্ভবপর নয়। হয়তো ঐ বিষয়ে এমনও হতে পারে যে পরবর্তী উদ্‌ঘাটন এমন উন্নততর জ্ঞানগত কাঠামো নিয়ে হাজির হবে যে, যে জ্ঞানের কোন কিছুই পূর্বে আমরা অর্জন করার সুযোগই পাইনি, যা হবে আমাদের প্রাপ্ত পূর্ব জ্ঞানের গন্ডীর সম্পূর্ণ বাইরে। এই পর্যায়ে তাই আমাদের কাজ হবে প্রতিটি পর্যায়ের উদ্‌ঘাটিত সঠিক তথ্যগুলোকে সযত্নে তুলে ধরা। কেননা প্রতিটি আবিষ্কার ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে পর্যায়ে এবং ভিন্ন-ভিন্ন আলাদা বক্তব্য নিয়ে হাজির হলেও সকল তথ্য ও তত্ত্বগুলো সঠিকভাবে একটি বিষয়কেই উপস্থাপনে যে নিবেদিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটি উদাহরণ পেশ করে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝানো যেতে পারে। যেমন- একটি লোক গভীর রাতে ল্যাবরেটরীতে তার গবেষণার টেবিলে বসে একখন্ড সাদা কাগজের ওপর প্রয়োজনীয় নোট লিখ্‌ছে। এই অবস্থায় একটি পিঁপড়া টেবিলের একটি পা বেয়ে

ওপরে উঠে শুধু খচ্ খচ্ শব্দ শুনতে পেল, কিন্তু ঐ শব্দের কোন কারণ উদ্‌ঘাটন করতে না পেরে অপারগ অবস্থায় টেবিলের অপর প্রান্ত দিয়ে পা বেয়ে নেমে পড়লো। পরে নিজ দলের নিকট গিয়ে রিপোর্ট করলো- টেবিলের ওপর এক প্রকার খচ্ খচ্ শব্দ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এর কোন কারণ সে খুঁজে পায়নি। এই তথ্য লাভ করার পর দলের অন্য একটি পিঁপড়া শব্দের রহস্য উন্মোচনের লক্ষে একইভাবে টেবিলের ওপর উঠে পূর্বের পিঁপড়াটির ন্যায় খচ্ খচ্ শব্দ শুনতে পেল। এর কারণ হিসেবে সে দেখতে পেল টেবিলের ওপর রক্ষিত একখন্ড সাদা কাগজের ওপর থেকেই শব্দ বেরিয়ে আসছে। নতুন আবিষ্কারের বুক ভরা আনন্দ নিয়ে পিঁপড়াটি দ্রুত গতিতে নেমে দলের নিকট উপস্থিত হয়ে রিপোর্ট করলো এই বলে যে, টেবিলের ওপর ঐ খচ্ খচ্ শব্দের কারণ হচ্ছে এক খন্ড সাদা কাগজ। ওপর থেকেই শব্দের উৎপত্তি। সবাই তাকে বাহবা দিল।

এরপর তৃতীয় আরেকটি পিঁপড়া আরও গভীর মনযোগ নিয়ে একইভাবে টেবিলের ওপর উঠে পূর্বের পিপড়াদের ন্যায় খচ্ খচ্ শব্দ শুনতে পেয়ে এর কারণ উদ্‌ঘাটনে এগিয়ে গিয়ে দেখে যে, টেবিলের ওপর রক্ষিত এক খন্ড সাদা কাগজের ওপর একটি 'কলম' খুব দ্রুততার সাথে কি যেন লিখে যাচ্ছে আর তাতে ঐ খচ্ খচ্ শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। এতটুকু উদ্‌ঘাটনে পিঁপড়াটি আনন্দে উদ্বেল হয়ে টেবিল থেকে নেমে পড়লো এবং দলের নিকট গিয়ে রিপোর্ট করলো এই বলে যে, তার আবিষ্কার এইবার বিষয়টির পূর্ণতা আনয়ন করেছে। টেবিলের ওপর রক্ষিত সাদা কাগজের ওপর একটি কলম অনবরত লিখে যাচ্ছে বলেই ঐ শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। দলের বাকী সকল পিঁপড়া এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'আমরা এবার সফল হয়েছি।' কিন্তু বাঁধ সাধলো বিরোধী গ্রুপের একটি কম বয়সী পিঁপড়া। সে বললো বিষয়টিতে আরও কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, তাই এখানেই ঘটনার ইতি টানা যাবে না। নতুন বাড়তি কিছু আবিষ্কারের আশায় এবার সে নিজেই টেবিলের ওপর উঠে গেল। পূর্বের রিপোর্টের সাথে সব মিলিয়ে দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে নিজ দৃষ্টিকে গভীর থেকে আরও গভীরে নিয়োজিত করে দেখতে পেল সাদা কাগজটির ওপর যে কলমটি লিখছে সেই কলমটি নিজ থেকে লিখতে পারছে না, একটি শক্ত

'হস্ত' কলমটিকে ধারণ করে যেভাবে লিখ্তে চাচ্ছে কলমটি কেবল সেভাবেই লিখে যাচ্ছে। চতুর্থ এই পিঁপড়াটি আবিষ্কারের আনন্দে বাগ-বাগ হয়ে দলের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, 'আমি এবার বিষয়টির মূল রহস্য উন্মোচন করেছি এবং এটাকেই সর্বশেষ রিপোর্ট বলা যায়। বিষয়টি হচ্ছে একটি হাত কলমকে ধারণ করে লিখতে চাচ্ছে বলেই কলমটি লিখে যাচ্ছে আর তাতেই খচ্ খচ্ শব্দ হচ্ছে'। সকল পিঁপড়া এক যোগে হাত তালি দিয়ে বাহ্বা বাহ্বা করে তাকে স্বাগত জানালো। তারা বললো এই রিপোর্টের পরে আর কোন প্রকার রিপোর্ট থাকতে পারে না। এটাই সর্বশেষ রিপোর্ট। কিন্তু এক পর্যায়ে পিঁপড়াদের ঐ দলে বিজ্ঞানী যে কয়টি পিঁপড়া ছিল, ওদের জ্ঞানরাজ্যে বিষয়টি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করায় ওদের মধ্যে থেকে এক এক করে পরবর্তীতে ঐ টেবিলের ওপর আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হলো। ফলে পর্যায়েক্রমে ওদের একটি পিঁপড়া টেবিলের ওপর ঐ হস্তের সাথে একজন মনুষের দেহ আবিষ্কার করলো, পরবর্তী পিঁপড়া ঐ দেহ যে একজন গবেষক ও বিজ্ঞানীর দেহ তা আবিষ্কার করলো, তারও পরের পিঁপড়াটি ঐ টেবিলে বিজ্ঞানী লেখকের সাথে তার সহকর্মী আরও কয়েকজনের উপস্থিতিও সনাক্ত করতে সক্ষম হলো। সর্বশেষ অভিযান পরিচালনাকারী পিঁপড়াটি আরও অগ্রসর হয়ে ঐ টেবিলের ওপর সংঘটিত পূর্বের সকল আবিষ্কারের সাথে সাথে নতুন বাড়তি আবিষ্কাররূপে সমগ্র কক্ষটিকে একটি বিজ্ঞানাগার হিসেবেও সনাক্ত করতে সমর্থ হল।

এখন ওপরে বর্ণিত উদাহরণটিতে উপস্থাপিত অসংখ্য রিপোর্টের মধ্যে কোনটিকে 'সত্য' আর কোনটিকে 'মিথ্যা' বলা যাবে? প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি পিঁপড়ার রিপোর্ট-ই ছিল সত্য। তবে যে যতটুকু তার জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পেরেছিল ঠিক ততটুকুই সে তার রিপোর্টে তুলে ধরেছিল। অর্থাৎ, সময়ের সাথে ওদের জ্ঞানের যতটুকু অগ্রাযাত্রা ঘটেছিল কেবল তারই আলোকে ওরা উদ্‌ঘাটিত বিষয়কে পেশ কেরছিল। একটি বিশাল ঘটনার এক একটি পর্যায় বা অংশ ওরা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। ঘটনার বিস্তৃতি বহু দূর থাকার পরও ওরা প্রতিবারে খুব বেশী একটা অগ্রসর হতে পারেনি। শেষের দিকে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে একটি

বিজ্ঞানাগার পর্যন্ত আবিষ্কারে ওরা সফল হয়েছে। এখানে পুরো ঘটনাটি একটি পিঁয়াজের ওপর থেকে একটি একটি করে খোসা ছাড়ানোর মতই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এই জাতীয় বাস্তব বহু সংখ্যক এমনকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিজ্ঞান বিশ্বে এটাই প্রাধান্য পেয়েছে যে কোন আবিষ্কারকেই চূড়ান্ত বা সর্বশেষ বলা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণিকার রহস্য উন্মোচনে আমাদের পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ধারাবাহিকভাবে আবিস্কৃত বস্তুর ক্ষুদ্রতম ও সর্বশেষ কণিকা 'কোয়ার্ক' ও 'লেপটন' পর্যন্ত আমেরিকান বিজ্ঞানীগণ বেশী প্রাধান্য অর্জন করেছেন এবং 'কোয়ার্ক' ও 'লেপটন' পর্যন্তই এই ধারাবাহিকতার পর্যায় একপ্রকার চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই সেইদিন ২০০০ সালে ইউরোপীয় 'কণা পদার্থ বিজ্ঞানীগণ' (Particle Physcists) প্রেস কন্‌ফারেন্স করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানব সমাজকে অবহিত করেছেন এই বলে যে, 'কোয়ার্ক' এবং 'লেপটন'-ই বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণিকা নয়। তারা চ্যালেঞ্জ করেছেন 'কোয়ার্ক'-এর পূর্বে আরও কয়েকটি ধাপ তাদের গবেষণায় ধরা পড়েছে এবং অচিরেই তারা তা প্রকাশ করবেন। এই সেই পিঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত অবস্থা! যার ইতি টেনেও শেষ করা যায় না। সুতরাং এই মহাবিশ্বে বর্তমানে আবিস্কৃত বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশকে চূড়ান্ত বা সর্বশেষ বলা যাবে না। এই না যাওয়ার পিছনে আল্-কুরআন 'আল্লাহ তায়ালার' পরিকল্পনা ও তাঁর সিদ্ধান্ত বিষয়ক যে তথ্য আমাদেরকে সরবরাহ করেছে, বিজ্ঞানের প্রমাণ ভিত্তিক ও তথ্যবহুল বক্তব্যও সেই একই দিকে ইংগিত প্রদান করছে। এতে আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'কুরআনের' সাথে সঠিক 'বিজ্ঞানের' কোন মত-পার্থক্য নেই। উভয়-ই যেন একই উৎস থেকে আগমন করেছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে।

চিত্র -১৫৫

"তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।" (৬ ঃ ১০১)
"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে শুধু মাত্র আল্লাহর-ই।"
(১৬ ঃ ৭৭)

-- ওপরের ছবিতে একটি বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাইরের পরিবেশ থেকে বাড়ীটির যতটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তাতে ভেতরের তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন কেউ বাড়ীটির ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে চাইলে তখন শুধু ভেতরের একটা নির্দিষ্ট অংশই দেখতে পারে পুরোটা না, এবং বাইরের বর্তমান দৃশ্যতো দেখার তখন প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ একই জায়গায় অবস্থান করে কখনই মানুষ একটি বিষয়ের ভেতর ও বাইরের সকল অবস্থা একইসাথে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে অবহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং আমাদের এই মহাবিশ্বের সার্বিক মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য জগত সম্পর্কে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আমরা কখনই পরিপূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাব না। তাই বর্তমান মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগত যতটুকু আবিস্কৃত হয়েছে এটাকেই চূড়ান্ত বা শেষ বলা যাবে না।
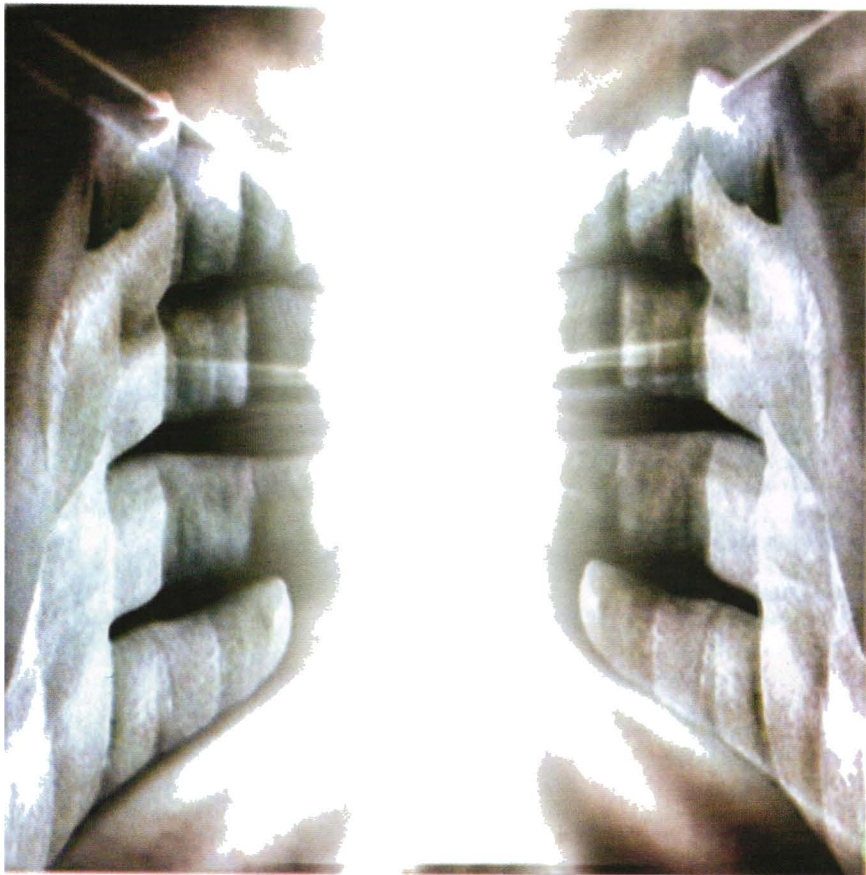
চিত্র -১৫৬

"অদৃশ্য সম্পর্কে (পরিপূর্ণরূপে) তোমাদিগকে আল্লাহ্ অবহিত করিবার নহেন। তবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুলগণের ওপর ঈমান আন।" (৩ ঃ ১৭৯)

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রায় আড়াই হাজার বছর থেকেই মানব ইতিহাসে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধান চলছে এ মহাবিশ্বের মৌলিক অবিভাজ্য ও আন্তঃগঠন কাঠামো বিহীন মহাসূক্ষ্ম বিল্ডিং ব্লকরূপী উপাদান উদ্‌ঘাটনের লক্ষে। কিন্তু এ যাবৎ প্রকৃতপক্ষে পিয়াজের খোসা ছাড়াবার মতই অবস্থা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এতে বিচলিত হয়ে বিব্রত বোধ করছেন বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজ। এক দিকে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার নিয়োজিত থেকেও সমাপ্তি লাইনে পৌঁছুতে না পেরে হতাশা, অপরদিকে যতই মহাসূক্ষ্মতার গভীরে প্রবেশ করা হচ্ছে- ততই বিজ্ঞানীগণ Three dimensional Quarks কে অতিক্রম করে Eleven dimensional tiny 'Vibrating Strings' এবং 'Membranes'-এর সম্মুখীন

হচ্ছেন। এ পর্যায়ে 'String' এবং 'Membrane'গুলো বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইনের 'Special relativity' কে উপক্ষো করে শুধু মানছে Own version of Special relativity. যে কারনে সেথায় আলোর বর্তমান গতি উপেক্ষিত এবং অনিয়মিত গতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কনাপদার্থ বিজ্ঞানীগণের (Particle Physicists) কেউ বলেছেন 'May be its impossible to discover these deepest Structures'.

কেউ বলেছেন- 'We can never determine what that basic "Stuff" is'.

আবার কেউ বলেছেন- 'May be we can never see much deeper into reality than the level of these subatomic particles'.

'The under lying equations of the Universe Can not be determined from what we know'.

'If all we could observe was the quasi particles, we would not be able to tell.'

আবার Mr. Robert laughlin (a Novel laureate at Standford University) বলেছেন- 'May be the Nature of reality is hidden from us. Everything is emergent, but we will never know what from'.

এ বিষয়ে ওপরে প্রদর্শিত ছবিটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। ছবিটি 'New Scientist' ম্যাগাজিন-এ ৯-ই ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালের সাপ্তাহিক কপির প্রচ্ছদ। এতে উল্লেখিত বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক পর্যায়ে প্রশ্নাকারে বলা হয়েছে- 'কেন প্রকৃত বাস্তবতা তোমার হাতের অংগুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে?' এর উত্তরে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা বিজ্ঞানীদের ওপরে উল্লেখিত কারণগুলোকেই চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে বলতে গেলে ছবিটির নীচে উদৃত পবিত্র ঐশী বাণীটিকেই উপস্থাপন করতে পারি।

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে মানব সম্প্রদায় কখনই চূড়ান্ত ও শেষ বাস্তবতায় পৌছতে পারবে না। এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। সুতরাং মানবীয় চেষ্টা সাধনায় আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে একের পর এক আবিষ্কার সম্পন্ন করবে, কিন্তু চূড়ান্ত বিন্দুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পৌঁছুতে পারবে না। পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতই বিষয়টি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকবে। অতএব মহাসূক্ষ্ম মৌলিক অদৃশ্য বস্তুকণা বর্তমান 'কোয়ার্ক'-ই শেষ কথা নয় বা একেই সর্বশেষ বলা যাবে না।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় ১৪০০ বৎসর পূবে আল্-কুরআন উক্ত বিষয়ে মাত্র একটি বারের জন্য যা ব্যক্ত করেছে, বর্তমান বিজ্ঞান এত দীর্ঘ সময় পর চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে হুবহু ঐ একই বিষয়ে একই বক্তব্যই বিশ্ববাসীকে অবহিত করছে। সুতরাং 'কুরআনের' সাথে সঠিক 'বিজ্ঞানের' কোন মতবিরোধ নেই। নেই কোন ভিন্নতা। সবই একই স্রোতে মিশে একাকার হবে মহাবিশ্বব্যাপী এক আল্লাহর গুণ-গানে মুখরীত হচ্ছে।

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁহার বানী কেহ-ই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সমস্ত বিষয়-ই অবগত রহিয়াছেন। (৬ ঃ ১১৫)

"এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

(২) প্রশ্ন ঃ প্রায় শতাধিক উপ-আনবিক মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকা (Sub-Atomic Particles) সমূহকে আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাইনা কেন?

উত্তর ঃ উল্লেখিত প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা পেশ করার-ই দাবী রাখে। আল্-কুরআন এই প্রশ্নটির উত্তরে যা বলতে চায় তা হলো- আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন একটি মহান উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার আলোকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, অপ্রয়োজনীয় কিংবা নিরর্থক কোন কিছুই এর মাঝে সৃষ্টি করা হয়নি। "আমি (আল্লাহ্) আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই" (৩৮ ঃ ২৭)। সর্বশক্তিমান ও একক স্রষ্টা হিসেবে কোন বাজে কাজ কিংবা অনর্থক কিছু করা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। ছোট হোক বা বড় হোক এই মহাবিশ্বে আল্লাহর প্রতিটি কাজের পেছনেই রয়েছে নিখুঁত পরিকল্পনা এবং এক মহা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সে জন্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যা করা দরকার, যা হওয়া দরকার, যে ভাবে করা দরকার এবং যে রূপে করা দরকার তার সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করেছেন। "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।" (৩০ ঃ ৮)। মানব সমাজে অধিকাংশ মানুষ-ই কিন্তু বিষয়টিকে সেভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম বিধায় একজন স্রষ্টার প্রয়োজন বোধ করে না এবং মহাবিশ্বের বিশাল এই বাস্তবতার নজীরবিহীন আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার পিছনেও কোন প্রকার যুক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে বলে মনেও করে না। এদের এই অযৌক্তিক আচরণে প্রতীয়মান হয় অজ্ঞতা ও মূর্খতা এদের ভিত্তিকে ধারণ করে আছে এবং এরা কখনো সত্যপোলব্ধির জন্য কোন নবী, রাসূল বা ঐশী বাণী লাভে ধন্য হতে পারে নি। তাই অন্ধকারের আবর্তেই এদের অস্তিত্ ঘুরপাক খাচ্ছে। "মানুষের মধ্যে কেহ-কেহ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, তাহাদিগের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।" (৩১ ঃ

২০)। যার কারণে অনেক বড় বড় সত্য ঘটনাও এদের অজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে ন্যায্যতা পায় না। এরা প্রকৃত পক্ষে-ই অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মানব সমাজের ভালো করেই জানা দরকার এই মহাবিশ্বে যেখানে যেখানে যা যা দর্শন করছে এবং যতপ্রকার অদৃশ্য বিষয় এর মাঝে নিহীত আছে সমস্ত কিছুই একমাত্র আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আবার দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়কও একমাত্র তিনি। "আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক" (৩৯ ঃ ৬২)। তাই কোন বিষয়ই চাই তা মহাসূক্ষ্ম একটি কণিকা-ই হোক কিংবা বৃহৎ কোন গ্যালাক্সী, কোয়াসার অথবা অন্য কোন মহাজাগতিক বস্তুই হোক সব কিচুর ওপরই তাঁর মহাজ্ঞান ছেয়ে আছে বিধায় তিনি সব জানেন এবং সমস্ত খবর তাঁর নখদর্পনে, এই জন্যই কেউ তাঁর কঠোর হস্তের শাস্তি থেকে যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি আবার তাঁর অবিরত বর্ষিত রহমতে সমস্ত কিছুই সিক্ত এবং সার্বিক কল্যাণ পেয়ে ধন্য হচ্ছে। "তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু" (৩৩ ঃ ৬)। এই কারনে মানব সমাজের কখনোই এটা ভাবা ঠিক হবে না যে মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান বা ক্ষমতা কোন কোন বিষয়ে কমতি আছে কিংবা কোন কোন বিষয়ে তাঁর সামর্থ সীমিত। অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচরণ আবিষ্কার অথবা তৎপরতায় কখনও কখনও এরকম একটা ভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণরূপে অনুচীত। "তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যাহা তিনি অবগত নহেন? নিশ্চয় তিনি অজ্ঞানতা থেকে পবিত্র" (১০ ঃ ১৮)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বত্র সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গঠনগত পর্যায়ে পরিমিতি, নৈপুণ্যতা ও মহাজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করেছেন। কল্পনাতীত এই বিশাল কর্মকাণ্ডটি সংঘটিত করতে তাঁকে শুধু একটি আদেশ করতে হয়েছে 'হও' শব্দটি উচ্চারণ করে। আর অমনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু সৃষ্টির ধারায় এগিয়ে গিয়ে বর্তমান রূপ পর্যন্ত পৌঁছেছে। "আমি (আল্লাহ্) প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে। আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন। চক্ষুর পলকের মত" (৫৫ ঃ ৪৯, ৫০)। "তিনিই যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি

করিয়াছেন, যখন তিনি আদেশ করেন, 'হও' তখনই তা হইয়া যায়, তাঁহার কথা-ই সত্য" (৬ ঃ ৭৩)।
তাঁর এই সৃষ্টি কার্যটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবীয় জ্ঞানে অচিন্তনীয় কর্ম-কৌশল অবলম্বনে সম্পাদিত। এর যাত্রা ঘটানো হয়েছে এমন 'সুক্ষ্মতর' স্তর থেকে যে, সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান মানব সম্প্রদায়ের নেই। মানুষের অর্জিত জ্ঞান ঐ উর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা ও রাখে না। "তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (মহাসূক্ষ্মতার স্তর থেকে) এমন অনেক কিছুই, যাহা তোমরা অবগত নও" (১৬ ঃ ৮)। তবে মানুষ তাদের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণকে এ ব্যাপারে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে এই অদৃশ্য মহাসূক্ষ্মতার গোপনীয় অনেক কিছুই অবহিত হতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে মহাসূক্ষ্মতার কোন পর্যায় থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়েছে তার অনেক তথ্য-ই জানতে পারবে। "তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুসন্ধান কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করিয়াছেন?" (২৯ ঃ ২০)।
এই অদৃশ্য মহাসূক্ষ্মতার গোপনীয় বিষয়ের কিছু কিছু মানুষ তাদের জ্ঞানগত অগ্রযাত্রার কারণে জানতে সক্ষম হলেও সমস্ত অদৃশ্য ও গোপনীয় বিষয় কিন্তু কখনও পূর্ণরূপে অবহিত হতে শত চেষ্টা করেও সফল হবে না। এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিজ থেকেই গৃহীত একটি বিষয় যা অর্জন মানুষের জন্য সব সময়ই অসাধ্য ব্যাপার হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা মহান স্রষ্টা হিসেবে সকল প্রকার দৃশ্য-অদৃশ্যেরই মালিক, যে কারণে সকল গোপনীয়তা তাঁর জ্ঞানের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে সকল সময় ও সকল অবস্থায় প্রকাশিত। শুধু তা-ই নয়, তিনি এদের পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি পূর্বেই পরিকল্পনানুযায়ী তৈরী করে 'লৌহে মাহ্ফুজে' লিখেও রেখেছেন। "বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশন্ডলী ও পৃথিবীতে (পৃথিবীতে) কেহ-ই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না" (২৭ ঃ ৬৫)। "আকাশে ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (লৌহে-মাহফুজে) লিপিবদ্ধ নাই।" (২৭ ঃ ৭৫)
এখন এই যে দৃশ্য ও অদৃশ্য (গোপন) দু'ভাগে মহাবিশ্বের বিভিন্ন উপাদানকে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে দৃশ্যমান জগত

ও এর বিভিন্ন প্রকার বস্তুসম্ভার দর্শন করে, নাড়া-চাড়া করে, ভোগ-ব্যবহার করে মানব সম্প্রদায়ের অনুভবে এই সকল বস্তু সৃষ্টির পেছনে একজন মহান স্রষ্টার উপস্থিতির চিন্তা সক্রিয় হবে। অতঃপর এগুলি যে নিজ থেকেই সৃষ্টি হতে পারে না সে কথার স্বীকৃতি প্রদান করবে। এই সমস্ত বস্তুসম্ভারের কোন কিছুই যে অযথা সৃষ্টিও হয়নি এবং হতে পারে না সেই মহাসত্যকেও মেনে নিবে।

অতঃপর যখন 'অদৃশ্য' বস্তু সম্ভারের বাস্তব উপস্থিতি টের পাবে, প্রমাণ পাবে, তখন একথাও মানবমন্ডলী বিশ্বাসের রাজ্যে স্থান দিতে যেন কুণ্ঠিত না হয় যে, এই মহাবিশ্বের একজন মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' আছেন এবং তিনি অদৃশ্যে (গোপনীয়ভাবে) বিরাজমান থেকে সকল কিছু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। হাজার-লক্ষ ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র-মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকা, ভাইরাস, প্রাণীকোষ ইত্যাদি 'অদৃশ্যে' অবস্থান করে এই মহাবিশ্বে সক্রিয় কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যদি প্রতিটি মূহুর্তের কর্মকান্ডের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারে, তাহলে মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' একমাত্র 'সত্ত্বা' রূপে যে বিরাজমান আছেন এবং প্রতিটি মূহুর্তেই সমস্ত কিছুর সার্বিক প্রয়োজন পূরণ করে চলেছেন, তখন সেই সত্ত্বার অদৃশ্যে বিরাজমান থাকা বা গোপন থাকাকে প্রমাণিত অন্যান্য বাস্তবতার আলোকে তারা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবে কেন? তখনতো অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়ের উপস্থিতির সাথে তুলনা করে যুক্তির দিক থেকে তাদের একমাত্র অদৃশ্য প্রভুকেও বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে তারা ধন্য হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। মানব সমাজ যদি বাস্তবতার আলোকে অদৃশ্য কোন বস্তুর দেহ সত্ত্বাকে জানতে, বুঝতে সক্ষম না হয়, তাহলে সেই অপরিপক্ক জ্ঞান দিয়ে অদৃশ্য 'প্রভুকে' কিভাবে, কোন যুক্তিতে মেনে নিতে এগিয়ে যাবে? যুক্তির দিক থেকে এই দৃঢ় আপত্তিকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যেই দৃশ্য-অদৃশ্য দু'ধরনের জগতের সমন্বয় ঘটিয়ে 'আল্লাহ্ তা'আলা' এই মহাবিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ, দৃশ্য-অদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে মানবজাতির এই পৃথিবীর জীবনকে তিনি 'পরীক্ষা স্বরূপ' করে দিয়েছেন। তিনি এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে চান কারা অদৃশ্যের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সেই আলোকে অদৃশ্য 'প্রভুকে' স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ মতো জীবন নির্বাহ

করে এবং কারা এই অদৃশ্যে বিরাজমান 'পরম সত্যকে' অস্বীকার করে অপরাধী সেজে কঠোর শাস্তি গ্রহণের লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। আল্-কুরআন সে জাতীয় ধারনা-ই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছে। "তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর (দৃশ্য-অদৃশ্যের এই মহাবিশ্বে) তোমাদিগের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ হয় মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যকদ্রষ্টা" (৬৪ ঃ ২)। "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কে তোমাদিগের মধ্যে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল" (৬৭ ঃ ২)। এখানে এই পর্যায়ে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট এই মহাবিশ্বে প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিসকেই অদৃশ্য করে সৃষ্টি করেননি। সকল সৃষ্টিই বাস্তবিকপক্ষে দৃশ্যমান। "আল্লাহ্র 'নূর'-এ উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি)" (২৪ ঃ ৩৫)। এখানে 'আল্লাহ্'র 'নূর' থেকে সকল কিছু সৃষ্টি করে আবার প্রতিটি মহাসূক্ষ্ম কণিকা থেকে শুরু করে বৃহৎ-বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তু 'নূর'-এর মহাসাগরে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে নিরেট বাস্তবতার আলোকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন বস্তুই অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার সুযোগ নেই; বরং সবই আল্লাহর 'নূর'-এর আলোতে অবিশ্বাস্যরূপে উদ্ভাসিত। এরই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে আমরা প্রাণীজগত মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে অনেক বস্তুর অস্তিত্ব দেখ্তে পাইনা কেন? এই কঠিন প্রশ্নটির উত্তরে একেবারে সহজভাবে যা বলা যায় তাহলো মহাবিশ্বে বিভিন্ন জগতে অন্ধকারের অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য বিভিন্নভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নতুন নতুন আলোর উৎস সৃষ্টি করেছেন। যে উৎসগুলো থেকে নির্গত আলো আল্লাহ্র প্রকৃত 'নূর'-এর চাইতে তুলনামূলকভাবে বহু বহু গুণে কম উত্তাপ ও উজ্জ্বল্যের অধিকারী। আল্লাহ্র খাঁটি 'নূর'-এর উজ্জ্বলতাকে চলার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে বাধাগ্রস্থ করতে পারে এমন কোন বস্তু এই মহাবিশ্বে সৃষ্টি করা হয়নি। তাই সেই ক্ষেত্রে অন্ধকারের কোন অস্তিত্বও নেই। অন্ধকারের অস্তিত্ব প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয় 'নক্ষত্র' সৃষ্টির মাধ্যমে। নক্ষত্রের এই আলো মহাশূন্যে চলার পথে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সম্মুখে এসে পড়লে তখন ঐ বস্তুকে ভেদ করে চলে যাওয়ার মত ক্ষমতা না থাকায় আলোর বিপরীত

দিকে 'অন্ধকার' আত্মপ্রকাশ লাভ করে। পরে এই সৌর আলোক শক্তির কারণে প্রতিটি সৌরজগতে সৃষ্ট আবার নতুন নতুন আলোক উৎসের আলোও একই কারণে 'অন্ধকারের' জন্ম দেয়। ফলে অন্ধকারে পতিত বস্তুকে আমরা দেখতে পাই না। বিজ্ঞানের আলোচনায় এই বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা পাব। এখানে আরও একটি বিষয়ও বিবেচ্য আর তা হলো, যে জিনিসগুলো এই মহাবিশ্বে আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য কিংবা ক্ষুদ্রত্বের কারনে গোপনীয় হয়ে আছে, এটা 'আল্লাহ্ তা'আলা'-ই শুধু আমাদের 'দৃষ্টিকে' বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধাপে আবদ্ধ করে দিয়ে অতি সহজেই তা দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করেছেন। ফলে এক এক ধাপের দৃষ্টিশক্তি অন্য এক ধাপের দৃষ্টির তুলনায় কম বা বেশি বস্তু দর্শন লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- মানুষ রাতের বেলায় অন্ধকারে যে জিনিসগুলো শতচেষ্টা করেও 'আলো' ছাড়া দেখতে পায় না (যদিও বাস্তবে বস্তুগুলো বিরাজমান আছে) সেই একই জিনিসগুলো বিভিন্ন ধরণের প্রাণী যেমনঃ বাদুর, পেঁচা, শৃগাল, কুকুর, বিড়ালসহ অনেক প্রাণী তা দিব্যি দেখতে পায় এবং সে কারণে রাতের অন্ধকারেও এদের বেশ উপস্থিতি ও চলাফেরা লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রখর আলোতেও ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রাণীকোষ, পরমাণু, মহাসূক্ষ্মকণিকা সমূহ ইত্যাদি আমাদের স্বাভাবিক চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ঐ একই পরিবেশে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে উল্লেখিত জিনিসগুলো দর্শন লাভ করা যায় এবং সনাক্ত করা ও সম্ভব হয়।

এখানে আরও দু'একটি উদাহরণ পেশ করে বলা যায়, যেমন- প্রতিটি উদ্ভিদ সূর্যের 'আলোকে' (রশ্মিকে) কাজে লাগিয়ে পাতার সবুজ রং, মূল দিয়ে চুষে নেয়া পানি ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে নিজ খাদ্য তৈরী করে থাকে। পরবর্তীতে ঐ খাদ্য উদ্ভিদের সকল কোষে সরবরাহের মাধ্যমে কোষগুলোকে পুষ্ট করে থাকে। ফলে কোষের উপাদান সমূহ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে বৃদ্ধি ঘটে বহুকোষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে অনবরত কোষের বৃদ্ধির কারণে উদ্ভিদটি ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে। এখানে কোষের বৃদ্ধি এমন এক সূক্ষ্ম পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে চলে যে তা আমরা আমাদের সীমিত দৃষ্টি শক্তি দিয়ে সরাসরি দেখতে সমর্থ হই না,

চিত্র -১৫৮

"তোমাদিগের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের জন্যে।" (৪৫ ঃ ৪)
"তিনিই তোমাদিগের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।" (২৩ ঃ ৭৮)
-- ছোট শিশুটির চক্ষুদ্বয় এবং বিড়ালটির চক্ষুদ্বয় দেখতে একই রকম দেখালেও গঠনগত বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন। পশু-পাখিরা রাতের আঁধারে 'Visible light-এর চেয়ে 'ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ' সম্পন্ন Infrared ray-এর আলোতে দিব্যি দেখতে পেলেও আমরা দেখতে না পেয়ে অন্ধকার দেখি। এভাবে আল্লাহ আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে একটা সীমাবদ্ধতা দান করে আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তুকণিকা জগত এবং আলোক রশ্মিকে অদৃশ্য করে রেখেছেন। উল্লেখিত বিষয়গুলো পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কখনো নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে না। অতএব যে 'সত্ত্বা' কল্পনাতীত মহাজ্ঞানের আবরণে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী উল্লেখিত মহাসূক্ষ্মস্তরে তাঁর নিদর্শন (Sign) তুলে ধরছেন, তাঁকে উপেক্ষা করা কি জ্ঞানী সমাজের উচিত হবে?

কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে আমরা উদ্ভিদের কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতাসহ বিভিন্ন অংশ বর্ধিত হওয়া, মোটা হওয়া ও ফুল-ফল দান করার আলামত দর্শন করে থাকি। এখানেও আমাদের চক্ষুর সীমিত দর্শন শক্তির কারণেই প্রতিটি মূহুর্তে উদ্ভিদের বর্ধিত হয়ে চলা 'কোষকে' দেখতে পাই না।

আবার প্রাণী দেহ 'কোষ' হিসেবে আমাদের নিজেদের দেহের কোষগুলো প্রতিমূহুর্তে খাদ্যের সারাংশ তথা 'প্রোটিন' লাভে ধন্য হয়ে অসংখ্য কোষের বৃদ্ধি যে ঘটাচ্ছে, তা কিন্তু আমরা আমাদের সীমিত স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তি দিয়ে দর্শন লাভে সক্ষম হই না, কিন্তু Final Product হিসেবে আমাদের দেহের বৃদ্ধি যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, তা আমরা আমাদের বৃদ্ধি পাওয়া দেহের দিকে তাকিয়ে বুঝ্তে পারি। এখানেও একইভাবে বলা যায়, প্রতিনিয়ত বিন্দু-বিন্দু আকারে বৃদ্ধি পাওয়া পদ্ধতিটি আমরা আমাদের দৃষ্টি সীমায় বন্দী করতে না পারার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা।

এতে করে এখানে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, এই মহাবিশ্বে কোন কিছুই অদৃশ্য নয়, সবই দৃশ্যমান। কিন্তু দৃষ্টির (চক্ষুর) গঠনগত তারতম্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ কেবল কোন কোন বস্তুর ক্ষুদ্রত্বকে কিংবা ক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডকে দেখা না যাওয়ার মত করে 'দৃষ্টি শক্তিকে' সীমিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। আর এই বিস্ময়কর কাজটি মহান স্রষ্টা একমাত্র 'আল্লাহ্' তাঁর মহাজ্ঞান দিয়ে সম্পন্ন করেছেন সুনিপুন কৌশলে। এখানে এই বিষয়ে অন্য কারও-ই হাত নেই। কারও পক্ষে তা উল্টিয়ে দেয়াও সম্ভব নয়। এই আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআন বলছে- "বল, কে তোমাদিগকে আকাশ হইতে জীবনপোকরণ সরবরাহ করিয়া থাকেন, অথবা কে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন? জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করেন? এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? উত্তরে তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্', তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না" ? (১০ ঃ ৩১)। মোট কথা এই মহাবিশ্বে যা কিছু

ঘট্‌ছে তথা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ একমাত্র মহা প্রভু আল্লাহ্‌র-ই কুদ্‌রতি হাতে সম্পন্ন হচ্ছে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করেই মানব সমাজের দৃষ্টিশক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দেখার ক্ষমতা প্রদান করে মানবজীবনকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে রেখেছেন। একজন পরীক্ষার্থী যতক্ষণ পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার হলে অবস্থান করে, ততক্ষণ পরীক্ষার সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতা বিধানের জন্য অনেক কিছুই পরীক্ষার্থীর নিকট হতে সরিয়ে অস্থায়ীভাবে কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য (গোপনীয়) করে রাখা হয়। এতে পরীক্ষা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হওয়ার দাবী যথার্থ বলে সর্বত্র গৃহীত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের এই পার্থিব জীবনকে পরীক্ষাস্বরূপ করায় মানব দৃষ্টি শক্তিকে একটা সময়ের জন্য সীমিত পর্যায়ে রেখে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকে, ক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডকে অদৃশ্য (গোপনীয়) করে রেখেছেন। এই দৃশ্য-অদৃশ্য অবস্থার ভেতর দিয়ে রচিত পরিবেশে মানবসমাজ পরীক্ষায় অংশ. গ্রহণের মাধ্যমে তাদের পার্থিব এই পৃথিবীর জীবনের সময় ব্যয় করতে পারে এবং 'বিশ্বপ্রভু' যে অদৃশ্যে আছেন তা বলা মাত্রই যেন আর অস্বীকার করতে না পারে। কেননা মহাবিশ্বে দৃষ্টির আড়ালে বিশাল জগৎ বাস্তবে থেকে ব্যাপক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকার কথা প্রমাণভিত্তিক বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করলে, তাদের-ই একমাত্র প্রভু 'আল্লাহ্‌' সেইরূপ অদৃশ্যে থেকে যে মহাবিশ্বটি সৃষ্টি, চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন তা কেন বিশ্বাস করা যাবে না? এই মৌলিক প্রশ্নটির একটি সহজতর মীমাংসার লক্ষ্যেই অদৃশ্যের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। পরে বিচার দিন বিষয়টি মেনে নেয়া আর না নেয়ার ওপরই ফলাফল ঘোষণা করে 'আল্লাহ' তার বিশ্বাসী বান্দাহদের সফলতার জন্য যেন তাদেরকে 'জান্নাত' দান করতে পারেন এবং ব্যর্থ বান্দাহ্‌দের অগ্নিময় প্রচণ্ডশাস্তির স্থান 'জাহান্নাম' তাদেরকে প্রদান করতে পারেন। দৃশ্য-অদৃশ্য পরিবেশের সমন্বয় ছাড়া পরীক্ষা যেমন যথার্থ হয় না, তেমনিভাবে ফলাফল প্রাপ্তি ছাড়া 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম' প্রদানও যৌক্তিকতা পায় না।

অতীত যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী-রাসুলগণ তাদের দাওয়াতের পাশাপাশি প্রমানস্বরূপ যখন কোন ঘটনার ক্ষুদ্রস্তরের ভিত্তিমূলক

কর্মকাণ্ডকে অদৃশ্য রেখে Final Product হিসেবে কোন কিছু প্রদর্শন করতেন, তখন সাধারণ মানুষ তাদের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতার কারনে ঐ বিষয়টিকে 'যাদু' বলেই চিহ্নিত করেছে এবং নবী-রাসুলদেরকে 'যাদুকর' বলেই আখ্যায়িত করেছে। "পরে সে (আহ্‌মদ) যখন স্পষ্ট নিদর্শন সহ উহাদিগের নিকট আসিল উহারা বলিতে লাগিল ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু" (৬১ ঃ ৬) "উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে ইহাতো চিরাচরিত যাদু" (৫৪ ঃ ২)। "ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, এতো একজন সুদক্ষ যাদুকর" (৭ ঃ ১০৯)।

এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে পার্থিবজীবনে মানবদৃষ্টিকে একটা সীমিত পর্যায়ে আবদ্ধ করে রাখার কারণে। পরকালে কিন্তু এই অবস্থা থাকবে না, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। সেখানে বর্তমান সীমাবদ্ধতাকে তুলে নেয়া হবে। ফলে মানুষ বর্তমান দৃষ্টিশক্তির তুলনায় বহু বহু গুণ বেশি প্রখর দৃষ্টিশক্তি লাভ করবে। তখন সেই জগতে সকল কিছুই দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়বে। কোন কিছুই অদৃশ্য থাকবে না। এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ একটি আয়াত এখানে পেশ করা যায়, যেখানে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানবজাতিকে একটু তাচ্ছিল্যভাবেই প্রশ্ন করবেন। "যেদিন অবিশ্বাসীদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকটে, সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, ইহা কি সত্য নহে (ইহা কি যাদু)? উহারা বালিবে, আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ ইহা সত্য" (৪৬ ঃ ৩৪)।

এমনকি বর্তমান দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতাকে পরকালে তুলে নেয়ার কারণে বিশাল গ্রহ 'জান্নাত' থেকে সফলতা লাভকারী মানুষ দৃষ্টিশক্তির তুলনাহীন ক্ষমতা দিয়ে দূরে 'জাহান্নাম' নামক অগ্নিকুণ্ডের ভেতর শাস্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামীদের দেখতে পাবে। আবার অনুরূপভাবে জাহান্নামীরাও দূর থেকে সুখময় নেয়ামতে পরিপূর্ণ 'জান্নাত' ও তার অধিকারি সৌভাগ্যবানদের দর্শন লাভ করতে সমর্থ হবে এবং একে অপরকে বলবে "জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদিগের উপর কিছু পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু নিক্ষেপ কর। তাহারা

(জান্নাতিগণ) বলিবে, 'আল্লাহ' এই দুইটি নিষিদ্ধ করিয়াছেন অবিশ্বাসীদের জন্য" (৭ ঃ ৫০)।

সুতরাং আল্-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা অনুধাবন করছি মহাবিশ্বের যাত্রাক্ষণ থেকে অর্থাৎ মহাসূক্ষ্ম কণিকা-স্তর থেকে পরবর্তী প্রায় 'পরমাণু' অবদি আবিস্কৃত এই পর্যন্ত (প্রায় শতাধিক) মহাসূক্ষ্ম কণিকা-জগতকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির আওতাবহির্ভূত করে অদৃশ্য বা গোপনীয় করে রাখা হয়েছে। যাতে করে মানবসমাজকে এই পৃথিবীতে ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। অদৃশ্য এই বিরাট জ্ঞানের ভান্ডার-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে মানবসম্প্রদায় এগিয়ে যেতে যদি কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে, তাহলে এই বিশাল জ্ঞানের ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পেছনে অদৃশ্য মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান 'বিশ্বপ্রভুকে' মেনে নেয়ার যৌক্তিক ভিত্তিকে কিভাবে কোন যুক্তিতে মানুষ অস্বীকার করতে পারে? তাহলে কি তাদের মনে এই ভীতির সৃষ্টি হয়েছে যে, উল্লেখিত বিষয়টি মেনে নিলে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি খসে যাবে? আর হয়তো তখন এক ও একক স্রষ্টা ও প্রভু 'আল্লাহর' প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না! এই অবস্থা আসার পরও পৃথিবীবাসী কি ভূমিকা গ্রহণ করে তা স্পষ্টতই দেখার ও সে অনুযায়ী ফলাফল নির্ধারণ করার জন্য-ই বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে দৃশ্য ও অদৃশ্যের সমন্বয়ে এই মহাবিশ্বের ভীত রচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞান বিশ্ব এই মহাবিশ্বে দৃশ্য-অদৃশ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বর্তমানে স্বীকার করছে এবং প্রতিদিনই কিছু না কিছু অদৃশ্য জগতের গোপণ তথ্য উদ্‌ঘাটন করে মানবমন্ডলীর জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থাপন করছে। তবে যেহেতু কোন বিষয়ের পেছনে লুকায়িত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান জানেনা, জানে শুধু পদ্ধতিটি কিভাবে কেমন করে সংঘটিত হচ্ছে তার বাস্তবসম্মত আসল কথাটি, তাই আমাদের বর্তমান এই পর্যালোচনায় আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত অদৃশ্য বিষয়ের মৌলিক কথা ও পদ্ধতিগুলো সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই চলবে। এতে করে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হবে যে এই মহাবিশ্বে কুরআনের দাবী অনুযায়ী দৃশ্য-অদৃশ্য ব্যবস্থার অগ্রিম বার্তা সম্পূর্ণরূপে সত্য ও বাস্তবসম্মত এবং তা

মানুষের পার্থিব জীবনে পরীক্ষার নিমিত্তেই মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' নিজ থেকেই সৃষ্টি করেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতিতে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এই মহাবিশ্বে দৃশ্যমান বস্তু, ঘটনা ও পরিবেশের তুলনায় অদৃশ্য বস্তু, ওদের কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ-পরিস্থিতিই বিশাল অংশ দখল করে আছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ছাড়া মানবজাতি পূর্বে যে সকল তথ্য কল্পনা বা অনুমান করতেও সক্ষম হয়নি। আর তাই অতীতে ব্যাপকভাবে এবং বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কিছু একটা Final Product হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে মানবসমাজ চিৎকার করে বলে উঠে "এটাতো খোলাখুলি একটা যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়? অথচ যদি শুরু থেকেই অদৃশ্য পর্যায়ের স্তরগুলো দিব্য দৃষ্টি শক্তি দিয়ে দর্শন লাভ করে এগিয়ে আসতে পারতো, তাহলে Final Product পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান অর্জন করার কারণে তখন আর 'যাদু' বলে চিৎকার দিত না।

আমরা একটু পূর্বেই জানতে পেরেছি বিজ্ঞান প্রায় আড়াই হাজার (২৫০০) বছর ধরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বস্তুর মৌলিক মহাসূক্ষ্ম কণিকার অদৃশ্য জগতের বহু তথ্য উদ্‌ঘাটন করে মানবমন্ডলীর চোখের সামনে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এতে আমাদের নিকট দিনের স্বচ্ছ আলোর মতই স্পষ্ট হয়েছে যে আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বস্তুর দৃশ্যমান ইতিহাস- কাহিনীর তুলনায় ওদের অদৃশ্য (মানবীয় দৃষ্টিতে) জগতের ইতিহাস-কাহিনীই অনেক দীর্ঘ, অনেক লম্বা। বিজ্ঞান বিষয়গুলোকে এক এক করে হাতে-কলমে প্রমাণ করে আমাদের সম্মুখে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরায় আমরা তা কোন প্রকারে আর অস্বীকার করতে পারছি না। ফলে আমাদের মানবীয় বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে কোন কিছু দেখতে না পেলেই তা অস্বীকার করার মানসিকতা বা প্রবণতা বর্তমান বিজ্ঞান কার্যত রুদ্ধ করে দিয়েছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এই মহাবিশ্বে অধিকাংশ জ্ঞানপূর্ণ বিষয়বালীকে (তা উদ্ভিদ, জীব, প্রাণী ও জড় পদার্থসহ সকল ক্ষেত্রেই) মানবীয় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। যথাযথভাবে বিষয়টি উপলব্ধির জন্য এখানে কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরছি। যেমন ঃ

(১) জড় পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রাংশ বলতে আমরা আমাদের প্রাপ্ত বাহ্য দৃষ্টি শক্তি দিয়ে খুব বেশি হলে 'অণু' (Molıcule) পর্যন্ত-ই কেবল দর্শন লাভ করতে পারি। এর পরবর্তী ধাপে একটি 'অণু'-র চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র অংশ যা 'পরমাণু' (Atom) নামে অভিহিত তা খালি চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাই না। এর পরবর্তী ধাপে আবিস্কৃত পরমাণুর উপাদানরূপী 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus), আবার নিউক্লিয়াসের উপাদান- 'প্রোটন' (Proton), ও 'নিউট্রন' (Neutron) নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকা, 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকা, আবার এদের আন্তঃগঠন উপাদানরূপী মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'কোয়ার্ক' (Quark), অনুরূপ মেসন কণিকা, ৪টি মৌলিক শক্তির 'দূত' (Messenger) কণিকা- গ্র্যাভিটন, ফোটন, 'গ্লুওন' ও W^{-+} এবং Z (Graviton, Photon, Gluon, W^{-+} and Z Particles) কণিকাসমূহ সহ আবিস্কৃত প্রায় শতাধিক মহাসূক্ষ্ম কণিকাদের মোটেই খালি চোখে দেখতে পাই না। অথচ অদৃশ্য প্রায় এই কণিকাদের সুশৃংখল ও ধারাবাহিক নিয়ম-পদ্ধতির 'চেইন ওয়ার্ক'-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি সঠিকভাবে গঠিত ও সার্বিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে বর্তমান দৃশ্যযোগ্য নয়নাভিরাম পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে আমাদের কল্যাণ সাধন করে চলেছে। পৃথিবী তার পৃষ্ঠদেশে মানব সভ্যতার সকল কিছুকে ধারণ করে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ বেগে অথচ নিরাপদভাবে ছুটে চলা, সূর্য তার সৌর পরিবারসহ প্রায় ২৫০ কিঃ মিঃ/সেকেন্ড গতিতে কর্মতৎপর থাকা, গ্যালাক্সীগুলো গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্রকে গুচ্ছাকারে ধরে রেখে প্রচন্ডগতিতে মহাশূন্যে উড়ে যাওয়া, সমগ্র বিশ্বব্যাপী দ্রুত যোগাযোগ, রেডিও, টিভি, টেলিফোন ইত্যাদি ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করা, আবার অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ধ্বংস করে ওর অস্তিত্বকে মহাবিশ্ব থেকে নির্মূল করে দেয়া সবই সম্পাদিত হচ্ছে মানবীয় বাহ্য দৃষ্টিতে অদৃশ্য অথচ বাস্তব (ওপরে উল্লেখিত) মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকাদের দ্বারা। বর্তমান বিজ্ঞানময় পরিবেশে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে উক্ত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার অর্থই হলো- মহাবিশ্বে বিরাজমান বাস্তব সত্যকে, বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানের সঠিক ও সার্বিক অগ্রগতিকেই অস্বীকার করা।

বিষয়টিকে উদাহরণ পেশ করে আরও সহজভাবেই বোধগম্য করে তোলা যায়। যেমন- আমরা বাতাস থেকে যে 'অক্সিজেন' গ্রহণ করি এবং যে 'কার্বনডাই অক্সাইড' ঐ বাতাসে ছেড়ে দেই, বিজ্ঞানের প্রমাণিত দৃষ্টিতে তা রীতিমতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার-ই বলা যায়। বিজ্ঞান আবিষ্কার করে দেখিয়েছে যে, 'অক্সিজেন' হচ্ছে একটি বায়বীয় মৌলিক পদার্থ। এর প্রতিটি পরমাণুতে (Atom) রয়েছে 'নিউক্লিয়াস' ও 'ইলেকট্রন' কণিকা। নিউক্লিয়াসে জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে ৮টি প্রোটন (Proton) ও ৮টি নিউট্রন (Neutron) নামক উপ-আনবিক কণিকা (Sub- Atomic Particles)। উক্ত নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত প্রদক্ষিনরত রয়েছে ৮টি 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকা। এটি একটি ইউনিট, একটি 'পরমানু' (Stable Atom)। আমাদের প্রতিবারে শ্বাস নেয়ার সময় উক্ত 'অক্সিজেন' (O_2) পরমানু লক্ষ-লক্ষ হিসেবে আমাদের নাক ও মুখ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করছে। সেখানে ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তের সংস্পর্শে এসে সমস্ত শরীরের দেহকোষ গুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং শরীরের চাহিদা পূরণ করে আমাদের দেহকে সুস্থ রাখছে অথচ আমরা একটি পরমানুকেও কিংবা ওদের কর্মকান্ডকে মোটেই দেখতে পাচ্ছি না। অনুরূপভাবে শরীরের দূষিত বায়ু অর্থাৎ 'কার্বন ডাই অক্সাইড' (C_{O2}) ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে প্রশ্বাস রূপে নির্গত হয়ে যাচ্ছে। এখানেও 'কার্বন ডাই অক্সাইড'-এর লক্ষ-লক্ষ পরমানু (৬টি 'প্রোটন' ৬টি 'নিউট্রন' এবং ৬টি 'ইলেক্ট্রনের সমন্বয়ে গঠিত) আমাদের নাক ও মুখ দিয়ে প্রতিবারের প্রশ্বাসে দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা মোটেই দেখতে পাচ্ছি না। এর কারণ হচ্ছে- আমাদের চোখের ভেতর সজ্জিত কোষের ব্যবস্থাপনায় (রেটিনায়) সবচেয়ে ক্ষুদ্র বস্তুকণা দর্শন লাভ করার যে ব্যবস্থাটি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, ঐ নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে ক্ষুদ্র কোন বস্তুর প্রতিফলিত আলোই চোখের রেটিনার (Retina) কোষগুলোকে আলোড়িত করতে সক্ষম না হওয়ায় কোন প্রকার অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। ফলে আমরা সেই বস্তুগুলোকে দর্শন লাভ করতে পারি না (বিস্তারিত একটু পরেই আলোচনায় আসবে)। এই অবস্থায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরমানু সমূহকে দেখতে পাইনা বলেই ওদের মৌলিক বাস্তব দেহসত্ত্বাকে অস্বীকার করা বর্তমান
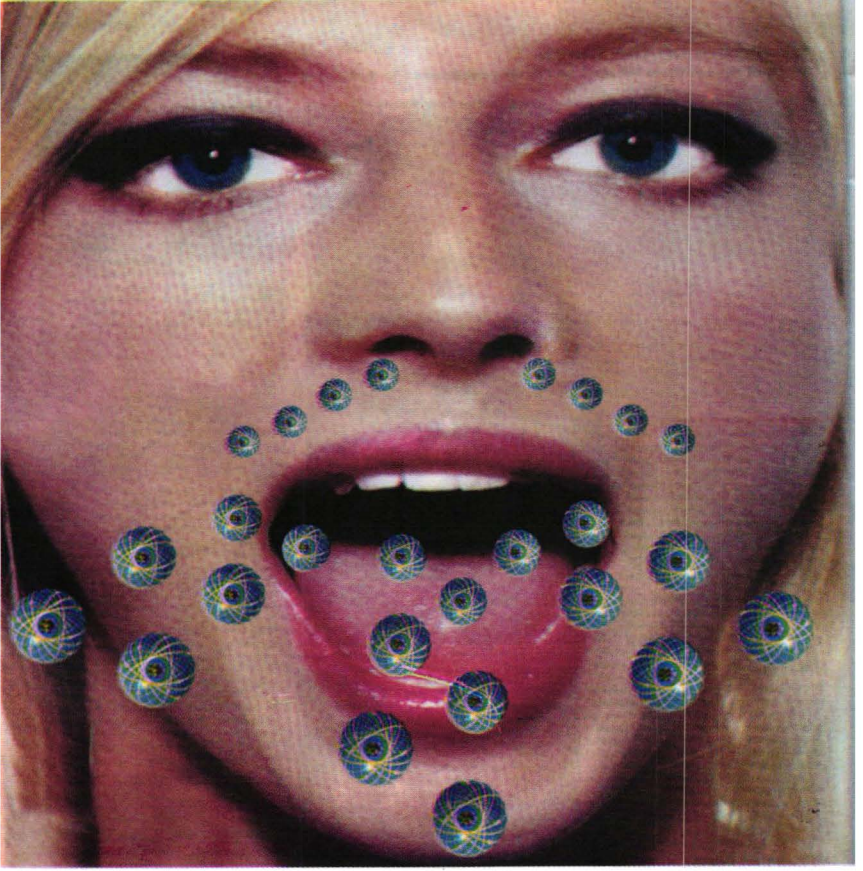
চিত্র -১৫৯

"উহারা কি উহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও জমিনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না?" (৩৪ ঃ ৯)
-- বাস্তবিক পক্ষে মানব সমাজের অবস্থান বড়ই দূর্বল। এরা 'যা দেখিনা, তা মানিনা' এই অজ্ঞতাপূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করে এমন এক মহান স্রষ্টাকে দর্শন লাভ করার আকাঙ্খায় জেদ ধরে বসে আছে, অথচ সেই স্রষ্টার অগণিত সৃষ্টিকেই তারা দেখার যোগ্যতা রাখে না। এই যেমন, যে বাতাসের মহাসাগরে মানব সম্প্রদায় ডুবে আছে, সেই বাতাসের উপাদান অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি মৌলিক বায়ুবীয় পদার্থকে মোটেই দেখতে পায় না। প্রতিবারের শ্বাস নেয়ার সময় কোটি, কোটি, কোটি অক্সিজেন পরমাণু গ্রহণ করছে, কিন্তু একটি পরমানুকেও দর্শন লাভ করতে পারছে না। অথচ অক্সিজেনের মাত্র একটি পরমাণুতেও ৮টি প্রোটন, ৮টি নিউট্রন এবং ৮টি ইলেকট্রন কণিকা বর্তমান রয়েছে। বিষয়টি আশ্চর্য করার মত নয় কি? প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য 'আল্লাহ্'কে যে কখনই দেখা সম্ভব নয় তা বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্যই তিনি মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে এমন এক স্তরে ($10^{-7}m.$) আবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, ঐ পর্যায় থেকে আর কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। মানব সম্প্রদায় বিষয়টি থেকে বাস্তবে শিক্ষা গ্রহণ করবে কী?
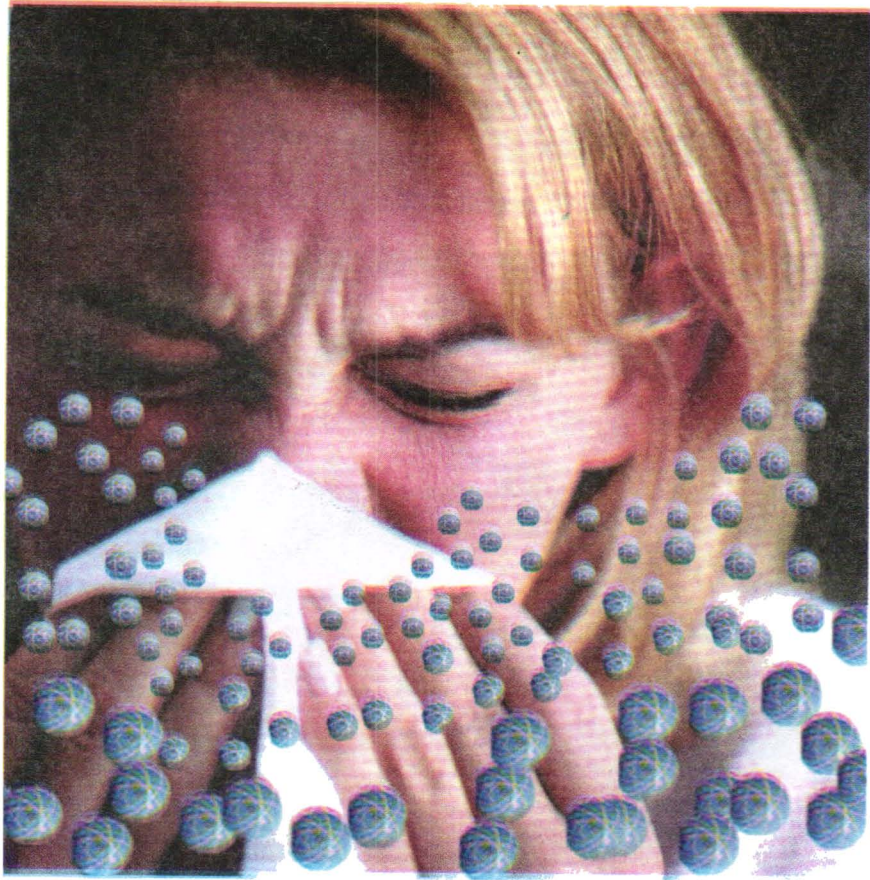
চিত্র -১৬০

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) যাহা কিছু আছে দৃষ্টি বহির্ভূত (মহাসূক্ষ্মতার কারণে) তাহা সকলই আল্লাহর।" (১১ ঃ ১২৩)

-- দৃশ্য-অদৃশ্যের সমন্বয়ে আমাদের এ মহাবিশ্ব। তবে দৃশ্যের চেয়ে অদৃশ্যের উপস্থিতিই বেশি প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের শরীর থেকে যে প্রশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি মূহুর্তে, তাতে কার্বন-ডাই অক্সাইড-ই মূলতঃ নির্গত হচ্ছে। এতে প্রতিটি পরমানুর মধ্যে রয়েছে ৬টি প্রোটন, ৬টি নিউট্রন ও ৬টি ইলেকট্রন কণিকা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ছে না। এর কারণ হলো আমাদের দৃষ্টির দর্শনযোগ্য সর্বশেষ সীমার চেয়েও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরমাণু ক্ষুদ্র বিধায় তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অথচ বাস্তবে আমাদের চারপাশ পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সুতরাং যে মহান স্রষ্টার অগণিত ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি না, সেই মহাবিস্ময়কর বর্ণনাতীত জ্ঞানময় সূক্ষ্মতার আবরণে বিরাজমান 'আল্লাহ'কে কিভাবে দেখতে পাবো? সম্ভবত মানবীয় এ জীবনের পরীক্ষাটি যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্তেই এ ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হয়েছে। বস্তুতঃ পরকালে এ ব্যবস্থা থাকছে না। তখন দৃষ্টি শক্তির বর্তমান সংকীর্ণতা তুলে নেয়া হবে।

বিজ্ঞানের উন্নততর আবিষ্কারকেই চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করার শামিল। সৃষ্টির সেরা মানবসম্প্রদায় জ্ঞানগত উৎকর্ষতা লাভ করার পরও বাস্তবে সত্য অথচ ক্ষুদ্রত্বের কারণে এই জাতীয় বস্তুকে কিংবা নির্দিষ্ট করা দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ঐ সীমার বাইরে অবস্থানকৃত কোন 'সত্ত্বাকে' অস্বীকার করার মত আচরণ, অজ্ঞতাকেই শুধু প্রকট করে উপস্থাপন করে মাত্র।

(২) উদ্ভিদজগতের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীও এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত। প্রতিটি উদ্ভিদ তার বাঁচার জন্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত খাদ্য তৈরীর উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে এমন সুক্ষ্মপর্যায়ে পুরো কাজটি সমাধা করে থাকে যে তা আমাদের দৃষ্টিশক্তি দর্শন লাভ করতে পুরোদমে অক্ষম। আর সে কারণেই আমরা তা (ক্ষুদ্র পর্যায়ে) দেখি না। কিন্তু ঐ তৈরী খাদ্য গ্রহণ করে উদ্ভিদ কোষ বৃদ্ধির মাধ্যমে যখন উদ্ভিদের কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফুল-ফলের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে চলে তখন আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভিদের বর্ধিত ঐ রূপ দেখে কেবল বুঝতে পারি খাদ্য গ্রহণের অদৃশ্য কর্মকান্ডটি। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরীর জন্য বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড (Co_2), মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে চোষণ করে নেয়া পানি (H_2O), পানির সাথে দ্রবীভুত রাসায়ণিক মৌল ফসফরাস, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, আয়রণ, জিংক ও কপারসহ মোট ১২টি উপাদান, সবুজ পাতা ও কান্ডের 'ক্লোরোফিল' নামক জটিল জৈব যৌগ (Complex Organic Compound) এবং সূর্য রশ্মির (Sun light) সাহায্যে এক মহাসুক্ষ্মস্তরে খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। উল্লেখিত খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতিকে 'সালোক সংশ্লেষন' (Photo Synthesis) বলা হয়।

Photosynthesis is the Conversion of Luminous Energy to Chemical Energy.

$6Co_2 + 12H_20 + \text{Chlorophill} + \text{Sunlight} \doteq C_6H_{12}0_6 + 6O_2 + 6H_2O + 2861\ \text{KJ/ MOL.}$

'সালোক সংশ্লেষণ' প্রক্রিয়ার প্রথম স্তরে তৈরী হয় 'গ্লুকোজ' (Glucose) বা সরল চিনি ($C_6H_{12}O_6$) যা সকল প্রকার Carbo Hydrate Polymer এর ভিত্তি বা একক। 'পলিমার' একই অনু বা রাসায়ণিক এককের ক্রমান্বয়ে সংযোজনী বা রাসায়ণিক বন্ধনের তৈরী বড় 'অনু'।
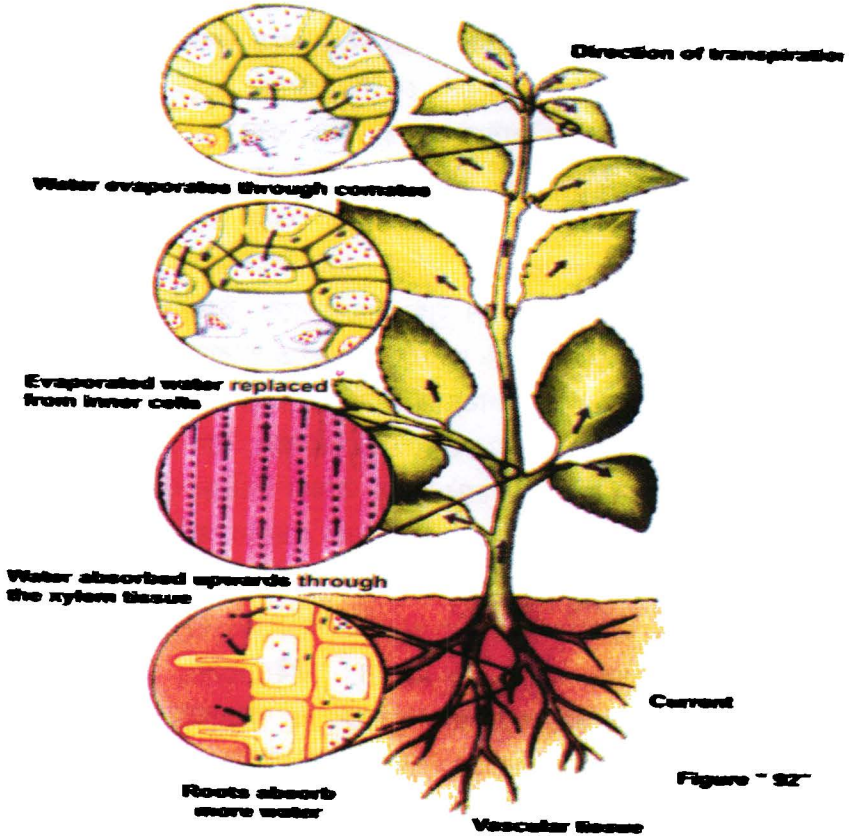
চিত্র -১৬১

"তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মহাসূক্ষ্ম) এমন অনেক কিছুই। যাহা তোমরা অবগত নও।" (১৬ ঃ ৮)

-- এ মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক 'আল্লাহ'। তিনি তাঁর অদৃশ্য মহান 'সত্ত্বাকে' বিশ্বাস করার যে আহবান মানবজাতির নিকট পেশ করেছেন, মানবজাতি যেন 'অদৃশ্যের' দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সে জন্য একইভাবে দৃশ্যমান জগতের অনেক কিছুকেই তিনি মানবীয় দৃষ্টির অন্তরাল করে দিয়েছেন। উদ্ভিদ জগতের মূল দিয়ে সংগৃহীত পানি, সূর্যালোক থেকে নেয়া সৌর শক্তি, পাতার সবুজ রং এবং আরও সংগৃহীত কয়েকটি মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে ফটোসিনথেসিস পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরী করে থাকে। এ খাদ্য উদ্ভিদের সকল কোষগুলি গ্রহণ করে পুষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে সার্বিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে এক পর্যায়ে ফুল-ফল দান করে। আমাদের চারপাশে এ কাজগুলো বাস্তবে প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে অথচ আমরা সরাসরি দর্শন করতে পারি না। আমরা শুধু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুভবই করে থাকি। আর সে আলোকে বিশ্বাস করে থাকি।

উল্লেখিত অবস্থার অনুকরণে একইভাবে অদৃশ্য 'আল্লাহ'কেও বিশ্বাস করে মেনে নেয়াই হচ্ছে জ্ঞানের দাবী। বাস্তবে উদ্ভিদের কর্মকাণ্ড না দেখে তো ঠিকই বিশ্বাস করে নিচ্ছি। এ ছাড়াতো উপায়ও নেই। দেখিনা বলেই তো বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না।
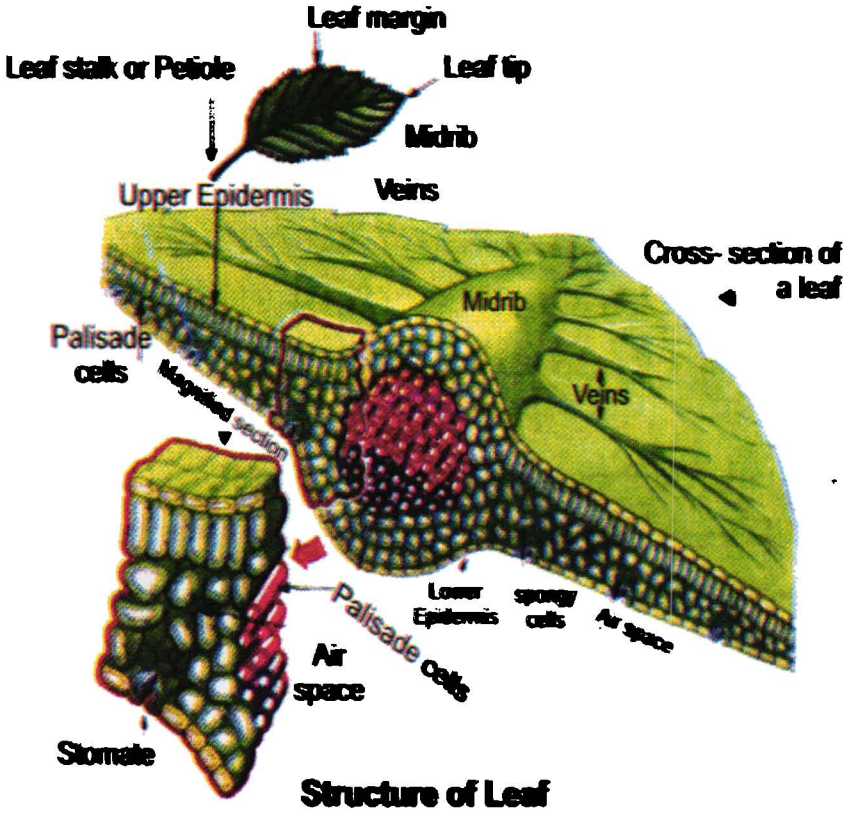
চিত্র -১৬২

"দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে (মহাবিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল ব্যাপারেই) তুমি কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। তুমি আবার তাকাইয়া দেখ। কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?" (৬৭ ঃ ৩)

-- আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে এমন এক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন যে, আমরা যদি সারাক্ষণ একটি উদ্ভিদের একটি পাতার কর্মকান্ড স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে সরাসরি দেখার চেষ্টা করি তথাপিও উদ্ভিদের পাতায় সংঘটিত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীটি দর্শনলাভে সক্ষম হবো না। কেননা যে ক্ষুদ্রস্তরে ঐ কাজটি সংঘটিত হচ্ছে ঐ ক্ষুদ্রস্তর আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য। ফলে উদ্ভিদটির বর্ধিত হওয়া এবং ফুল-ফল দান করার আলামত দেখেই আমরা উপলব্ধি করি এবং বিশ্বাস করি ওর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর বাস্তবতাকে।

এখন এই অদৃশ্য অথচ বাস্তব বিষয়টিকে মেনে নিতে কষ্ট না হলে, অদৃশ্য 'আল্লাহ'কে এবং সমগ্র মহাবিশ্বের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁর বাস্তব 'সত্ত্বা'কে মেনে নিতে কষ্ট হবে কেন? বরং কষ্ট না হওয়ার জন্যইতো চারপাশে এত অদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। বিষয়টি সত্য নয় কী?
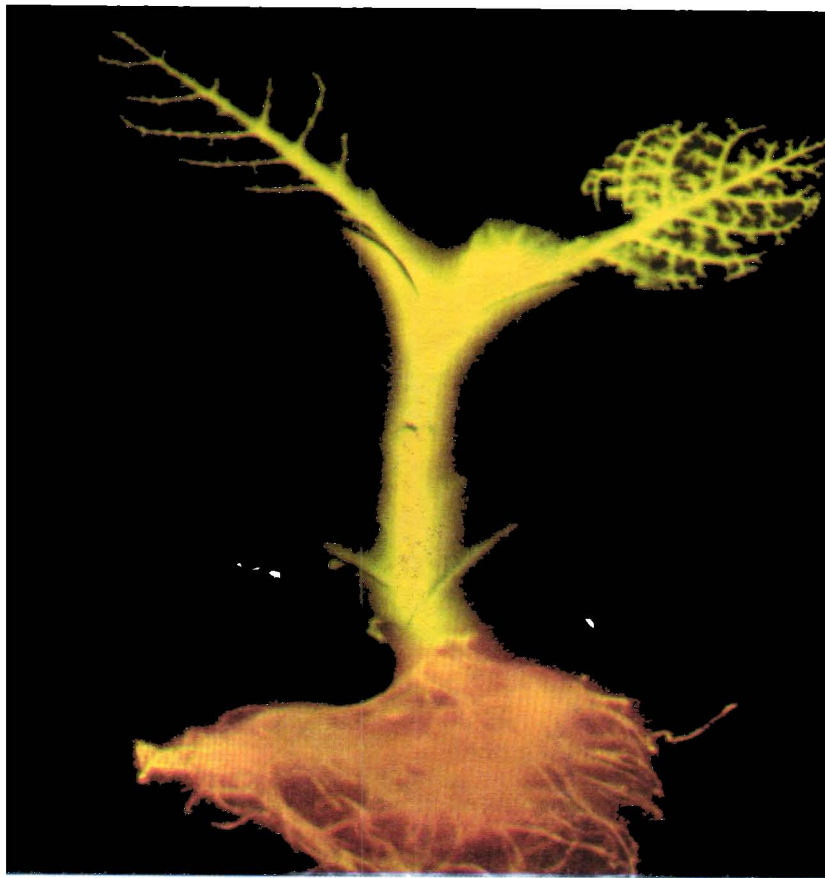
উল্লেখিত উদ্ভিদের খাদ্য 'গ্লুকোজ' (Glucose) প্রতিদিন আমাদের চারপাশে আমাদেরই চোখের সামনে ব্যাপকভাবে তৈরী হয়ে উদ্ভিদ জগতকে খাদ্যের যোগান দিচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে উদ্ভিদ জগতের বৃদ্ধি, বংশ বিস্তার, ফুল ও ফলদানসহ সার্বিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ওদের খাদ্য তৈরী ও কোষ বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার নীরব কর্মকান্ড মহাক্ষুদ্রত্বের এমন এক স্তরে সংঘটিত হচ্ছে যে, আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তি ঐ জাতীয় ক্ষুদ্রস্তরের তৎপরতায় কোন প্রকার অনুভূতি বোধ করে না। ফলে আমাদের নিকটেই বিশাল উদ্ভিদজগতে ঘটতে থাকা ঐ ঘটনাগুলো চরম বাস্তবতায় বিরাজ করলেও আমরা তা স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দেখতে পাই না। আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্যভাবে ঘটে চলা ঐ সকল কাজের চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে কেবল উদ্ভিদের কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফুল-ফলের আগমন ও বৃদ্ধির সামগ্রিক রূপটাই দর্শন করে থাকি। বিন্দু বিন্দু আকারে বৃদ্ধির পদ্ধতিটিও মহাক্ষুদ্রত্বের জন্য দেখি না। আমাদের দৃষ্টিশক্তি এই পর্যায়ে একেবারেই অকার্যকর।

(৩) একইভাবে প্রাণীজগতের বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। আমরা মানবজাতিও প্রাণী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। আমরা প্রতিদিন কয়েকবার খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। এই খাদ্যগুলো পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে পরিপাক প্রণালীতে পুষ্টিতে রূপান্তরীত হয়ে রক্তের মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি কোষে সরবরাহ হয়ে থাকে। প্রাণী দেহকোষ এই খাদ্য প্রাণ গ্রহণ করে সতেজ হয় এবং পরবর্তীতে কোষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেহের সামগ্রিক কাঠামোকেও সার্বিকভাবে পুষ্ট ও বর্ধিত করে চলে। এই যে পাকস্থলী হতে কোষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘ পদ্ধতি, এর পুরোটাই এক মহাসুক্ষ্মতার ভেতর দিয়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে যে, আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও আমরা তা দর্শন লাভ করতে সক্ষম হবো না। কেননা ঐ মহাসুক্ষ্মস্তরের বস্তুকণিকায় প্রতিফলিত আলো চোখের ভেতর দিয়ে গমন করার সময় কোনভাবেই চোখের কোষগুলোকে আলোড়িত করতে সক্ষম হয় না। এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পরিপাক প্রণালীর বিন্দুবত-বিন্দুবত কর্মকান্ড ও অগ্রগতিকে দর্শন করতে সক্ষম না হলেও আমাদের দেহের সার্বিক বৃদ্ধি দর্শন করে পরিপাক পদ্ধতির অদৃশ্য
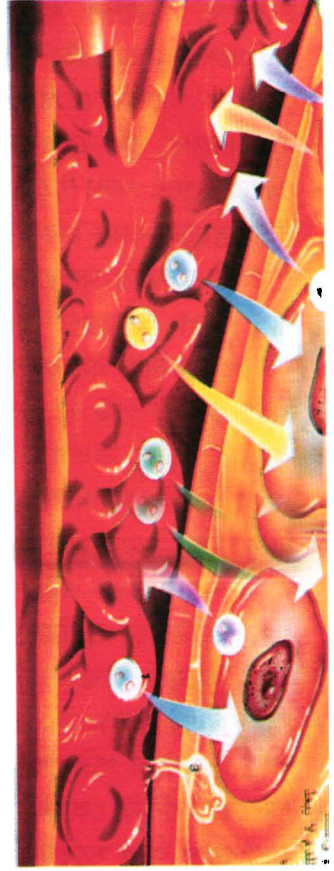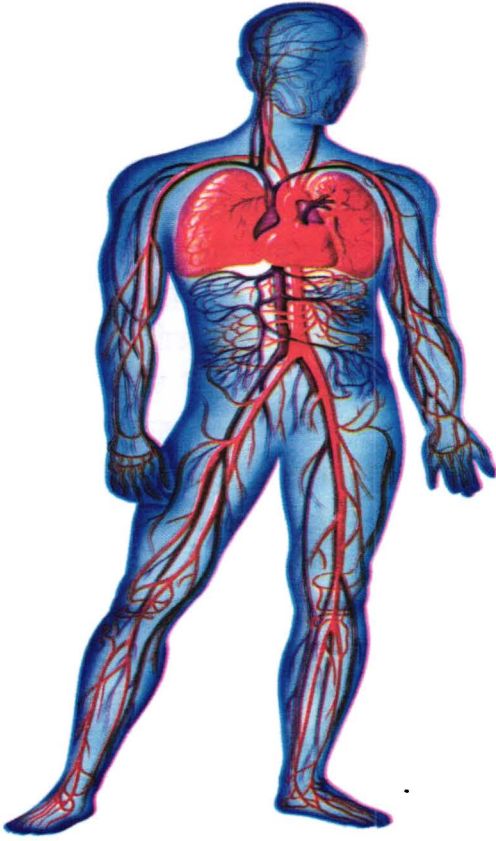
চিত্র -১৬৪

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন (Sign) রহিয়াছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের নিজদিগের (শারীরিক কর্মকাণ্ডের) মধ্যেও। তোমরা কি (বিষয়গুলো) অনুধাবন করিবে না?" (৫১ : ২০, ও ২১)

-- উদ্ভিদের ন্যায় মানব দেহেরও বিভিন্ন কার্যক্রমকে অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রস্তরে সেটআপ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ খাদ্য পরিপাক প্রণালীর কথা-ই উল্লেখ করা যায়। আমরা খাদ্য হিসেবে যা যা খেয়ে থাকি, এগুলো পাকস্থলীতে ভেংগে-চুরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণিকা রূপ ধারণ করে। পরে খাদ্যের সারাংশরূপ ধারণকারী ঐ কণিকাগুলো রক্তের মাধ্যমে স্থানান্তরীত হয়ে সমস্ত শরীরের কোষগুলোতে পৌছে যায়। কোষসমূহ এই খাদ্য প্রাণ লাভ করে বর্ধিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন উন্নতি সাধন করে থাকে। উল্লেখিত পুরো কাজটি আমরা যদি স্বাভাবিক চোখে দেখতে চাই, তাহলে তা ক্ষুদ্র ও মহাসূক্ষ্মতার কারণে আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু তাই বলে তো আমরা কেউ খাদ্য প্রণালীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমকে অস্বীকার করছি না।

সুতরাং আল্লাহ্ আমাদের শরীরের অদৃশ্য কর্মকাণ্ডের আলোকে তাঁকে ও তাঁর অদৃশ্যবস্থাকে উপলব্ধি করে মেনে নেয়ার জন্যই উল্লেখিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। জ্ঞানীরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন কী?
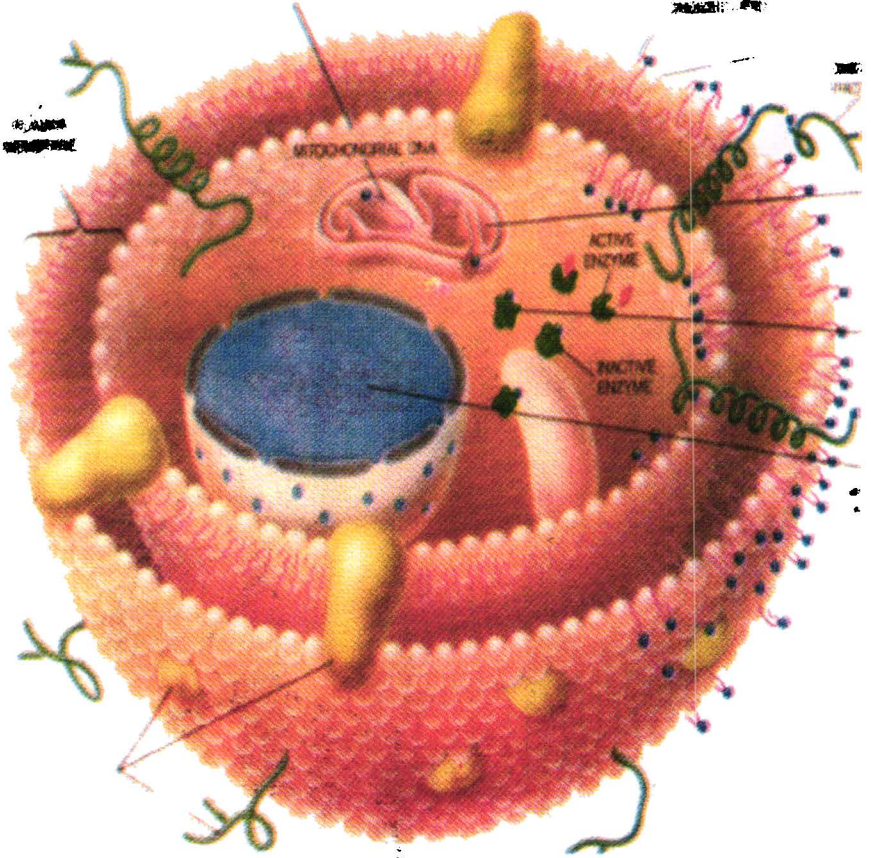
চিত্র -১৬৫

"আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই? অতপর আমি উহা স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (প্রাণী কোষ-এ রূপান্তরীত হওয়ার লক্ষ্যে)। আমি উহাকে (ঐ প্রাণীকোষকে) গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, (লক্ষ্য করে দেখ মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমানরূপে) আমি কত নিপুন স্রষ্টা।" (৭৭ ঃ ২০-২৩)

-- মানব দেহ কোষ ও সম্মিলিতভাবে এ মহাবিশ্বের এক ও একক মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্'তে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মানবজাতিকে নীরবে আহবান জানাচ্ছে। একটি প্রাণী কোষ অথচ ওর ভেতর মহাসূক্ষ্মস্তরে প্রতিটি মুহূর্তে ঘটছে অসংখ্য কর্মতৎপরতা। কোষের প্রধান অংশ হচ্ছে 'নিউক্লিয়াস'। এর মধ্যে আছে ২৩ জোড়া ক্রোমসম। আছে DNA-এর ৪টি এসিড উপাদান, যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী করে। এছাড়াও আছে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে প্রায় ৩০০ কোটি জিন (Gene)। যা কল্পনাকেও হার মানায়। একটি প্রাণী কোষকেই যেখানে আমরা খালি চোখে দেখিনা, সেখানে একটি কোষে যদি উল্লেখিত মহাসূক্ষ্মস্তরের কোটি কোটি কোটি কর্মকাণ্ড সংস্থাপিত হয়, যেগুলোর ওপরই মানব শরীরের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে, তাহলে ঐ মহাসূক্ষ্ম কর্মকাণ্ড আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ারই কথা। কিন্তু তাই বলে কেউ ঐগুলো অদৃশ্যের দোহাই পেড়ে অস্বীকার করছি না, বিনা বাক্যে মেনে নিচ্ছি।

অতএব যে মানুষ নিজ দেহ কোষের অদৃশ্য কর্মকাণ্ডকে মেনে নিচ্ছে, তার পক্ষে অদৃশ্য আল্লাহকে মেনে নেয়া-ই যুক্তিযুক্ত। কেননা আল্লাহর অদৃশ্যবস্থাকে বুঝার জন্যই মানব শরীরে অদৃশ্যপ্রায় ব্যবস্থা এঁটে দেয়া হয়েছে।
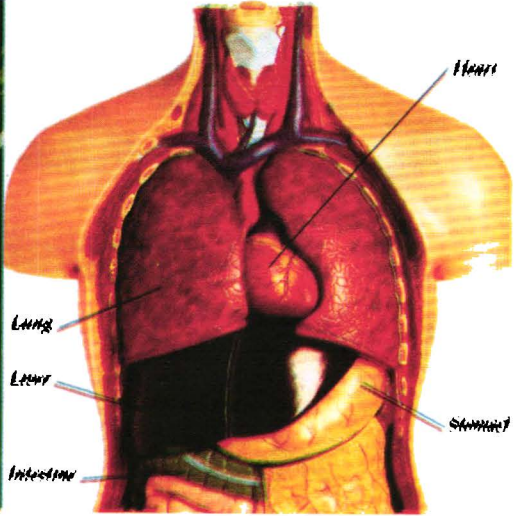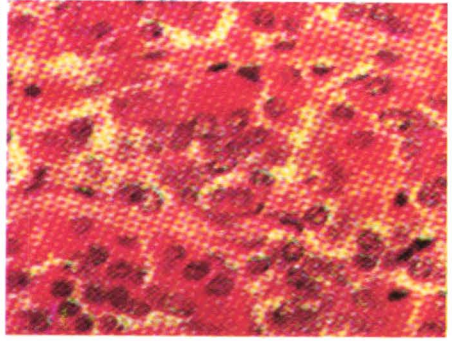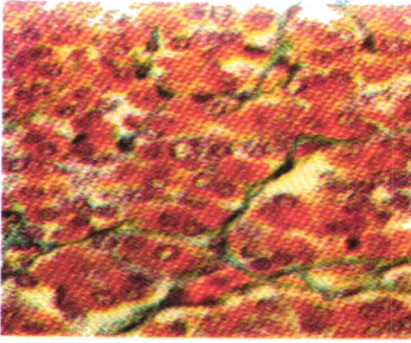
চিত্র -১৬৬

"মানুষ ধ্বংস হউক। সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি উহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? শুক্রবিন্দু হইতে (প্রথমে একটি প্রাণীকোষে, অতঃপর অগনিত প্রাণীকোষের সমাহারে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে) উহাকে তিনি সৃষ্টি করেন। পরে উহার (সার্বিক) পরিমিত বিকাশ সাধন করেন।" (৮০ ঃ ১৭, ও ১৮)

-- ওপরের ছবিতে অসংখ্য কোষের সমষ্টি দেখানো হয়েছে। বস্তুতঃ প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন প্রাণী কোষের সমাহারে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীর গঠিত। এতে এক একটি প্রাণী কোষ যে কত ক্ষুদ্র হতে পারে তা অনুমান করতেই কষ্ট হয়। খালি চোখে যা সনাক্ত-ই করা যায় না এত ক্ষুদ্র। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এদের সনাক্ত করা হয়।

এই অদৃশ্যপ্রায় মহাসূক্ষ্ম প্রাণী কোষও তার আভ্যন্তরীন উপাদানে গড়া ব্যবস্থা মানব সমাজ যাতে করে লক্ষ্য করে হলেও জ্ঞানময় দৃষ্টির ভেতর দিয়ে 'আল্লাহ্'র অদৃশ্যবস্থাকে মেনে নিয়ে ধন্য হতে পারে সে জন্য তিনি মানব দেহে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ঐ ব্যবস্থা এঁটে দিয়েছেন। জ্ঞানীজন চোখ খুলে তাকাবেন কী?
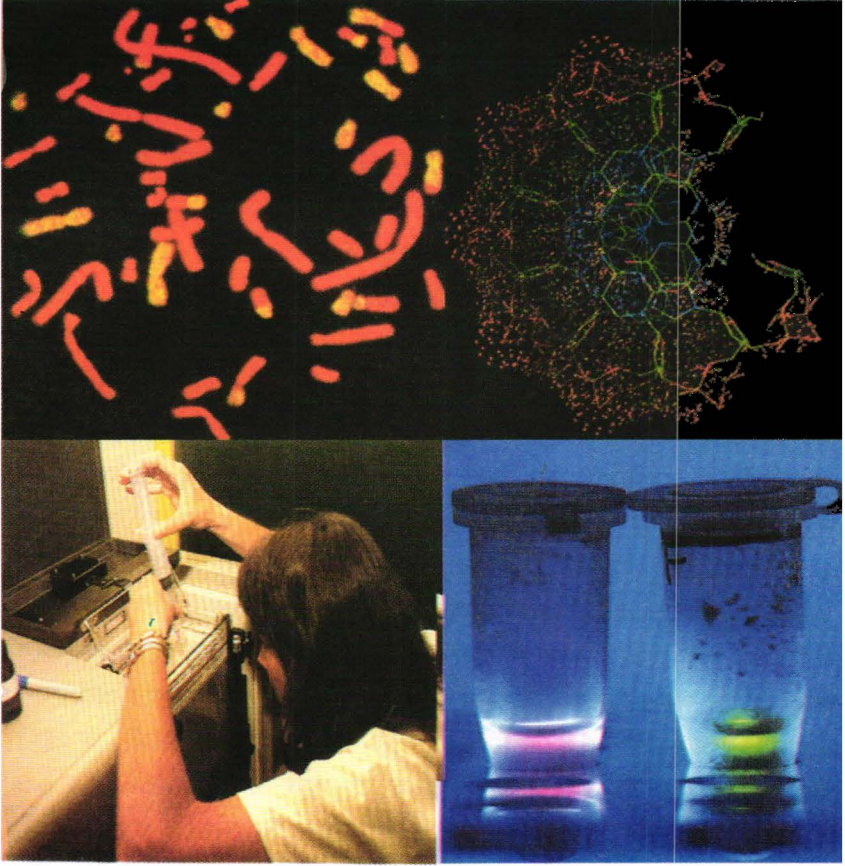
চিত্র -১৬৭

"হে মানুষ কি জিনিষ তোমাকে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং (ডিএনএ ও জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্বিকভাবে) সুসামঞ্জস্য বিধান করিয়া যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন (সেই আকৃতিতে) তিনি তোমাকে সুগঠিত করিয়াছেন।" (৮২ ঃ ৬, ৭, ৮)

-- একবিংশ শতাব্দির শুরুতেই বিজ্ঞান বিশ্ব 'জেনেটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করার কারণে মানব দেহে মহাসূক্ষ্ম কার্যকলাপের এক সাগর তথ্য বেরিয়ে আসে। মানুষ জানতে পারে তার দেহের সূক্ষ্ম একটি কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসে প্রায় ৩০০ কোটি জিন (Gene) অবস্থান গ্রহণ করছে। এই জিনগুলিই মানুষের সার্বিক কাজ-কর্ম, আকার-আকৃতি চেহেরা, রং, লম্বা, চওড়া, কথা-বার্তা, মনোভাব, স্বভাব, ব্যবহার ইত্যাদি সব বিষয় বংশ পরম্পরায় বহন করে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখিত প্রাণীকোষ থেকে পরবর্তীতে আরও সূক্ষ্ম ও মহাসূক্ষ্ম জগতসমূহকে মানব দৃষ্টিতে অদৃশ্য করে দিয়ে যেন বলতে চাইলেন, 'হে মানুষ! তুমি তোমার দেহ কোষের কর্মকাণ্ড যেখানে খালি চোখে দেখনা, সেখানে আমাকে কিভাবে দর্শন করতে চাও? আমাকে দর্শন করতে চাইলে জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।'

অথচ বিরতিহীন কর্মতৎপরতাকে বাস্তবভাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য থাকি।

সুতরাং মানবীয় বাহ্যদৃষ্টিতে কোন কিছু দর্শনযোগ্য না হলেই যে তা অস্বীকার করা উচিত নয় তা ওপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়েছে। সাথে সাথে বিজ্ঞান আমাদের আরও অবহিত করছে যে, আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা বস্তুর ক্ষুদ্রত্বের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই কেবল দর্শন করার ক্ষমতা রাখে। আর সেই নির্দিষ্ট সীমাটি হচ্ছে 10^{-7} cm, এর চাইতে বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের পরিমাপমিতি কম হলে তখন আর ঐ সকল বস্তুকণা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না এবং ঐ পর্যায়ে সব শূন্য বা ফাঁকা দেখা যাবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে সেই ক্ষুদ্রস্তরে কিংবা তার চাইতে আরও বহু বহু গুণে ক্ষুদ্রস্তরের বিশাল পটভূমিতে বিরামহীনভাবে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড চলছে। আমাদের চারদিকের সুন্দর পরিবেশে একজন অন্ধ মানুষের যে অবস্থা, সব কিছু থাকার পরও যেমন দেখে না, ঠিক তেমনি অদৃশ্য ক্ষুদ্রস্তরে আমাদের চারদিকে আমাদের মত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষেরও ঐ একই অবস্থা। অর্থাৎ, মহাসুক্ষ্ম বিভিন্ন জগতে অনবরত ঘটে চলা কর্মতৎপরতা ও কর্মচাঞ্চল্য দৃষ্টিশক্তি কর্মক্ষম থাকার পরও আমরা তা দেখতে পাইনা। এই ক্ষুদ্র (Micro) জগতগুলো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গোপণভাবে নিজ নিজ কাজ কর্ম ঠিক-ই সম্পাদন করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের অবদানে এই অদৃশ্য ক্ষুদ্র জগতগুলোকে বর্তমানে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

(৪) এখানে আরও একটি উদাহরন তুলে না ধরলে-ই নয়। কেননা দীর্ঘদিন থেকে মানবসমাজে প্রবাদটি চালু আছে যে, 'যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না'। এই বাক্যটি এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধির আকার ধারণ করে মানবমন্ডলীর মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে চলেছে। অথচ একজন জ্ঞানবান, সচেতন মানুষ হিসেবে উক্ত বাক্যটিকে অজ্ঞতাপ্রসুত ও বোকার বকাবকি বিবেচনা করে তার থেকে শুধু দূরত্ব বজায় রাখা-ই যথেষ্ট নয় বরং মনে-প্রাণে পূর্ণরূপে ঘৃণা করাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিগত বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাস্তব সত্য তথ্য সরবরাহ করে ধন্য করেছে। এর মধ্যে একটি
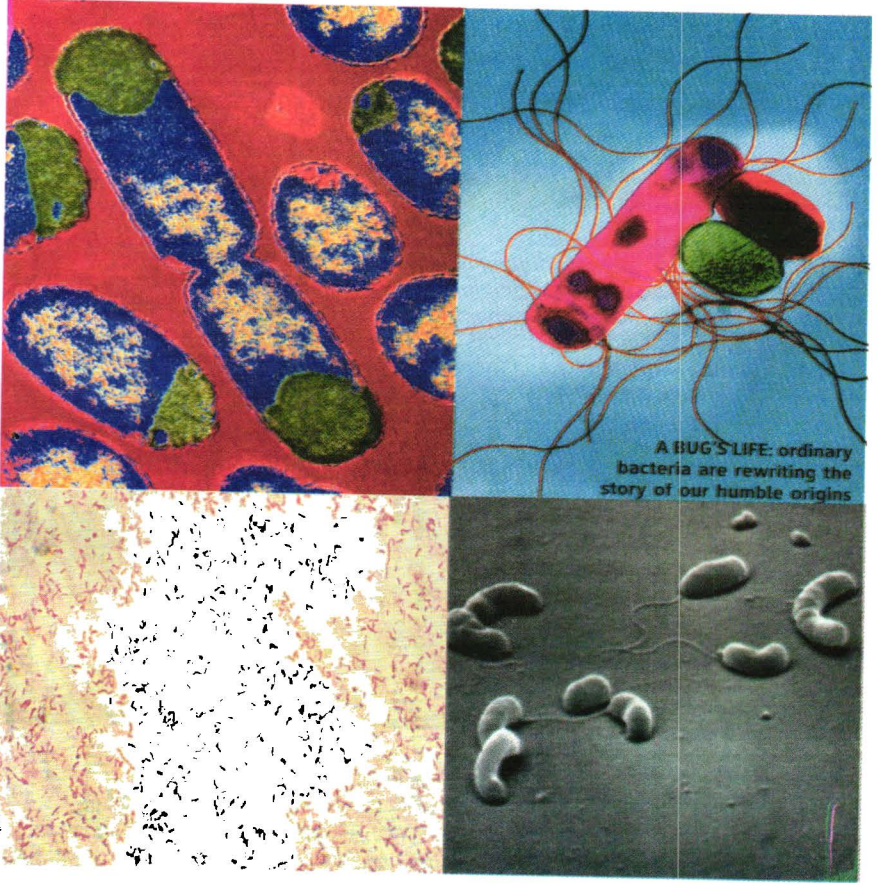
চিত্র -১৬৮

"যিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি করিয়াছেন এমন (মহাসূক্ষ্ম) অনেক কিছুই যাহা তোমরা অবগত নও।" (১৬ ঃ ৮)

-- এ মহাবিশ্বে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন অগনিত অদৃশ্য জগতের মধ্যে 'ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস' নামক মহাসূক্ষ্ম দু'টি জগতও সৃষ্টি করেছেন। এদের আকৃতি ও গঠন আমাদের দৃষ্টিশক্তির আওতা বহির্ভূত, যে কারণে এদেরকেও আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাই না। কিন্তু তাই বলে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে এদের আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। এরা এতই ক্ষুদ্র জগতের বাসিন্দা যে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে এরা রীতিমত আসা-যাওয়া করলেও আমরা এদের খালি চোখে দেখতে পাই না।

মহাসূক্ষ্ম ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জগতও যেন মানবজাতির জন্য বিশেষ বার্তা বয়ে বেড়াচ্ছে যে, 'হে মানব সমাজ! কেন মিথ্যে ভান ধরেছ? আমাদের মহাসূক্ষ্মতা ও অদৃশ্যতা যদি বিশ্বাস করে থাক, তাহলে আমাদের সবার যে স্রষ্টা 'আল্লাহ্' অদৃশ্যে আছেন তাঁকে কেন অস্বীকার করা হবে? এটাতো স্পষ্টতঃ আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল!'
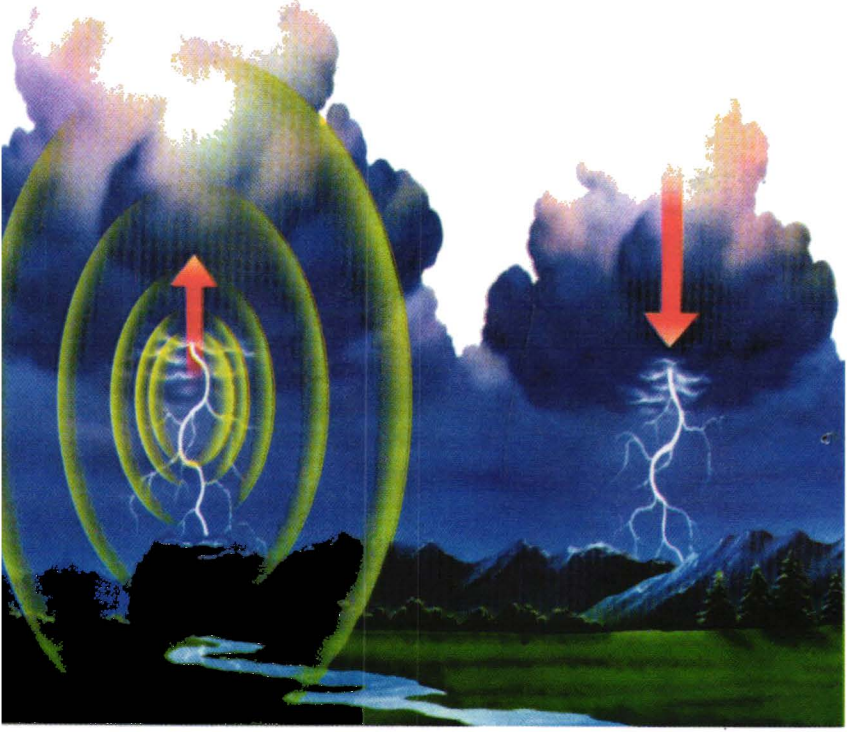
চিত্র -১৬৯

"অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বিশেষ অবহিত।" (৬ ঃ ১০১)

-- আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অদৃশ্য মহান পবিত্র 'সত্ত্বাকে' মানবীয় উপলব্ধির মধ্যে হাজির করার জন্যই আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অসংখ্য বিষয়কে মহা-ক্ষুদ্র আকৃতি দান করে আমাদের নিকট অদৃশ্য করে রেখেছেন। যেমন 'পানি চক্র' (Water Cycle)। ভূ-পৃষ্ঠে পানির প্রবাহ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বজায় রাখার জন্য তিনি সাগর-মহাসাগর থেকে পানিকে উত্তপ্ত করে বিন্দু-বিন্দু বাষ্পাকারে মহাশূন্যে উত্তোলণ করার পর আবার অপেক্ষাকৃতভাবে ঠান্ডা করে জমিয়ে পানির ফোটা-ফোটা আকারে ভূ-পৃষ্ঠে অবতীর্ণ করেন এবং ভূমিকে ভিজিয়ে সতেজ রাখেন। এতে সমগ্র প্রকৃতি ও প্রাণীকূল প্রভূত কল্যাণ লাভ করে থাকে।

উল্লেখিত 'পানি চক্র' (Water Cycle)টিও অদৃশ্য ও নীরব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করছে- 'যা দেখি না তা মানি না' উক্তিটি শুধু 'অজ্ঞ ও মূর্খ' লোকদের জন্যই সাজে, জ্ঞানবান সমাজের জন্য কখনই শোভনীয় হতে পারে না। আজকের গর্বিত বিজ্ঞান সে কথাই ছড়িয়ে যাচ্ছে।
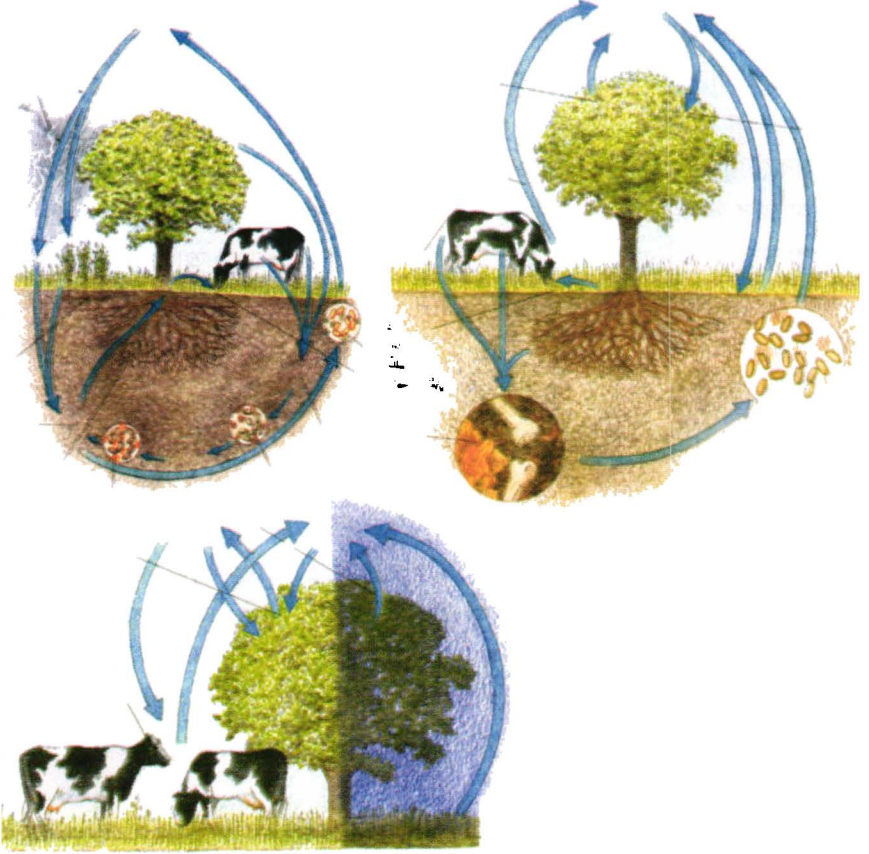
চিত্র -১৭০

"মানুষের (বুঝার) জন্য আমি (বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে) এই সকল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)

--যে কোন অবস্থাতেই যেন মানুষ তার অদৃশ্য 'প্রভু'কে জ্ঞানের আঙ্গিকে উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি গভীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে সর্বিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা মানুষের সাথে নিবীড়ভাবে সম্পৃক্ত অসংখ্য বিষয়কে মহাসূক্ষ্মতা দান করে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তির বাইরে অদৃশ্য করে রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কার্বন ডাই অক্সাইড চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র ইত্যাদির পর্যাপ্ততা প্রাণীজগতের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু এরা মানবীয় দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য। উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ চক্রগুলো যতই অপরিহার্য হোক না কেন এদের কোন একটি চক্রের ধারাবাহিক পরিক্রমণও মানুষ সরাসরি দর্শন করার যোগ্যতা রাখে না। শুধু বিভিন্নভাবে পরীক্ষণের মাধ্যমেই উপলব্ধি করে নিশ্চিত হতে পারে যে, ঘটনাগুলো সত্য। ঠিক একইভাবে অদৃশ্য 'আল্লাহ্‌'কে জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করে সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার জন্যই উল্লেখিত অদৃশ্য চক্রসমূহ সেট-আপ করেছেন। ছবিতে কয়েকটি চক্র দেখা যাচ্ছে। সুতরাং অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে 'আল্লাহ্‌' কে অস্বীকার করার কোন পথ আছে কী?

অন্যতম বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণুর জন্য দায়ী 'ভাইরাস' জগত ও 'ব্যাকটেরিয়া' জগত। প্রাচীন কাল হতে চলে আসা কাল্পনিক গল্পগুলোকে গুড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে প্রতিটি রোগের জন্য কোন না কোন প্রকার 'ভাইরাস' জড়িত আছে। এই ভাইরাসগুলো এত ক্ষুদ্র জগতের বাসিন্দা যে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না বা সনাক্ত করা যায় না। এছাড়া কিছু কিছু মহাসুক্ষ্ম জগতের 'ব্যাকটেরিয়া' আমাদের খাদ্য সরবরাহকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আমাদের কল্যাণ সাধন করছে। আবার কিছু কিছু আমাদের দেহের জন্য মারাত্মক সংকটও সৃষ্টি করছে। উল্লেখিত জিনিসগুলো আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাইনা বলে কি তাদের অস্বীকার করতে পারি? পারি না।
অতএব, একটা নিদির্ষ্ট সীমায় ($১০^{-৭}$ সেঃ মিঃ) বেঁধে দেয়া আমাদের দৃষ্টি শক্তির ক্ষমতার বাইরে ক্ষুদ্র কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না বলেই তা অমান্য করা, অস্বীকার করা বিজ্ঞান সমর্থন করে না। বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ব্যাক্তিত্বের দাবীদার হতে হলে অবশ্যই অদৃশ্য বা গোপনীয় বিষয়কে চরম বাস্তবতার আলোকে মেনে নিয়ে তবেই সন্মুখে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা এক পর্যায়ে বিজ্ঞান প্রিয় হওয়া সত্বেও, জ্ঞানবান হওয়া সত্বেও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে হবে এবং মূর্খ পন্ডিতের দলে শামিল হতে হবে। যা আমাদের বিবেকবান সমাজের কারও কাম্য নয়।
আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে দৃষ্টিশক্তি তথা চোখের দেখার কৌশল এবং কেন মহাসুক্ষ্ম জগত আমাদের দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে আছে তা সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তুলে ধরতে চাই।
প্রাণী জগতের 'দৃষ্টিশক্তি' আলোর প্রতি সংবেদনশীল। আলো ছাড়া তাই আমরা মানুষও কিছু দেখতে পাইনা। আমাদের চোখে দু'ধরনের কোষ রয়েছে। এক ধরনের 'কোষকে' বলা হয় 'শঙ্কু' Cone। এদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় দশ মিলিয়ন। অন্য প্রকার 'কোষকে' বলা হয় 'পাড়' (Rod) এদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় একশত ত্রিশ মিলিয়ন। Cone নামক কোষগুলো তীব্র ও উজ্জল আলোতে এবং Rod নামক কোষগুলো ক্ষীণ বা স্বাভাবিক আলোতে আলোড়িত হয়ে অনুভুতির সৃষ্টি করে এবং বস্তুকে দর্শন কাজে সহযোগিতা করে থাকে। Cone এবং Rod নামক কোষগুলো চোখের

ভেতর পর পর দশটি পর্যায়ে সুশৃংখলভাবে সাজানো থাকে। এদেরকে একত্রে 'Retina' বলে। বস্তুর ওপর পতিত আলো প্রতিফলিত হয়ে আগমন করলে 'রেটিনার' কোষগুলো তা গ্রহণ করে থাকে। অতঃপর ঐ আলো চক্ষুশিরার (Optic Nerve) মাধ্যমে মস্তিষ্কের পশ্চাতে প্রেরিত হয়ে থাকে যেখানে বস্তুর ধারণা তৈরী হয়। দু'টি চক্ষুশিরায় প্রায় দু'লক্ষ আঁশ আছে। এই আঁশগুলোর অধিকাংশই মধ্য মস্তিষ্কের গাত্রে এসে মিশে গেছে। আবার এই গাত্রের প্রতিটি আঁশে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) 'নিউরন' (Neuron) বর্তমান আছে। এই 'নিউরনের' প্রতিটি আবার প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) অন্য 'নিউরনের' সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক কথায় বিস্ময়কর সৃষ্টি নৈপুণ্যতার সমাহার মানবদেহে 'চক্ষু' নামক এই অন্যতম সৃষ্টিটি।

আমাদের এই মহাবিশ্বে আলো ঢেউ এর মত করে পথ চলে থাকে। এই চলার ভঙ্গি আবার তিন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- (ক) Short wave Length, (খ) Medium wave length, ও (গ) Long wave length.

এখন মানুষ হিসেবে আমাদের চোখের দেখার কৌশল হচ্ছে- $১০^{-৮}$ সেঃ মিঃ বা তার চেয়ে বড় আকৃতির কোন বস্তুর ওপর পতিত আলো প্রতিফলিত হয়ে যখন চোখের 'রেটিনায়' সজ্জিত কোষসমূহের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে গমন করে, তখন ঐ আলো কোষগুলোকে আঘাত করে চলার কারণে 'ফটো কেমিক্যাল' প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাতে আবেগ সৃষ্টি হয়। এতে কোষগুলো আলোড়িত হয় এবং একই সাথে 'রং' সম্পর্কেও ধারণা দেয়। ফলে রেটিনার এই আবেগে উৎপাদিত সংকেত 'চক্ষুশিরার' মাধ্যমে মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে প্রেরিত হয়। এখানে আগত আলোর কার্যকারিতা প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কৌশলগত পরিচয় উদ্‌ঘাটন এখনও বিজ্ঞানের অজানা। আবার $১০^{-৮}$ সেঃ মিঃ এর চেয়ে আকৃতিতে ক্ষুদ্র কোন বস্তুর ওপর পতিত আলো প্রতিফলিত হয়ে যখন চোখের রেটিনার সজ্জিত কোষসমূহের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে গমন করে, তখন ঐ কোষগুলোর গায়ে কোন প্রকার স্পর্শ না করেই নীরবে প্রস্থান করে বিধায় কোষগুলো কোন প্রকার
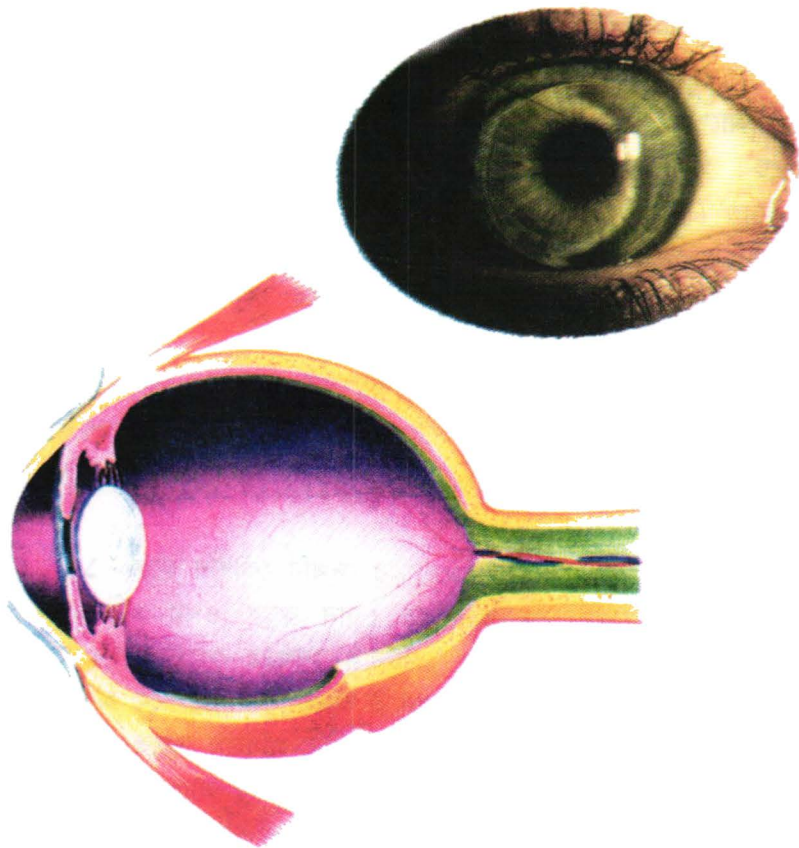
চিত্র -১৭১

"আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ?" (৯০ ঃ ৭, ৮, ৯)

-- জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এ মহাবিশ্বে এক ও একক স্রষ্টা মহান রাব্বুল আ'লামিনকে জ্ঞানের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করার এবং দর্শন করার জন্য সৃষ্ট প্রতিটি বিষয়ের দিকে মনোযোগের সাথে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। মাত্র এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ১টি মানবীয় চক্ষুতে তিনি প্রায় এক শত চল্লিশ মিলিয়ন কোষ (Cone এবং Rod) পর-পর সজ্জিত করে এর কার্যকারিতা দান করেছেন। বিষয়টি কল্পনা করতেও জ্ঞানরাজ্য দোল খেয়ে যায়। শুধু কি তাই! উল্লেখিত এক শত চল্লিশ মিলিয়ন কোষগুলো আবার পরস্পর একে অপরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে মহাসূক্ষ্ম নার্ভ দিয়ে। পরে আবার সম্মিলিত অপটিক নার্ভটি (Optic Nerve) মস্তিষ্কের পিছনে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে যেখানে বস্তুর ধারণা তৈরী হয়।

কোন আলো কিংবা কোন বস্তুর ওপর পতিত আলো প্রতিফলিত হয়ে সজ্জিত কোষগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান দিয়ে গমনকালে কোষগুলো প্রভাবিত হলেই বস্তু বা আলো দৃশ্যমান হয়ে উঠে নতুবা বস্তু বা আলো তখন অদৃশ্যই থেকে যায়। তাই বলা যায় মহাসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট এই 'চক্ষু'গুলোও মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে। অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কী?
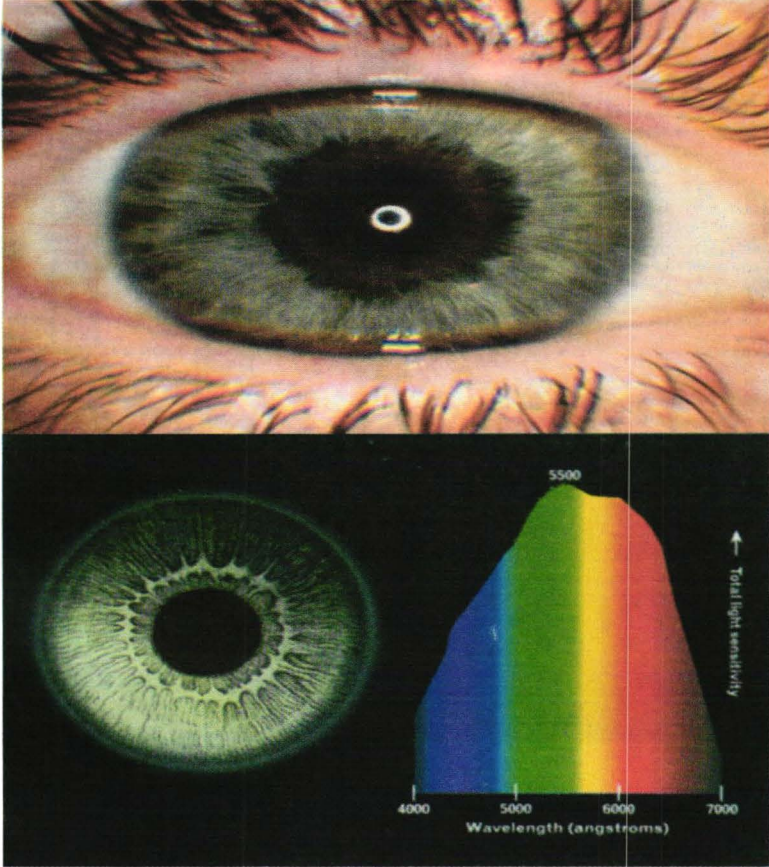
চিত্র -১৭২

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য; এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।" (৭৬ ঃ ২)

-- পৃথিবী পৃষ্ঠে দাড়িয়ে মহাবিশ্বকে সম্মুখে রেখে জ্ঞানের চোখ খুলে কেউ যদি ভাবতে থাকেন তার আগমন কেন ঘটেছে এই সুন্দর নয়নাভিরাম মহাবিশ্বে? তাহলে নিজ বিবেক-ই তাকে বলে দেবে নিশ্চয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এ মহাজাগতিক পরিবেশে অযথা-ই তার আগমন ঘটেনি।

যে দু'টো চোখ দিয়ে সে সবকিছু দর্শন লাভ করে ধন্য হচ্ছে সেই দু'টো চোখের গঠন ও বস্তুকে দর্শন লাভ করার পদ্ধতিটি কোন মানুষ জ্ঞান দিয়ে অবহিত হওয়ার পর মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্'র সম্মুখে মাথা নত না করে উপায় থাকবে না। প্রতিটি বস্তুর ছবিই প্রকৃতপক্ষে উল্টো আকৃতি নিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে এবং পরক্ষণে মস্তিষ্ক তা নিজ থেকেই গুছিয়ে দিয়ে দৃষ্টিকে সহায়তা করছে দর্শন কাজে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র বিপরীতে অসংখ্য আহ্বান আমাদের মস্তিষ্ক গ্রহণ করলেও সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় রত হলে অবশ্যই সত্য আহ্বানটি সম্মুখে ভেসে উঠবেই।
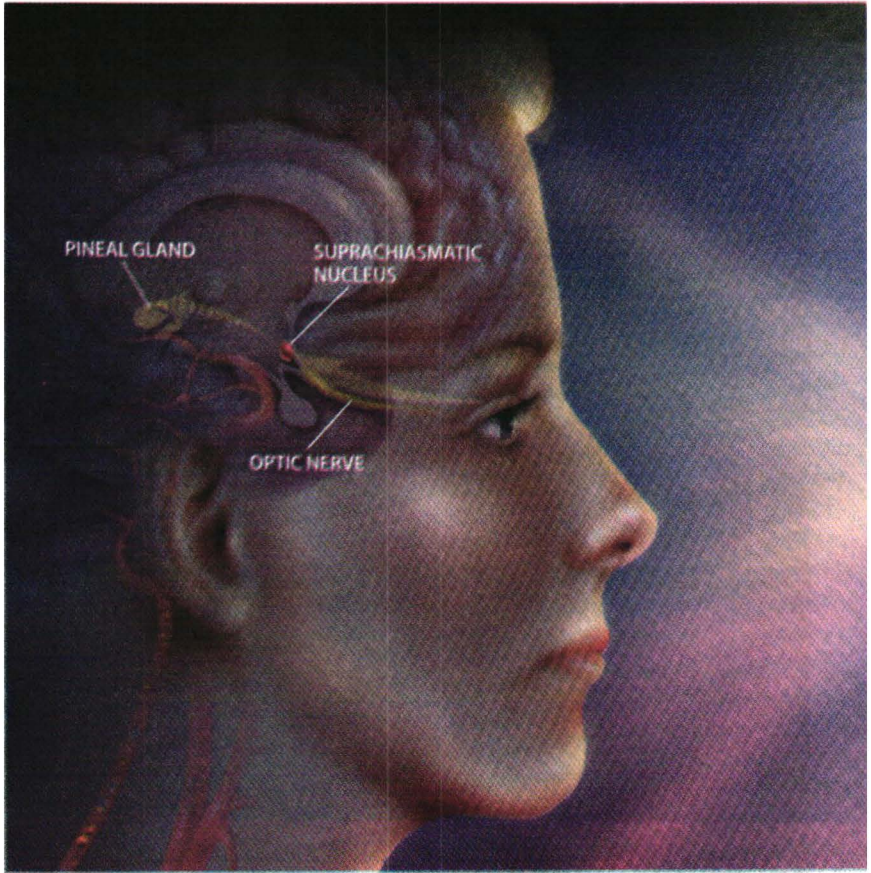
চিত্র -১৭৩

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি (উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থার সমন্বয়ে) সুন্দরতম গঠনে।" (৯৫ : ৪)
-- 'দৃষ্টিশক্তির' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাটাই আল্লাহ্ তায়ালা মহাসূক্ষ্মতার আবরণে এমন কৌশল অবলম্বনে সৃষ্টি করেছেন যে- এর দিকে একনজর তাকাতেই মহাজ্ঞানী 'সত্তা'র অদৃশ্য কর্মকাণ্ড যে এর পেছনে ক্রিয়াশীল আছে তা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে যায়। বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অগ্রগতি সাধিত হলেও বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কৌশলগত পরিচয়টি উদ্‌ঘাটন এখনও বিজ্ঞান জগতের অজানাই থেকে গেছে। মহাসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টি শক্তির বন্ধনে আমাদের দর্শন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে মহান আল্লাহ্ নিজের পরিচয়, কৃতিত্ব ও মাহাত্ম মানবসমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন- জ্ঞানময় পরিবেশে তা কি অস্বীকার করা চলে? সমগ্র মানবমণ্ডলী চেষ্টা-সাধনা করেও কি আমাদের দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ পদ্ধতি অন্য কোন উপায়ে বদলিয়ে দিতে পারবে? দু'একটি অংশের উন্নয়ন করতে পারবে ঠিকই কিন্তু পুরো সিষ্টেম বদলাতে কক্ষনই পারবে না। এখানেই 'আল্লাহ্'র কৃতিত্ব। সমাজের জ্ঞানীদের জন্য এ এক বড় নিদর্শন বৈকি!

অনুভূতি সৃষ্টি করে না এবং সে জন্য আমরাও ঐ ক্ষুদ্র জগতের বস্তুদের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দর্শন লাভ করতে পারি না। ওরা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে থাকে যদিও বাস্তবে এই মহাবিশ্বে ওদের অস্তিত্ব এক মহাসত্যতায় বিরাজমান। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (Wave Length) ওপর নির্ভর করে 'রং'। তরঙ্গ দৈঘ্য বদলে গেলে রং ও (Colour) বদলে যায়। দৃশ্যমান আলো (Visible light) অর্থাৎ, যে আলোর তরঙ্গগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) 4×10^{-5} cm হতে 8×10^{-5} cm পর্যন্ত। অর্থাৎ, ১ (এক) সেঃ মিঃ এর ১ (এক) লক্ষ ভাগের ৪ (চার) ভাগ থেকে ৮ (আট) ভাগ পর্যন্ত। বিভিন্ন বর্ণের (রং- এর) আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। বর্ণালী (Spectrum)-তে ৭ (সাত) টি বর্ণের আলো আছে। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট। এদের 'অ্যাংষ্ট্রম' (Angstrom) এককে প্রকাশ করা হয়। এক (Angstrom) ইউনিট বা $A^0 = 10^{-8}$ cm অর্থাৎ ১ সেঃ মিঃ এর ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ মাত্র।

রং (Colour)	**তরঙ্গ (Wave lenght)**
বেগুনী (Violet)	$3800\ A^0 - 4500\ A^0$
নীল (Indigo)	$4500\ A^0 - 4800\ A^0$
আসমানী (Blue)	$4800\ A^0 - 5000\ A^0$
সবুজ (Green)	$5000\ A^0 - 5500\ A^0$
হলুদ (Yellow)	$5500\ A^0 - 5900\ A^0$
কমলা (Orange)	$5900\ A^0 - 6400\ A^0$
লাল (Red)	$6400\ A^0 - 7800\ A^0$

$A^o = 10^{-8}$ cm.

$\therefore$ Violet, $3800A^0 = 3800 \times 10^{-8}$ cm.

$= 3.8 \times 10^{-6}$ cm.

$= 4 \times 10^{-5}$ cm.
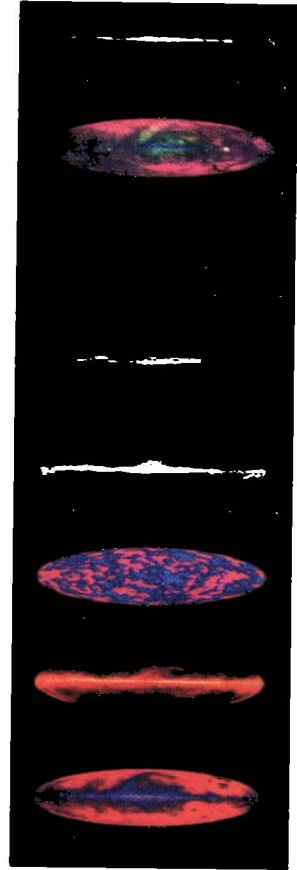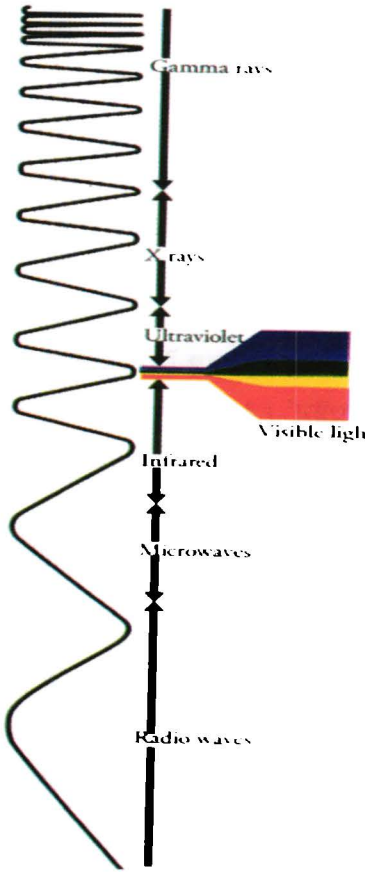
চিত্র -১৭৪

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন, আর উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন অন্ধকার ও আলোর" (৬ : ১)।

-- মহাবিশ্বের মহাকাশে দৃশ্য আর অদৃশ্য আলো মিলে সবচেয়ে বড় রহস্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞান এ যাবত যে সকল আলোকশক্তি (Radiation) -কে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- গামা-রে, এক্স-রে, Ultra violet ray, ইনফ্রারেড রে, ভিজিবল লাইট, রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি। এদের মধ্যে মানবচক্ষু শুধু মাত্র ভিজিবল লাইট-এর মাধ্যমেই দর্শন করতে সক্ষম। অন্যান্য আলোগুলো Short wave length ও Long wave length বিশিষ্ট হওয়ায় মানুষের চোখের রেটিনা প্রভাবিত হয় না, ফলে দৃষ্টি শক্তিতে তার ওপর ধরা পড়ে না। আলোর ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা হচ্ছে 4×10^{-5} cm হতে 8×10^{-5} cm পর্যন্ত। এর চেয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বা কম হলেই তা আর দর্শন সীমায় আসবে না। সুতরাং বিশাল মহাবিশ্বে বিশাল আলোক (Radiation) ক্ষেত্রের মাঝে মাত্র সামান্য দশমাংশ আলো 4×10^{-5} cm হতে 8×10^{-5} cm -এর এই ক্ষুদ্র সীমাকে মানুষ কাজে লাগিয়ে কিভাবে স্রষ্টাকে দর্শন করতে চায়? এটা অলৌকিক নয় কি?
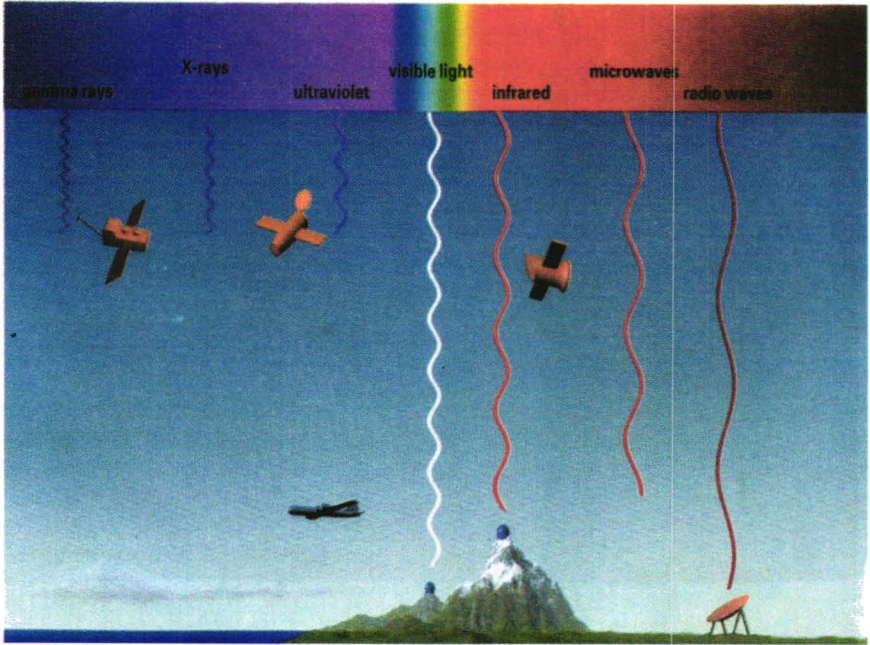
চিত্র -১৭৫

"আলোর ওপর আলো (মহাবিশ্বব্যাপী)।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- ওপরের ছবিতে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর এবং সাথে সাথে আলোক শক্তির (Radiation) বর্ণালী বীক্ষণ (Spectrum) দেখানো হয়েছে। ছবিতে বাম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে ডান দিকে মহাসূক্ষ্ম 'বস্তুকণা' ও আলোকশক্তির 'ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য' থেকে বৃহৎ 'বস্তু' ও আলোকশক্তির 'লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য' প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে এই বিশাল অঙ্গণে দৃশ্যমান আলোর (Visible Light) স্থান খুবই নগন্য পর্যায়ে যা ছবির মধ্যস্থানে সাদা আলোতে নির্দেশিত হয়েছে।

সমাজের জ্ঞানীজন উক্ত ছবিটি সম্মুখে রেখে যদি একটিবার ভাবেন যে, এই বিশাল জগতে তার দৃষ্টিশক্তির এই নগন্য ক্ষমতা দিয়ে যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন তা কতটুকু কৃতিত্বের দাবীবার এবং এই নগন্য দর্শন ক্ষমতা দিয়ে যখন সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষ দেখতে পায়না তখন সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র মহান স্রষ্টাকে দেখার যোগ্যতা ও ক্ষমতাই বা তার কোথায়? মিঃ ষ্টিফেন হকিংস কি একটিবারও বিষয়টি ভেবে দেখেছেন? ভেবে দেখলে হয়তো 'আল্লাহ্'কে দেখার বায়না ধরতেন না এবং বলতেন না- 'Show me God'.
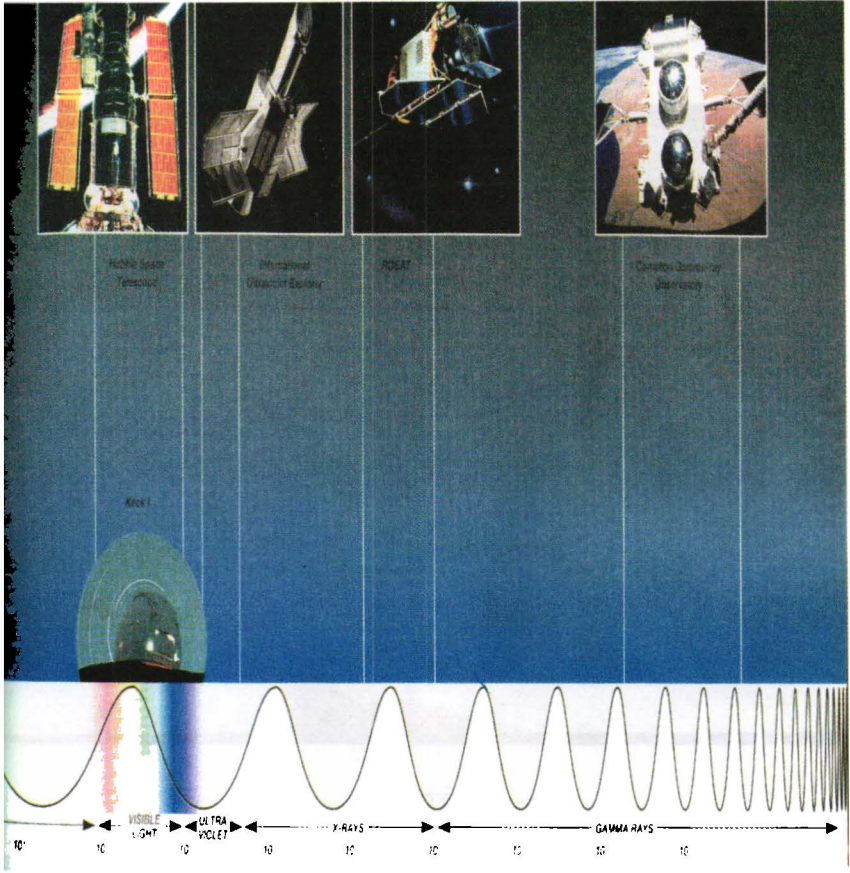
"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) আল্লাহর 'নূর'-এ উদ্ভাসিত।" (২৪ ঃ ৩৫)
-- ওপরে নির্দেশিত ছবিটি এবং পর পৃষ্ঠার ছবিটি পাশাপাশি সংযুক্ত করে দেখতে হবে। কেননা উভয়ই একটি ছবির ২টি অংশ।

আমাদের মহাবিশ্বের মহাকাশে অসংখ্য ধরনের মহাজাগতিক আলোকরশ্মি (Radiation) যে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করে চলেছে, তা এখন আর কল্প-কাহিনী নয় বরং একশত ভাগ-ই যে সত্য ঘটনা বিজ্ঞান জগত তা বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের মাধ্যমে বাস্তবে প্রমাণ করেছে। ছবিতে ওপরে মহাশূন্যে প্রেরিত উপগ্রহগুলোর ছবি এবং নীচের দিকে ওদের কোন্‌টি কি ধরনের আলোকরশ্মি (Radiation) আবিষ্কার করেছে সেই রশ্মিগুলোর পরিমাপসহ অংকিত ছবি দেখানো হয়েছে। মহাবিশ্বের বিশাল আলোকরশ্মির জগতে আমাদের দৃশ্যমান আলোর ব্যাপ্তী মধ্যস্থানে দেখানো হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কত বিশাল জগত-ই আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

অতএব সৃষ্টির প্রায় সবটুকু-ই যেখানে আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য, সেখানে মূল স্রষ্টার পবিত্র 'সত্ত্বা' অদৃশ্যে বিরাজমান থাকবেন, এতে আশ্চর্যের বা হতবাক হওয়ার কি বা থাকতে পারে?
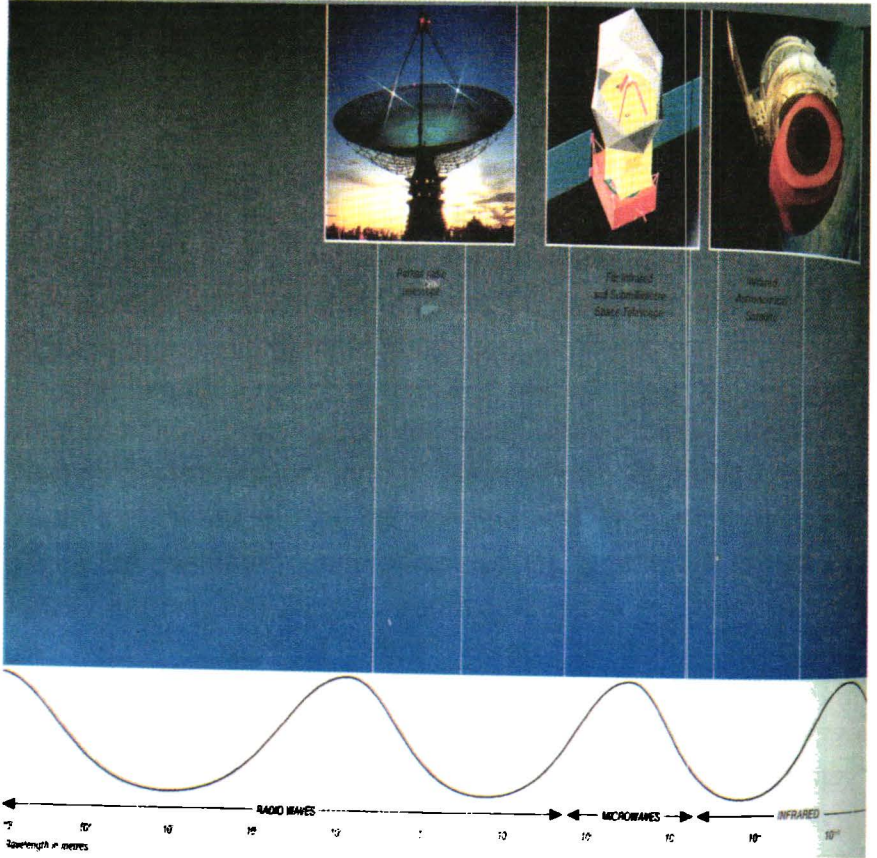
চিত্র -১৭৭

"মানুষের জন্য আমি এই সকল নিদর্শন ব্যক্ত করি; কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে।" (২৯ ঃ ৩) -- প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে বলতে হয়, সমাজের মধ্যে বসবাসকারী নিরেপেক্ষ জ্ঞানীজনই মহাবিশ্বে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে বিছিয়ে রাখা জ্ঞানময় নিদর্শন (Sign)গুলো ভালভাবে দেখে-শুনে ও গবেষণা করে এর মাধ্যমে মহান স্রষ্টার এই সৃষ্টিকে একদিকে যেমন বুঝতে পারে অপরদিকে তেমনি এ সকল বিষয়ের মধ্যে দিয়ে মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্ত্বাকেও উপলব্ধি করতে এবং তাঁর একান্ত উপস্থিতিকে মেনে নিতে পারে। কেননা তাঁরা এতটুকু বুঝতে পারেন যে, নিদর্শনগুলোর কোন একটিও সমগ্র মানবজাতির মিলিত চেষ্টা সাধনার মাধ্যমেও সম্ভব নয়। ওপরে ছবিতে দৃশ্যমান বস্তুর আয়তন এবং আলোর ব্যাপ্তি অতি ক্ষুদ্র পরিমিতি মাত্র $10^{-8}cm$ হতে $10^{-7}cm$ এবং $4 \times 10^{-5}cm$ হতে $8 \times 10^{-5}cm$ দেখা যাচ্ছে। এর বাইরে আমরা অন্ধ। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এর চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু এবং আলোর ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন কিছুই আমরা দর্শন লাভে সক্ষম হই না। এ অবস্থা আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে অদৃশ্যের বিশাল অঙ্গনে তিনি সত্যি-সত্যিই আছেন।

আমরা জানি বর্ণালীতে ৭টি বর্ণ আছে। এক প্রান্তে আছে 'বেগুনী' এবং অপর প্রান্তে আছে 'লাল' বর্ণ। বর্ণালীর (Spcetrum) ৭টি রং অর্থাৎ ৭ প্রকারের তরঙ্গ দৈর্ঘ (Wave Length) বিদ্যমান। এখানে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে যে, 'বেগুনী' রং-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং 'লাল' রং-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো আমাদের চোখের 'রেটিনাকে' প্রভাবিত করতে না পারায় তা চোখে ধরা পড়ে না। ফলে আমরা ঐ পরিমাপের রশ্মিগুলো দেখতে পাই না।

সুতরাং আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 8×10^{-5} হতে ক্ষুদ্র হলে এবং বস্তুর আকৃতি 10^{-8}cm কিংবা এর চেয়ে ক্ষুদ্র হলে ঐ 'আলো' এবং 'বস্তুকে' আমাদের চোখের রেটিনায় সাজানো কোষগুলো সনাক্ত করতে সক্ষম হয় না বিধায় আমরা তা দেখতে পাই না। যে কারণে 'গা-মা-রে' (Gamma-ray), এক্স-রে (X-ray) ইত্যাদি আলোকে এবং বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ পরমাণু, নিউক্লিয়াস, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, মেসন, গ্লুওন, গ্র্যাভিটন, ফোটন ইত্যাদি কণিকাসহ প্রায় শতাধিক মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকাদেরকে আমরা স্বাভাবিক কায়দায় দর্শন লাভ করতে ব্যর্থ হই। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে 'পরমাণুর' ব্যসার্ধ হচ্ছে 10^{-8}cm অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের মাত্র একভাগ। অনুরূপভাবে 'নিউক্লিয়াসের' ব্যাসার্ধ হচ্ছে 10^{-12}cm, 'প্রোটনের' ব্যসার্ধ হচ্ছে 10^{-13}cm, 'নিউট্রন' ও 'ইলেকট্রনের'ও 'প্রোটনের' ন্যায় একই ব্যাসার্ধ। ফলে উক্ত মহাসূক্ষ্ম কণিকাদের বাস্তব উপস্থিতি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ওরা আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য বা গোপণীয়। এখানে এই পর্যায়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি কথা থেকে যাচ্ছে, আর তা হলো- যদি আমরা আমাদের চারপাশের অদৃশ্য বস্তুকণিকাসমূহকে, এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে সৃষ্ট প্রভাবসহ দেখতে পেতাম, তাহলে বাস্তবে কি ঘটতো? এর উত্তরে জ্ঞানের আলোকে যা বলা যায় তা হলোঃ–

(১) এই মহাবিশ্বটি 'পদার্থ এবং শক্তির' কণিকাসমূহ দিয়ে একেবারে পরিপূর্ণ (ঠাসা) বিধায় আমরা চোখ খুলে চতুর্দিকে স্থায়ীভাবে কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্ট ও ঘোলাটে পরিবেশ দেখতে পেতাম।

(২) যে কারণে বর্তমানের ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত দেখার সুযোগ থাকতো না। চতুর্দিকে মাত্র কয়েক হাত পর্যন্ত কোন মতে দর্শন করার সুযোগ ঘটতো।

(৩) তাতে বর্তমানের ন্যায় কোন প্রকার দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা কল্পনাই করা যেত না। সম্ভব হতো না কোন প্রকার উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা।

(৪) কোটি কোটি বিষয়ের সকল প্রকার অসীম কর্মকান্ড নজরে পড়ার কারনে মানবসম্প্রদায়ের বর্তমান সীমাবদ্ধ মস্তিষ্ক খেই হারিয়ে ফেলতো এবং স্বল্প সময়ে বিকৃতি ঘটতো।

(৫) মানবসম্প্রদায় নিজ দেহের আভ্যন্তরীণ কর্মকান্ড এবং সে কারণে ভেতরে যা কিছু তৈরী হচ্ছে ও দেহ থেকে যা কিছু প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে নির্গত হচ্ছে তা সরাসরি দর্শন করার কারণে নিজ দেহের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হতো এবং এক পর্যায়ে অসহ্য হয়ে মৃত্যু কামনা করতো।

(৬) একে অপরের সমস্ত শরীর পুঙ্খানুপঙ্খরূপে দর্শন করার পরিবেশে লজ্জা-শরমের কোন বালাই থাকতো না এবং সে কারণে বিপর্যস্ত হতো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ও সামাজিক ব্যবস্থা। মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যেত।

(৭) কোনও প্রকার অদৃশ্য বা গোপণ বিষয়ের অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বে না থাকায় মানবসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই সমভাবে জ্ঞানলাভ করার কারণে কারও কর্তৃত্ব কেউ স্বীকার করতো না। ফলে বিশৃংখলায় পূর্ণ হয়ে যেত এই পৃথিবীর ন্যায় জীবনময় জগতসমূহ। এরূপ আরও অসংখ্য ভয়ংকর পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যা হয়তো এখনো আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করতে ও ব্যখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছি না। তবে অসংখ্য প্রমাণের আলোকে প্রতীয়মান হচ্ছে- সৃষ্টির সেরা মানুষ তার অস্তিত্ব সার্বিকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যই এবং পৃথিবীর এই পরীক্ষা নামক জীবনে অদৃশ্য স্রষ্টাকে খুঁজে নিয়ে ধন্য হওয়ার লক্ষ্যেই দৃশ্যমান বস্তুর চেয়ে অদৃশ্য বস্তুর সংখ্যা বেশী হওয়া জরুরী ছিল এবং বাস্তবে হয়েছেও তা-ই।

চিত্র -১৭৮

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই, তিনি তোমাদিগকে খুব শীঘ্রই দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন (Sign); তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে।" (২৭ ঃ ৯৩)

-- বিগত শত বৎসরের ব্যাপক বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মাধ্যমে মানবজাতি প্রমাণ করতে পেরেছে যে, এ মহাবিশ্বের সর্বত্র বস্তুকণিকা ও মৌলিক ৪টি শক্তি সমভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কোথাও এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও এদের থেকে মুক্ত পাওয়া যাবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা বাস্তবে সেরকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে বস্তুর বেলায় $10^{-8} cm$ থেকে $10^{-7} cm$ পর্যন্ত এবং আলোর (Radiation) বেলায় $4 \times 10^{-5} cm$ হতে $8 \times 10^{-5} cm$ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তাই মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা, শক্তিকণিকা এবং অসংখ্য আলো দিয়ে পরিপূর্ণ এ পরিবেশে ওদের দেখতে না পেয়ে সব দিক থেকেই সার্বিকভাবে স্বচ্ছন্দময় জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হচ্ছি। তা না হলে বস্তুকণিকা, শক্তিকণিকা ও আলোর স্থায়ী ঘন কুয়াশাময় পরিবেশে মানবীয় জীবন হয়ে যেতে দুর্বীসহ এবং বিপর্যস্ত।

সুতরাং এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রশংসা উচ্চারিত হতে পারে কী? এবং কারো গোলামী হতে পারে কী?

অতএব, আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে বলা যায় এই মহাবিশ্বে আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আমরা যা দর্শন করে থাকি, তার চাইতে যা আমরা দেখতে পাই না তার পরিমান-ই কার্যত অনেক বেশী। অদৃশ্য জগতে আছে সুশৃংখল কার্যপদ্ধতি, অলংঘনীয় বিধি-বিধান এবং আলোর গতিতে কিংবা প্রয়োজনে তার চেয়েও বেশি গতিতে কর্ম সম্পাদনার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। সুতরাং আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারনেই মূলতঃ আমরা অসংখ্য জগতকে দেখতে পাচ্ছি না, আর সেই কারণে কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বলেই তাকে অস্বীকার করা বর্তমান বিজ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত এই বিশ্বে চরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

একই সাথে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও বলা যায় 'আল্-কুরআন' দাবীকৃত এই পৃথিবীপৃষ্ঠে মানবমণ্ডলীকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করার লক্ষ্যেই যে বিশাল জগতকে দৃষ্টির আড়াল করে রাখা হয়েছে, সেই মহা সত্য বিষয়টিকে বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করে প্রমাণসহ প্রকারান্তরে ঐশীগ্রন্থের দাবীকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনের নতুন আলোতে (New light) 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' এই কোরাস কণ্ঠকে মানব সমাজ কোন যুক্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারে? তাই জ্ঞানের এমন আলো ঝলমল সত্য পথ ছেড়ে দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকার পথ মাড়াবার ইচ্ছা অন্ততঃ প্রকৃত জ্ঞানীসমাজের থাকতে পারে না।

(৩) প্রশ্ন ঃ এই মহাবিশ্বে মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকাসমূহের পদ্ধতিগতভাবে সৃষ্টি ও সুশৃংখল কর্মতৎপরতা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্যভাবে বিরাজমান থেকে মানব সমাজের জন্য কি বার্তা (Message) বহন করে বেড়াচ্ছে?

উত্তর ঃ আল্-কুরআনের দৃষ্টিতে বার্তাটি হচ্ছে- আমাদের এই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা হচ্ছেন-মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ও একমাত্র প্রতিপালক 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন'। তিনিই ধারাবাহিক পদ্ধতি ও ক্রমোন্নতির ধারা প্রয়োগ করে মহাসূক্ষ্ম কণিকা পরমাণু, অণু ও বৃহৎ-বৃহৎ বস্তুসম্ভার সৃষ্টির মাধ্যমে এই মহাবিশ্বকে সাজিয়েছেন এবং এর যাবতীয় পরিচালনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবেই সম্পন্ন করে চলেছেন। তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব সকল প্রকার গুণই তুলনার অতীত। যাঁর সমকক্ষ আর

কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই। তিনি সর্বকালে সর্বযুগে বিরাজমান ও সকল প্রকার দূর্বলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। "তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী" (১৫ ঃ ৮৬)। "আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর (মহাসূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র, ও বৃহৎ সকলের) স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক" (৩৯ ঃ ৬২)।
"আসমান এবং জমিনের (সমগ্র মহাবিশ্বের) সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ ঃ ১৮৯)
"প্রশংসা আল্লাহ্‌র-ই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক (মহাসূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও বৃহৎসহ সকল) জগতসমূহের প্রতিপালক।" (৪৫ ঃ ৩৬)
"বল, তিনিই আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই, এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ-ই নাই।" (১১২ ঃ ১-৪)
সমগ্র মহাবিশ্বে মহাসূক্ষ্মকণিকাসমূহ থেকে শুরু করে বৃহৎ অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর মালিক তিনি এবং সকল কিছুকেই তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছেন বিধায় কোন একটি সূক্ষ্ম কণিকাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। প্রতিটি মূহুর্তেই তিনি সবার ফরিয়াদ শুনেন এবং সবারই সার্বিক প্রয়োজন পুরণ করে থাকেন। এই গুরু দায়িত্ব আল্লাহ্ ছাড়া অপর কেউ পালন করার ক্ষমতা রাখে না।
"আসমান এবং জমিনে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যাহা কিছু আছে সব আল্লাহর-ই; এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।" (৪ ঃ ১২৬)
"আকাশগুলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যাহা কিছু (দূরত্ব ও মহাসূক্ষ্মতার কারণে) দৃষ্টির অগম্য তাহা সকলই আল্লাহর।" (১১ ঃ ১২৩)
"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে সর্বত্র) যাহা কিছু আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থী; তিনি তাঁর কুদরতে প্রতি মূহুর্তেই তাদের সেই চাহিদা পূরণ করিয়া থাকেন।" (৫৫ ঃ ২৯)
আল্লাহ্ তা'আলার এই সৃষ্টিজগতের অধিকাংশই অদৃশ্য-গোপনীয়। তিনি মানুষকে তাঁর এই গোপনীয় সবকিছুই অবহিত করান না। তবে নবী-রাসুলগণের মধ্যে কাউকে কাউকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অধিকাংশ গোপনীয় অবহিত করেছেন। সাধারণভাবে মানবজাতিকে যতটুকু বিজ্ঞানের মাধ্যমে অবহিত করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, তা তিনি নিজ সিদ্ধান্তের আলোকে

নির্দিষ্ট সময় পর-পর জ্ঞানের পরিপক্কতার-উন্নতির ভিন্ন-ভিন্ন পর্যায়ে মানব জ্ঞানের আঙ্গিনায় উপস্থিত করেন। ফলে মানবসমাজ তা আবিষ্কারের মাধ্যমে জানতে পারে। তাঁর সিদ্ধান্তনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মানবজাতি শত চেষ্টা করেও কোন বিষয়ের ওপর থেকে আবরণ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয় না।

"অদৃশ্য সম্পর্কে (পূর্ণরূপে) তোমাদিগকে আল্লাহ্ অবহিত করিবার নহেন; তবে তাঁহার রাসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুলদিগের ওপর ঈমান আন।" (৩ ঃ ১৭৯)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।" (৬ ঃ ৬৭)

"যাহা তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা ছাড়া তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা (মানব সম্প্রদায়) আয়ত্ব করিতে পারে না।" (২ ঃ ২৫৫)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অকল্পনীয় জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পরিকল্পনা বিষয়ে মহাসূক্ষ্মতার আবরণে অগণিত গোপনীয় বা অদৃশ্য ব্যবস্থার অবতারণা করে সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে এক পরীক্ষাময় জীবনে নিক্ষেপ করেছেন, যাতে করে তাদের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য অদৃশ্য ও গোপণীয় বিষয়ের প্রকৃত বাস্তবতা হাতে কলমে প্রমাণ করে অতঃপর অদৃশ্য বিষয়ের উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শেখে। এতটুকু কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পর যখন এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তারূপে অদৃশ্যে বিরাজমান 'আল্লাহ'-র দাওয়াত কর্ণকুহরে পৌঁছবে, তখন যেন অসংখ্য অদৃশ্য বস্তুসম্ভার ও তাদের সুশৃংখল কর্মতৎপরতার বাস্তব প্রমাণের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের আলোকে বিনাবাক্যে মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তি-ক্ষমতাসম্পন্ন এক 'আল্লাহর' অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস পোষণ করতে পারে। অতঃপর এই একক মহান সত্ত্বা 'আল্লাহর' ওপর বিশ্বাসের আলোকে যারা জীবন গড়তে সক্ষম হবে, পরকালে তাদেরকে তিনি কৃতকার্য ও সফল ঘোষণা করে 'জান্নাত' দান করবেন। আর যারা এত আয়োজন এত উদাহরণ এবং অসংখ্য নিদর্শন উপস্থাপন সত্বেও বিশ্বাস পোষণে ব্যর্থ হবে তাদেরকে তিনি অগ্নিময় কঠোর শাস্তির স্থান 'জাহান্নামে' প্রেরণ করবেন।

"আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে, আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।" (৪৫ ঃ ২২)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি ক্ষমতা দিয়ে এই মহাবিশ্বের সকল কিছুই মানুষের দৃষ্টিগোচর করেই সৃষ্টি করে উপস্থাপন করার সামর্থ থাকা সত্বেও অনেক কিছুই অদৃশ্য তথা গোপণ করে রেখেছেন এবং সময়-সময় তার কিছু কিছু মানবজাতিকে উদ্‌ঘাটনের সুযোগ দিয়ে অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপূর্ব এক করুণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যারা এই অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী তাদের জন্য প্রকৃত পক্ষেই রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক অফুরন্ত কল্যাণ যা কখনই শেষ হবে না।

তাই, কুরআনের দৃষ্টিতে বক্ষমান অধ্যায়ের অদৃশ্য, মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহের পর্যালোচনার পেছনে মূল বার্তা (Message) হচ্ছে- অণু, পরমাণু অপেক্ষা আরও বহু বহু গুণে ক্ষুদ্রজগতের অদৃশ্য বা গোপণীয় কর্মকাণ্ড প্রমাণ করছে মানবজাতি এ পর্যন্ত মহাবিশ্বে জ্ঞানের যতটুকু অর্জন করেছে তা প্রকৃত জ্ঞানসাগর-এর তুলনায় এখনো বালুকণার পর্যায়ে রয়ে গেছে। দৃশ্যমান জগতের তুলনায় অদৃশ্য জগত আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত যার সঠিক কোন জ্ঞান মানুষের নেই এবং মানুষের পক্ষে পূর্ণরূপে তা কখনও অর্জন করাও সম্ভব নয়। মহাবিশ্বের মালিক ও প্রভু একমাত্র 'আল্লাহ'-ই তা পূর্ণরূপে অবহিত আছেন। সবই তাঁর নিকট 'লৌহে-মাহফুজে' সংরক্ষিত আছে। সুতরাং অদৃশ্য জগতসমূহের সৃষ্টি, উপস্থিতি ও পরিচালনা এবং সার্বিক সুশৃংখল নিয়ন্ত্রণ এই মহাবিশ্বে যেমনি 'সত্য' ঘটনা, তেমনি একজন অদৃশ্য মহাজ্ঞানী 'সত্ত্বার' সক্রিয় উপস্থিতিও সত্য ঘটনা হিসেবে করছে। ফলে 'আল্লাহ্‌কে' অস্বীকার করার কোন প্রকার যৌক্তিকতা মানবজাতির হাতে কার্যতঃ থাকলো না। এখন তাঁর কর্মকাণ্ডের অজস্র প্রমাণ হাতে পেয়ে তার ওপর ভিত্তি করে তাঁর মহান 'সত্ত্বার' সম্মুখে মানবজাতি অবনত হওয়া সময়ের দাবী।

বর্তমান বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহের সৃষ্টি ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা এবং পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ডের

মাধ্যমে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের জন্য যে বার্তা বয়ে এনেছে তা হলো- এই মহাবিশ্বটি মূলতঃ বিভিন্নমুখী ও বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের সম্মিলিত এক মহাসাগর। যে কোন দিক থেকেই গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালালে প্রতিনিয়ত-ই নিত্য-নতুন উন্নততর 'তথ্য ও তত্ত্ব' আবিস্কৃত হয়ে সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। গতকাল যা আবিষ্কার হয়েছিল, ঐ একই বিষয়ে আজকের নতুন আবিষ্কার পূর্বের ধ্যান-ধারণা ও প্রাপ্ত উপাত্তকে ম্লান করে দিয়ে একেবারে নতুন আঙ্গিকে অভিনব, যাদুকরী ও এক অকল্পনীয় নতুন তথ্যের প্রবাহ নিয়ে হাজির হচ্ছে। মানব সমাজ এই অবস্থায় হাতে পাওয়া সর্বশেষ আবিস্কৃত তথ্যকেই ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত উদ্‌ঘাটন হিসেবে বরণ করে নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভে সচেষ্ট হচ্ছে। আবার যখন বর্তমান অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যত বর্তমানের জায়গা দখল করছে তখন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ই নিত্য-নতুন 'তথ্য ও তত্ত্বের' বিস্ময়কর সমাহার বুকে নিয়ে বিজ্ঞান বিশ্বের দরজায় কড়া নাড়তে এগিয়ে আসছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু ফেলফেলে নয়নে তাকিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে- এই যদি হয় প্রতিটি বিষয়ের পিছনে লুকানো মহাজ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা ; তাহলে সমগ্র মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর পিছনে লুকানো একত্রিত জ্ঞানসমুদ্রের উৎসের প্রকৃত চেহারা কি মানবজ্ঞানে কখনো কোন কুল-কিনারা করা সম্ভব হবে? বস্তুতঃ তা কখনোই সম্ভব হবে না। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ) পূর্ব থেকে যখন মানবসমাজে মহাবিশ্বে বস্তুর সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম মৌলিক উপাদান সন্ধান করার নিমিত্তে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই আজ পর্যন্ত মানব সম্প্রদায় উক্ত বিষয়ে প্রায় প্রতিটি শতাব্দীতেই কিছু না কিছু 'তথ্য ও তত্ত্ব' উদ্‌ঘাটনে সফলতা লাভ করেছিল এবং প্রতিবারেই তারা ভেবেছিল ঐ তথ্যটি-ই হয়তোবা সর্বশেষ তথ্য হবে। কিন্তু না, পরবর্তীতে দেখা গেল একই বিষয়ে নতুন আবিষ্কার আগমন করে পূর্বের তুলনায় বিষয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করে আরও উন্নততর তথ্য বের করে আনতে সফল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট করেই বলা যায় যে, প্রথম দিকে মহাবিশ্বের মৌলিক পদার্থরূপে মাটি, পানি, আগুণ ও বাতাসকে সনাক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল উক্ত তথ্য আর

গ্রহনযোগ্যতা ধরে রাখতে পারলো না, বস্তুর ক্ষুদ্রতম মৌলিক উপাদান 'অনু' (Molecule) মতবাদ সে স্থান দখল করে নিল। যে 'অনু' কণারা পরস্পর একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ আকৃতি ধারণ করতে পেরেছে। পরবর্তীতে উক্ত প্রস্তাবও বেশিদিন টিকেনি। কিছু দিনের মধ্যেই 'পরমানু' (Atom) প্রস্তাব এগিয়ে এসে 'অনু' প্রস্তাবকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ঘোষণা করল যে, মহাবিশ্বে বস্তুর মৌলিক ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে 'পরমানু' (Atom) এবং এই অসংখ্য পরমানু একত্রিত হয়ে গঠন করে 'অনু' এবং পরবর্তীতে অগনিত-অসংখ্য 'অনু' পরস্পর মিলিত হয়ে গঠন করেছে দৃশ্যমান বস্তুর। আবার অগণিত বস্তু সমূহ দিয়ে তৈরী হয়েছে এই 'মহাবিশ্ব'।

এই 'পরমানু' মতবাদ ও অবশেষে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আসন ধরে রাখতে পারেনি। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার এসে ঘোষণা করে 'পরমানু' বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ নয়; বরং পরমানু-ই অসংখ্য উপ-আনবিক বস্তুকণার সমন্বয়ে গঠিত। 'প্রোটন' (Proton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) নামক মহাসুক্ষ্ম উপ-আনবিক কণিকার সমন্বয়ে পরমানুর 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) গঠিত এবং ঐ নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে প্রদক্ষিনরত 'ইলেকট্রন' নামক সুক্ষ্ম কণিকা ধারণ করে বস্তুর প্রথম ইউনিট 'পরমানু'-এর অস্তিত্ব লাভ করেছে। বিজ্ঞানী সমাজ এই পর্যায়ে ভেবে ছিলেন হয়তো এবার এখানেই বিষয়টি ইতি টানা যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটলো না। কিছু দিনের মধ্যেই আবার নতুন আবিষ্কার এসে জানালো 'পরামানু'-র উপাদান মহাসুক্ষ্ম কণিকা 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' এর আন্তঃগঠন কাঠামো আছে এরা মৌলিক অবিভাজ্য বস্তুকণিকা নয়। 'কোয়ার্ক' নামক এক প্রকার চার্জযুক্ত আরও ক্ষুদ্র মহাসুক্ষ্ম কণিকাসমূহ দিয়ে এরা গঠিত। তিন-তিনটি 'কোয়ার্ক' কণিকা দিয়ে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন নামক উপ-আনবিক কণিকা সমূহ সৃষ্টি হয়েছে। সবাই বললো এবার যাবে কোথায়? পদার্থের ক্ষুদ্রাংশের ইতিহাস এরপর আর অগ্রসর হবার সুযোগ নেই। উক্ত কাহিনী এখানেই ইতি টানতে বাধ্য। কিন্তু না! নতুন আরেক আবিষ্কার এসে ঘোষণা করলো কথা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তিন-তিনটি 'কোয়ার্ক'-কে একত্রিত করে 'প্রোটন' ও 'নিউটন' কণিকাদের সৃষ্টির পেছনে বাইন্ডিং এনার্জি রূপে

'গ্লুওন' (Gluon) নামক একপ্রকার আরও ক্ষুদ্র কণিকা কাজ করছে। বাস্তবে তা প্রমাণ করে বিজ্ঞান উপস্থাপন করে দেখাল। সবাই বললো এবার সব কথাই শেষ হবে। কিন্তু না! 'Big Bang Models' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ দাবী করেন- 'কোয়ার্ক' (Quark) নামক মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকার আগমণ ঘটেছে- আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) থেকে। সবাই অবাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে থাকলো এবং এক পর্যায়ে বললো- 'এরপরও কি আর কিছু আছে?' এবারও কি শেষ বলা যাবে না? উত্তর এলো ইউরোপীয়ান 'কণা পদার্থ বিজ্ঞানীদের' (Particle Physicst) নিকট থেকে। এই সেইদিন ২০০০ সালে ইউরোপীয়ান কণা পদার্থ বিজ্ঞানীরা 'প্রেস কনফারেন্স' করে ঘোষণা করলেন যে, 'কোয়ার্ক'-ই বস্তুকণা হিসেবে শেষ কথা নয়। তারা তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানে কোয়ার্কের আগের পর্যায়ে আরও কয়েক ধরণের বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আগামী দিনগুলিতে খুবই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রমাণভিত্তিক তারা তা মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থাপনে সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে মাথায় হাত রেখে এখন ইউরোপের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে এবং ভাবছে এই মহাবিশ্বের বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'মহাসূক্ষ্ম কণিকা' আবিষ্কার নামক পিঁয়াজের যে খোসা ছাড়ানো শুরু হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব হতে, তা বুঝি কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত শেষ হয়েও হবে না? বাস্তবে এওকি সম্ভব? তাহলে কি দৃশ্যমান জগতের চেয়ে অদৃশ্য জগতের প্রাধান্য ও বিস্তার-ই বেশি? বস্তুতঃ পক্ষে বিষয়টি তা-ই।

'অণু' থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীগণ যতই বস্তুর আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাদের নিকট পরিস্কার হয়েছে যে, বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের অদৃশ্য ঐ জগতসমূহ ব্যাপক বিশাল অথচ সুশৃংখল, নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতির কঠিন বন্ধনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। সত্যিকার অর্থেই যা সমাজের জ্ঞানীদের জন্য ভাবনার খোরাক সৃষ্টি করে। অণু (Molecule), পরমাণু (Atom), নিউক্লিয়াস (Nucleus), প্রোটন (Proton), নিউট্রন (Neutron), ইলেকট্রন (Electron), কোয়ার্ক (Quark), গ্লুওন (Gloun) ও ফোটন (Photon) সহ আণবিক, উপ-আণবিক ইত্যাদি

মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহ মহাবিশ্বের সর্বত্র একই 'নির্দেশের' (Command) অধীনে একইভাবে সৃষ্টি, একইভাবে সদা কর্মতৎপরতা ও একইভাবে সার্বিক আচরণ সম্পন্ন করে চলেছে বিধায় মহাবিশ্বটিকে বর্তমান দৃশ্যযোগ্য আকৃতিতে দর্শন লাভ করা সম্ভবপর হচ্ছে।

এতে আরও প্রতীয়মান হচ্ছে যে মহাবিশ্বটি সীমা-পরিসীমাহীন বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে মহাশূন্যে বিরাজিত থাকলেও এর সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কঠিন বাধ্যবাধকতার একটি উৎস থেকেই উৎসারিত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র বস্তুর মৌলিক ক্ষুদ্রাংশ সন্ধান করতে গিয়ে পর পর যে বিশাল অদৃশ্য ও গোপনীয় জগতের অস্তিত্ব মানবজ্ঞানে ধরা পড়েছে, তাতে বুঝতে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে যে সমগ্র মহাবিশ্বে অনুরূপভাবে অগণিত বিষয়ে অদৃশ্য বা গোপনীয় জ্ঞান রাজ্য বিস্তার লাভ করে আছে, যার সমষ্টি একত্রে সকল প্রকার সীমাকে ছাড়িয়ে অসীম এক স্কেলে প্রবেশ করেছে, যা পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া মানবীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানে কখনও সংকুলান হবে না। বিজ্ঞানের বদৌলতে আজ বিষয়টি চূড়ান্তপর্যায়ে দৃঢ়ভিত্তির ওপর আসন করে নিয়েছে। ফলে 'মহাবিশ্বটি' সৃষ্টির পেছনে উত্থাপিত অযৌক্তিক ও অবিবেচনাপ্রসূত প্রস্তাব-দূর্ঘটনা থেকে, বিশৃংখলা থেকে, নিজ থেকেই কিংবা কখনও সৃষ্টিই হয়নি পূর্ব থেকেই এমনি আছে এবং অনাদিকাল পর্যন্ত এইরূপ একইভাবে বিদ্যমান থাকবে ইত্যার্দি দাবীগুলোর ভিত্তি ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। তদস্থলে বিজ্ঞান প্রমাণভিত্তিক যুক্তি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ব্যাপক জ্ঞানের সমারোহ ঘটিয়ে সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যে একটি অকল্পনীয় মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি-ক্ষমতার উৎস থেকেই একই নির্দেশের (Command) অধীনে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে সে ব্যাপারে এখন আর দ্বিমত করছে না। সাথে সাথে মানবীয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে কোন কিছু দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না বলেই যে তা অস্বীকার করতে হবে এমন অযৌক্তিক দাবীগুলোকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে, কারণ অনেক 'আলো' এবং অনেক 'বস্তুকণার উপস্থিতি' বাস্তবে থাকার পরও তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না নিজ চোখের সীমাবদ্ধতার জন্য। দূর্বলতার জন্য। তাই এই জাতীয় মূর্খ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দাবী মেনে নেয়ার অর্থই হলো হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনার ফল হিসেবে বিজ্ঞান তার

অর্জিত সাফল্য দিয়ে যে গগণচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে, তা কি-না একটি ভয়ংকর 'ডিনামাইট' দিয়ে ধ্বংস করার মতই পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান বর্তমান প্রেক্ষাপটে জ্ঞানপূর্ণ নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে সেই জাতীয় পরিবেশ থেকে এখন নিজকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এখন 'বিজ্ঞান'কে পকেটে পুরে বিশেষ স্বার্থে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঠিক ব্যাখ্যার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিজ্ঞান বর্তমানে পূর্বের তুলনায় নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। এখন প্রকৃত 'সত্যের' বিপরীতে কথা বলতে হলে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক প্রথমেই বিজ্ঞান ও তার সফলতাকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু পানি এতদিনে বহু দূর গড়িয়ে এসেছে বিধায় এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন একটি মাত্র পথ-ই জ্ঞানী সমাজের জন্য শুধু খোলা রয়েছে, আর তা হচ্ছে আবিস্কৃত দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কীয় 'তথ্য ও তত্ত্ব' যে মহাজ্ঞানের ও মহাশক্তি-ক্ষমতার 'উৎসে'র সন্ধান দিচ্ছে তা দৃশ্যতঃ দৃষ্টির বাইরে থাকলেও চরম বাস্তবতার কারণে তাদের পক্ষে তা মেনে নেয়া উচিত। আর তাহলেই ইহকালীন ও পরকালীন হবে সফল, স্বার্থক ও কল্যাণময়। নইলে সকল প্রকার চতুরতা, বাকপটুতা, ধুরন্ধরতা, কপটতা ও বিদ্রোহীতা শুধু শাস্তি ও গ্লানির বোঝা বৃদ্ধি ঘটিয়ে ধ্বংসের তলদেশে-ই তাদের টেনে নিয়ে যাবে। যেখান থেকে বাঁচার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

এই হচ্ছে বিজ্ঞানের বর্তমান সাফল্যের আলোকে বক্ষমান অধ্যায়ে আলোচিত বক্তব্যের পক্ষ থেকে আমাদের মানব সমাজের জন্য 'বার্তা' (Massage)। ওপরের আলোচনায় একই সাথে আরও একটি বিশেষ দিকও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আর তা হলো- মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ 'আল্-কুরআন' প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই এই মহাবিশ্বে বস্তুর ক্ষুদ্রাংশের যে আগাম তথ্য সরবরাহ করেছে, প্রযুক্তিগত উন্নততর পরিবেশে বর্তমান 'বিজ্ঞান' সেই জ্ঞানময় বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলো হাতে-কলমে উদ্ঘাটন করে প্রমাণ করলো 'আল্-কুরআন বিজ্ঞানময়'।

সমাজের জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য সঠিক পথ প্রাপ্তির নিমিত্তে বিষয়গুলো একান্ত-ই ঠান্ডা মাথায় ভাবনার বিষয় নয় কি?

Challenge to Americans : Find out more

Europeans find new state of matter

Geneva (AFP)

European physicists announced Thursday they had detected a new state of matter by smashing atomic particles together in a laboratory reenactment of the "Big Bang" that created the universe. Scientists at the European Laboratory for Particles Physics (CERN) said.

By colliding lead ions together, they briefly created temperatures over 100,000 times as hot as the center of the sun and energy densities 20 times that of ordinary nuclear matter. In these extraordinary conditions, they found that the tiniest particles of matter, called quarks and gluons, whizzed around freely for a fraction. The particles then stuck together, fromning the building blocks of atoms, they believe.

The work, CERN said, confirms for the first time with happened in the microseconds after the Big Bang- the massive explosion, about 12-15 billion years ago, that is belived to have been the origin of our universe.

Previous experiments had only confirmed what happned about three minutes after the Big Bang.

This was when atomic nuclei were created by the fusing of subatomic particles as the vast explosion cooled as it expanded outwards, rather as steam condenses into water droplets, "The collected data from the experiments gives compelling evidence that a new state of matter has been created," CERN said in a statement.
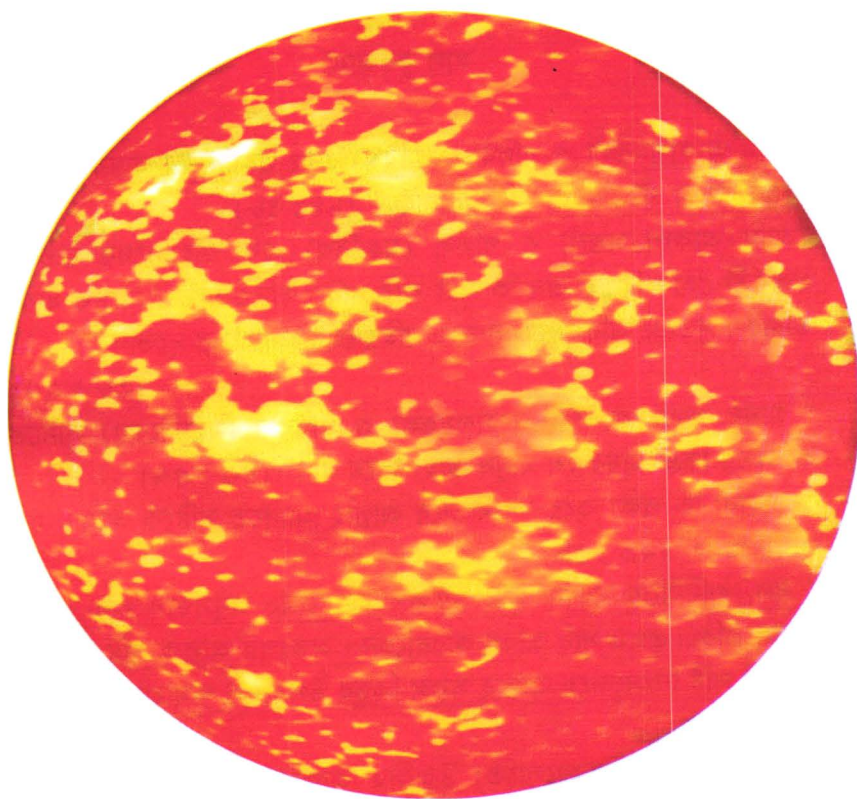
'নূরুন আলা নূর'

(আলোর ওপর আলো)

আল্ কুরআনঃ

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অযথা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনাই।" (৪৪ঃ ৩৮)

"আমি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাহাই। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দূর্ভোগ।"

(৩৮ ঃ ২৭)

" মানুষ সৃজন অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সৃষ্টিতো কঠিনতর কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।" (৪০ ঃ ৫৭)

" তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন?" (২৯ ঃ ১৯)

" বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর আল্লাহ্ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"

(২৯ ঃ ২০)

" আল্লাহ্র 'নূর'-এ (আলোতে) উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব)" (২৪ ঃ ৩৫)

" অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি) মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে? অতঃপর আমি (প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে) উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম।" (২১ ঃ ৩০)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র-ই, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন। আর উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন অন্ধকার ও আলোর।" (৬ ঃ ১)

"তিনিই সূর্যকে করিয়াছেন তেজস্কর ও চন্দ্রকে করিয়াছেন জ্যোতিময়।"
(১০ ঃ ৫)

"তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে।"
(১৪ ঃ ৩৩)

" তোমার প্রতিপালক-ই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।" (১৫ঃ ৮৬)

" সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র-ই জন্য রহিয়াছে।" (১৩ ঃ ৩১)

" আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র-ই, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন।" (৪২ ঃ ৪৯)

" আলোর উপর আলো (মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারাবাহিকতায়)। (২৪ ঃ ৩৫)

" আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌র-ই এবং সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টণ করিয়া আছেন।" (৪ ঃ ১২৬)

" আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মুমিন (বিশ্বাসী) সম্প্রদায়ের জন্য।"
(২৯ ঃ ৪৪)

" আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫)

" তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।" (৬ ঃ ১০১)

" অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত, আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।" (৬ ঃ ৭৩)

" প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা (অনেক কিছুই) অবহিত হইবে।" (৬ ঃ ৬৭)

"মানুষের (বুঝার) জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল মাত্র জ্ঞানী ব্যাক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)

" অদৃশ্য সম্পর্কে (পরিপূর্ণরূপে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে অবহিত করিবার নহেন, তবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, সুতরাং তোমরা 'আল্লাহ্' ও তাঁহার রাসুলদিগের উপর ঈমান আন।" (৩ ঃ ১৭৯)

" নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের ম্যাধ্যমে দৃশ্য-অদৃশ্য জগত সম্পর্কে) উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

" আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বব্যাপী) গৌরব গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪৫ ঃ ৩৭)

'আল্-কুরআন' মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক 'আল্লাহ্ তা'আলার' পক্ষ থেকে আমাদের এই ভূ-পৃষ্ঠে আগত মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। তাই এই অমূল্য সম্পদতুল্য কিতাবের আবেদন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন ও অটুট থাকবে বিধায় এতে উৎকীর্ণ প্রতিটি ঐশীবাণী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য, প্রস্তাব ও বাস্তবতা এবং একাধিক বিষয়ের একাধিক সারমর্মকে বিজ্ঞোচিতভাবে গুছিয়ে-সমন্বয় ঘটিয়ে মাত্র একটি বাক্যে এমন বিস্ময়কর আবেদন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এক একটি আয়াত বা বাক্য বহু সংখ্যক বিষয়ের পর্যালোচনায় সমভাবে তথ্য সরবরাহের ধারা অক্ষুন্ন রেখেও এগিয়ে যেতে কোন প্রকার অসুবিধা-ই হয় না। এতে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানের অতুলনীয় মহিমা-ই প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলো বুকে ধারণকারী বাণীগুলো এতই জ্ঞানের সমারোহতে পরিপূর্ণ যে, গবেষণায় রত হলে শত বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

আমাদের বক্ষমান সিরিজটি এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর সৃষ্টি বিষয়ক মূল বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে বিধায় এই সম্পর্কিত আয়াতগুলো একই সাথে অনেক বিষয়ের জ্ঞানপূর্ণ তথ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মনে হয় যেন এক একটি বাক্য কয়েক শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিস্কৃত তথ্যের গুছানো এক একটি বান্ডেল। আসলে বাস্তবেও কিন্তু তা-ই। ' আল্-কুরআন' এক-একটি বাক্যকে গুছিয়ে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে যে সব 'বৈজ্ঞানিক' তথ্য প্রকাশ করেছে, বিজ্ঞান কয়েক শত বছরে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে হাজার বছরেও তা প্রমাণ করে গুছিয়ে উপস্থাপণে সক্ষম হয়নি। মানবজাতির সম্মুখে বিষয়টি একেবারে খোলা-মেলাভাবে বিরাজমান। উদাহরণ স্বরূপ পূর্বের অধ্যায়টি সম্মুখে তুলে আনলেও ব্যাপারটি বুঝতে কষ্ট হয় না। যেমন এই মহাবিশ্বে বস্তুকণার

ক্ষুদ্রতম অংশ অনু-পরমানু অপেক্ষাও যে আরও ক্ষুদ্র অদৃশ্য মহাসুক্ষ্ম কণিকার উপস্থিতি বিদ্যমান সে কথা প্রথম পরিবেশিত হয়েছে 'কুরআনে'। আর সে তথ্য বাস্তবে প্রমাণ করে মানব সমাজকে দেখিয়ে দিতে বিজ্ঞানের সময় লেগেছে প্রায় আড়াই হাজার (২৫০০) বছর। বিষয়টি আশ্চর্য হবার মত নয় কি?

'আল্-কুরআন' মানবজাতির জন্য প্রকৃত পক্ষে একখানা 'ইন্ফরমেশান' বুক। প্রত্যেকটি বিষয়কে এখানে 'সূত্র' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনাকে এখানে পরিত্যাগ করা হয়েছে। 'কুরআন' বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে অবতীর্ণ হলে শত-সহস্র খন্ডেও তা সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না। ইতোমধ্যে কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা লক্ষ-লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও বক্তব্য দিয়েছেন যে, তাঁর বাণী লেখার জন্য যদি সমগ্র পৃথিবীর গাছগুলো কলমরূপে ব্যবহার করা যায়,এবং সমস্ত সমুদ্রের পানিগুলো কালি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে 'আল্লাহ্র' কথা লিখতে লিখতে সাগরের পানি শেষ হয়ে যাবে। আবারও যদি পূর্ণ করে আনা হয়, তারপরও কালিরূপী ঐ সাগরের পানি লিখতে-লিখতে নিঃশেষ হয়ে যাবে অথচ 'আল্লাহ্'র বানী তখনও শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে উক্ত তথ্যের যৌক্তিকতা ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানে কখনই সংকুলান হবে না। কেননা সেইরূপ মহাজ্ঞানের বিশালতা নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে মানব সম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করেনি।

আমাদের বর্তমান অধ্যায়টি সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম ও বৈশিষ্টপূর্ণ দিক। 'আল্লাহ্ তা'আলা' যে কত মহাজ্ঞানের আঁধার, তার যৎসমান্য উপলব্ধির জন্য অধ্যায়টি মানব জাতির জ্ঞানের রাজ্যে অংকিত করাই যথেষ্ট হবে। মহাবিশ্বের সৃষ্টির উৎস আলো, সৃষ্টির ভিত্তি আলো, সৃষ্টির পর্যায়সমূহের এক এক ধাপে আলোর ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আলোর একক ভূমিকা পালনের সেই অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্য তথ্যের জোয়ার নিয়ে হাজির হয়েছে অধ্যায়টি। প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন একটি ক্ষুদ্রবাক্যে যে অমূল্য তথ্যটি প্রদান করেছে মানবজাতিকে, সেই গুরুত্বপুর্ণ তথ্যটি প্রমাণ করে হাতে লাভ

করতে বিজ্ঞানী সমাজের প্রয়োজন পড়েছে প্রায় দেড় হাজার (১৫০০) বছর এবং বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় মন্ডিত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির। বর্তমান বিজ্ঞান প্রিয় মানবগোষ্ঠী তাদের প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞান সম্পন্ন একমাত্র 'প্রভুর' কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্য দর্শন লাভের জন্য এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচীত হতে পারে। শত বিস্ময়ের বিস্ময় সৃষ্টিকারী বিষয়টি জানার জন্য অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ পর্যালোচনায় এবার আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

ওপরে উদ্ধৃত ঐশীবাণীসমূহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে মর্মবাণী আমাদেরকে পর্যালোচনায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে, আমরা তা পর্যায়ক্রমে পর পর তুলে ধরবো।

প্রথমদিকের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর মানবসমাজকে অবহিত করছেন এই বলে যে তিনি এই মহাবিশ্বে দৃশ্য-অদৃশ্য কোন কিছুই হাসি-তামাশার ছলে বা বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। বিবেকহীন, কান্ডজ্ঞানহীন বা মস্তিষ্ক বিকৃত কেহ (এই রূপ) অযথা কিছু করলেও করতে পারে কিন্তু মহাবিশ্বের প্রতিপ্রালক একমাত্র 'আল্লাহ্' এমনটি কখনও করতে পারেন না। কেননা তিনি এত মহান, পবিত্র ও প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা এবং মহাজ্ঞানের অধিকারী যে তাঁর পক্ষে অনর্থক কিছু সৃষ্টি করা মোটেই শোভনীয় নয়। যখন কোন কিছু ইচ্ছে করে 'হও' বলতেই তা হয়ে যায় তখন অযথা কিছু তিনি কেন তৈরী করবেন? সর্বশক্তিমান ও সর্বোজ্ঞ পবিত্র 'সত্ত্বার' জন্য উদ্দেশ্যবিহীন কোন কিছু সৃষ্টি করা মোটেই মর্যাদা রক্ষিত হয় না। তাই তিনি এই জাতীয় বেহুদা কাজ করা থেকে অতি পবিত্র।

আসল কথা হচ্ছে মহান স্রষ্টা একমাত্র 'আল্লাহ্' তাঁর নিজস্ব ইচ্ছানুযারী একটি সুপরিকল্পনা রচনা করে তার আওতায় একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং তার ওপর পর্যায়ক্রমে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ অগণিত বস্তুসমূহকে সাজিয়ে বর্তমান দৃশ্য-অদৃশ্য এই কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। অবিশ্বাসী সম্প্রদায় নিজ চোখে দেখেও যদি জ্ঞানদিয়ে বুঝতে না চায়, তাহলে তাদের এই হঠ্কারিতামূলক আচরণের জন্য তারা অবশ্যই কঠোর শাস্তির যোগ্য বলেই বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার এই সমগ্র সৃষ্টির ভেতর মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে পরিচিত হলেও তুলনামূলকভাবে কিন্তু সম্পুর্ণ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতর দৃশ্য-অদৃশ্য লক্ষ-কোটি যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং সকল প্রকার বস্তুসহ সমস্ত মহাবিশ্বটিকে সম্পূর্ণরূপে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় গতিশীল (Motion) রেখে প্রয়োজনমত ভারসাম্য সৃষ্টি করে টিকিয়ে রাখা মূলতঃই এক কঠিন কাজ। মানবসমাজে বসবাসকারী জ্ঞানী সম্প্রদায় ছাড়া বাকী অধিকাংশ মানুষই বিষয়টি অবহিত নয়। যারা অবিশ্বাসী তারা এই বিষয়টি ভাবার সাথে সাথে এই বিস্ময়কর কাজটির পেছনে লুকায়িত ও সদা তৎপর 'কর্তা'কে সন্ধান করার প্রয়াস চালালে অবশ্যই তারা তাদের একমাত্র প্রভুর সন্ধান জ্ঞানের আঙ্গিকে পেয়ে যেত।

সৃষ্টির সেরা মানবরূপী অবিশ্বাসী সম্প্রদায় কি জ্ঞানের চোখ ব্যবহার করে না? করে থাকলে তারা কি দেখতে পায় না আল্লাহ্ কোন পদ্ধতিতে, কিভাবে, কোন জিনিস থেকে এই মহাবিশ্বটিকে অস্তিত্ব দান করেছেন? এই প্রথম সৃষ্টি কিভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করলো? উল্লেখিত বিষয়গুলোর চূল-চেরা বিশ্লেষণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই তাদের সম্মুখে বেরিয়ে আসতো এবং পরোক্ষভাবে প্রমাণ পেয়ে যেত সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' সকল কিছুর ওপর পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান।

এরপর বলা হয়েছে, একেবারে মৌলিক কথা হচ্ছে-এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, গোড়াপত্তন, সকল প্রকার বস্তুর সৃষ্টি এবং সমগ্র মহাবিশ্বটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' থেকে এবং 'নূর' দিয়েই তা সংঘটিত হচ্ছে। আল্লাহ্র 'নূর' কে বাদ দিয়ে মহাবিশ্বে একটি মহাসুক্ষ্ম বস্তুকণিকার কথাও কল্পনা করা যায় না বা ভাবা যায় না। কেননা মহাবিশ্বের উৎস-ই হচ্ছে 'নূর', আবার আল্লাহ্র আদেশ 'হও' বলতেই সাথে সাথে তা হয়ে যায় এবং এই মহাবিশ্বে 'আলো' ছাড়া আর কোন বস্তুর দ্রুতি চোখের পলকের ন্যায় দ্রুততর নয় বলেই এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মহাবিশ্বের যাবতীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণও এই 'আলোক শক্তির' মাধ্যমেই সম্পন্ন করে থাকেন। এক কথায় মহাবিশ্বের যে কোন দিক থেকে যে কোন ব্যাপারেই গভীর থেকে গভীরে নজর দিলে মূলে যে 'নূর' (আলো) সক্রিয় রয়েছে, তা দর্শন লাভ করা যাবে। গুছিয়ে বললে
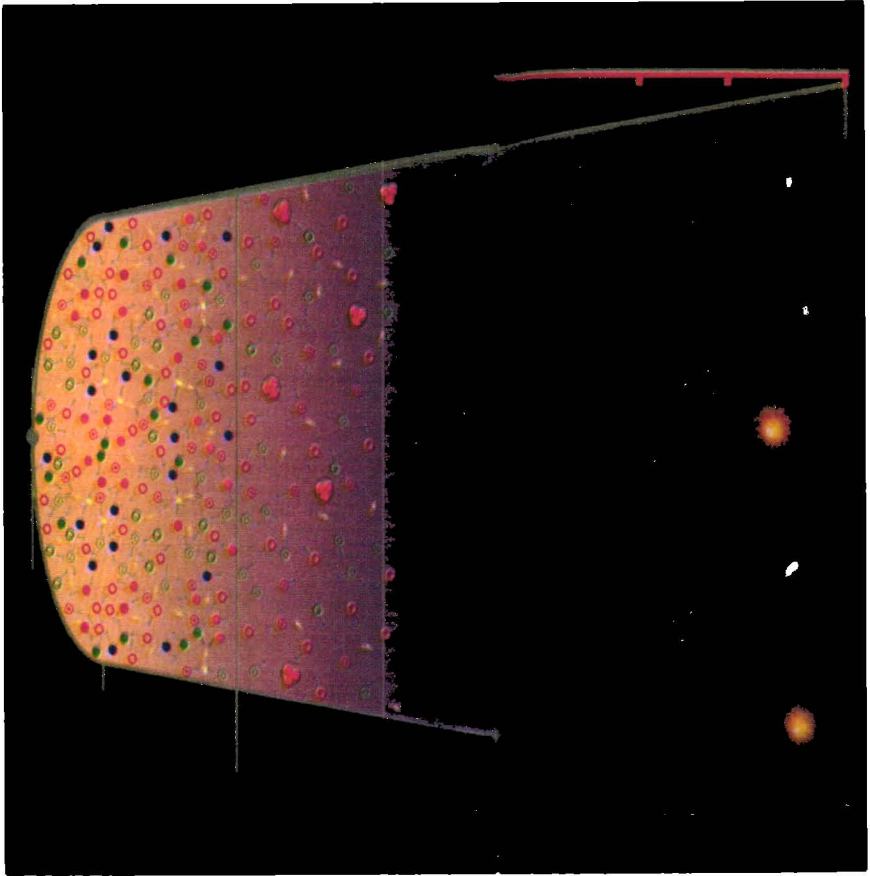
চিত্র -১৭৯

"তাঁহার অন্যতম নিদর্শন (Sign) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (তথা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের) সৃষ্টি।" (৪২ ঃ ২৯)

-- আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর এ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টির পূর্বে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 'নূর'কে পদ্ধতিগতভাবে Black hole-এর মধ্যে প্রচণ্ড ঘনায়ন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত করে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (প্রায় 10[illegible] cm) জমিয়ে দেন। ফলে প্রচণ্ড চাপ ও সে কারণে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হলে বিন্দুটি নিজেকে সামাল দিতে না পেরে মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটিয়ে দিলে একদিকে মহাসম্প্রসারণ এবং অপরদিকে আলোর কণিকা 'ফোটন' থেকে যুগপৎভাবে পর্যায়ক্রমে বস্তুকণিকার আবির্ভাব ঘটে এ মহাবিশ্বরূপ ধারণ করে।

সুতরাং 'আল্লাহ্' নামক একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যে বাস্তবিকপক্ষেই বিদ্যমান ও বিরাজমান আছেন- তা এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। কুরআন এবং বিজ্ঞানের উল্লিখিত বিষয়ে একই বক্তব্য বর্তমান মানবসম্প্রদায়কে এক মহাসত্যের পানে এগিয়ে যেতে আলোক উজ্জ্বল পথ তৈরী করে দিয়েছে। সমাজের জ্ঞানীজন কল্যাণময় সে পথে এগিয়ে যাবেন কী?

বলা যায় 'আল্লাহ্‌র নূরে উদ্ভাসিত এই মহাবিশ্ব'। এর কোন পরিবর্তন নেই, সকল যুগে সকল অবস্থায় এ এক মহাসত্য রূপে প্রতিভাত হবেই।

যারা অবিশ্বাসী তারা যদি তাদের চারপাশে উদ্‌ঘাটিত 'আলোর' রহস্য অবগত হওয়ার পর একটুখানি ভেবে দেখে যে এই রহস্যপূর্ণ 'আলোর' মূল উৎস কোথায়? 'আলোর' হাজারো রকম বিভিন্ন চরিত্রের কারণ কি? আলোর গতিবেগ সকল প্রকার বস্তুর দ্রুতি অপেক্ষা বেশী কেন? সমগ্র মহাবিশ্ব আলোকশক্তি (Radiant Energy) দিয়ে পরিপূর্ণ কেন? এবং সমগ্র মহাবিশ্বে সকল ব্যাপারে আলোর প্রাধান্য এত বেশী কি কারণে? তাহলে তারা এক পর্যায়ে জানতে সক্ষম হবে যে, বর্তমান দৃশ্যযোগ্য ও অদৃশ্য মিলে যে মহাবিশ্ব, তা পূর্বে এক সময় এই 'নূর' বা আলোক শক্তিরূপে এরই উপাদান হিসেবে ওতপ্রোতভাবে একই স্থানে মিশে ছিল। 'আলো' ছাড়া অন্য কোন শক্তির দ্রবণে এমন একাকার হয়ে মিশ্রণ তৈরী সম্ভব নয়। তাছাড়া 'আলোক শক্তিতে' একই সাথে নিহিত আছে 'তাপশক্তি', যা পরবর্তীতে সৃষ্ট মহাবিশ্বে জীবন স্পন্দনে অতীব প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে সক্ষম হবে এবং সৃষ্ট জগতগুলো আলোকিত করার কাজে 'আলোর' কোন বিকল্প নেই। এরপরও কথা হচ্ছে-সকল প্রকার দ্রুত যোগাযোগ ও সংরক্ষন পদ্ধতি 'আলো' ছাড়া কল্পনা-ই করা যায় না। এই জাতীয় বহু বহু কারণেই আল্লাহ্ তাআলা 'আলোক শক্তিকে' একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রচন্ড বিষ্ফোরনমুখ অবস্থায় এনে পরক্ষণে এক 'মহাবিষ্ফোরণের' (Big Bang) মাধ্যমে মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তুকে কণিকারূপে পর্যায়ক্রমে কৌশলে 'আলো' থেকে সৃষ্টি করে পৃথক করে দেন। সৃষ্ট নতুন নতুন মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা তাপের এক এক পর্যায়ে এক এক প্রকার বস্তুর আবির্ভাব ঘটায়ে দৃশ্য-অদৃশ্য এই মহাবিশ্বের বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

'মহাবিষ্ফোরণ' পরবর্তী অবস্থা ছিল আলোয় পরিপূর্ণ তুলনাবিহীন এক উজ্জল পরিবেশ। যেখানে কোন প্রকার অন্ধকার ছিল না। ঐ আলোর তেজস্ক্রিয়তা ও প্রখরতা কল্পনাতীত এমন এক পর্যায়ে ছিল যখন কোন প্রকার বস্তুই আলোর চলার পথ রুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল না। সেখানে অন্ধকার সৃষ্টি হওয়ার কোন প্রকার প্রশ্নই ছিল অবান্তর। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা একটি নিদিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফলতায় পৌছাবার নিমিত্তে জীবনময়

জগত তৈরী করবেন এবং সেই পরিবেশে প্রয়োজনীয় আলো-আঁধারের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয়, তাই মহা-বিস্ফোরণে উদ্ভূত তাপমাত্রাকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে কমিয়ে এমন এক পর্যায়ে এনেছেন, যেখানে 'আলো' অনেক কঠিন বস্তুকে ভেদ করে আর অগ্রসর হতে না পেরে ফিরে যাওয়ায় 'অন্ধকার' (আলোহীন অবস্থা) সৃষ্টি হয়েছে। এই 'আলো-অন্ধকার' সৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই। অন্য কারো এতে হাত নেই। আলোর চলার পথে এই যে অন্ধকার সৃষ্টির প্রক্রিয়া 'আল্লাহ্ তাআলা' ঘটিয়েছেন, এতেও 'আল্লাহর' বর্তমান থাকা এবং আশ্চর্য করার মত উক্ত কাজের পেছনে অদৃশ্য 'কর্তা'রূপে একমাত্র 'আল্লাহ্‌র' কর্মকাণ্ড-ই প্রকাশ পাচ্ছে।

জীবনময় জগত সমূহে 'আলো-অন্ধকার' সৃষ্টির প্রক্রিয়াটির চূড়ান্ত পর্যায়ে 'আল্লাহ্ তাআলা' পদ্ধতিগতভাবে সৃষ্টি করেছেন সূর্য বা নক্ষত্র, যা মহাবিষ্ফোরণ পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট অগ্নিগোলকেরই সাদৃশ্যপূর্ণ ও সেই অবস্থা থেকেই যদিও বিভিন্ন পদ্ধতি অতিক্রম করে 'নক্ষত্ররূপ' লাভ করতে তাপমাত্রা বহুলাংশে হ্রাস ঘটেছে, তবে নক্ষত্রের ভেতর সৃষ্ট 'আলো'-ই জীবনময় জগতসমূহে পৌঁছুতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে 'অন্ধকার' জন্ম দিয়ে থাকে। মহাকাশে বিরাজমান প্রচণ্ড তেজস্ক্রীয় বিকীরণের চলার পথে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ও ধূমকেতু ছাড়া আর কোন এমন বস্তু নেই যার কারণে 'অন্ধকার' সৃষ্টির আশা করা যেতে পারে। মূলতঃ মহাশূন্যে 'Highest Energetic Photon' কণিকা সমৃদ্ধ 'তেজস্ক্রিয়তা' (Radiation) দিয়ে ভরপুর হয়ে আছে এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রাণী ও জীব-উদ্ভিদ জগতের জন্য উক্ত পরিবেশ কখনোই কল্যাণকর নয়। এ কারণেই 'আল্লাহ্' আলাদাভাবে নতুন করে তুলনামূলক কম তাপীয় বস্তু 'নক্ষত্র' সৃষ্টি করেছেন।

জীবনময় জগতের নানাবিধ কল্যাণে নিয়োজিত নক্ষত্র (সূর্য) 'আল্লাহ' তাআলার 'নূর' এর-ই একটি পর্যায়ক্রমিক অংশ মাত্র, যা তিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি-ক্ষমতার বলে তাঁর 'নূর' থেকে সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীর সার্বিক প্রয়োজনে নিয়োজিত রেখেছেন। আল্লাহ্ তাঁর 'নূর' থেকে যেভাবে. যে পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে 'আলোক শক্তিকে' প্রচন্ড চাপে ফেলে
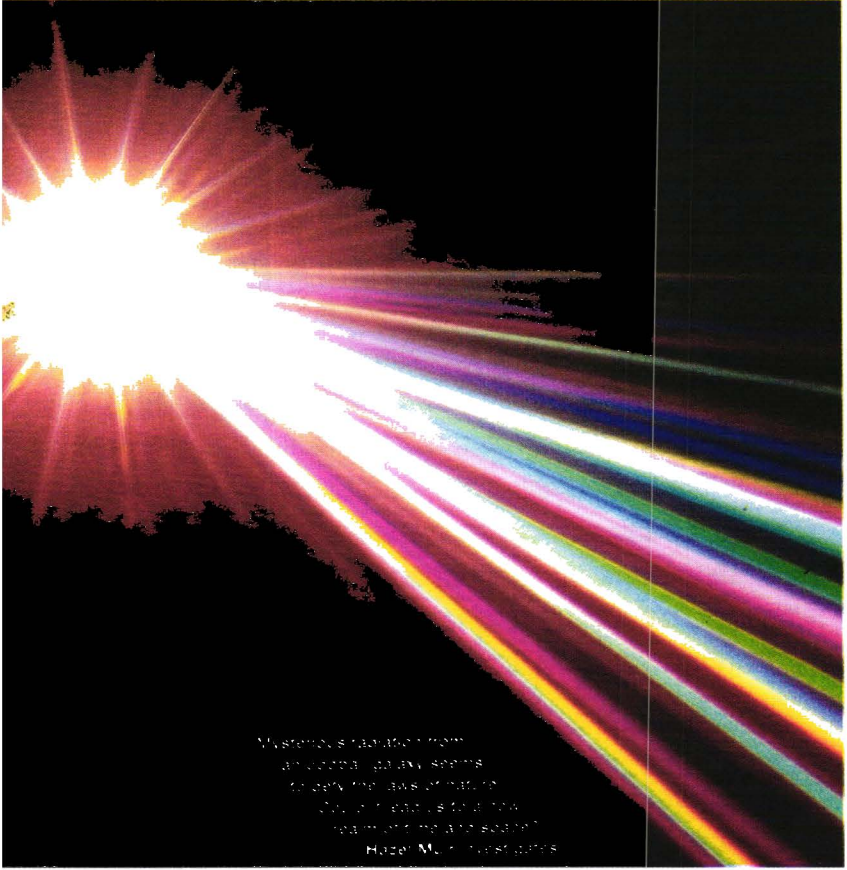
চিত্র -১৮০

"তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী।" (১৪ ঃ ৩৩)

-- মহাবিশ্বের মহাকাশে মহাজাগতিক বস্তু সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কোনটি-ই মানবসম্প্রদায় সৃষ্টি করেনি, চেষ্টা করলেও কখনও তা সম্ভব করে তুলতে পারবে না। এ এক চির সত্য কথা। মূলতঃ এগুলো আল্লাহ্ তায়ালা-ই একমাত্র মহান স্রষ্টা হিসেবে নিজ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি নক্ষত্র বা সূর্য সৃষ্টি করে আমাদের এ সৌরজগতকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরকে যে পদ্ধতির এবং যে ব্যাপ্তির হিসেবে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন তার আলোকে আলো-অন্ধকার আবির্ভাবের জন্যই এ সূর্যটিকে তিনি জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন।

তাই এ পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চারের সাথে সাথে আলো-অন্ধকার ও তাপসহ ইত্যাদি বিষয়ের কেন্দ্র হিসেবে যে আল্লাহ্ সূর্যটিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি মানব সমাজের নিরঙ্কুশ গোলামী লাভ করার অধিকারী নন? তাঁর এ অতুলনীয় অনুগ্রহকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

মহাবিষ্ফোরণ (Big Bang) ঘটিয়ে পরবর্তীতে সৃষ্ট অগ্নিগোলক থেকে তাপমাত্রার নিম্নগতির এক এক পর্যায়ে বিভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব ঘটায়ে এই মহাবিশ্বকে বর্তমান রূপ দান করেছেন, কোন মানুষের পক্ষে তা কোন দিনই সম্ভব নয়। একমাত্র 'আল্লাহ্‌র' জন্যই সম্ভব, কেননা মহাবিশ্বের প্রয়োজনে যত প্রকার ক্ষমতা দরকার তার সবই তাঁর করায়ত্ত। মানুষ যে সকল ক্ষমতার অধিকারী কখন-ই হতে পারে না। মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার কারণে 'আল্লাহ্' যখন যা চান, তখন তা-ই করেন, কেউ এতে বাঁধ সাধতে পারে না।

ওপরের বর্ণনানুযায়ী 'আলোক শক্তি' তথা 'নূর' থেকে এক মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে পর্যায়ক্রমে তাপমাত্রার নিম্নমূখী এক এক ধাপে এক এক প্রকার বস্তু সৃষ্টি হয়ে এই মহাবিশ্বের রূপ লাভ করার এক বিস্তারিত বিবরণকে একেবারে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে 'আল্লাহ্ তাআলা' তাঁর মহাজ্ঞানের ছাপ রেখে এক নাতিদীর্ঘ রিপোর্ট প্রদানের পর (সূরা 'নূর', আয়াত-৩৫) ঘোষণা করলেন, সমগ্র বিষয়টি হচ্ছে 'নূরুন আ'লা নূর', অর্থাৎ 'আলোর ওপর আলো'র প্রাধান্য মাত্র। এ যেন একটি ছোট শামুকের ভেতর একটি সাগরকে সুকৌশলে প্রবিষ্ট করে রাখার মত। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন হয় না বিধায় যুগে-যুগে, কালে-কালে মানব সম্প্রদায় মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিয় জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে প্রতিবারই এই দাবীর সত্যতা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় 'নূর' (আলো) থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন বিধায় এর ভেতর যত কিছু আছে, তার সব কিছুর মালিকও একমাত্র তিনি-ই। তিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাক্ষমতার আবরণে সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছেন। একটি মহাসূক্ষ্ম কণিকাও তা দৃশ্য-অদৃশ্য যাই হোক না কেন তাঁর কুদ্‌রতি দৃষ্টির মোটেই বাইরে নয়। সবই আছে তাঁর নখ-দর্পণে।

এই যে 'আল্লাহ্ তাআলা' মহাবিষ্ফোরণ পরবর্তী সময়ে 'আলোক শক্তি' (নূর)-এর তাপমাত্রায় হ্রাস ঘটিয়ে এক এক পর্যায়ে এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পন্ন অসংখ্য বস্তু যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, এই বিষয়টি চিন্তাশীল সমাজের লোকদের জন্য তাদের একমাত্র 'প্রভুর' উপস্থিতির একটি বড় নিদর্শণ, তারা একথা খুব সহজেই ভাবতে পারবে

যে, 'আল্লাহ্' নামে যদি একজন মহান 'সত্ত্বা' স্রষ্টা হিসেবে বিরাজমান না থাকবেন, তাহলে শত সহস্র কোটি বছর (প্রায় ১৫ শত কোটি বছর) ধরে একটি মহৎ ও বিস্ময়কর পরিকল্পনা এভাবে কি করে পর্যায়ক্রমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়ে বর্তমান মহাবিশ্বরূপী এই মনমুগ্ধকর বিশাল জাহান তৈরী হতে পারে? সুতরাং 'আল্লাহ্' নামে একজন মহান 'সত্ত্বা' সর্বদা বিরাজমান আছেন এই চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত-ই তাদেরকে একদিন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে।

এই পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর জ্ঞানের বেষ্টনিতে একথা আগমন করুক আর না-ই করুক, এতো একশত ভাগই সত্য যে, আল্লাহ তাআলা-ই 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞান' নামক বাস্তব এক বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সকল বিষয়ের অদৃশ্য 'তথ্য ও তত্ত্ব' মানব জাতির জ্ঞানের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, পূর্বে মানবজাতি যা জানতো না, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে 'ওহী' এবং পরে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তা বর্তমানে অবহিত করে চলেছেন।

বস্তুতঃ এই কাজটি একমাত্র 'আল্লাহর' পক্ষেই সম্ভব। কেননা তিনি সমগ্র মহাবিশ্ব ও সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সর্ববিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর নখ-দর্পণে। একমাত্র তাঁর মহাজ্ঞান সমগ্র মহাবিশ্বকে ঘিরে আছে। মহাবিশ্বের প্রতিটি বালি কণা নয় শুধু বরং প্রতিটি মহাসূক্ষ্ম উপ-আনবিক কণিকা (Sub-Atomic Particles) পর্যন্ত সৃষ্টিকারি হিসেবে ওদের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক পরিস্থিতি তিনি জানেন। এই জ্ঞান অন্য কারও নেই এবং হতেও পারে না।

আল্লাহ্ দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষণাবেক্ষণকারী পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র পবিত্র 'সত্ত্বা' বিধায় তিনি নিজ থেকে মানবমণ্ডলীকে অদৃশ্য বিষয় অবহিত করার জন্য যে পদ্ধতি ও সময় তিনি নির্ধারণ করেছেন, তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। নির্দিষ্ট করা সময়ে প্রতিটি জিনিস তার রহস্য উন্মোচন করে নিদর্শনসহ এক এক করে মানবমণ্ডলীর সম্মুখে প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ্ তাআলার উপস্থাপিত নিদর্শণ কেবলমাত্র সমাজের প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরাই অনুধাবন করতে পারে, বাকীরা আল্লাহ্র নিদর্শণের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কিংবা অন্তরনিহিত আবেদন কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাস নিয়েই তারা মত্ত। সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্‌র কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সে ব্যাপারে যেন তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। শুধু খাও, দাও ও ফুর্তি কর- এতটুকুনই যেন তাদের করণীয়।

শেষ পর্যায়ের বাণীসমূহে 'আল্লাহ্' জানাচ্ছেন যে, মানব সমাজকে 'কুরআন ও বিজ্ঞানের' মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মহাবিশ্বের মূলতত্ত্ব, সকল প্রকার বস্তুর সৃষ্টি, আলোক শক্তির রহস্য, অণু-পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র অদৃশ্য জগত ও তাদের সুশৃংখল কর্মতৎপরতা ইত্যাদি বিষয়সহ আরও বহু গোপণ বিষয় অবহিত করার পরও আরও আরও অসংখ্য অদৃশ্য গোপণ বিষয় মহাজ্ঞানী আল্লাহর নিকট রয়েছে যার কিছু কিছু একমাত্র বাছাইকৃত রাসুলগণের কাউকে-কাউকে তিনি অবহিত করেছেন, সকল নবী-রাসুলও সেই সকল অতি গোপণ অদৃশ্য বিষয় অবহিত নয়। সুতরাং মানুষ যা আবিষ্কার করেছে তা কিন্তু শেষ কথা নয়। এর পরও বহু বহু অদৃশ্য ও গোপণ বিষয়ে এই মহাবিশ্বের 'আল্লাহ্' সৃষ্টি করে রেখেছেন। তবে 'আল্লাহ্' নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যতটুকু মানুষকে জানানোর পরিকল্পনা করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধাপে ধাপে তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ততটুকুর উন্নতি ঘটাতে বা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, আর তিনি তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না বিধায় মানব সমাজ আরও অনেক অদৃশ্য গোপণ বিষয় চেষ্টা সাধনা করে অবহিত হতে পারবে ঠিক-ই, তবে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কার্যাবলীর বহু সুক্ষ্ম গোপণ ও অদৃশ্য বিষয়ই মানুষ কোনদিন জানার সুযোগ পাবে না।

সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী প্রকৃত অর্থে গৌরব-গরিমা, সম্মান-মর্যাদা, কৃতিত্ব-মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার-ই জন্য, যিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি-ক্ষমতার বলে তাঁর নিজস্ব 'নূর' (আলো) থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এর অভ্যন্তরে 'নূর'-এর ভিন্ন-ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব ঘটায়েছেন। আবার 'নূর'-এর মহাসাগরে সমগ্র মহাবিশ্বকে ভাসমান রেখে ডুবিয়ে আনয়ন করেছেন। তারপর 'নূর' থেকেই ৪টি মৌলিক শক্তির উৎপত্তি ঘটায়েছেন এবং সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন ঐ 'নূর' দিয়েই চোখের পলকের চাইতেও দ্রুততর সময়ে তাঁর পবিত্র আদেশ

প্রদান ও কার্যকর করছেন। যে কারণে মহাবিশ্বের যেদিকে তাকানো হোক, কিংবা যে কোন দিক থেকেই মহাবিশ্ব ও এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহের মৌলিক উপাদানের দিকে লক্ষ্য করা হোক, সকল অবস্থায়-ই ভিত্তিরূপে 'নূর' (আলো) কেই মূলে সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে।

সুতরাং যে মহান সত্ত্বা-'আল্লাহ্' তাঁর 'নূর' (আলো) দিয়ে এই মহাবিশ্বের সকল দিক ও বিভাগকে কাঠামো দান করে সার্বিকভাবে উদ্ভাসিত করেছেন, সকল প্রকার গুণ-গান, প্রশংসা ও মাহাত্ম একমাত্র তার জন্যই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই হচ্ছে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় 'আলোর ওপর আলো' প্রস্তাবটির মোটামুটি মর্মকথা।

এবার আলোচিত উক্ত বিষয়টিকে অর্থাৎ 'আলোর ওপর আলো' সম্পর্কীয় কুরআনিক বক্তব্যকে বর্তমান সাফল্যময় বিজ্ঞানের ঘরে নিয়ে যাব। দেখি এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কি জানে এবং সামগ্রিক প্রতিবেদনে কি বলতে চায়।

বিজ্ঞান ঃ

আজ থেকে মাত্র একশত বৎসর পূর্বেও এই মহাবিশ্বের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পেছনে লুকানো মাত্র দু'চারটি কথাও জানার সামর্থ মানবজাতির ছিল না, অথচ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার এক কল্পনাতীত সাফল্যে ভরা বর্তমান বিজ্ঞানময় পরিবেশে সেই বিষয়গুলোর অসংখ্য 'তথ্য ও তত্ত্ব' আবিষ্কার এবং উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই মানবজাতি বহু কিছুই জানতে সক্ষম হয়েছে। পূর্বে এই জাতীয় আবিষ্কার সংঘটিত না হওয়ায় সমাজে জ্ঞানীদের একাংশ ভাবতেন- প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ 'কুরআন' মানব সমাজে বসবাসরত অজ্ঞ, মূর্খ ও সরল সাদা-সিদে মানুসের শুধু মাত্র ধর্মীয় প্রয়োজনই মেটাতে পারে এবং সেই কারণে তাদের নিকট 'কুরআন' মানসিক সান্তনামূলক বড়জোর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একখানা 'ধর্মীয় গ্রন্থ' হিসেবেই কেবল বিবেচিত হতে পারে। এর চেয়ে বৃহৎ অন্য কোন ক্ষেত্রে 'কুরআনকে' মেনে নেয়া যেতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরূপেতো নয়-ই।

কিন্তু সত্য কথাতো এই যে, বিগত একশত বৎসরের ভিতর আবিস্কৃত প্রায় প্রতিটি 'বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটন' প্রমাণ করেছে 'আল্-কুরআন' শুধু

একখানা ধর্মীয় গ্রন্থ-ই নয় বরং একাধারে ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মূল্যবোধে পরিপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ও সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনায় ভরপুর এক অনন্য গ্রন্থও বটে। যার তুলনা 'কুরআন' শুধু নিজেই। বিজ্ঞানের প্রথমিক পর্যায়ের আবিষ্কারসমূহ কিছুটা সত্যতা, বাকীটা প্রযুক্তিগত স্বল্পতার কারণে বিজ্ঞানী সমাজের আন্দাজ, অনুমান ও ধারণার সংমিশ্রণে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য নিয়ে আগমন করায় মানব সমাজে পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নতি ঘটায় এবং প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞানী সমাজের নিরপেক্ষ ও নিরলস প্রচেষ্টার কারণে প্রায় প্রতিদিনই মহাবিশ্বে আবিস্কৃত নতুন নতুন বিষয়গুলো সরাসরি 'আল্-কুরআনের' বৈজ্ঞানিক 'প্রস্তাবগুলোকে' নতুন আলোতে (New Light) প্রমাণিত করে বিশ্বব্যাপী উদ্ভাসিত করে তুলছে। আর এই দৃশ্য অবলোকনে সমাজের বর্তমান জ্ঞানীজন ও বিজ্ঞানীমহলও হতবাক হয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে- নিঃসন্দেহে 'কুরআন' মহান ও উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানসমৃদ্ধ এক অনন্য গ্রন্থ, প্রযুক্তিগত এবং জ্ঞানগত উৎকর্ষতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো ছাড়া যার প্রস্তাবিত 'বৈজ্ঞানিক তথ্যের' নিকটেও ঘেঁষা যায় না। বোধগম্য তো অনেক পরের কথা। হাল্‌কা এবং ভাসা-ভাসা জ্ঞান বা আবিষ্কার দিয়ে বিজ্ঞানময় 'কুরআন' বুঝা সত্যিই এক দুরূহ ব্যাপার। আর সেই কারণেই 'কুরআন' যে মহাবিশ্বের একমাত্র মালিক ও প্রতিপালক 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের' নিকট হতে অবতীর্ণ এবং 'কুরআন' যে পরম সত্যতা সহকারেই মানবজাতির নিকট আগমন করেছে, জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তার বাস্তব প্রমাণ হাতে লাভ করে এখন বিনা বাক্যে কুরআনের ঐ 'সত্যতাকে' মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এক ও একক প্রভু 'আল্লাহ্‌র' সম্মুখে মাথা অবনত করা-ই মানবজাতির জন্য অধিকতর শ্রেয় ও প্রশংসনীয় কাজ হবে।

আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ে. এই মহাবিশ্বের একেবারে আদি ইতিহাস (Origin of the Universe) থেকে শুরু করে মাঝপথে 'পরিবর্তিত বিন্দু' (Turning Point) তথা 'Big Bang'-এর মাধ্যমে বর্তমান আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ লাভে ধন্য হয়ে এগিয়ে চলার বিস্তারিত তথ্যও ওপরে বর্ণিত দাবীর পক্ষে একটি বড় ধরনের প্রমাণ বহন করে বেড়াচ্ছে।

এখন যে আলোচনাটি সম্মুখে আগমন করছে তা আরও ব্যাপকভাবে 'কুরআনের' অতুলীনয় বৈজ্ঞানিক দূরদর্শিতা, বাস্তব সত্য প্রকাশে দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বোপরি মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টার কল্পনাতীত অজেয় মহাজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যতাকে আরও মজবুতভাবে উদ্ভাসিত করে তুলবে।
১৯৩৩ সালে বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'ল' মেইটর' কর্তৃক সরকারিভাবে ঘোষিত 'Big Bang' প্রস্তাবটি ১৯৬৫ সালে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী 'মিঃ' আরনো পেনজিয়াস' ও 'মিঃ রবার্ট উইলসন' বেল টেলিফোন কোম্পানীতে চাকুরীরত অবস্থায় তাদের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তৈরী 'এন্টেনাতে' (Antena) সর্বপ্রথম 'Big Bang' মহাবিষ্ফোরণের ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা ৩ (k). কেলভীন (Back Ground Radiation 3k.) মহাবিশ্বের যে কোন দিকে সমভাবে প্রদর্শিত হয়ে বিশ্বব্যাপী প্রমাণ করেছে মহাবিশ্বটির সৃষ্টি বিষয়ক 'Big Bang' প্রস্তাব পুরোপুরি সত্য ঘটনা। ফলে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কীয় অন্যান্য সকল প্রস্তাবগুলো প্রমাণবিহীন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং 'Big Bang' প্রস্তাব এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।
প্রথম দিকে এই 'Big Bang Point' কেই মহাবিশ্বের সৃষ্টির একেবারে শুরু (Beginning) হিসেবে ধরে নেয়া হলেও বর্তমানে কিন্তু যুক্তি-তর্ক ও নিরেট বাস্তবতার কারণে আর 'Big Bang' বিন্দুকেই মহাবিশ্বের একেবারে শুরু (Beginning) হিসেবে মেনে নেয়া যাচ্ছে না বরং 'পরিবর্তিত বিন্দু' (Turning Point) হিসেবেই দেখা হচ্ছে এবং একেবারে প্রথম শুরু (Beginning of the Universe) হিসেবে Big Bang-এরও বহু পূর্বে 'স্থিতিশক্তি' (Static Energy) কে এবং ঐ শক্তির ভেতর 'একটি মৌলিক স্পন্দন পদ্ধতিকে' (One of the Fundamental Vibration Mode) দেখা হচ্ছে (যা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। আমাদের চলমান অধ্যায়ে বিষয়টি এরচেয়ে বেশী আলোচনা করা বিবেচ্য নয় বিধায় আমরা আর সেদিকে যাচ্ছি না। আমরা বর্তমান আলোচনাকে এই মহাবিশ্বের মাঝে অগনিত 'মৌলিক পদার্থ' ও 'যৌগিক পদার্থের' আর্বিভাব ঘটার পেছনে ধারাবাহিক পদ্ধতির
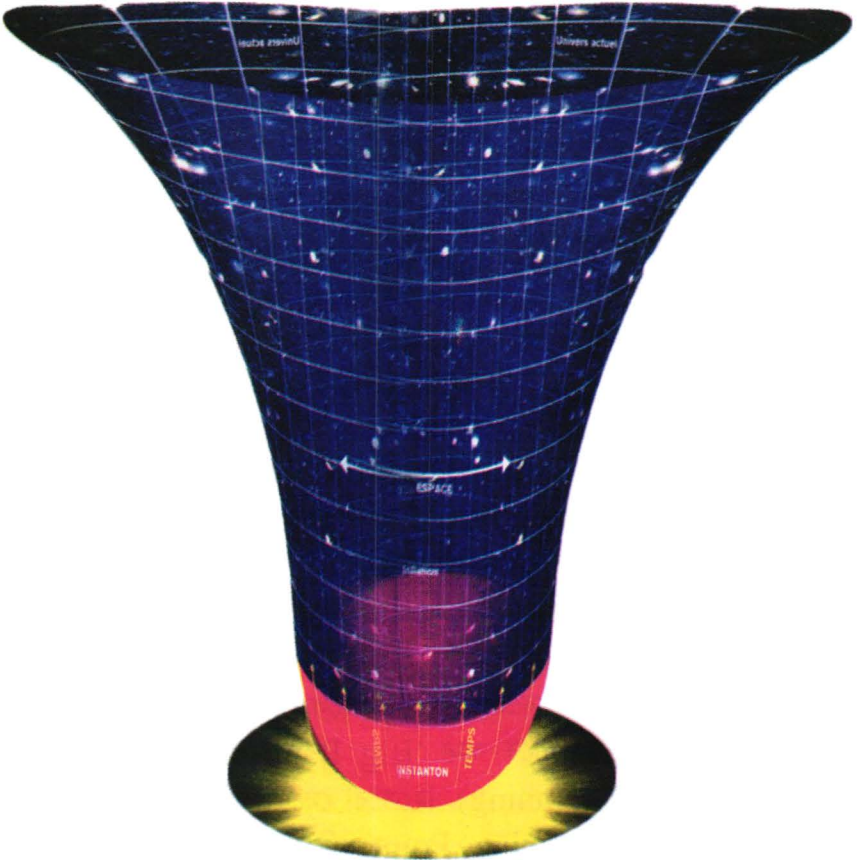
চিত্র -১৮১

"তিনিই যথাযথভাবে (মহাবিস্ফোরণ পদ্ধতির মাধ্যমে) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন, যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়, তাঁহার কথা-ই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

-- ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী 'জর্জ ল' মেইটর' কর্তৃক প্রস্তাবকৃত 'বিগ-ব্যাংগ' সৃষ্টিতত্ত্ব ১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো' কর্তৃক সমর্থন এবং ঐ মহাবিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা ৩K. এখনো বিরাজমান আছে বলে তাঁর ম্যাথম্যাটিক্যালী তথ্য ১৯৬৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'আরনো পেনজিয়াস' ও 'রবার্ট উইলসন' তাদের তৈরী টেলিফোন এন্টেনাতে ২.৭৩K. আবিষ্কার করার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতএব ১৯৬৪ সালে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ 'কুরআনের' বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করায় প্রমাণ হয়েছে- আল্লাহ সত্য, রাসূল সত্য এবং আল্লাহর পবিত্র ঐশীবাণী 'আল্-কুরআন'ও মহাসত্যতা মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।
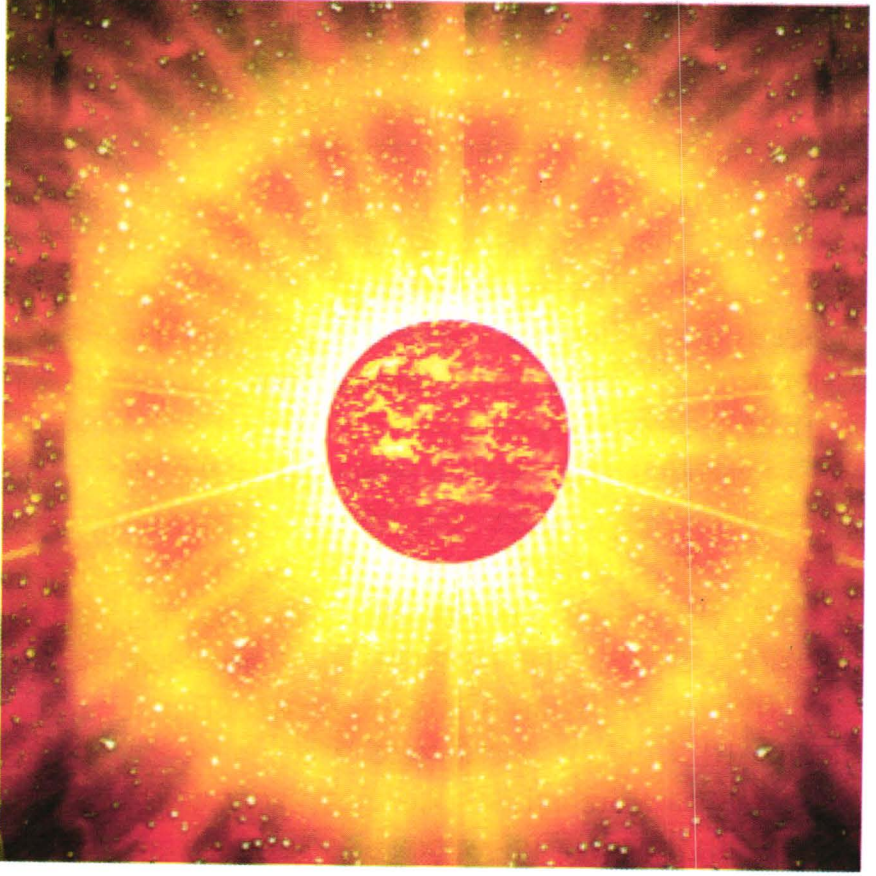
চিত্র -১৮২

"আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।" (২৯ : ৪৪)

-- 'Big Bang Model' গবেষণাকারী বিজ্ঞানী মহল আমাদের অবহিত করেছেন যে মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে $10^{-33}cm$ বিন্দুবত শক্তির আধারটি অগ্নিগোলকের (Fireball) রূপ ধারণ করে সময়ের দ্রুতগতির সাথে 'কল্পনাতীতভাবে বর্ধিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে একদিকে দ্রুত অগ্নিগোলকটি বর্ধিত হয়ে চলায় তাপমাত্রাও ক্রমান্বয়ে দ্রুত কমে যেতে থাকে। ফলে তাপমাত্রার নিম্নগামীতার কারণে প্রথমে আলোর কণা 'ফোটন' থেকেই মহাবিশ্বের 'building block' রূপী আন্তঃগঠন শূন্য মহাসূক্ষ্ম মৌলিক বস্তুকণিকা সৃষ্টি হয়ে তা থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুসমূহ আকৃতি লাভ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বর্তমান চেহারায় আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। প্রায় ১৫০০ কোটি বছর থেকে এ পর্যন্ত বিশাল মহাবিশ্বে কার্য-কারণ নীতির সমগ্র কর্মকাণ্ডটির পেছনে একজন মহাজ্ঞানী ও সক্রিয় প্রভু যে ক্রিয়াশীল আছেন তা সার্বিক বিবেচনায়-ই প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লাহ্ ছাড়া কারো পক্ষেই এ জাতীয় অকল্পনীয় কাজ সম্পাদন সম্ভব নয়।

এক এক পর্যায়ে এক এক স্বভাব ও প্রকৃতি এবং গুনাগুণ সম্পন্ন আলোই (Light) যে মূলতঃ সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে ছিল যার ফলে মহাবিশ্বটি বর্তমান চেহারায় রূপ ধারন করতে সক্ষম হয়েছে, সেই বিস্ময়কর বক্তব্যতেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 'Big Bang Model' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে- মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচিত সেই মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে ঐ ঘনীভূত 'শক্তির' আঁধার নামক বিন্দুটিতে (আয়তন প্রায় 10^{-33} cm.) সবোর্চ্চ পরিমাণ চাপের কারণে তাপমাত্রা কল্পনাতীত পর্যায়ে প্রায় 10^{32}K. (কেলভীন) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে প্রচন্ড চাপ ও তাপের কারণে শক্তির আঁধারটি একেবারে শূন্যমানে পৌঁছার পূর্বক্ষনে প্রায় 10^{-33} cm. (অদৃশ্যপ্রায়) অবস্থায় থাকতে এবং ঘনীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সময় শূন্যমানে পৌঁছার পূর্বেই অর্থাৎ প্রায় 10^{-43} Sec. সময়ে মহা এক বিস্ফোরন (Big Bang) ঘটে গিয়ে এই মহাবিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে চতুর্দিকে সমভাবে সম্প্রসারনের মাধ্যামে কেবলই বর্ধিত হয়ে ছুটতে থাকে।

মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটার মুহূর্তে তাপমাত্রা (Temperature) সর্বোচ্চ 10^{32}k থাকলেও পরবর্তী মুহূর্তে 'শক্তির' আঁধার নামক বিন্দুটি অগ্নি গোলকের (Fireball) রূপ ধারণ করে সময়ের সাথে দ্রুত বর্ধিত (Expand) হওয়ার কারণে তাপমাত্রাও সেই অনুপাতে দ্রুত কমতে থাকে। এর ফলে তাপমাত্রার এক এক পর্যায়ে এক এক ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পদার্থ কণিকাসমূহ আত্মপ্রকাশ লাভ করে ধাপে ধাপে ধারাবাহিক নিয়ম পদ্ধতিতে (Systematically) এই মহাবিশ্বটিকে পর্যায়ক্রমে বর্তমান রূপ ও গড়নে গড়ে তুলেছে। এখন পর পর আমরা তা উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। যেমন ঃ

(1)	Temperature	10^{32} k.
	Diameter	10^{-33} cm.
	Time	10^{-43} Sec.

তাপমাত্রা 10^{32}k. উল্লেখিত তাপীয় অবস্থায় সংঘটিত বিষয়াবলী ঃ

- Big Bang Occured
- Space and Time Begin to have a meaning.
- Tiny particles of electrons, neutrinos and Photons and also antiparticles as Positrons, anti neutrinos are appeared.
- Gravitational force and Electromagnetic force are also separated by the process of 'Phase transition' in which the forecs in the universe 'freeze out' from a unified forces as temperature drops.
- The Universe filled with radiation

অর্থাৎ, এক সেকেন্ডের ১০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ভাগের ১ ভাগ কাল সময়ে (10^{-43} sec.) একটি পরমাণুর হাজার কোটি, কোটি, কোটি ভাগের ১ ভাগ মাত্র (10^{-33} cm.) আয়তন বিশিষ্ট শক্তির ঘনীভূত অদৃশ্য প্রায় বিন্দুটি ১০,০০০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ডিগ্রি কেলভীন (k) তাপমাত্রা প্রাপ্তবস্থায় আর স্থির থাকতে না পেরে যে ঘটনাগুলোর সূত্রপাত ঘটায় তা হলো-

- Big Bang মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত।
- এই মহাবিশ্বে তখন থেকেই 'স্থান ও কাল' (সময়) বোধগম্যরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।
- মিশ্রিত দ্রবণ থেকে মহাসূক্ষ্ম কণিকা (Particles) 'ইলেকট্রন্স' (electrons), 'নিউট্রিনোস' (neutrinos), ও ভরশূন্য 'ফোটন্স' (Photons) এবং প্রতিকণিকা (Anti particles) রূপে 'পজিট্রন্স' (Positrons) ও পৃথক হয়ে পড়ে।
- একই সাথে 'মহাকর্ষ বল' (Gravitational force) ও 'বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় শক্তি' (Electromagnetic force)-এর মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহ যথাক্রমে, 'গ্র্যাভিটন' (Graviton), ও 'ফোটন' (Photon), বিস্ফোরণজাত দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে অগ্নিগোলকের
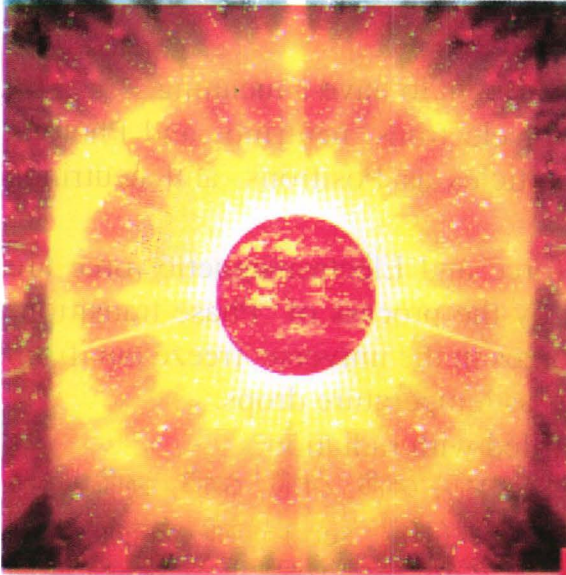
10^{-43} Sec.

10^{32} K
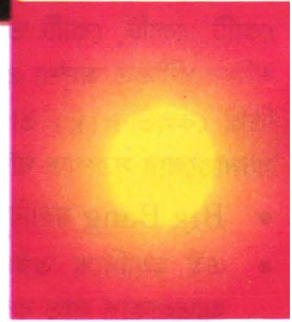
চিত্র -১৮৩

"তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, ইতোপূর্বে সে যাহা জানিত না।" (৯৬ ঃ ৫)

-- 'আল-কুরআন' যে মহাসত্যতার ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত তা একটি আয়াত থেকেই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। আয়াতটি হচ্ছে 'আলোর উপর আলো' (২৪ ঃ ৩৫)। আল্লাহ্ তায়ালা মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক মূল তথ্য বর্ণনা করার পর সমগ্র বিষয়টিকে একটি বাক্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে উল্লেখিত মন্তব্য পেশ করেছিলেন। যা কেবল বর্তমান বিজ্ঞানময় ব্যাপক সাফল্যে ভরা পরিবেশেই আমরা বিষয়টিকে প্রকাশ্য আলোতে এনে পরখ করে তার সত্যতা প্রমাণের সুযোগ লাভ করেছি। মহাবিস্ফোরণ মূহুর্তে শক্তির আধারটির তাপমাত্রা ছিল = 10^{32}k., অর্থাৎ দশ মিলিয়ন বিলিয়ন কেলভীন। সময় ছিল = 10^{-43} Sec. মাত্র এবং আয়তন ছিল 10^{-33}cm মাত্র। এ পর্যায়ে 'সময়' ও 'স্থান' বোধগম্যের সীমায় বাস্তবভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'মহাকর্ষ বল' এক প্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকা গ্র্যাভিটনের (Graviton) আবির্ভাবের মাধ্যমে এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি 'ফোটন' কণিকার আবির্ভাবের মাধ্যমে অন্যান্য শক্তি থেকে পৃথক হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। কুরআনের দাবী অনুযায়ী বিজ্ঞানের মাধ্যমে 'আল্লাহ্' এ সকল তথ্য আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যা পূর্বে আমরা অবগত ছিলাম না। অতএব সব কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর-ই।

(Fireball) ভিতর প্রচন্ড প্রতাপে সক্রিয় হয়ে উল্লেখিত মৌলিক শক্তি (basic force) দুটিকে কর্মচঞ্চল করে তোলে।

- এই অবস্থায় ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন তাপে (Highest Energetic Radiation-এ) অগ্নিগোলক পরিপূর্ণ ছিল। সর্বত্র শুধু আলো আর আলোর বন্যা বইতে ছিল।
- সেই আলোর গতি ছিল বর্তমান আলোর গতির তুলনায় শত কোটি গুণ বেশি (বর্তমান আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল)

(2)	Temperature	10^{28}k. to 10^{17}k.
	Diameter	10^{-24} cm. to Tennis ball
	Time	10^{-35} sec. to 10^{-32} sec.

তাপমাত্রা 10^{28}k. হতে 10^{17}k. উল্লেখিত পরিমান তাপীয় অবস্থায় সংঘটিত বিষয়াবলী ঃ

- Quarks and Anti quarks are appeared.
- Strong Nuclear Force seperated by appearing its messenger particles of 'Gluon'
- Electrons, Positrons, Photons and Neutrinos are also present in the primordial fireball.
- Radiation & Particles are mixing and form Dense fog, which later filled the Universe.

অর্থাৎ, মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী অবস্থায় মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত অগ্নিগোলকের (Primordial Fireball) তাপমাত্রা যখন আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে গিয়ে প্রায় 10^{28}k. (কেলভীন) হতে 10^{17}k. -এ নেমে আসে। তখন ঐ অবস্থায় যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, তা হলো-

- Radiation-র Highest Energatic Photon (ফোটন) কণিকাসমূহ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ বাঁধিয়ে প্রথমবারের
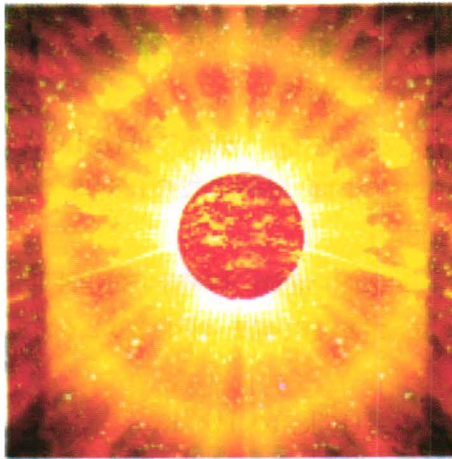
10^{-43} Sec.

10^{32} K

10^{-32} Sec.

10^{28} K. To 10^{17} K.

চিত্র -১৮৪

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- মহাবিষ্ফোরণ (Big Bang) ঘটে গিয়ে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে একদিকে যখন মহাবিশ্বটি চতুর্দিকে বর্ধিত হচ্ছিল দ্রুত বেগে, তখন আয়তন বৃদ্ধির সাথে সমানুপাতিক হারে তাপমাত্রাও নিম্নগামী হতে থাকে দ্রুততার সাথে। তাপমাত্রা যখন নেমে দাড়াল $10^{28}k$ থেকে $10^{17}k$.এ তখন অগ্নিগোলকের আয়তন ছিল $10^{-24}cm$ টেনিস বলের সমান এবং সময় ছিল $10^{-35}Sec.$ থেকে $10^{-32}Sec.$ মাত্র। এ অবস্থায় মোটামুটি একটা অনুকুল পরিবেশ তৈরী হওয়ায় প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন আলোক শক্তির 'ফোটন' কণিকা সমূহ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটিয়ে 'কোয়ার্ক' নামক মহাসূক্ষ্ম বস্তুকণিকা সৃষ্টি করে। একই সময় 'গ্লুওন' (Gluon) নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকা আত্মপ্রকাশ লাভ করে 'সবল পারমাণবিক শক্তিরূপে' কর্মতৎপর হয়ে উঠে। মানব সমাজ প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পর এ তথ্য অবহিত হচ্ছে। সুতরাং 'আল্লাহ্' নামক যে মহান 'সত্ত্বা' এগুলো তখন সার্বিকভাবে গুছিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন- তাঁকে মেনে নিতে হীনমন্যতা কেন?

মত 'কোয়ার্ক' ও 'এ্যান্টি কোয়ার্ক' (Quarks and Anti Quarks)-এর সৃষ্টি করে।

- 'গ্লুওন' (Gluon) নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকার আবির্ভাব ঘটে 'সবল পারমানবিক শক্তি' (Strong Nuclear Force) কে পৃথক মৌলিক (Basic) শক্তিরূপে নবীন মহাবিশ্বে সক্রিয় করে তোলে।
- 'Radiation' ও 'Particles' সমৃদ্ধ মহাবিশ্বটি বর্ধিত হয়ে 'টেনিস বল' কিংবা কমলা লেবুর মত আকৃতি ধারন করে।
- 'Radiation' ও 'Particles'-এর মিশ্রনে সৃষ্ট Dense Fog (ঘন কুয়াশা) দিয়ে নবীন মহাবিশ্ব ভরপুর হয়ে যায়।

(3)	Temperature	10^{13}k.
	Diameter	5 light hours.
	(Same as solar system)	
	Time	10^{-6} Sec.

মহাবিষ্ফোরণজাত তাপমাত্রা আরও কমে যখন প্রায় 10^{13} কেলভীন (k) তখন সংঘটিত ও সৃষ্ট বিষয়াবলীঃ

- The basic Nuclear Weak force appeared by producing of its messenger particles of '$W^{\pm}$ & Z'
- Quarks and Anti Quarks annihilated each other.
- Dense fog continued.
- Electrons, Positrons, Photons and Neutrinos are also available in the dense fog.

অর্থাৎ, অগ্নিগোলকটি মহাসম্প্রসারণের কারণে বর্ধিত হয়ে আমাদের সৌরজগতের আয়তন সমান আকৃতি ধারণ করায় তাপমাত্রা আরও কমে গিয়ে যখন 10^{13} কেলভীন (k.)-এ পৌঁছে তখন 'দূত' কণিকা (messenger particles) '$W^{\pm}$ ও Z' আবির্ভূত হয়ে নতুন মৌলিক

চিত্র -১৮৫

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- সৃষ্ট নবীন অগ্নিগোলকরূপী মহাবিশ্বটির তাপমাত্রা $10^{13}k$. তখন ওর আয়তন টেনিস বলের আকৃতি থেকে বর্ধিত হয়ে আমাদের বর্তমান সৌর জগতের সমান হয়ে যায়। তখন সময় 10^{-6}Sec. প্রায়। এ অবস্থায় তখন $W^{\pm}$ ও Z নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকাদের আবির্ভাব ঘটে 'Weak Nuclear Force'-কে সক্রিয় করে তোলে। উল্লেখিত তাপমাত্রায় অনুকুল পরিবেশ লাভ করে 'কোয়ার্ক' এবং 'এ্যান্টি কোয়ার্ক' সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে একে অপরকে ধ্বংস করতে থাকে। আলোর বন্যার সাথে পদার্থ কণিকাদের মিশ্রনে সমগ্র পরিবেশ ঘন কুয়াশা দিয়ে পূর্ণ থাকে। ভূ-পৃষ্ঠে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জনকারী হিসেবে দাবী করা বর্তমান মানবসমাজের জানা তো দূরের কথা চিন্তায়ও অতীত এমন মহাবিস্ময়কর কর্মকাণ্ড একজন 'কর্তা' ছাড়া কি পর্যায়ক্রমে এভাবে এগিয়ে যেতে পারে? একদিকে জ্ঞানী হিসেবে দাবী করা হচ্ছে আবার অপরদিকে মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষের মত আচরণ সত্যিকারভাবে আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল নয় কী?

(basic) শক্তি 'Weak Nuclear force' (দূর্বল নিউক্লিয় শক্তি) রূপে সক্রিয় হয়ে উঠে।

- 'কোয়ার্ক' ও 'এ্যান্টিকোয়ার্ক' (Quarks & Anti Quarks) পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে একে অপরকে ধ্বংস করার সুযোগ লাভ করে।
- 'রেডিয়েশান' তথা প্রচন্ড তেজস্ক্রিয়তা ও পদার্থ কণার মিশ্রনে সৃষ্ট 'ঘন কুয়াশা' (Dense Fog) তখনও বিরাজমান থাকে।

(4) Temperature 10^{10}k.
Diameter same as many solar syster.
(approximately one light day)
Time 1 Sec.

'Big Bang' সংঘটিত হওয়ার পূর্ণ ১ সেকেন্ড পর তাপমাত্রা যখন 10^{10}(k) কেলভীন-এ পৌছে তখন ঐ অপেক্ষাকৃত কম তাপীয় অবস্থায় যা সংঘটিত হয় তা হচ্ছে ঃ

- Neutrinos escape in vast number.
- Quarks grouped and formed Protons and Neutrons.
- Dense fog Continued.

অর্থৎ, অগ্নিগোলকটি প্রায় এক সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার মূহুর্তে মহাসম্প্রসারণের কারণে যখন বর্ধিত হয়ে আমাদের সৌরজগতের ন্যায় কয়েকটি সৌরজগতের সম্মিলিত আকৃতির সমান আয়তন লাভ করে তখন বিপরীত দিকে সমানুপাতিকহারে তাপমাত্রাও কমতে থাকে। এই অবস্থায় তাপমাত্রা 10^{10} কেলভীন পর্যন্ত নিম্নগামী হওয়ায় যে পরিবেশ তৈরী হয় তাতে-

- অধিকাংশ 'নিউট্রিনো' (Neutrinos) গুলো পালিয়ে যায় অদৃশ্য অজানায়।
- তিন-তিনটি 'কোয়ার্ক' একত্রিত হয়ে প্রথম উপ-আনবিক কণিকা 'প্রোটন' (P·oton) ও 'নিউট্রন' (Neutron) সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।
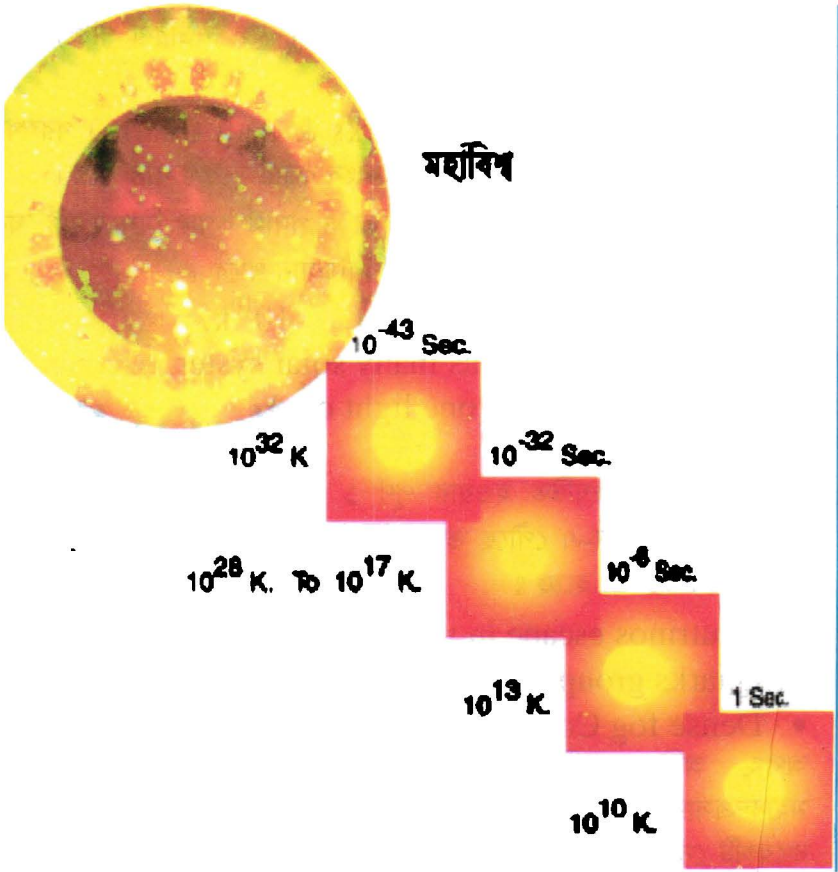
চিত্র -১৮৬

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- নবীন মহাবিশ্বের বয়স যখন মাত্র এক সেকেন্ড, তখন মহাবিশ্বটি মহাসম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে কয়েকটি সৌরজগতের আকৃতি ধারণ করে। ফলে তাপমাত্রা আরও অনেক কমে গিয়ে দাড়ায় $10^{10}k$. এ। অগ্নিগোলকটি অবিশ্বাস্যরূপে সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে এবার উল্লেখিত তাপমাত্রয় অনুকুল পরিবেশ লাভ করে প্রতি ৩টি-৩টি করে 'কোয়ার্ক' মিলিত হয়ে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা সৃষ্টি করতে থাকে। তাপমাত্রার এ পর্যায়ে সুযোগ বুঝে ব্যাপকভাবে মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'নিউট্রিনো'গুলো পালিয়ে যায় কোথাও। ঘন কুয়াশা কিন্তু তখনও দূর হয়নি।

মহাবিশ্বের কোথাও তখন সৃষ্টির সেরা মানুষের আগমন ঘটেনি। ফলে এ কাজে তাদের কোন দখল আছে বলে দাবীও তুলতে পারছে না। তাহলে কোন সেই 'সত্ত্বা' যিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাক্ষমতা দিয়ে বিশাল মহাবিশ্বকে স্থায়ী একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সুকৌশলে? তিনি কি সেই এক ও একক মহান এবং পবিত্র সত্ত্বা 'আল্লাহ্' নন? এত অগনিত বাস্তব প্রমাণের পরও সন্দেহ আছে কী?

- Radiation ও Particles-এর মিশ্রণে তৈরী 'ঘন কুয়াশা' (Dense Fog)– তখনও বিরাজমান থাকে।

(5) Temperature 10^9 k.
Universe size many light years across.
Time 3 minutes

মহাবিষ্ফোরণ 'Big Bang' ঘটার প্রায় ৩ মিনিট পর তাপমাত্রা যখন 10^9k. পর্যন্ত নিম্নদিকে নেমে আসে তখন ঐ অবস্থায় সংঘটিত বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

- Protons and Neutrons began to stick together to form 'Atomic Nuclei' in large Scale.
- Dense fog Continued.

অর্থাৎ, Big Bang পরবর্তীতে ৩ মিনিট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মহাবিশ্বটি অস্বাভাবিক গতিতে চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে কয়েক আলোকবর্ষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, তখন তেজস্ক্রিয়তার (Radiation) তাপমাত্রা আরও নীচে নেমে এসে প্রায় 10^9 কেলভীন (k.)-এ পৌঁছে। ফলে উক্ত তাপমাত্রায় যে পরিবেশ তৈরী হয় তাতে ঃ

- অবস্থা অনুকূলে আসায় তখন উপ-আণবিক কণিকা 'প্রোটন' (Proton), ও 'নিউট্রন' (Neutron), প্রথমবারের মত মিলিত হয়ে মহাবিশ্বে বস্তুর প্রাথমিক ভিত্তি 'এ্যাটমিক নিউক্লি' (Atomic Nuclei) ব্যাপকভাবে গঠন করতে শুরু করে।
- তখনও 'ঘন কুয়াশা'য় মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ ছিল।
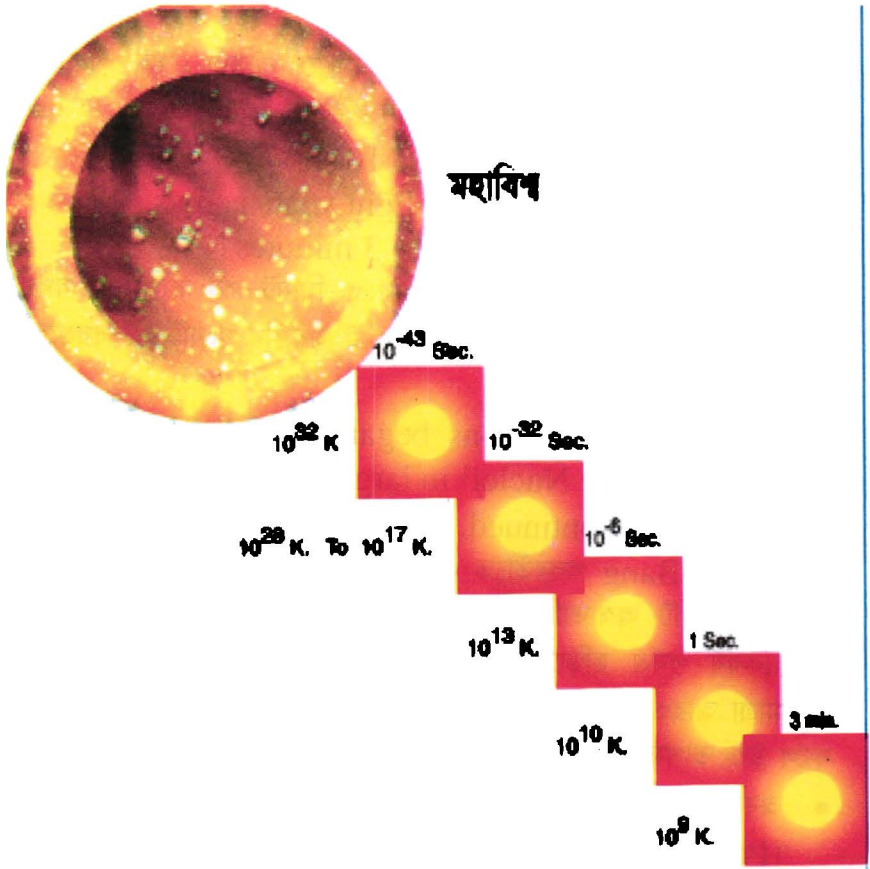
চিত্র -১৮৭

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- মানবজাতির পক্ষে এক 'আল্লাহ্'কে বাস্তবতার আলোকে জানার জন্য মহাগ্রন্থ 'কুরআনের' এক একটি বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচীত। কেননা 'আল্লাহ্' যদি বাস্তবে না-ই থাকবেন তাহলে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানীগণ যে বিষয়গুলো আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বব্যাপী সুনাম ও নোবেল পুরষ্কার লাভ করছেন, সেই একই বক্তব্য হুবহু প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে 'কুরআন' অগ্রিম কিভাবে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছে? এতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে মহান 'আল্লাহ্' সৃষ্টির শুরু থেকেই বর্তমান আছেন, কারণ তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। অতএব তাঁকে অস্বীকার করা বিবেকহীন কর্মের-ই শামীল।

আমাদের নবীন মহাবিশ্বটির বয়স যখন তিন মিনিটে পৌঁছে তখন ওর আয়তন কয়েক আলোকবর্ষের সমান হয়ে যায়। ফলে তাপমাত্রাও অনেক নীচে নেমে আসে প্রায় $10^9 k$.এ। আর তাতে সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরী হওয়ায় প্রথমবারের মত প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা মিলিত হয়ে ব্যাপকভাবে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' গঠন করতে থাকে। ঘন কুয়াশা তখনও বিরাজমান। মহান আল্লাহর তৈরী পরিকল্পনা কত সুন্দর এবং নিখুঁত তাই না?

(6) Temperature 10^4k.
Universe size thousands of light years across
Time 300,000 years

'Big Bang' মহাবিষ্ফোরণ ঘটার পর প্রায় তিন লক্ষ বৎসর (300,000) পর সৃষ্ট মহাবিশ্বটি হাজার হাজার আলোকবর্ষ ব্যাপী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাপমাত্রা পূর্বের তুলনায় অনেক অনেক কমে গিয়ে প্রায় ১০,০০০ কেলভীন (k)-এ নেমে আসে। ফলে অপেক্ষাকৃত কম তাপীয় ঐ অবস্থায় অনুকুল পরিবেশ লাভ করায় নবীন মহাবিশ্বে যে ঘটনা ঘটার সুযোগ পেয়ে যায় তা হচ্ছে ঃ

- Atomic Nuclei start to capture 'Electrons' and formed first 'Stable atoms'.
- The Universe be come transparent and filled with light.
- Dense fog cleared.

অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সর্বত্র তাপমাত্রা মাত্র ১০,০০০ কেলভীন-এ নেমে আসার ফলে ঃ

- 'এ্যাটমিক নিউক্লি' এলো-মেলো ছুটে চলা উপ-আণবিক কণিকা 'ইলেকট্রন' (Electron) সমূহকে চতুর্দিকে কক্ষপথে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এতে করে মহাবিশ্বে প্রথমবারের মত 'স্থায়ী পদার্থ বা অটল পরমাণু' (Stable Atoms) সৃষ্টি হতে শুরু করে।
- এই পর্যায়ে তেজস্ক্রিয়তার (Radiation) 'ফোটন' (Photon) কণিকাসমূহ ব্যাপক হারে 'ইলেকট্রন' কণিকাদের কক্ষপক্ষে আবদ্ধ হওয়ার পথে 'ভিত্তি' (Foundation) হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় মহাবিশ্বটি পূর্বের তুলনায় আরও স্বচ্ছ নির্মল হয়ে আলো ঝলমল করে উঠে।
- সাথে সাথে 'ঘন কুয়াশার' (Dense Fog) অস্তিত্বও তিরোহিত হয়ে যায়।
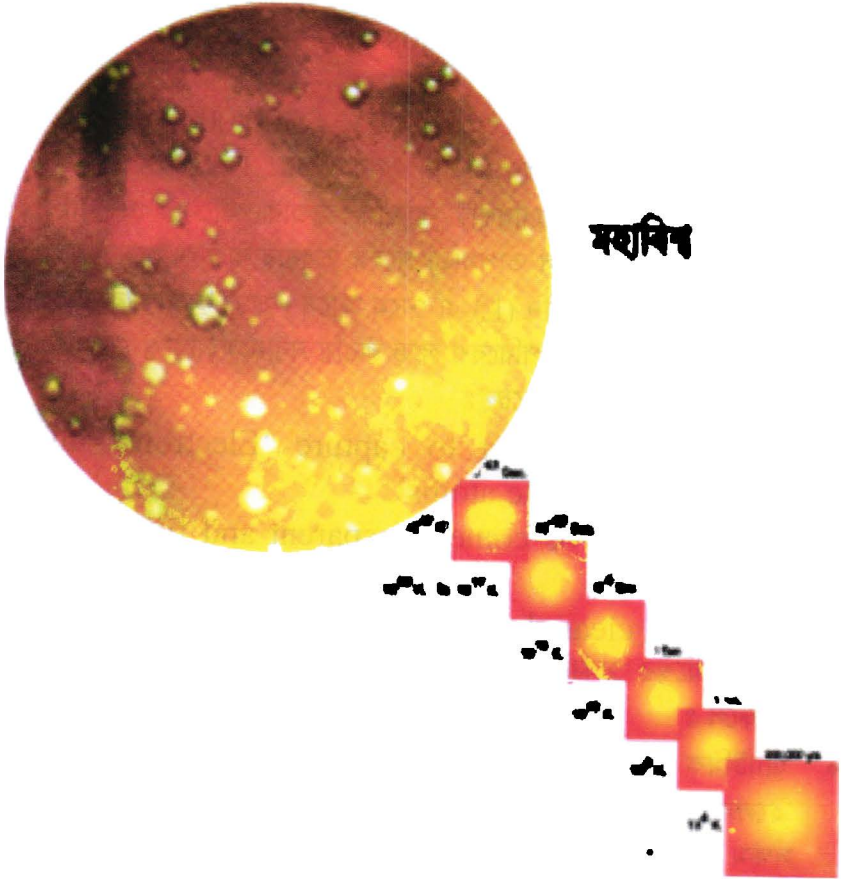
চিত্র -১৮৮

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- 'এ্যাটমিক নিউক্লি' গঠনকালটি দীর্ঘ সময় ধরে তথা প্রায় তিন লক্ষ বৎসর ধরে চলতে থাকায় মহাবিশ্বটি এ সময়ে হাজার হাজার আলোকবর্ষ আয়তন সমান বর্ধিত হয়ে যায়। এতে তাপমাত্রা অনেক অনেক কমে প্রায় $10^4 k$. তথা ১০,০০০ k-এ উপনীত হয়। তখন মহাবিশ্বটি অপেক্ষাকৃত আরও বহুগুণে ঠান্ডা হয়ে আসায় 'এ্যাটমিক নিউক্লি' প্রথমবারের মত চতুর্দিকের কক্ষপথে 'ইলেকট্রন' কণিকাদের ধারণ করে প্রথম 'স্থায়ী পদার্থ' (Stable atom) সৃষ্টি করতে শুরু করে। এতে করে তেজস্ক্রিয়তা থেকে পদার্থ কণা পৃথক হয়ে পড়ায় ঘন কুয়াশা দূরীভূত হয়ে মহাবিশ্ব স্বচ্ছতা লাভ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

'আল্লাহ্' বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবজাতিকে দীর্ঘ অতীতকালের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো উদ্ঘাটন করে জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে করে বিজ্ঞান প্রভাবিত বিশ্বে 'আল্লাহর' কৃতিত্ব সময় উপযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং মানব সমাজ বিজ্ঞানের চোখ দিয়েই 'আল্লাহ্'কে জানতে পেরে তাঁর গোলামী গ্রহণ করে নিতে পারে।

(7) Temperature 10^3 K.
Universe size millions of
Light years across
Time 1000, 000,000 Years.

প্রায় এক হাজার মিলিয়ন বছর পর মহাবিশ্বটি যখন প্রায় কয়েক হাজার মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন তাপমাত্রা আরও কমে প্রায় ১০০০ কেলভীন (K) এ নেমে আসে, ফলে-

- Universe filled with atomic gas cloud
- Cosmic String appear.
- Cosmic String gradually from that gas cloud start to form galaxies and Quasers.

অর্থাৎ, প্রায় এক হাজার মিলিয়ন বছর পর তাপমাত্রা যখন প্রায় ১০০০ কেলভীন এ নেমে আসে তখনঃ-

- সমগ্র মহাবিশ্বটি ব্যাপকভাবে পদার্থ কণার ধূয়াঁর মেঘ পুঞ্জে ভরে যায়।
- ঐ মেঘ-পুঞ্জের ভেতর 'মহাজাগতিক তার' (Cosmic String) আবির্ভূত হয়।
- মহাজাগতিক তারগুলো প্রবল 'মহাকর্ষ বলের' (Gravitational force) মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে গ্যালাক্সী ও কোয়াসারের জন্ম দিতে থাকে।
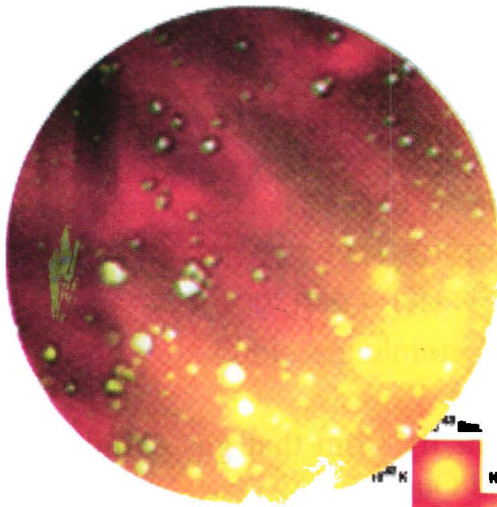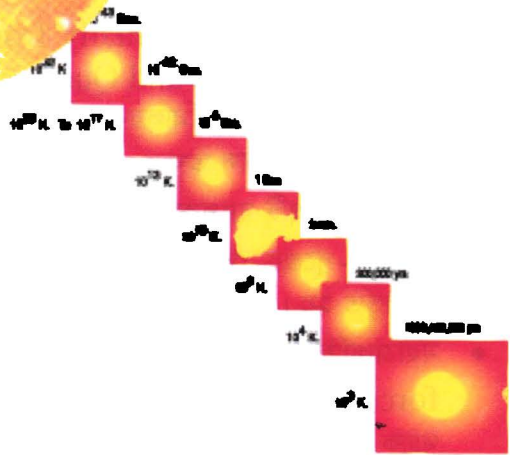
চিত্র -১৮৯

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- Big Bang ঘটার প্রায় এক হাজার মিলিয়ন বছর পর এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তখন মহাবিশ্বটি কয়েক মিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হয়ে যায়। এতে তাপমাত্রা আরও অনেক কমে মাত্র ১০০০k.-এ উপনীত হয়। উক্ত পরিবেশে ব্যাপকহারে সৃষ্ট 'স্থায়ী পদার্থ' বা Stable atoms-এর কণিকাসমূহ ধূয়ার ঘন মেঘের পরিবেশ সৃষ্টি করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যেই ধূয়ার ভেতর মহাজাগতিক এক প্রকার সূতার ন্যায় 'তার' আবির্ভূত হয়ে মেঘপুঞ্জকে গুচ্ছাকারে সাজিয়ে তোলে। পরে ঐ সকল মেঘপুঞ্জ থেকেই পর্যায়ক্রমে গ্যালাক্সী, কোয়াসার জন্ম নিতে থাকে।

মহান স্রষ্টার মহাপরিকল্পনায় মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ময়কর ধারা এভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পর মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান 'প্রভু'র মহাকীর্তি বিজ্ঞানের অর্জিত সফলতার মাধ্যমে অবহিত হওয়ার পরও কিভাবে মানুষ তাঁকে অস্বীকার করতে পারে? তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতি মানবসমাজকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে?

(8) Temperature 3K.
The Universe as we know it now
(approximately 20,000 billions of LY. across)
Time 15000,000,000 Years.

'Big Bang' নামক মহাবিষ্ফোরণ ঘটার মুহুর্ত থেকে প্রায় 'পনের হাজার মিলিয়ন' বছর পর মহাবিশ্বটির তাপমাত্রা প্রায় নামমাত্র ৩ কেলভীন (K) এ নেমে আসায় যে ঘটনাগুলো সংঘঠিত হওয়ার অনুকুল পরিবেশ লাভ করে তা হলোঃ-

- Stars, Planets, Satellites etc, gradually appear.
- After That plants, animals and human beings are also step by step ppears.
- Human being establised their gretest position world wide by their Scientific advanceness.

(When Temperature reduces as 2.73 K).

অথার্ৎ আমাদের মহাবিশ্বটি প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পার হওয়ার পথে চতুর্দিকে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় তাপমাত্রা কমতে কমতে মাত্র ৩ (3K) কেলভীন এ আগমন করার পর্যায়ে অনুকুল পরিবেশ লাভ করায়ঃ-

- গ্যালাক্সী হতে পর্যায়ক্রমে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে।
- পরবর্তীতে জীবনময় ঐ সকল মহাকাশীয় 'জ্যোতিষ্ক' গুলোতে পর্যায়ক্রমে পদ্ধতিগতভাবে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব সম্প্রদায়ের আর্বিভাব ঘটতে থাকে।
- বর্তমান ৩ কেলভীন (K) তাপমাত্রার অনুকুল পরিবেশে মানব সম্প্রদায় তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ধারায় বিশ্বব্যাপী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

এখন নীচে ছকের সাহায্যে পুরো বিষয়টি প্রদর্শিত হল।

তাপমাত্রা	সময়	ঘটনা	ফলাফল
10^{32} কেলভীন (k)	10^{-42} সেকেন্ড	'Big Bang' মহাবিষ্ফোরণ সংঘটিত। সৃষ্ট নবীন মহাবিশ্ব highest energetic photon কণিকা সমৃদ্ধ আলোর বন্যায় শুধু ভাসমান। অন্য কিছুই তখন ছিলনা। Conditions in the early Universe allowed light travels faster than its present Speed a billion times faster or more.	আলো আর আলো (Radiation and radiation)
10^{28} কেলভীন (k)	10^{-32} সেকেন্ড	হাইয়েষ্ট এনার্জি ফোটন কণিকার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ (Highest Energetic Photons Colliding)।	'কোয়ার্ক' ও 'এ্যান্টি কোর্যক' সৃষ্টি (Quark and Antiquark apear)
10^{13}k.	10^{-6} সেকেন্ড	কোয়ার্ক ও এ্যান্টি কোয়ার্ক সংঘর্ষ (Quark and Antiquark annihilation)	কোয়ার্ক উদ্বৃত্ত থেকে যায়।
10^{10}k.	এক (১) সেকেন্ড	উদ্বৃত্ত কোয়ার্ক পরস্পর মিলিত হতে শুরু করে।	ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন সৃষ্টি হতে থাকে।
10^{9}k.	তিন (৩) সেকেন্ড	'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' মিলিত হতে শুরু করে।	এ্যাটমিক নিউক্লি (Atomic Nuclei) সৃষ্টি হতে থাকে।
10,000 k.	তিন লক্ষ বছর	'এ্যাটমিক নিউক্লি' (Atomic Nuclei) 'ইলেকট্রন' কণিকা ধারণ করতে শুরু করে।	অটল পরমাণু (Stable Atoms) সৃষ্টি হতে থাকে।
1000k.	এক বিলিয়ন বছর	অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ধোঁয়ার মেঘখন্ড ঘনীভূত হতে শুরু করে।	গ্যালাক্সী, [illegible] কোয়াসার আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।
3k.	পনের বিলিয়ন বছর	হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, সালফার ও নাইট্রোজেন মিলিত হতে থাকে।	নক্ষত্র ও গ্রহ ব্যবস্থা সৃষ্টি হতে থাকে এবং আমিষ অনু সৃষ্টি হয়ে প্রাণের আবির্ভাবের মাধ্যমে মানুষের আগমন ঘটতে থাকে।
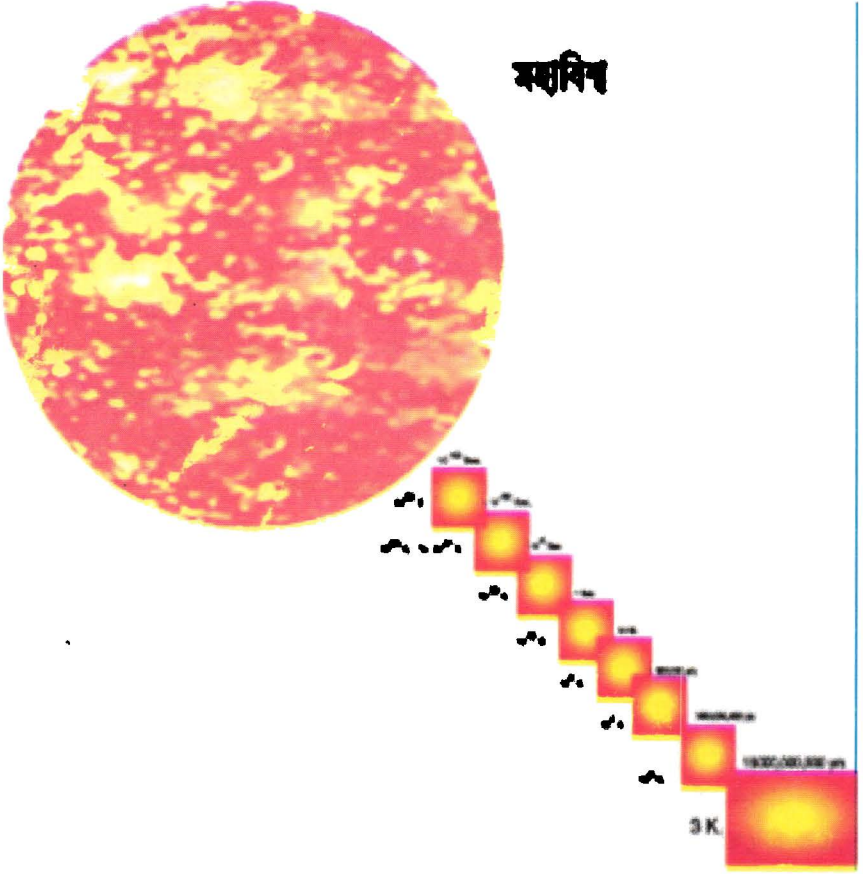
চিত্র -১৯০

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- Big Bang মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পর আজকের পরিবেশে মহাবিশ্বটি চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে বর্ধিত হয়ে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাপমাত্রা কমতে কমতে মাত্র ৩ k.-এ নেমে আসে। এরই মধ্যে গ্যালাক্সীগুলোতে পদার্থ কণিকার ধূঁয়ার মেঘ থেকে পর্যায়ক্রমে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি জন্মলাভ করে এবং ৩k. তাপমাত্রায় অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় মহাবিশ্বব্যাপী অনুকুল আবহাওয়ায় একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে পদ্ধতিগতভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান ২.৭৩ কেলভীন (k.) তাপমাত্রায় মানবজাতি হিসেবে আমরা 'সৃষ্টির সেরা' উপাধিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ অগ্রগতির মাধ্যমে সমুন্নত রেখে কেবলই এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত Static Energy এবং আল্লাহর ঘোষিত 'নূর' (Light) থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় ১৫০০ কোটি বছরের দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি নিখুঁত পরিকল্পনার যে বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ্য করেছি আলোর বিভিন্ন পর্যায়ে, তাতে এ মহৎ কাজের পেছনে একজন মহাজ্ঞানী সত্ত্বার উপস্থিতি কি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেনা? নিজ থেকে এভাবে মহাবিশ্বটি কি এগিয়ে যেতে পারে? 'কুরআন' ১৪০০ বছর পূর্বে অবৈজ্ঞানিক যুগে একথা জানলো কিভাবে?

যেহেতু শুরুতে মহাবিশ্বটির উৎপত্তিগত বিস্ফোরণজাত উদ্ভুত তাপমাত্রা 10^{32} কেলভীন (K) হতে পরবর্তীতে আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতিকহারে ঐ তাপমাত্রাও কমতে কমতে মাত্র 3 K এ আগমন করার পরই যথোপযুক্ত অনুকুল পরিবেশ তৈরী হয়ে উদ্ভিদ ও আমাদের প্রাণীজগতের বৈচিত্রময় প্রাণ-চাঞ্চল্যভরা সুন্দর এই বিশ্ব আত্মপ্রকাশ লাভে সম্ভব হয়েছে, তাই বর্তমান 'স্থান ও সময়' (Space and Time) থেকে যদি আমরা অতীতের দিকে তথা ওপরের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে আমাদের এই মহাবিশ্বটির যাত্রার সেই আদি বিন্দু পর্যন্ত পুরো চলার পথটিতে সময়ের সাথে-সাথে, ধাপে ধাপে তাপমাত্রার ক্রমবৃদ্ধিজনিত এক একটি প্রচন্ড তাপীয় পরিবেশের ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হবো। যা সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে চাইলে বলা যাবে- মহাবিশ্বতো নয়, এ যেন 'আলোর ওপর আলো'-র এক অকল্পনীয় বিস্ময়কর খেলা। মানব সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীরাই শুধু যা ভাবতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হতে পারে।

সুতরাং এই পৃক্ষাপটে 'আল-কুরআন' সুরা 'নূর'-এর ৩৫ নং আয়াতে আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টিগত মূলতত্ত্ব বিষয়ক সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ শেষে সমগ্র কর্মকান্ডটিকে সার্বিকভাবে জ্ঞানের মোড়কে সাজিয়ে উপস্থাপন করতে গিয়ে 'আলোর ওপর আলো' ('নূরুন আ'লা নূর')-র একক খেলা সম্পর্কীয় তথ্য উপস্থাপন করে যে মহাজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করেছে, প্রায় ১৪০০ বৎসর পর বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক 'তথ্য ও তত্ত্ব' আবিষ্কার করে এর পরতে পরতে ধারাবাহিক পদ্ধতির এক এক পর্যায়ে তাপ তথা আলোর এক এক ধরনের অবস্থা উদ্‌ঘাটন করে মূলতঃ 'কুরআনের' সেই উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনাকেই সুদৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির (Foundation) ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। 'কুরআন' এবং সঠিক 'বিজ্ঞান' জ্ঞানপুর্ণ একটি বিন্দুতে এসে যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। তাই বর্তমান চরম উৎকর্ষিত বিজ্ঞানময় পরিবেশে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণিত 'কুরআনের'
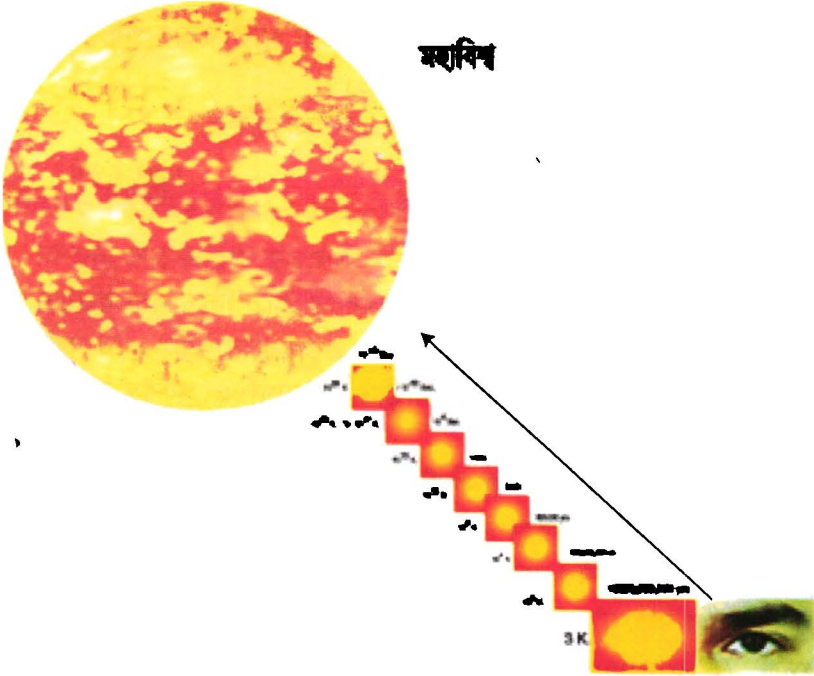
চিত্র -১৯১

"(তাঁহার সৃষ্টির উপমা যেন) আলোর উপর আলো।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- ইতেপূর্বে আমরা 'Big Bang Model' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের উদ্ঘাটিত এবং বিশ্বব্যাপী সমর্থিত মহাবিষ্ফোরণ ও তার পরবর্তী ১৫০০ কোটি বছরের মধ্যে ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাবিশ্বটি তাপমাত্রার হ্রাস ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে নিত্য-নতুন পদার্থ ও বস্তুর সৃষ্টি করেছে তার স্বচিত্র বর্ণনা প্রদান করেছি। এতে স্পষ্ট হয়েছে যে বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা সম্ভব হয়েছে বিষ্ফোরণ পরবর্তীতে সময়ের সাথে আলোর তাপমাত্রার নিম্নগামীতার কারনে, নতুবা কিছুই সম্ভব হতো না।

ভাবতে অবাক লাগে, 'আল্লাহ্' যদি সত্যিই না থাকবেন তাহলে, 'কুরআন' কিভাবে ১৫০০ কোটি বছর ধরে তাপমাত্রার বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট মহাবিশ্বে যাবতীয় বস্তু সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতাকে বিজ্ঞোচিতভাবে মহাজ্ঞানের স্বাক্ষরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে এই বলে যে, মহাবিশ্বটি যেন- 'আলোর ওপর আলোর খেলা' শুধু। ছবিতে বর্তমান সময় থেকে ওপরের দিকে মহাবিষ্ফোরণ পর্যন্ত তাকালে শুধু আলোর ওপর আলোর খেলা-ই দেখা যায়, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা কখনই অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান প্রমাণ করছে 'মহান আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই এ মহাবিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিক।'

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা সমূহকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ আর মানব জাতির হাতে থাকলো না।

অতএব, সৃষ্টি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর তথ্য লাভ করার পর "এই গুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য" (৩১ ঃ ৩)

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা এক মহা সাফল্য।"

(১০ ঃ ৬৪)

মানব সমাজে যারা সত্যিকার অর্থেই জ্ঞানী, তারাই কেবল যখন কোন সত্য বিষয় দর্শনে উপবিষ্ট হয়, তখন মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্র' মহাজ্ঞানের নিদর্শন দর্শন লাভ করে নীরবে তাঁর সম্মুখে মাথা অবনত করে দিয়ে ধন্য হওয়ার প্রত্যাশায় ফরিয়াদ করতে থাকে। আর প্রকৃতপক্ষে এই স্বতঃস্ফুর্ত আত্মসমর্পণ-ই জ্ঞানবানদের জন্য কল্পনাতীত সৌভাগ্য ও অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে এনে থাকে।

ওপরে আলোচিত অধ্যায়টিতে যে কয়টি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবার আমরা সে প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর উপস্থাপনের চেষ্টা করবো। যেমন ঃ-

(১) প্রশ্ন ঃ এই মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় সৃষ্টি ও কর্মকাণ্ড-ই যদি 'আলোর ওপর আলো'-র খেলা হয়ে থাকে, তাহলে 'আল্লাহ'-র পবিত্র 'আদেশ' (Command) এর বহিঃপ্রকাশও কি এক প্রকার 'আলো' (নূর)?

উত্তর ঃ এখানে প্রথমতঃ যে বিষয়টি আমাদের জানা দরকার তা হলো 'আল্লাহ তাআলা তাঁর যে জাতি বা মূল 'নূর' (আলো) থেকে এই মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় সকল প্রকার বস্তুর আবির্ভাব ঘটায়েছেন, সেই আদি 'নূর'-এর যাবতীয় মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ 'আল্লাহ্' নিজে পবিত্র গ্রন্থ 'কুরআনে' উল্লেখ না করায় মানব সমাজ কখনো-ই সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভে সফল হবে না বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। মানব সমাজকে সে বিষয়টি বুঝার মতো করে জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি বলে কুরআনে তা উল্লেখও করা হয়নি। আর বাস্তবিক পক্ষে 'পরীক্ষা' নামক এই পৃথিবীর জীবনে নগন্য মানব সম্প্রদায়ের সেই 'নিগুঢ় তথ্য' বিস্তারিত জানারও প্রয়োজন নেই, পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য যতটুকু জানা প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে ইতোমধ্যেই অগণিত-অসংখ্য বিষয়ে অভূত

জ্ঞানের সমারোহ ঘটিয়ে চতুর্দিকে সেট্আপ করা হয়েছে। উত্তমভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যেগুলি অবশ্যই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

'আল্লাহ্ তাআলা' তাঁর পবিত্র 'নূর' থেকেই যে এই বৈচিত্রময় মহাজগতের আবির্ভাব ঘটায়েছেন তা ইতোমধ্যেই আমরা বিস্তারিত অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি পূর্বের অধ্যায়গুলোতে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকাণ্ডটি সম্পাদন করতে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যেখানে যেসকল পবিত্র 'আদেশ' প্রদান করেছেন, সেই পবিত্র আদেশ (Command) গুলোও যে মূলতঃ কল্পনাতীত একরাশ বিস্ময়াভূত 'নূর' (আলোর)-এর ঝল্‌ক ছুটে গিয়ে নির্ধারিত কাজগুলো তড়িৎ সম্পাদনে এগিয়ে গিয়েছে, তা এখন আমরা প্রথমে 'কুরআন' ও পরে বর্তমান 'বিজ্ঞান'-এর উদ্‌ঘাটিত তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবো। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

আমাদের এই মহাবিশ্বের (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর) প্রতিপালক এক ও একক মহান 'আল্লাহ্ তাআলা' এর সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে যে সকল 'আদেশ' প্রতি মূহুর্তে প্রদান করছেন, তার বহিঃপ্রকাশও যে এক প্রকার 'নূর' (আলো)-এর ঝল্‌ক (Flash)এর প্রমান স্বরূপ প্রথমে কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতকে দলিল আকারে পেশ করছি এবং পরক্ষণে ঐ আয়াতের সমর্থনে বর্তমান বিজ্ঞানের অতি সাম্প্রতিক প্রমাণিত একটি তথ্যকে উপস্থাপন করবো যা একশত ভাগই নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করবে 'আল্লাহ্ তাআলার' পবিত্র আদেশ প্রদানও একপ্রকার 'নূর' (আলো)-এর ঝল্‌ক (Flash) ছাড়া অন্য কিছু নয়। আয়াতটি হচ্ছে- "(হে রাসুল!) তোমাকে উহারা 'রূহ্' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্' (জীবন স্পন্দন) আমার প্রতিপালকের 'আদেশ' মাত্র এবং এই ব্যাপারে তোমাদিগকে খুবই নগন্য জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে" (১৭ ঃ ৮৫)। এখানে আমরা স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি প্রাণী জগতের যে 'রূহ' (জীবন স্পন্দন) তা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার একটি 'আদেশ' ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যদিও এই আদেশটির কার্যকারিতা কিভাবে সক্রিয় হয়ে প্রাণের সঞ্চার গড়ে তোলে তার সঠিক ব্যাখ্যা মানব সম্প্রদায় এখনও অনবহিত। এর মুল রহস্য যে মানুষ কখনো পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হবে না সে কথা 'আল্লাহ্' স্বয়ং নিজেই

আমাদেরকে অবহিত করেছেন আয়াতের শেষাংশে। এখন কুরআনের দাবী অনুযারী 'প্রাণের স্পন্দন' যে আল্লাহ তাআলার একটি আদেশ সেই তথ্যটিকে আবার কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য আয়াত- "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বের যাবতীয় সকল কিছু ও কর্মকান্ড-ই) আল্লাহ্ তাআলার 'নূর'-এ উদ্ভাসিত" (২৪ ঃ ৩৫), এর পাশাপাশি তুলে ধরলে দেখা যায়- 'আল্লাহ তাআলার' নিজ পবিত্র মহান সত্ত্বার বাইরে 'হইজগত (Material World) ও 'পরজগত' (Spiritual World) দিয়ে যে প্রকান্ড মহাবিশ্ব বিরাজমান তার সকল কিছুই সৃষ্টিসহ সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণও সেই 'নূর'-এর মধ্যেই মূলতঃ আবর্তিত ও নিমজ্জিত। অর্থাৎ, এখানে মৌলিকভাবে প্রথমে 'আল্লাহ্'-র একক মহান সত্ত্বা এবং তাঁর পবিত্র সেই মহান সত্ত্বার পরে সৃষ্টি বিষয়ক যাবতীয় কাজে দ্বিতীয়তঃ মৌলিক বিষয় হচ্ছে তাঁর মূল 'নূর'-এর একক কার্যকরী ভূমিকা। এই 'নূর'-কে বাদ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট এই মহাবিশ্বে কোন একটি বিষয়কেও ব্যাখ্যা করা যাবে না, সকল কাজেই 'আল্লাহ্'-র 'নূর' একমাত্র বাহন হিসেবে কার্যরত রয়েছে। উল্লেখিত ঐশীবাণী সেই কথা-ই আমাদের চিন্তার রাজ্যে বিছিয়ে গেছে। এবার আমরা বিষয়টি বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতিতে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রমাণ করার জন্য এগিয়ে যাব।

বর্তমান চরম উৎকর্ষিত বিজ্ঞান বিশ্বের নিকট প্রাণহীন থেকে প্রাণে আসার আদিম অগ্রযাত্রা সবচেয়ে বড় নাটকীয় ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রাণহীন থেকে প্রানে আসার ঘটনা ঘটেছে সাগর সৈকতের প্রখর 'আলো ঝলসানো' কাদামাটিতে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, বিশ্ব-ঘেরা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে রাসায়ণিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রথম জীব-কণা জন্মলাভ করেছিল। পৃথিবীর প্রাথমিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে গঠিত হয়েছিল কিছু এ্যামোনিয়া সহ মিথেন, হাইড্রোজেন ও জ্বলীয় বাষ্প দ্বারা। মহাসাগরের আদিম আবহাওয়া যখন সেখানে প্রাকৃতিকভাবে তড়িৎ সূর্য থেকে 'অতি বেগুনী আলোর' (Ultraviolet Ray) বিচ্ছুরণ অথবা 'এ্যামিনো এসিড' সহ 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Ray) এবং অন্যান্য জৈব বস্তুর উদ্ভব হয়েছিল, তখনই সম্ভবতঃ জীবনের আবির্ভাব

ঘটেছিল। বিজ্ঞান বিশ্বে এই জাতীয় অনুমানকে 'প্রাথমিক ঝোল' (Primary Broth) তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ১৯৫০ সনে বিজ্ঞানী ও রসায়ণবিধ 'মিঃ এস, এল, মিলার' হাইড্রোজেন, এ্যামোনিয়া, মিথেন ও জ্বলীয় বাষ্পের গ্যাসীয় মিশ্রণ একটি জলাশয়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পরবর্তীতে 'শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ঝলক' (Powerful Electric Flash) অতিক্রম করিয়ে দেন। এতে করে কয়েকদিন পর দেখা গেলো ঐ জলাশয়ের পানি 'এ্যামাইনো এসিডের' একটি দ্রবণরূপ ধারণ করেছে। ১৯৯৩ সালে তিনি বিজ্ঞানাগারে উপরোক্ত পদ্ধতিতে একগুচ্ছ 'এ্যামাইনো এসিড' উৎপাদন করেন। এই জাতিয় 'এ্যামাইনো এসিডের' সংযোগেই 'প্রোটিন' (Protein) তৈরী হয়, যে 'প্রোটিন' জীবকোষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। এ ধরনের রাসায়ণিক ক্রিয়া-কর্মের ফলে যে প্রথম জীবকোষের উদ্ভব ঘটে প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়েছে সে ব্যাপারে সকল বিজ্ঞানী বর্তমানে একমত পোষণ করছেন। এখানে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে মাত্র কয়েকটি মৌলিক পদার্থের অনুকণা একত্রিত হওয়ার পর জীবকোষের প্রাথমিক ক্ষেত্র রচনা করেছে। কিন্তু যখন 'শক্তিশালী আলোর ঝলকের' মাধ্যমে ঐ মিশ্রণটি প্রভাবিত হল কেবল তখনই মিশ্রনটি জীবন প্রাপ্তির দিকে একধাপ এগিয়ে গেল। যদিও তাতে চূড়ান্তভাবে 'প্রাণের স্পন্দন' জেগে উঠেনি। এই না উঠার কারন হলো পৃথিবীর তথা বস্তু জগতের এই 'আলোর ঝলক' কখনই 'আল্লাহ্‌র' পবিত্র আদেশ (Command) রূপী 'নূর' এর ঝল্‌কের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। তাই বস্তুজগতের 'আলোর ঝল্‌ক' (Lighting flash) পদ্ধতিগতভাবে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে 'প্রোটিন' তৈরী পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্‌র আদেশ' নামক মূল 'নূর' এর আগমন ঘট্‌লে তা নিঃসন্দেহে প্রানের স্পন্দন 'রূহ্‌' পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আল্লাহ্‌ মানুষকে এতটুকু ছাড় দিয়েছেন শুধু মাত্র যেন তাঁর উপস্থিতি ও তাঁর কর্মকান্ডের বিশাল অঙ্গনের কিছুটা হলেও এই জাতীয় প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত হতে পারে।

অতএব, কুরআনে যে আল্লাহ্‌ জানিয়ে দিলেন 'রূহ্‌' হচ্ছে তাঁর একটি পবিত্র 'আদেশ' (Command), যা প্রানীজগতে প্রাণের সঞ্চার করে

চিত্র -১৯২

"আমার আদেশ চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায়, একবার ব্যতীত নহে।" (৫৪ ঃ ৫০)

-- ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী 'এস, এল, মিলার' মৌলিক পদার্থ হিসেবে হাইড্রোজেন, মিথেন, এ্যামনিয়া ও জলীয় বাষ্পের গ্যাসীয় মিশ্রণ একটি জলাশয়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে 'শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ঝলক' (Powerful Electric flash) অতিক্রম করিয়ে দেন। কয়েকদিন পর দেখা গেল এতে করে ঐ মিশ্রণটি 'এ্যামিনো এসিডের' একটি দ্রবণরূপ ধারণ করেছে। এই 'এ্যামিনো এসিড'-ই জীবকোষের জন্য 'প্রোটিন' হিসেবে কাজ করে এবং কোষের খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু। এ পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানবিশ্ব বর্তমানে নিশ্চিত হয়েছে যে, এ ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আলোর ঝলকে প্রভাবিত হয়েই পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষের তথা প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়েছিল। সুতরাং যারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে 'কুরআনকে' তথা 'আল্লাহ্‌কে' অস্বীকার করতে চান, তারা সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে প্রকৃত সত্য ঘটনাসমূহকে অবলোকন করার সময় কি এখনও আসেনি? বিজ্ঞান প্রিয় হওয়াতো ক্ষতিকর নয়, কিন্তু অতি বিজ্ঞানপ্রিয় হওয়াটা-ই ধ্বংসের কারণ। কেননা এ পর্যায়ে এসে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, যদিও বাহ্য দৃষ্টি ঠিক-ই থাকে।
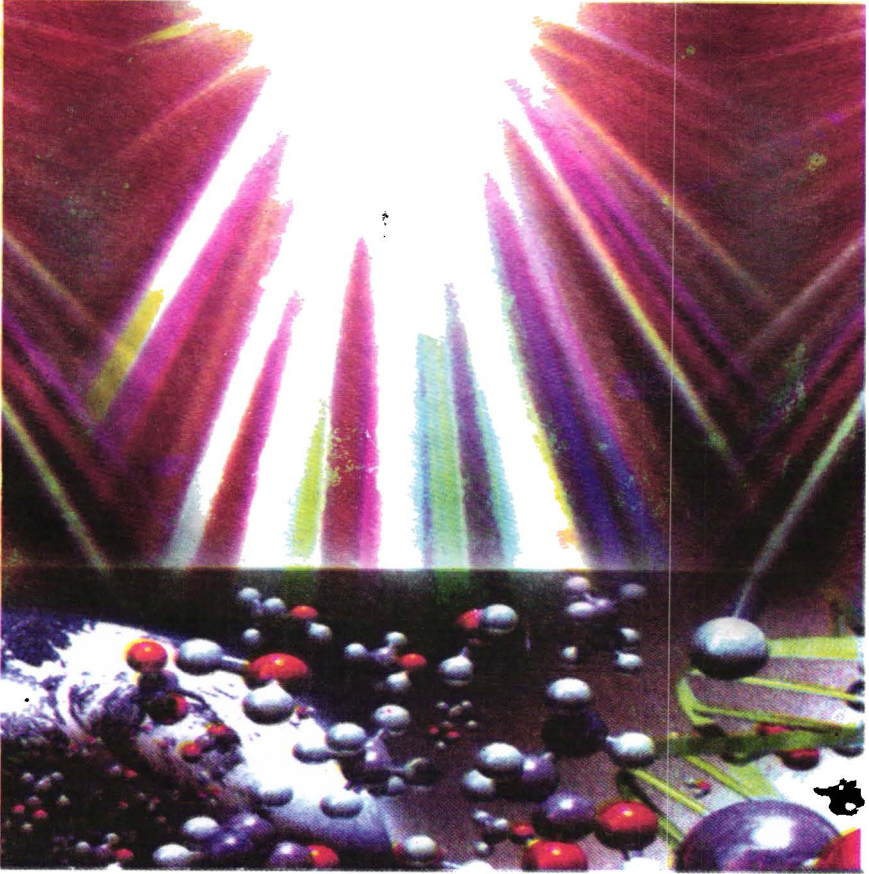
চিত্র -১৯৩

"হে রাসূল! তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ্ (জীবন স্পন্দন) হচ্ছে প্রতিপালক আদেশ মাত্র এবং এই ব্যাপারে তোমাদিগকে খুবই নগন্য জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে।" (১৭ ঃ ৮৫)

-- এ পৃথিবীতে সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি ঘটছে, ততই 'কুরআনের' বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনাগুলো 'ধ্রুব সত্য' হিসেবে স্পষ্ট আলোতে ফুটে উঠছে। মানব সমাজে যারা প্রকৃতই ভাগ্যবান কেবল তারাই বিষয়গুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরেট সত্যকে অবলোকন করে মাথা নুইয়ে দিয়ে ধন্য হচ্ছে। আর যারা প্রকৃত-ই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত তারা বিষয়গুলো দেখেও না দেখার ভান করছে। ১৯৫০ সালে জ্বলাশয়ের ওপর এবং ১৯৯৩ সালে ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞানী 'মিঃ এস, এল, মিলার' মৌলিক পদার্থ আর আলোর ঝলকের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবকোষের অন্যতম প্রধান অংশ 'প্রোটিন' তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে কুরআন যে দাবী করেছে, "বল, রূহ্ (প্রাণের স্পন্দন) হচ্ছে আমার প্রতিপালকের আদেশ মাত্র এবং এই ব্যাপারে তোমাদিগকে খুবই নগণ্য জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে" (১৭ ঃ ৮৫), এতে স্পষ্ট হয়ে-ধরা দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার আদেশেই পৃথিবীতে 'প্রাণ সঞ্চারিত' হয়েছে এবং তাঁর সেই পবিত্র আদেশটি ছিল একরাশ 'নূর' তথা 'আলোর ঝলক' মাত্র। বিজ্ঞানের বর্তমান প্রমাণ বিষয়টিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এতবড় প্রমাণের পরও আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ আছে কী?

থাকে এবং এই আদেশটি যে মূলতঃই তাঁর 'নুর' (আলো)-এর ঝল্‌ক ছাড়া আর অন্য কিছু নয় তা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়েছে। সমাজের জ্ঞানীদের নিকট বিষয়টি এখন অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে এসেছে তাদের 'প্রভুর' বাস্তব উপস্থিতি অনুধাবন করার লক্ষ্যে।

সুতরাং এই মহাবিশ্বের উৎস, মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মহাবিশ্বের সকল বস্তুর আবির্ভাব এবং মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিক্ষণে প্রদত্ত পবিত্র 'নির্দেশ' সহ সকল ব্যাপারগুলোই তাঁর 'নূর' থেকে এবং এই 'নূর' এর মাধ্যমেই তা আবার সম্পাদিতও হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলার 'নূর' কল্পনাতীত গতি সম্পন্ন ও সকল প্রকার গুণে গুনান্বিত মানব জ্ঞানে এক অবোধগম্য মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি। মহান সত্ত্বা 'আল্লাহ তাআলার' মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি-ক্ষমতার এ এক মহাকীর্তি-ই বটে।

(২) প্রশ্নঃ 'Big Bang' মহাবিষ্ফোরনে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back Ground Radiation) 10^{32} K. থেকে কমতে কমতে বর্তমানে প্রায় 2.73K. এ নেমে এসেছে। এই তাপমাত্রা ভবিষ্যতে আরও কমে কমে শূন্যের কোঠায় গমন করলে পৃথিবীর জন্য কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা আছে কী?

উত্তরঃ সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পরিচালনা ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণের বেলায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানব জ্ঞান বহির্ভূত কল্পনাতীত ও মহাবিস্ময়কর জ্ঞানের সমারোহ দৃষ্টি গোচর হয়। আর এই বিরাট-বিশাল ব্যাপারটির পিছনে অবশ্যই যে একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্ত্বার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও তাঁর ক্রিয়াশীল হস্ত প্রতিনিয়ত-ই যে কর্মরত আছে সেই বিষয়ে নিরপেক্ষ বিবেক সায় না দিয়ে পারে না।

ওপরের প্রশ্নটির উত্তর প্রদানের জন্য আমরা শুধু মহাবিশ্বের ধারাবাহিক সৃষ্টিকার্যকে একটি পর্যায়ে এবং মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকে আরেকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। এতে বিষয়টি খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের জন্য সহজ হতে পারে। ব্যাপারটি আরও সহজ করে তোলার জন্য বরং এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা একটি উদাহরণ ও পেশ করতে পারি। যেমনঃ একটি 'ঘর' তৈরীর জন্য এর প্রয়োজনীয় খুঁটিসমূহ, চারপাশের ঘেরা, ওপরের ছাদ তথা টিন, কাঠ, বাঁশ, পেরেক, স্ক্রু,

ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এক সময় পরিকল্পনা অনুযারী একটি ধারাবাহিক পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ভেতর দিয়ে 'ঘর'-টির বাস্তবে রূপ দান করে থাকি। একটি 'ঘর' তৈরী বলতে এতটুকু কাজকে আমরা আমাদের জ্ঞানের আওতায় উপলব্ধি করে থাকি, কিন্তু যখন এই ঘরটির ব্যবহার শুরু হবে তখন সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে ঘরটি তার নতুনত্ব ক্রমান্বয়ে হারাতে থাকবে এবং এক এক সময় এক একটি জিনিষ যেমন- খুটি, ঘেরা, ছাদের টিন, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ক্ষয় হয়ে নিঃশেষ তথা ধ্বংস হতে থাকবে। এই অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাওয়া যে কোন অংশকেই যথাসময়ে পরিবর্তন (Replace) করে ঘরটি ব্যবহার উপযোগী রাখাই হচ্ছে সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ। এখানে উদাহরণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকার্য এবং পরবর্তীতে প্রাণের বসবাস উপযোগী করে মহাবিশ্বের সকল অংশকে সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের গৃহীত পদক্ষেপের কথাই ফুটে উঠেছে। এখন প্রথমেই আমরা উল্লেখিত বিষয়ের কুরআনিক বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করবো এবং পরক্ষণে বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতিতে উদ্‌ঘাটিত সঠিক তথ্যগুলোকেও একইভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে যথাযথ উত্তর প্রদানের চেষ্টা করবো।

ওপরে উত্থাপিত প্রশ্নটি আমাদের এই পৃথিবীসহ মহাবিশ্বটি থাকা না থাকা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিধায় খুবই মনযোগের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণের দাবী জানায়। আমরা Big Bang বিন্দুতে প্রাথমিকভাবে তাপমাত্রা 10^{32}k-এর এক ভয়ংকর রূপ দেখতে পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে সেই ভয়ানক তাপমাত্রা মহাবিশ্বের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে কমতে কমতে বর্তমানে প্রায় 2.73 k.-এ নেমে এসেছে। যেহেতু মহাবিশ্বটি প্রতিটি মূহুর্তেই ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে চতুর্দিকে কেবলই বেড়ে চলেছে, তাই '2.73k' বর্তমান তাপমাত্রা এক সময় যে শূণ্যের কোঠায় পৌছে যাবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় মহাবিশ্বটি এবং তার জীবনময় প্রাণস্পন্দন ভরা জগতসমূহ কি বিপর্যস্ত হয়ে ধ্বংসের গহ্বরে হারিয়ে যাবে? না-কি অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থায় বর্তমানের ন্যায় টিকে

থাকবে? যদি টিকে থাকবে বলা যায় তাহলে সেই ব্যবস্থাটি কি হতে পারে আমরা এখন সেই বিষয়ে কুরআনের আলোচনায় এগিয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনে এই বিষয় সম্পর্কীয় একাধিক প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ মানবসম্প্রদায়কে অবহিত করেছেন এই বলে যে, "আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মুমীন সম্প্রদায়ের জন্য" (২২ ঃ ৪৪)। "উহারা (অবিশ্বাসীরা) কি নিজেদের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না? আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি) ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য" (৩০ ঃ ৮)। "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) এবং উহাদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই" (১৫ ঃ ৮৫)। উক্ত ঐশী বাণীসমূহে 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন' স্পষ্ট করেই দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি বিনা উদ্দেশ্যে এই বিশাল মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত বস্তুসহ কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। মানব সমাজ তাদের ক্ষুদ্র, নগণ্য ও সীমিত জ্ঞানের পরিসর দিয়ে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সমর্থ না হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এক মহৎ 'উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য একটি সময়কালকে নির্ধারণ করে সেই চূড়ান্ত সময় পর্যন্ত মহাবিশ্বকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনমত করে সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থার সমারোহ ঘটিয়ে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাঁর কাছেই লুকায়িত সেই নির্দিষ্ট সময়-মূহুর্ত পর্যন্ত, মহাবিশ্বটি একই ধারায় ব্যবস্থিত হয়ে এগিয়ে যেতে পরিবেশ পরিস্থিতির একাধিক পরিবর্তন সাধিত হলেও মূল মহাবিশ্বের টিকে থাকা এবং জীবনময় আবাসযোগ্যতা মোটেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। এ জন্য তিনি মহাবিশ্বের 'সৃষ্টির ব্যবস্থা' পূর্বে তুলে ধরা উদাহরণ 'ঘর'-এর মত একটি আলাদা পর্যায়ে রেখেছেন এবং মহাবিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ঐ ঘরের 'রক্ষণাবেক্ষণের' মতই প্রয়োজনমত পরিবর্তীত অবস্থার মাধ্যমে আলাদা করে ফেলেছেন। এই দু'টি ভাগকে বুঝতে সক্ষম হলে পুরো বিষয়টি বোধগম্য হওয়া সহজ হয়ে যাবে। প্রথম ভাগ বা ধাপটি সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন -তিনিই ছয়টি সময়কালে (ধারাবাহিক পদ্ধতিতে) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর

ভিতর সকল প্রকার বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর (তিনি) আর্‌শে সমাসীন হইয়াছেন" (৫৭ ঃ ৪)। অর্থাৎ 'ঘর' দাঁড় করাবার মতই এই মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ তাআলা ছয়টি সময়কালে একাধিক পদ্ধতির ধারাবাহিক সমন্বয় ঘটিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এই অবস্থায় মহাবিশ্বটি পরিকল্পনানুযায়ী যা যা লাভ করার তা প্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এখন এই পর্যায়ে পরিপূর্ণতা লাভকারী মহাবিশ্বটির সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা 'কন্ট্রোল রুম' (নিয়ন্ত্রণ কক্ষে) বা 'আরশে' আসন গ্রহণ করেছেন। এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে প্রথম ধাপের কাজ শেষে এবার আল্লাহ্ তাআলা দ্বিতীয় ধাপের সার্বিক কাজ পরিচালনার নিমিত্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যাতে করে তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার পথে মহাবিশ্বের ভিতর সময়ে সময়ে পরিবর্তিত পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখার মাধ্যমে জীবনময় ও আবাসযোগ্যতা এবং এর (মহাবিশ্বের) অবস্থা টিকে থাকে। আর এই কাজটি করার জন্যই তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেছেন এই ভাবে-"কত মহান তিনি যিনি আকাশে সৃষ্টি করিয়াছেন গ্যালাক্সী এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ (সূর্য/নক্ষত্র) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র" (২৫ ঃ ৬১)। "তিনিই সূর্যকে তেজস্ক্রিয় ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন" (১০ ঃ ৫)। "সকল প্রশংসা আল্লাহর-ই যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো" (৬ ঃ ১১)। অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার পর এর ভেতর বড় সংগঠন কাঠামো হিসেবে সৃষ্টি করেছেন গ্যালাক্সী। এই গ্যালাক্সীগুলোই মহাবিশ্বের জন্য ব্যবহৃত বস্তুভর (Mass) ভাগাভাগী করে বিরাট-বিরাট নিজ দেহ সত্ত্বা তৈরী করেছে। আল্লাহ্ তাআলা এই দ্বিতীয় ধাপের মাঝে জীবনময় ও আবাসযোগ্য জগত তৈরী ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা স্বতন্ত্রভাবে স্থানীয় পর্যায়ে টিকিয়ে রাখার জন্য ঐ গ্যালাক্সীগুলোর মধ্যে 'নক্ষত্র' এবং তার 'সৌর ব্যবস্থা' সৃষ্টি করেন। 'সৌরব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু 'নক্ষত্র' বা 'সূর্যকে' ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার বিরাট পিন্ডরূপে সৃষ্টি করেন। যেখান থেকে প্রতিনিয়ত 'তাপ এবং আলো' বিচ্ছুরিত হয়ে শত সহস্র কোটি বৎসর পর্যন্ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা (অথচ মহাকর্ষবলের কারণে আবদ্ধ)

জীবনময় জগতগুলো আবাসযোগ্যতা পেতে থাকে। সাথে সাথে জগতগুলোর 'আহ্নিক গতির' কারণে সূর্য থেকে আগত আলোর প্রভাবে 'দিন ও রাতের' আবর্তনের এবং 'আলো-আঁধারে' পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে মানব সম্প্রদায়ের এই পার্থিব জীবনের পরীক্ষাকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই 'স্বতন্ত্র' সৌর ব্যবস্থাটি জীবনময় জগতগুলোর সার্বিক চাহিদা একশতভাগই পূরণে সক্ষম হয়েছে। কুরআনে তা উল্লেখিত রয়েছে " তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সুর্য ও চন্দ্রকে" (১৬ ঃ ১২)। অর্থাৎ পৃথিবীর ন্যায় জগতগুলোর সার্বিকভাবে সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট 'সূর্য'-ই যথেষ্ট। পৃথিবী টিকে থাকার জন্য এক কথায় প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি হচ্ছে 'সূর্য' এবং 'চন্দ্র'। "তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী" (১৪ ঃ ৩৩)। "সূর্য এবং চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।" (৫৫ ঃ ৫)। অর্থাৎ প্রতিটি সৌর পরিবারকে জীবনময়, স্বাচ্ছন্দ ও আবাসযোগ্যতা সহ আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা সময় পর্যন্ত যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যই নক্ষত্র (সূর্য) ও উপগ্রহ (চন্দ্র) সৃষ্টি করে গতির মাধ্যমে মহাশূণ্যে ভাসমান অবস্থায় ব্যবস্থিত করার মাধ্যমে একই নিয়মের অধীন করে রেখেছেন। ফলে তাঁর নির্ধারিত সময়টি আগমন না করা পর্যন্ত মহাবিষ্ফোরণ পরবর্তীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা 'শূণ্যের কোঠায়' গমন করলেও স্থানীয়ভাবে তাপ ও আলো সরবরাহকারী 'সূর্য' কর্মক্ষম থাকায় কোন প্রকার অসুবিধা-ই ঘটবে না। এখানে এতটুকু হতে পারে যে 2.73 k. শূণ্যের কোঠায় গমন করলে জীবনময় জগতগুলোর সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। সেই বর্ধিত চাহিদা আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে স্থানীয় শক্তি ও আলোর উৎস 'সূর্য' থেকেই প্রদান করতে পারেন। যেহেতু তিনি এসবের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী। বাস্তবপক্ষেতো 'সূর্যে' প্রতিটি মূহুর্তে যে তাপ ও আলোক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তার একেবারে নগন্য পরিমানই পৃথিবীর সার্বিক কাজে ব্যয়ীত হচ্ছে। অতএব, এটা পৃথিবীর জন্য তথা জীবনময় জগতের জন্য কোন সমস্যাই নয়। কুরআন সে ব্যাপারে সতর্কতার সাথেই জ্ঞানের
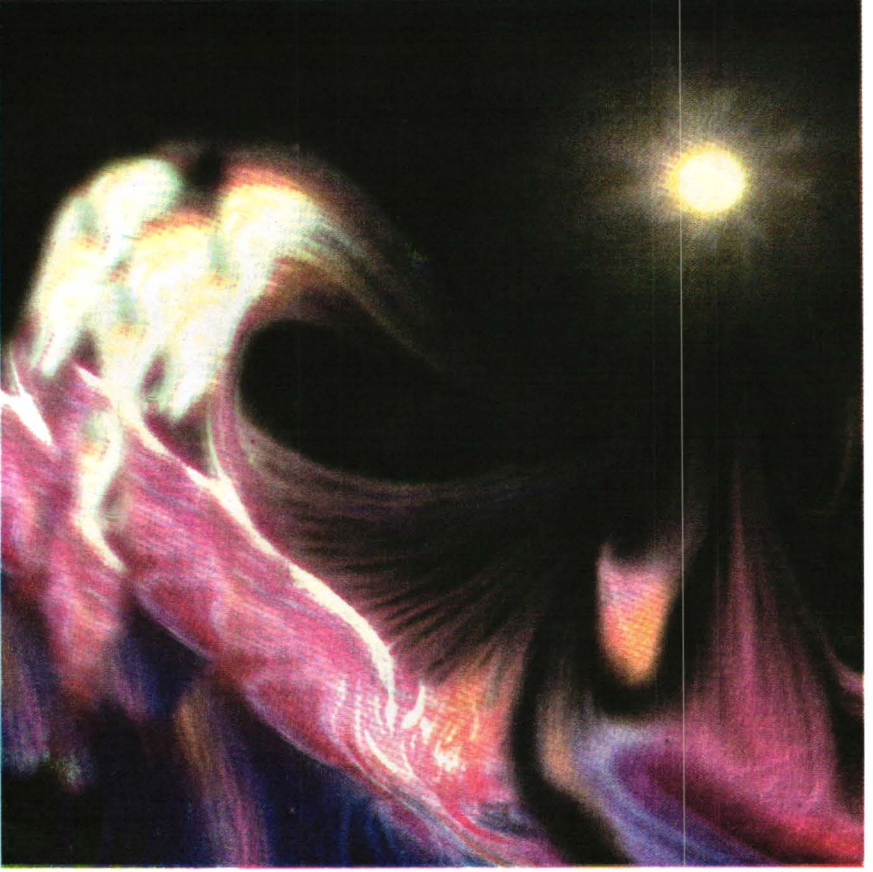
চিত্র -১৯৪

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতিময় করিয়াছেন।" (১০ : ৫)

-- আমাদের এ মহাবিশ্বে বৃহৎ সংগঠন হচ্ছে গ্যালাক্সী সমূহ। প্রতিটি গ্যালাক্সী বুকে ধারণ করে আছে গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র। প্রতিটি নক্ষত্র-ই আবার তার সৌর জগতের কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। প্রায় প্রতিটি সৌর জগতেই আছে গ্রহ ব্যবস্থা, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি। এদের মধ্যে উপগ্রহ ছাড়া বাকী সবাই সূর্যকে সরাসরি প্রদক্ষিণ করে থাকে। সমগ্র সৌর জগতের বস্তুভরের প্রায় ৯৯%ই নক্ষত্র ধারণ করে আছে। নক্ষত্র বা সূর্য একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুন্ড যার ভেতর অনবরত পারমাণবিক পদ্ধতিতে (Fusion) তাপশক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐ তাপশক্তি পরবর্তীতে সমগ্র সৌর জগতে ছড়িয়ে পড়ে জীবনময় জগতগুলোকে প্রয়োজনীয় তাপশক্তি প্রদান করে প্রাণবন্ত ও সচল করে রাখে। স্থানীয়ভাবে জীবনময় জগতগুলো সার্বিকভাবেই সংশ্লিষ্ট সৌরজগতের কেন্দ্র নক্ষত্রের (সূর্যের) ওপরই নির্ভরশীল। সুতরাং বলা যায় সূর্যের জীবন মরণের ওপর গ্রহদের অস্তিত্বও নির্ভরশীল। অতএব যে মহান আল্লাহ্ প্রতিটি জীবনময় জগতকে স্থানীয়ভাবে ওদের কেন্দ্রীয় সূর্যের ওপর নির্ভরশীল করেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি পৃথিবীবাসীর গোলামী পাওয়ার যোগ্য নন? এ সকল ক্ষেত্রে মানুষ কি তার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাতে পারে? তাহলে কেন এ মিথ্যে-মিথ্যে অহংকার যা সফল হবার নয়?
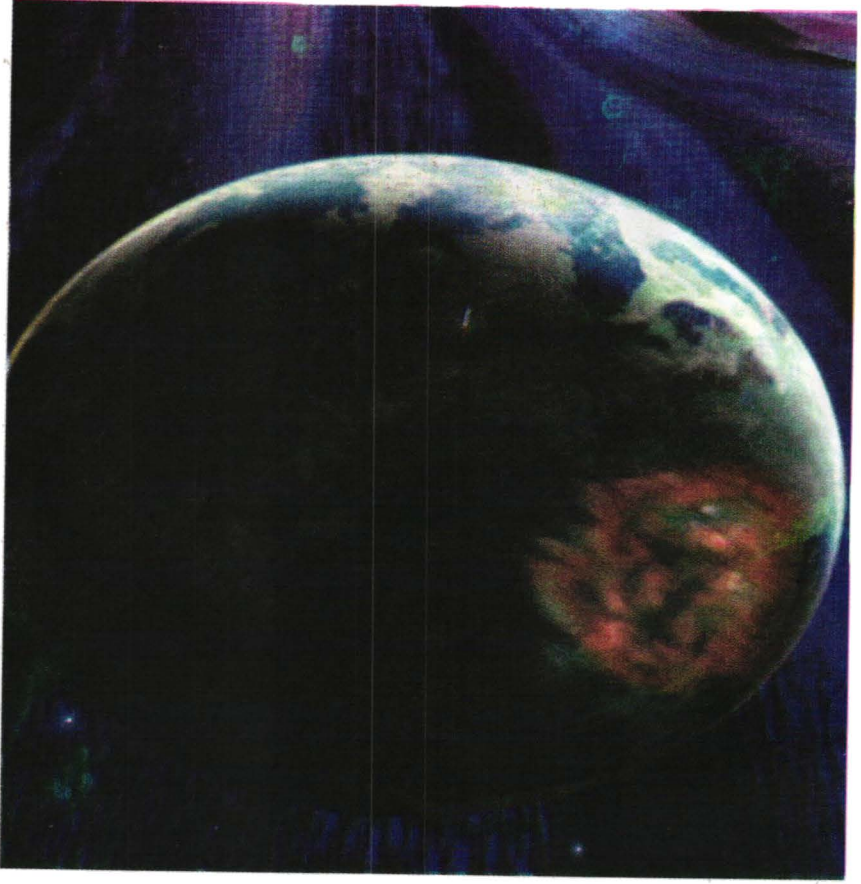
চিত্র -১৯৫

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি) সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলোর।" (৬ ঃ ১১)

-- পূর্বের ছবিটি উক্ত ছবির পাশাপাশি রেখে দর্শন করতে হবে। তাহলে সৌর জগতের কেন্দ্র নামক 'সূর্যটি' তার Sloar Wind প্রেরণ করে কিভাবে পৃথিবীকে আলোর বন্যায় ঢেকে দিচ্ছে তা বুঝতে সহজ হবে। আল্লাহ্ তায়ালা এ সূর্য সৃষ্টির মাধ্যমেই জীবনময় জগতসহ সকল প্রকার মহাকাশীয় জ্যোতিষ্কগুলোতে আলো-অন্ধকারের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এরই প্রেক্ষাপটে বলা যায় প্রতিটি সৌর পরিবারই নিজস্ব পরিবেশে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর সে কারণে সাধারণতঃ বাইরের কোন প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি সৌর পরিবারকে বেশি একটা সমস্যা ফেলতে পারে না। তাই যে আল্লাহ্ তাঁর মহাজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিস্ফোরণ ঘটাবার পর নক্ষত্র সৃষ্টি করে জীবনময় জগতগুলোকে স্থানীয়ভাবে ঐ সকল নক্ষত্রের আওতাভুক্ত করে দিয়েছেন সুচারুরূপে নির্দিষ্ট করা সময় পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সার্বিক কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে, সেই আল্লাহ্ কি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নন? তাঁকে অস্বীকার করে কি মানব সমাজ প্রকৃত কল্যাণ পেতে পারে? মহাবিশ্বব্যাপী তাঁর মহাজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেভাবে সুচারুরূপে এগিয়ে গেছে সৃষ্টির সেরা মানবসমাজ কি সেরূপ কিছু করার ক্ষমতা বা জ্ঞান রাখে? তাহলে কেন তাঁকে 'প্রভু' হিসেবে মানা হবে না?

মোড়কে সাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছে "সূর্য এবং চন্দ্র গণনায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে" (৫৫ ঃ ৪)। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থানীয় জীবনময় জগতগুলোর সার্বিক চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহ্-ই ঐ সিডিউল এর সর্বদিক যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সূর্য এবং চন্দ্রের কর্মক্ষম দিনগুলির হিসাব নিজেই রাখছেন যাতে করে মাঝপথে যে কোন কারণেই কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে না পারে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না বিধায় আমরা তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারি। "আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না" ( )

সুতরাং Back Ground Radiation 2.73 k. থেকে একেবারে শূণ্যের কোঠায় পৌঁছে গেলেও পৃথিবী যে ধ্বংস হবে না, 'কুরআন' সে কথা আমাদেরকে যুক্তিনির্ভর তথ্যের মাধ্যমে অবহিত করেছে।

'Big Bang' মহাবিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back Ground Radiation) 2.73k. (কেলভীন) পরবর্তীতে আরও কমে গিয়ে 'শূণ্যের কোঠায়' গমন করলে পৃথিবী টিকে থাকবে কি না? সে সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষ্য হচ্ছে- এতে পৃথিবী তার জীবনময় আবাসযোগ্যতা নিয়ে টিকে থাকার পথে কোন প্রকার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ 'Back Ground Radiation'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব এই মহাবিশ্বে ঐ তাপমাত্রায় বিভিন্ন ধাপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও বস্তু সৃষ্টির সাথে সরাসরি জড়িত। কিন্তু বস্তু বা পদার্থ সৃষ্টির পর ওদের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষন ও টিকে থাকার ব্যাপারটি আর প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি ঐ Back Ground Radiation-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে অনুল্লেখযোগ্যভাবে বস্তুর Pre-Heating ব্যবস্থায় যে কিছুটা অবদান ঐ তাপমাত্রার আছে তা কিন্তু অস্বীকার করছে না। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ২.৭৩ কেলভীন তাপমাত্রা কমে শূণ্যের কোঠায় গমন করলে মহাবিশ্বে নতুন পরিবেশে নতুন সৃষ্টি হিসেবে কিছু কিছু বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে এবং Pre-Heating ব্যবস্থায় তাপের যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে তা স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ সৌর পরিবার তার কেন্দ্র 'সূর্য' থেকে পুষিয়ে নিবে। এখানে এসে একটি প্রশ্ন বড় আকারে দেখা দিচ্ছে আর তা হলো সূর্য কি
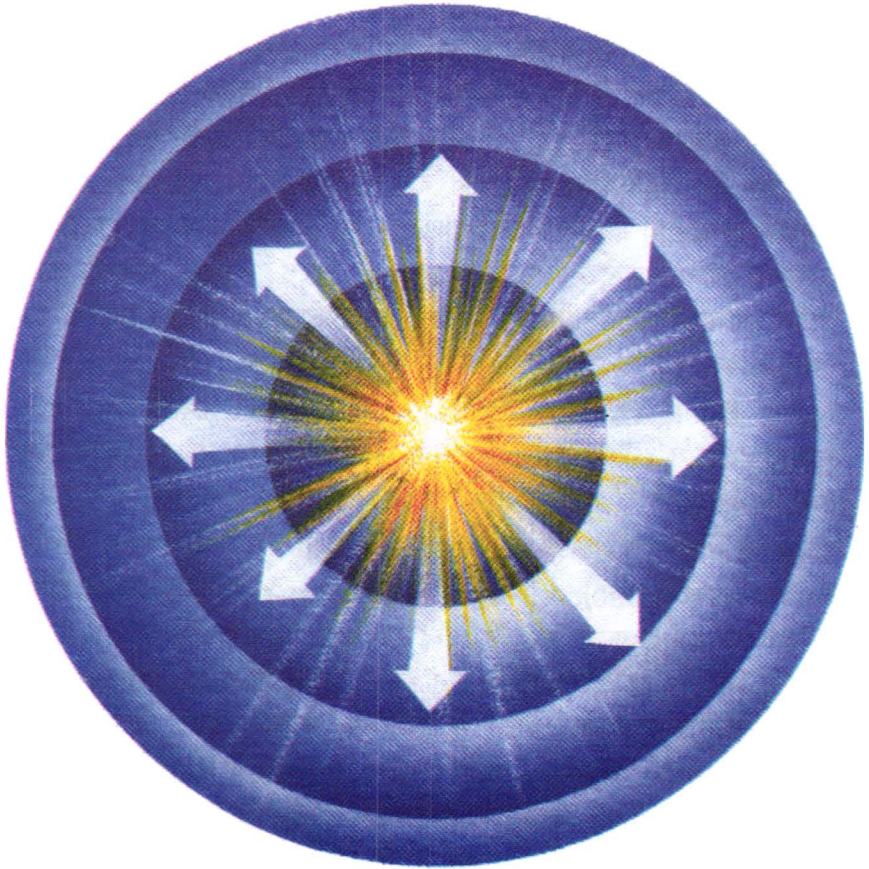
চিত্র -১৯৬

"তাহারা কি নিজদিগের মধ্যে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং এদের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন (এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) যথাযথ পরিমাপে এবং সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য?" (৩০ ঃ ৮)

-- Big Bang মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং একই সাথে 'সময়' (Time) ও বোধগম্যের ধারা অনুযায়ী চলতে শুরু করে। সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষক বিজ্ঞানীমহল জানাচ্ছেন 'Big Bang'-র শুরুতে সৃষ্ট আদি অগ্নিগোলকের মধ্যে এসেছে এক অতি বিস্ময়কর ও সংকটপূর্ণ পরিমাপমিতি। এই আদি অগ্নিগোলকের মধ্যে বস্তু ও শক্তির যে অনুপাত প্রাথমিক অবস্থায় নির্ধারিত হয়েছিল, তার সুক্ষাতি-সূক্ষ্ম পরিমাণ ব্যতিক্রম যদি হতো, তাহলে মহাবিশ্বকে বর্তমান চেহারায় দেখতে পেতাম না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষ্যেও প্রতীয়মান হচ্ছে- মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুর জন্যই রয়েছে স্থায়ীত্বের এবং সময়ের নির্দিষ্ট করা হিসেব। যার বাইরে কিছুই ঘটবে না। অতএব নির্ধারিত সময় পর্যন্তই জীবনময় এই পৃথিবী তার প্রাপ্য তাপমাত্রা যে কোন ভাবেই পেয়ে থাকবে। "আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাপ।" (১৩ ঃ ৮) আমাদের বোধগম্য হোক বা না হোক এটাই আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। শুধু জ্ঞানীজনই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে।
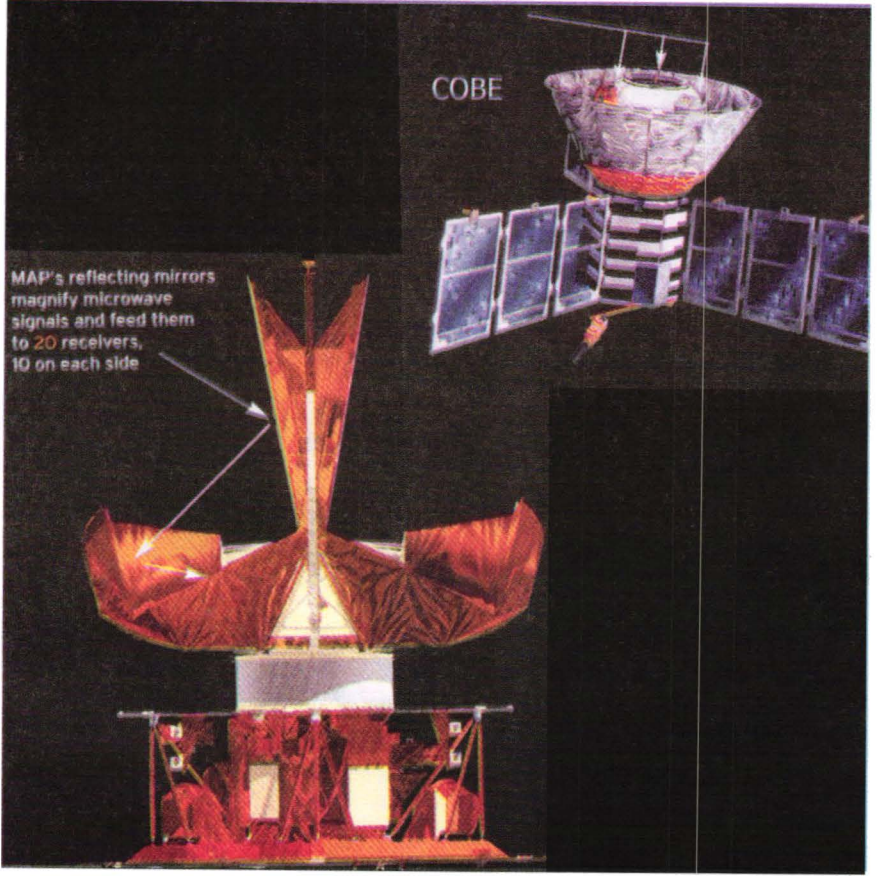
চিত্র -১৯৭

"তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট (তাঁহার উপস্থিতি ও একক কর্মকাণ্ডের) স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে। আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।" (৬ ঃ ১০৪)

-- বর্তমান ব্যাপক অগ্রগতি ও সাফল্য লাভকারী মহাকাশ বিজ্ঞান মহাশূন্যে প্রথমে COBE Satellite ও পরে MAP Satellite প্রেরণ করে Cosmic background radiation 2.73k. আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে Big Bang সত্য ঘটনা। সাথে সাথে এও প্রমাণ করেছে যে, উক্ত তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। এক সময় আসবে যখন শূন্যের কোঠায় গমন করবে। তবে মহাবিশ্বে তাপমাত্রা 3k.-এ নেমে আসার পরই কেবল আবাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই 2.73k. তাপমাত্রা শূন্যের কোঠায় পৌঁছুতে কয়েক মিলিয়ন বছরের প্রয়োজন হবে। উক্ত সময়ও মানব জাতির জন্য কম কথা নয়। ততদিনে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারনে পৃথিবী নিজেই থাকছে কি-না সেটাই ভাবার বিষয়। বিজ্ঞান ব্যাপক সাফল্য লাভ করলেও মূলতঃ পৃথিবীর বিপর্যয় যে কোন পদ্ধতিতে ও কিভাবে ঘটবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছে না এবং বলা সম্ভবও যে নয় তা স্বীকার করছে। 'কুরআন' দাবী করছে বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ্-ই জানেন। আশ্চয নয় কী?
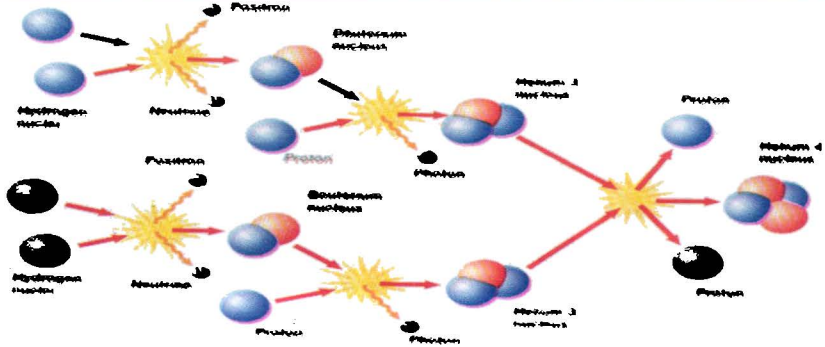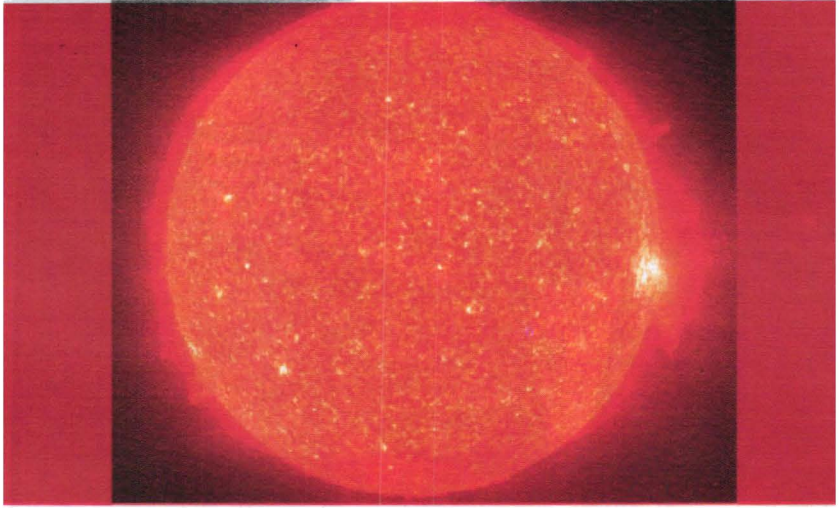
চিত্র -১৯৮

"তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন (প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন) সূর্য ও (তেজস্ক্রিয়তা বিহীন) চন্দ্রকে। যাহারা অবিরাম (তাহাদের প্রভুর নির্দিষ্ট করা) একই নিয়মের অনুবর্তী।" (১৪ ঃ ৩৩)

-- সূর্য হচ্ছে একটি নক্ষত্র, যার অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত পারমাণবিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে কল্পনাতীত তেজস্ক্রিয়তা, যে তেজস্ক্রিয়তা পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার আলোক রশ্মিতে রূপান্তরীত হয়ে সমগ্র সৌর জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্যের জ্বালানী হিসেবে ভেতরে মজুদ রয়েছে ৭৫% হাইড্রোজেন এবং ২৫% হিলিয়াম। বিগলন (Fusion) পদ্ধতিতে প্রোটন-প্রোটন চেইন রিয়েকশানের মাধ্যমে হাইড্রোজেন রূপান্তরীত হচ্ছে হিলিয়ামে। আর এই পদ্ধতি ঘটার ফলে বেরিয়ে আসছে ভয়ানক তেজস্ক্রিয়তা (Radiation)। যে তেজস্ক্রিয়তা পরবর্তীতে ভিজিবাল লাইট, রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি রূপে সৌর জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রাণময় জগতগুলোকে প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ করে প্রাণচাঞ্চল্য বজায় রাখছে।

সুতরাং কুরআন এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবী ও তার পৃষ্ঠে বসবাসরত প্রাণের কল্যাণ মূলতঃ নির্ভর করছে স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত 'সৌর শক্তির' ওপর। সূর্য কোন কারণে বিপর্যস্ত হলে সে ক্ষেত্রে সরাসরি পৃথিবীও বিপর্যস্ত হতে পারে।

ঐ সময় পৃথিবীর জন্য বাড়তি শক্তি সরবরাহ করতে পারবে? যদি পারে তাহলে তা কিভাবে ঘট্তে পারে? বিজ্ঞান এই বিষয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে হাতে কলমে এমন কিছু তথ্য লাভ করেছে যার আলোকে বলা যায় প্রাকৃতিক নিয়মের আশ্চর্যজনক কর্মকান্ড বিষয়টির সমাধান ইতোমধ্যেই প্রায় সমাধান করে ফেলেছে।

বিষয়টি খুলে বললে বলতে হয়- আমাদের আজকের পরিবেশে যখন Back Ground Rradiation কে ২.৭৩ কেলভীন স্কেলে দেখতে পাচ্ছি এবং আগামী দিনগুলোতে এই তাপমাত্রা আরও কমে গিয়ে শূণ্যের কোঠায পৌছার কারণে আমাদের চারপাশে বিরাজমান বস্তুর প্রয়োজনীয় তাপের ঘাট্তি পূর্বেই অনুভব করে চিন্তিত হচ্ছি, টিক সেই মূহুর্তেই অর্থাৎ ১৯৯৭ সাল থেকেই সূর্যটি পূর্বের তুলনায় গড়ে অধিক তাপ উৎপাদন করতে শুরু করেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই চার বৎসরের মধ্যে ২০০০ সালেই তাপ উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। সূর্য বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সূর্যের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে জানিয়েছেন যে আগামী দিনগুলোতে সূর্যের এই বাড়তি তাপশক্তি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকবে, কেননা সূর্য ওর অভ্যন্তরস্থ জ্বালানী হাইড্রোজেন মজুদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ইতোমধ্যেই ব্যবহার করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে কেন্দ্রে প্রবল 'মহাকর্ষ বলের' প্রাদুর্ভাব ঘটায় প্রচন্ড কেন্দ্রমূখী টানে ওর পৃষ্ঠদেশ ভেংগে-চুরে তুলনামূলক বেশি জ্বালানী নিয়ে কেন্দ্রে পারমাণবিক চূল্লীতে হাজির করছে আর তার ফলেই বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানীগণের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে যে আগামী আরও প্রায় এক হাজার মিলিয়ন বছর পর্যন্ত সূর্যটি এভাবে পূর্বের তুলনায় অধিক সৌর শক্তি উৎপন্ন করে সৌর পরিবারের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা রাখে। ঐ সময় পার হলেই সূর্যটি হয়তো পরবর্তীতে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে।

সুতরাং ওপরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাবিশ্বের সৃষ্টির ব্যাপারটি একটি বিষয় এবং সৃষ্টির পর মহাবিশ্ব ও তার সমগ্র বস্তু সমেত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ অন্য একটি ভিন্ন বিষয়। যে কারণে সৃষ্টি বিষয়ক ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত Back Ground

চিত্র -২০০

"তিনি পৃথিবীকে আবাসযোগ্য (সার্বিকভাবে বসবাসযোগ্য) করিয়াছেন সৃষ্ট প্রাণীকুলের জন্য।" (৫৫ ঃ ১০)

-- প্রায় পাঁচ আলোক ঘন্টা ও বিশ আলোক মিনিট ব্যাসসম্পন্ন আমাদের এই সৌর জগতের মধ্যে এ যাবৎ একমাত্র পৃথিবীকেই বিজ্ঞান জগৎ জীবনময় ও আবাসযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আবিস্কৃত প্রায় ৯টি গ্রহ ও অসংখ্য উপগ্রহসহ আমাদের এ সৌর পরিবার গঠিত। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে এমন একটি কক্ষপথ লাভ করেছে যে, যে কারণে একদিকে যেমন প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে আবার একই কারণে তেমনি প্রচণ্ড ঠান্ডা-বরফ থেকেও বেঁচে আছে। তাই পৃথিবীর তুলনা এই সৌরজগতে একা সে নিজেই।

আল্লাহ্ তায়ালা একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বিধায় তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত নেহায়েত বাহ্যিক কোন কারণে হঠাৎ করেই পৃথিবী বিপর্যস্ত হতে পারে না। তিনি যখন পৃথিবীকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করতে চাইবেন কেবল তখনই পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, নতুবা নয়। মনে রাখতে হবে সকল প্রকার বাহ্যিক অবস্থাও তাঁর কুদরতি হাতেই বন্দি। তাই তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটতে পারে না। পূর্ব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিশ্চয় তাঁর নিকট পরিকল্পিত ব্যবস্থা রয়েছে যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

Radiation ক্রমে 'শূণ্যের কোঠায়' গমন করলেও পৃথিবী এবং এর পৃষ্ঠদেশে বিরাজমান সমস্ত কিছু নিয়ে যথাযথ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ টিকে থাকার পথে বড় ধরনের তেমন কোন অসুবিধা দেখা দিবে না। কারণ পৃথিবী তার সার্বিক কর্মকান্ডে সম্পূর্ণরূপেই 'সূর্যের' ওপরই নির্ভরশীল এবং ভবিষ্যতের ঘাট্তি পূরণের লক্ষে প্রাকৃতিক ভাবেই বর্তমান সময় থেকে সূর্যটি অবিশ্বাস্যরূপে বাড়তি তাপশক্তি উৎপাদন ও বিতরণ শুর করে দিয়েছে।

অতএব, উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দান কল্পে প্রথমেই 'আল্-কুরআন' তার ঐশীবাণী উপস্থাপন করে 'সূর্যের' মাধ্যমে এই প্রাণময় জগত পরিচালিত ও টিকে থাকার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্য আগাম আমাদের অবহিত করেছে, প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পর 'বিজ্ঞান' ঐ একই বিষয় অর্থাৎ পৃথিবী তার আবাসযোগ্যতা নিয়ে টিকে থাকার পথে 'সূর্যের' ওপর-ই যে পুরোপুরি নির্ভরশীল সে কথা নতুন আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রকারান্তরে 'কুরআনের' সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। উভয় বক্তব্যই এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে প্রমাণ করেছে 'কুরআন' এবং সকল প্রকার মানদন্ডে উত্তীর্ণ 'সঠিক বিজ্ঞান' একটি উৎস থেকেই আগমন করেছে এবং সেই পবিত্র উৎসটি হচ্ছে- স্বয়ং 'আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন'। বিষয়টি আশ্চর্য হওয়ার মত নয় কি?

(৩) প্রশ্নঃ আমাদের এই মহাবিশ্বে যে কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমাণু' (Atom) ভাংগার ফলে বিপুল পরিমান তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) নির্গত হওয়ার কারন কি? কোথা হতে এই অস্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার (Radiation) আগমন ঘটে থাকে?

উত্তরঃ আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ে আলোচিত সকল বিষয়ের মধ্যে বর্তমান বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানময়। আমরা আমাদের চতুর্দিকে তাকিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন বস্তু দেখতে পেয়ে যদি অনুসন্ধান করি কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে বস্তুটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো বস্তুটি দৃঢ় ও মজবুত স্থায়ীত্ব লাভ করার পিছনে ওর 'ভিত্তি' (Foundation)-ই সবচেয়ে বেশি ও বড় দায়িত্ব পালন করছে এবং ঐ 'ভিত্তি'

(Foundation) মূল বস্তুর মতই একই উপাদানের তৈরী। উদাহরন স্বরূপ এখানে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। যেমন- একটি বিরাট 'বিল্ডিংয়ের' কথা প্রথমে আনা যায়। 'বিল্ডিং' যত বড় হয় ওর 'ভিত্তি' (Foundation) তত মজবুত ও দৃঢ় করতে হয়। মূল 'ভিত্তি' (Foundation) ছাড়া কোথাও কোন স্থায়ী বিল্ডিং তৈরী করা হয় না, করা হলে তা অস্থায়ী হিসেবেই টিকে থেকে এক সময় ব্যাপক জান-মালের ক্ষতি সাধন করে ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়। তাই একটি স্থায়ী বিল্ডিংয়ের 'ভিত্তি' (Foundation) সর্বদিক থেকেই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় যার ওপর ভিত্তি করেই পুরো বিল্ডিং তথা ইমারতটি যুগ যুগ ধরে টিকে থাকতে পারে, আর ইমারতটি যে সিমেন্ট, বালি, ইট ও রড দিয়ে তৈরী করা হয় ঐ একই উপাদান দিয়েই ইমারত তৈরীর পূর্বেই ওর 'ভিত্তি' (Foundation) তৈরী করে নিতে হয়। এর কোন বিকল্প নেই।

এবার একটি গাছের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো গাছটি দৃঢ় ও মজবুতভাবে মাটিতে দাড়িয়ে টিকে থাকার জন্য ওর 'মূল' বা 'শিকড়' নামক 'ভিত্তি' (Foundation)-র ওপর-ই পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে আছে। 'মূল' বা 'শিকড়' ঐ গাছটির সমজাতীয় উপাদানে তৈরী একটি অংশ। গাছ যত ছোট বা যত বড়ই হোক না কেন মাটির ওপর দাড়িয়ে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই 'মূল' বা 'শিকড়' নামক ভিত্তির (Foundation) ওপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে হবে। 'ভিত্তি' ছাড়া টিকে থাকা মোটেই সম্ভবপর নয়।

আবার যদি একটি 'পাহাড়ের' দিকে তাকাই তাহলে ও দেখতে পাবো বিশাল ঐ পাহাড়টি মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে, তার কারন হলো- মাটির নীচে পাহাড়টির নিম্নাংশে বিশাল 'ভিত্তি' (Foundation) পাহাড়টিকে লক্ষ-লক্ষ টন মাটি নিয়ে ধ্বসে যেতে দিচ্ছে না। বিরাট বিশাল 'ভিত্তি' (Foundation) পাহাড়টির পূর্ণ ভর (mass) কে আগলে থাকতে কোন প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না। অতি সম্প্রতি ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীগণ উক্ত তথ্য ছবিসহ প্রমান করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। পাহাড় সাধারণতঃ যে বস্তু দিয়ে সৃষ্ট, 'ভিত্তি' (Foundation)

ও সেই একই জাতিয় বস্তু দিয়ে রচিত। এভাবে প্রতিটি স্থায়ী বস্তুর-ই নিজস্ব 'ভিত্তি' (Foundation) আছে যা আজকের বিশ্বে বাস্তবতার আলোকে অস্বীকার করা চলে না। এখন যদি ওপরে আলোচিত বিল্ডিং বা ইমারত, গাছ ও পাহাড়কে ভেংগে টুকরো টুকরো করে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে পারি ওদের 'ভিত্তি' সহ, তাহলে 'ভিত্তি' (Foundation)-তে ব্যবহৃত বস্তু বা উপাদানও অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়বে। আর এই অবস্থায় দৃশ্যমান বিল্ডিং, গাছ ও পাহাড়ের অবয়ব এবং বস্তুভর (mass)-এর তুলনায় মাটির নীচে অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা 'ভিত্তি' (Foundation) রূপী বস্তুভর (mass)-এর ব্যাপক সমারোহ দর্শনে মানবীয় দৃষ্টি হকচকিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব কিছু নয়। উল্লেখিত প্রেক্ষাপটকে সম্মুখে রেখে এখন আমরা প্রথমে 'কুরআনিক' বক্তব্যকে এবং পরক্ষণে 'বৈজ্ঞানিক' উদ্ঘাটিত 'তথ্য'-কে উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

আল্-কুরআন ঘোষণা করেছে, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব এবং এর ভিতর সমস্ত বস্তু সম্ভার) আল্লাহর 'নূর'-এ উদ্ভাসিত ...... আলোর ওপর আলো" (২৪ : ৩৫)। মহা ঐশীগ্রন্থ 'আল-কুরআন' এমন অনন্য একটি বাক্যে মহাবিশ্ব ও তার ভিতরকার সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি সম্পর্কিয় সকল প্রকার তথ্যকে জ্ঞানের কভারে সজ্জিত করে প্রকাশ করেছে যে, সৃষ্টি সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের উত্তর বা আলোচনা ঐ আয়াতকে বাদ দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একটি মাত্র ঐশী বাণী অথচ শত-শত বাক্যের সমাহারের সারাংশ বুকে নিয়ে 'অন্ধকারে আলোকবর্তিকা' হয়ে যেন কাজ করছে। এ যেন একটি ঝিনুকের ভিতর এক মহাসাগর প্রবিষ্ট করে রাখা আছে।

প্রকারান্তরে বাক্যটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার মহাজ্ঞানের একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। উল্লেখিত আয়াতটিতে আল্লাহ্ তাআলার 'নূর' (আলো) মহাবিশ্বের সকল ব্যাপারে সংশ্লিষ্টতার এমন যুক্তি ও বাস্তবতা নির্ভর তথ্য এসেছে যে, মহাবিশ সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যে কোন কাজ ব্যাখ্যা করতে গেলে সেখানে তাঁর 'নূর' কে অবশ্যই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণরত অবস্থায় পাওয়া যাবে। যেদিক থেকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন আল্লাহৃর 'নূর' এর অস্তিত্ব এবং তার প্রয়োগ

সকল ক্ষেত্রেই দিবালোকের ন্যায় সম্মুখে ভেসে উঠবে। কোথাও সরাসরি আবার কোথাও বা পরোক্ষভাবে তাঁর 'নূর' অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছেই। আয়াতটিতে স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে যে, এই মহাবিশ্ব ও এর সকল প্রকার বস্তুই আল্লাহর 'নূর' থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়ে আবার ঐ 'নূর' এর সুপের মধ্যেই ডুবে আছে। যেমনিভাবে 'দুধ' দিয়ে তৈরী রশমলাই আবার দুধের মধ্যেই ডুবে থাকে। শুধু তাই নয় সাথে সাথে এই মহাবিশ্বের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণও আল্লাহ্ তাঁর 'নূর' এর মাধ্যমেই সম্পাদন করে চলেছেন। বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বেও সকল প্রকার যোগাযোগ, বার্তা প্রেরণ, প্রয়োজনীয় সংরক্ষন, যথাযথ পরিচালনা সহ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রেও একমাত্র 'নুর' বা 'আলো'-র ব্যবহার-ই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও দ্রুততর।

ইতোপূর্বেই আমরা 'কুরআন ও বিজ্ঞানের' মাধ্যমে প্রমাণসহ অবহিত হতে পেরেছি যে, মহাবিশ্ব এবং এর সকল প্রকার বস্তু-ই 'নূর' (আলো) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু কোটি কোটি কোটি বছরের জন্য এই বস্তুজগত সৃষ্ট তাই বস্তু সমূহ স্থায়ী পর্যায়ের অন্তরভূক্ত। আর সেই কারনে 'স্থায়ী পরমানুর' (Stable Atoms) 'ভিত্তি বা Foundation ও অত্যন্ত জরুরী, যা অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা উদাহরন স্বরূপ আলোচনায় পেয়েছি। সেখানে আমরা এও দেখ্তে পেয়েছি যে বস্তুর মূল গঠন এবং ওর 'ভিত্তি' (Foundation) একই জাতীয় উপাদান দিয়ে তৈরী যেন উভয় অংশ পরস্পরকে মজবুত ও দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারে। 'বস্তু' এবং ওর 'ভিত্তির' মাঝে কোন প্রকার ফাঁক বা বিভেদ না থাকে। অতএব এই মহাবিশ্বের পদার্থ কণা বা বস্তু কণা 'নূর' থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে ওদের ভিত্তিতে (Foundation) ও একই 'নূর' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা 'স্থায়ী পরমাণু' (Stable Atoms) সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হত না।

সুতরাং বর্তমান বিশ্বে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ ও প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত 'স্থায়ী পরমাণু' (Stable Atoms) ভাংগার ফলে যে বিপুল পরিমাণ 'তেজস্ক্রিয়তা' (Radiation) নির্গত হচ্ছে- তা মূলতঃ 'পরমাণুর' উপাদানসমূহ পরস্পর একত্রিত হওয়ার মূহুর্তে 'ভিত্তি বা Foundation' স্বরূপ ব্যবহৃত অতিরিক্ত 'নূর' বা আলো। একটি বিল্ডিং গুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন
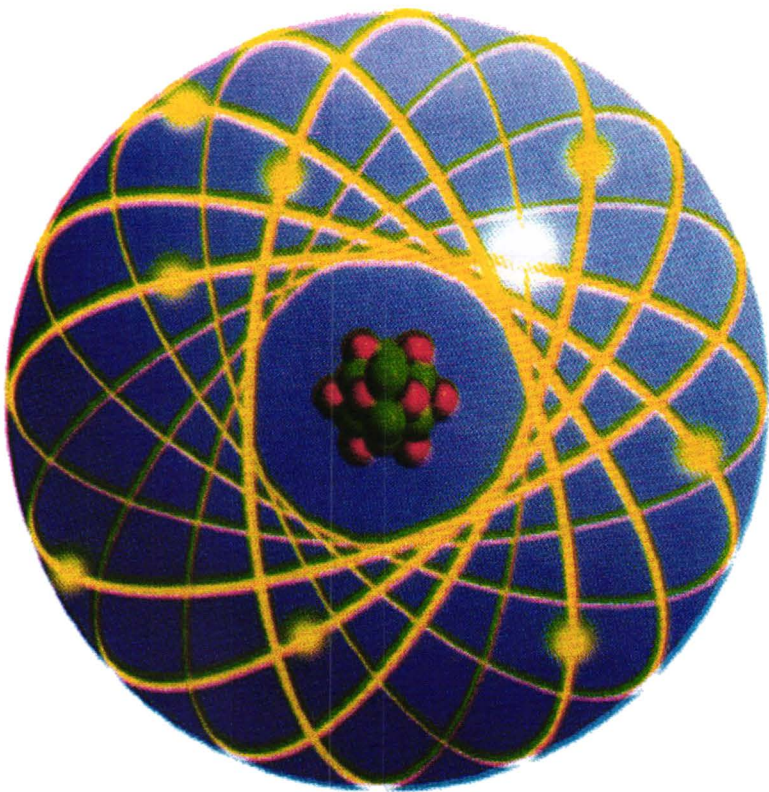
চিত্র - ২০১

"এই লোকদের সম্মুখে সেই অবস্থা আসিয়া গিয়াছে যাহাতে আল্লাহ্ দ্রোহীতা হইতে বিরত রাখার বহু শিক্ষা প্রদ উপকরণ নিহীত রহিয়াছে এবং এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিও (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর উদ্ঘাটন সমূহ) রহিয়াছে যাহা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ করিতে সক্ষম।" (৫৪ : ৪, ৫)

--বস্তুর ক্ষুদ্রতম অথচ পূর্ণাঙ্গ একক (Unit) হচ্ছে 'পরমাণু' (Atom) পরমাণুর উপাদান হচ্ছে- প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন নামক উপ-আনবিক কণিকা (Sub-Atomic Particles)। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে 'নিউক্লিয়ার্স' যা প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা পরস্পর একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়। আর এই নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অদৃশ্য 'কক্ষপথে' (Orbit) অনবরত প্রদক্ষিন করতে থাকে 'ইলেক্ট্রন' (Electron) কণিকা। উল্লেখিত অদৃশ্য কক্ষপথের অস্থিত্ব বিরাজমান না থাকলে 'ইলেক্ট্রন' কণিকাসমূহ 'এ্যাটমিক নিউক্লি' এর চতুর্দিকে পরিভ্রমন করতে সমর্থ হতো না। আবার প্রতিটি কণিকার আছে একটি অদৃশ্য ভিত্তি। যার উপর নির্ভর করে কণিকাটির অস্তিত্ব ধারণ করে থাকে এবং এ ভিত্তিটিও তেজস্ক্রিয়তা দিয়েই সৃষ্ট। তাই প্রথম 'সত্য' বিষয় হচ্ছে উপাদানসমূহের ভিত্তির অস্তিত্ব যার উপর নির্ভর করেই পরমাণু আকৃতি ধারণ করেছে। দ্বিতীয় সত্য বিষয় হচ্ছে সকল প্রকার বস্তুই মূলতঃ আলোক শক্তি (Radiation) থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যা আমরা পূর্বেই অবহিত হতে পেরেছি। সুতরাং 'নূর' বা আলো থেকেই মহাবিশ্বের যাবতীয় সকল কিছুই সৃষ্টি হয়েছে বলে কুরআন যে ঘোষনা দিয়েছে তা পুরোপুরি সত্য ঘটনা।

করে দিলে যেমন ওর 'ভিত্তি বা Foundation' মাটির গোপন থেকে বেরিয়ে আসে, একটি পাহাড়কে 'ডিনামাইট' দিয়ে উড়িয়ে দিলে ওর 'ভিত্তি বা Foundation' যেমন লুকানো থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, একটি গাছকে উপড়ে তুলে ফেললে ওর 'ভিত্তি বা Foundation' স্বরূপ মূল বা শিকড় যেমন স্থানচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশ পায় ঠিক তেমনি বস্তুর ক্ষদ্রতম অংশ (Unit) 'পরমাণু' (Stable Atoms) ভেঙ্গে ফেললে ওর 'ভিত্তি বা Foundation' স্বরূপ ব্যবহৃত ব্যাপক জমানো 'নূর' (Radiation)-ই বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ভয়াবহ রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।
এবার উল্লেখিত বিষয়ে বিজ্ঞানের সর্বশেষ ও উৎকর্ষিত আবিষ্কারের মাধ্যমে পেশকৃত ভাষ্য হচ্ছে- 'Big Bang' মহাবিস্ফোরণে উদ্ভুত প্রচন্ড তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন 'ফোটন' কণিকা (Highest Energetic radiation Particles 'photon') থেকে 'কোয়ার্ক' (Quark) সৃষ্টি, 'কোয়ার্ক' থেকেই 'প্রোটন' (Proton), নিউট্রন (Neutron), ও ইলেকট্রন (Electron) কণিকাসমূহ সৃষ্টি, আবার প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন মিলিত হয়ে বস্তুর ক্ষুদ্রতম ইউনিট (একক) 'স্থায়ী পরমানু' (Stable Atoms) সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর একাধিক তথা বিলিয়ন-বিলিয়ন 'পরমাণু' মিলিত হয়ে 'অণূ' এবং বিলিয়ন-বিলিয়ন-বিলিয়ন 'অণূ' মিলিত হয়ে বস্তুর আকৃতি লাভ করেছে। তারপর এই রূপ অসংখ্য বস্তু দিয়েই এই 'মহাবিশ্ব' পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।
একেবারে সংক্ষিপ্তাকারে বললেও বলতে হয়- ১৯৩৩ সালে বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'ল' মেইটর' কর্তৃক সর্বপ্রথম Big Bang সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পর ১৯৬৫ সালে আমেরিকান দু'জন বিজ্ঞানী 'মিঃ আরনো পেনজিয়াস' ও 'রবার্ট উইলসন' একযোগে তাদের নিজস্ব কাজের জন্য তৈরী 'এ্যান্টেনাতে' 2.73 k. তাপমাত্রা যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back Ground Radiation)

আবিষ্কারের মাধ্যমে 'Big Bang' সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একদিকে ১৯৬৫ সালে Big Bang প্রস্তাব প্রমাণিত হওয়া অপরদিকে পূর্বেই ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী 'রাদার ফোর্ড' কর্তৃক পরমাণুর উপাদান 'ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন' আবিষ্কৃত হওয়া এবং ১৯১৩ সালে ডেনিশ পদার্থবিদ 'নীলস বোহ্‌র' (Neils Bohr) কর্তৃক পরমাণুর 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকার 'কোয়ান্টাম জাম্প' (Quantum Jump) আবিষ্কারের মাধ্যমে শক্তির তারতম্য ঘটার কারণ প্রমাণিত হওয়া এবং ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী 'Lise Meitner' ও 'Otto Hahn ' নিউট্রন কণিকাকে 'Fission' পদ্ধতিতে 'ইউরেনাম-২৩৫' (Uranium-235) পদার্থের নিউক্লিয়াস-কে আঘাত করে ভেংগে দু'টুকরা করা এবং তাতে কল্পনাতীত তাপশক্তি নির্গত হওয়ার বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়ে প্রমাণ হয় যে, বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক (Unit) 'স্থায়ী পরমাণু' (Stable atoms)-র নিউক্লিয়াস (Nucleus) তৈরীতে 'প্রোটন ও নিউট্রন' কণিকাসমূহ একত্রিত হয়ে আসন গ্রহণের প্রক্রিয়ায় 'ভিত্তি' (Foundation) স্বরূপ এবং ঐ নিউক্লিয়াসের পজেটিভ চার্জযুক্ত 'প্রোটনের' আকর্ষণে পরবর্তীতে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকের 'কক্ষপথে' নেগেটিভ চার্জযুক্ত 'ইলেকট্রন' কণিকা সমূহ আসন গ্রহণ কল্পে ওদের জন্য ব্যাপকভাবে সর্বোচ্চ তাপ সম্পন্ন তেজস্ক্রিয়তা (Highest Energetic Radiation) 'ভিত্তি বা Foundation' রূপে অংশ গ্রহণ করে সহায়তা দান করেছিল, যে পরমাণুগুলিই পরবর্তীতে এই মহাবিশ্বে সকল বস্তুর রূপদান করেছে।

ফলে আজকের পরিবেশে যখন সূর্যের ভেতর 'Fusion' পদ্ধতিতে একাধিক হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু 'গলন' প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে এবং পারমাণবিক বোমার বেলায় 'Fission' পদ্ধতিতে যখন মৌলিক পদার্থের 'স্থায়ী পরমাণু' (Stable Atoms) কে আঘাত করে ভেংগে ফেলা হচ্ছে, তখন ঐ সকল পরমাণুতে 'ভিত্তি' বা 'Foundation' হিসেবে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তেজস্ক্রিয়তা (Highest Energetic Radiation) পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং Most

চিত্র -২০২

" আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্ তায়ালার 'নূর'-এর দ্বারা উদ্ভাসিত (নূর থেকেই সৃষ্ট, আবার নূর-এর মাধ্যমেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত)।" (২৪ ঃ ৩৫)

-- ১৯১৩ সালে ডেনিশ পদার্থবিদ 'নীলস্ বোহর' পরমাণুর ভেতর ইলেক্ট্রন কণিকায় 'কোয়ান্টাম জাম্প' সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, যখন কোন কারণে পরমাণুর নিউক্লিয়ার্সের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ রত 'ইলেক্ট্রন' কণিকা বাইরের দিকের কক্ষপথে লম্প দিয়ে চলে যায়, তখন বাইরের পরিবেশ থেকে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) পরমাণুতে প্রবেশ করায় পরমাণু ঐ তেজস্ক্রিয়তাকে ধারণ করে নেয়। আবার 'ইলেক্ট্রন' কণিকা যখন বাইরের দিকের কক্ষপথ থেকে ভেতরের দিকের কক্ষপথে লম্ফ দিয়ে চলে আসে, তখন তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) পরমাণু থেকে নির্গত হয়। তিনি এ বিষয়ে ১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এখানে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে- ইলেক্ট্রন কণিকার স্থান পরিবর্তনে পরমাণু তাপশক্তি গ্রহণ করছে কিংবা পরিত্যাগ করছে। অতএব 'তেজস্ক্রিয়তা' নির্গত হওয়ার জন্য ইলেকট্রন জাম্প স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে- কণিকাসমূহের ভিত্তি এতে প্রাভাবিত হয়ে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করে আবার আরেক পর্যায়ে তেজস্ক্রিয়তা বর্জন করে।
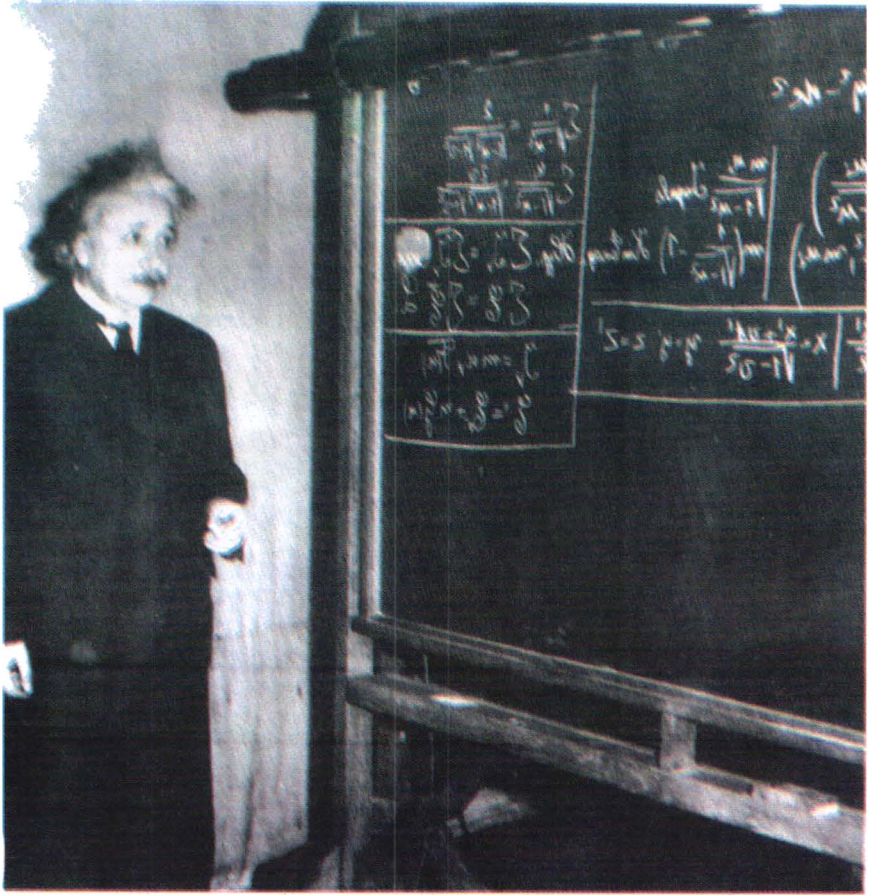
চিত্র -২০৩

" আর বল, প্রশংসা আল্লাহর-ই তিনি তোমাদিগকে সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন। তখনই তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে।" (২৭ ঃ ৯৩)

-- যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলবার্ট আইনষ্টাইন বিশ্বব্যাপি শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে 'বস্তু ও শক্তি' সম্পর্কিয় সমীকরণ $E = mc^2$ হচ্ছে অন্যতম। এই সমীকরণের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে মহাবিশ্বে 'বস্তু যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তেমনি শক্তিও প্রয়োজনে বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম ইউনিট 'পরমাণু' কে ভাংগার ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তা সংশ্লিষ্ট পদার্থ কণার ধ্বংসের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং সূর্যের ভেতর হাইড্রোজেন পরমানুর উপাদান ১টি 'প্রোটন' বিগলন পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়ে ১টি নিউট্রন, ১টি পজিট্রন, ১টি নিউট্রিনো এবং তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার পারমানবিক বোমার বেলায় সৃষ্ট নতুন 'নিউট্রন' নামক কণিকার ভিত্তি থেকে তেজস্ক্রিয়তা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সুতরাং যেভাবেই পরমাণুকে দেখা হোক না কেন সবদিক থেকে ওর মাঝে 'নূর'-এর কিরণচ্ছটা ঝলকিয়ে উঠবেই। এটা আল্লাহ্‌র-ই একক কৃতিত্ব বিশেষ।
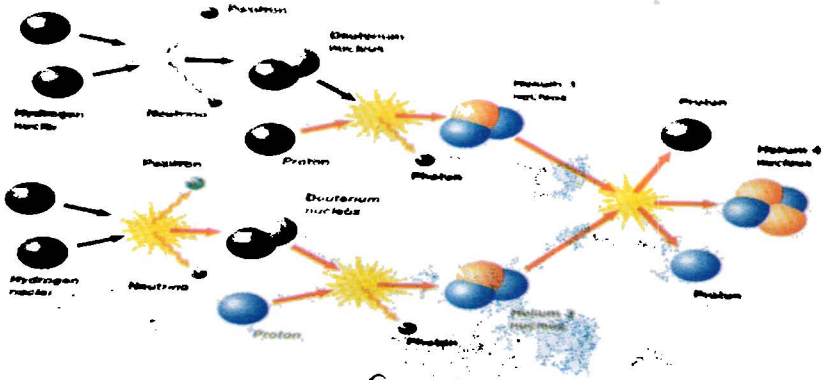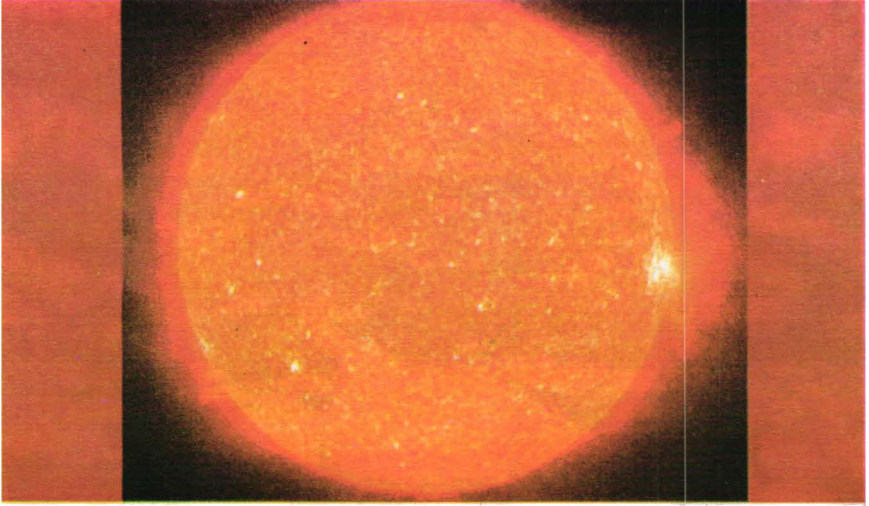
চিত্র -২০৪

" ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন (Sign) রহিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ-ই বিশ্বাস করে না।" (২৬ ঃ ১০৩)
-- সূর্যের ভেতর প্রতি সেকেন্ডে প্রোটন-প্রোটন চেইন রিয়েকশানে প্রায় ৬০০ কোটি টন হাইড্রোজেন পরমাণুর 'প্রোটন' কণিকা সমূহ (হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র 'প্রোটন' কণিকা থাকে) পরস্পর দুটি মিলে প্রথম রিয়েকশানে একটি ধ্বংস হয়ে তা থেকে ১টি 'নিউট্রন' কণিকা, ১টি পজিট্রন' কণিকা, ১টি 'নিউট্রিনো' কণিকা এবং তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়, অপর 'প্রোটন' কণিকাটি Fusion পদ্ধতিতে সৃষ্ট নতুন 'নিউট্রিনো,র সাথে মিলিত হয়ে 'ডিউটেরিয়াম নিউক্লি' রূপে পরবর্তী রিয়েকশানের দিকে এগিয়ে যায়। অতঃপর নতুন আরেকটি 'প্রোটন' কণিকা উল্লেখিত বিগলন (Fusion) পদ্ধতিতে ঐ প্রোটন, নিউট্রন জোড়ের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে 'হিলিয়াম-৩' নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয় এবং এতে করে তেজস্ক্রিয়তাও নির্গত করে। আবার 'হিলিয়াম-৩' নামক এ্যাটমিক 'নিউক্লি'টি একই পদ্ধতিতে (Fusion) অপর একটি 'হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াসের' সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি 'হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস' দু'টি আলাদা 'প্রোটন' কণিকা এবং তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে। সুতরাং কুরআন-এর দাবী অনুযায়ী বস্তু এবং বস্তুর ভিত্তি আল্লাহর 'নূর' থেকেই যে সৃষ্ট তা আবারও প্রমাণিত হল জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে। আশ্চর্য বিষয় নয় কী?
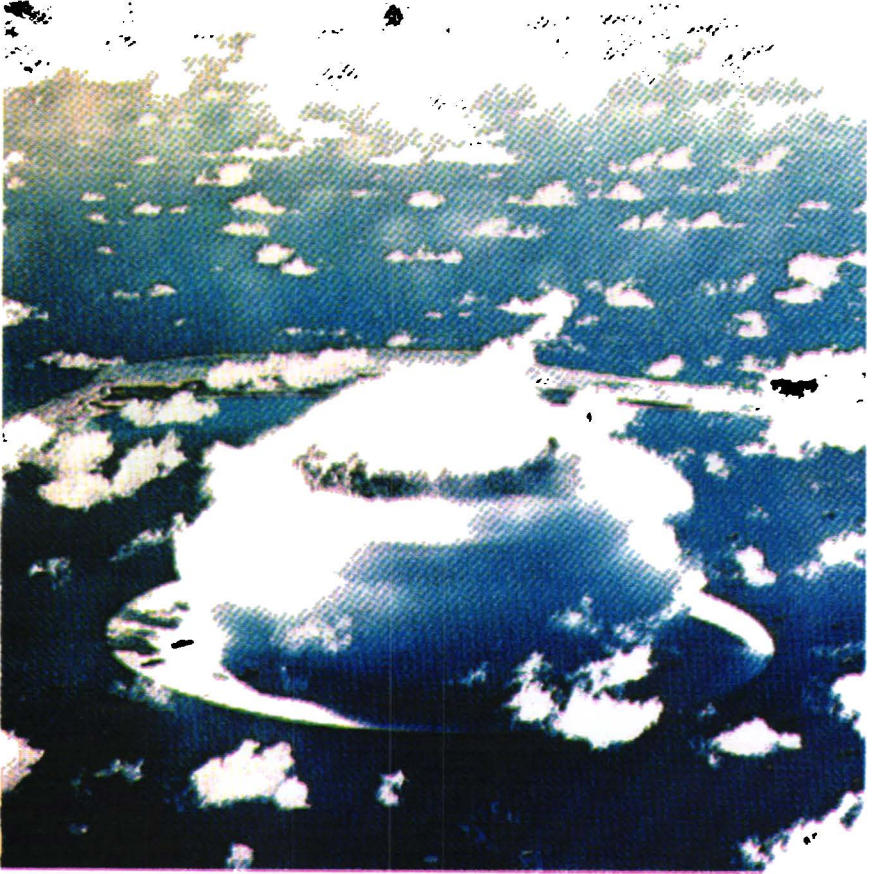
চিত্র -২০৫

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

-- ওপরের ছবিটি বিকিনী দ্বীপে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ। আমাদের পৃথিবী নামক এ গ্রহে ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই আমেকিরার নিউ মেক্সিকোর আলমাগোরডো-তে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। ১৯০৭ সালে বিজ্ঞানী 'Max Plank' সর্বপ্রথম ধারণা করেছিলেন যে 'এ্যাটমিক নিউক্লি'-র অভ্যন্তরে ব্যাপক তাপশক্তি আবদ্ধবস্থায় সঞ্চিত রয়েছে। কিন্তু তখন তাঁর এ ধারনা বিজ্ঞান বিশ্বে তেমন গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান বিশ্ব ক্রমে যতই পরমানুর গঠন সম্পর্কে অবহিত হতে থাকলো ততই একের পর এক অচিন্তনীয় রহস্য আবরণমুক্ত হয়ে মানবজাতির সম্মুখে ধরা দিতে লাগলো।
পারমনাবিক বিস্ফোরণে ইউরোনিয়াম নিউক্লিয়াস ভেংগে একাধিক তুলনামূলক ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে রূপান্তর ঘটলেও বিক্রিয়ায় নতুন পদার্থের সৃষ্টিতে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার সংখ্যায় পূর্বাপর কোন কমতি ঘটে না ঠিকই তবে ওদের ভিত্তিতে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয়তা বন্ধনমুক্ত হয়ে তাপশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।
আল্লাহর 'নূর'-এর উজ্জ্বল এ নিদর্শন (Sign) মানুষ কিভাবে অস্বীকার করতে পারে?
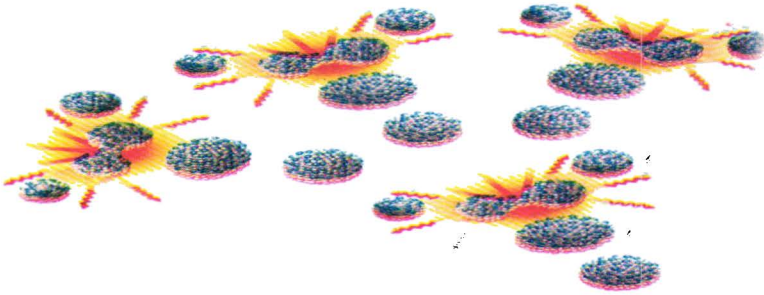
চিত্র -২০৬

"মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই, কিন্তু কেবলমাত্র (প্রকৃত) জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)

-- আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পরিকল্পিত ও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তব নিদর্শন মানব জাতিকে প্রদর্শনের নিমিত্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে তিনিই বিষয়টিকে মানব মস্তিষ্কে ও মনে জাগ্রত করে দিয়ে অদৃশ্য থেকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের ছদ্মাবরণে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া ছাড়া মানুষ নিজ ইচ্ছায় কিছুই লাভ করতে পারে না।

ছবিতে আমেরিকার আলামোগারডো-তে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ এবং ঐ বিস্ফোরণের মূল উপাদান ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর Chain reaction দেখানো হয়েছে। ছবিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ইউরেনিয়াম-২৩৫ একটি নিউট্রন কণিকা ধারণ করে ইউরেনিয়াম-২৩৬ অস্থির (unstable) নিউক্লিয়াসে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ভয়ংকর রূপ নিয়ে (viotently) দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পৃথক হয়ে যাওয়া নিউট্রন কণিকার ভিত্তিতে ধারণ করা তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) মুক্তি পেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বড় ইমারত বা গাছ উপড়ে ফেললে যেমন ভিত্তি বা Foundation ও শিকড় প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে যদিও পূর্বে মাটির নীচে অপ্রকাশ্যভাবে গোনীয় ছিল। ঠিক তেমনি এ ক্ষেত্রেও মহাসূক্ষ্ম আলোর কণা 'ফোটন' দিয়ে নিউক্লিয়াসের উপাদান প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার ভিত্তি রচিত বিধায় আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ছবিতে ইউরেনিয়াম-২৩৬ নিউক্লিয়াস পারমাণবিক বিক্রিয়ায় দু'টুকরো হয়ে এক ভাগ 'Bromine-85' ও অপরভাগ 'Lanthanum-148' দু'টি নতুন পদার্থরূপে আবির্ভূত হয়েছে। একই সাথে আলাদা তিনটি 'নিউট্রন' কণিকাও পৃথক হয়ে চেইন রিয়েকশান (Chain reaction) ঘটানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এভাবে একই পদ্ধতিতে সময়ের খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থাৎ মূহুর্তেই কোটি কোটি পারমাণবিক বিক্রিয়ার যোগ ফল-ই হচ্ছে একটি 'পারমাণবিক বিস্ফোরণ'।

ওপরে বর্ণিত এত বড় একটি পারমাণবিক বিক্রিয়ার ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বের প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা বিক্রিয়ার পরের একাধিক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এবং পৃথক হয়ে যাওয়া নিউট্রন কণিকার সংখ্যাতে কোন পার্থক্য নেই। বিক্রিয়ায় পূর্বের ২৩৬টি প্রোটন-নিউট্রন বিক্রিয়ার পরেও মোট ২৩৬টি অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। তাহলে নির্গত তাপশক্তি (Radiation) আসলো কোথা থেকে? এসেছে পৃথক হয়ে যাওয়া ৩টি নিউট্রন কণিকার ভিত্তি থেকে।

অতএব প্রমাণিত হচ্ছে- মূলতঃ আল্লাহর নূর থেকেই সমগ্র মহাবিশ্ব এবং সমস্ত বস্তু কণিকা ও তাদের ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের উজ্জ্বল পরিবেশে বিষয়টি এখন আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সত্য নয় কী?
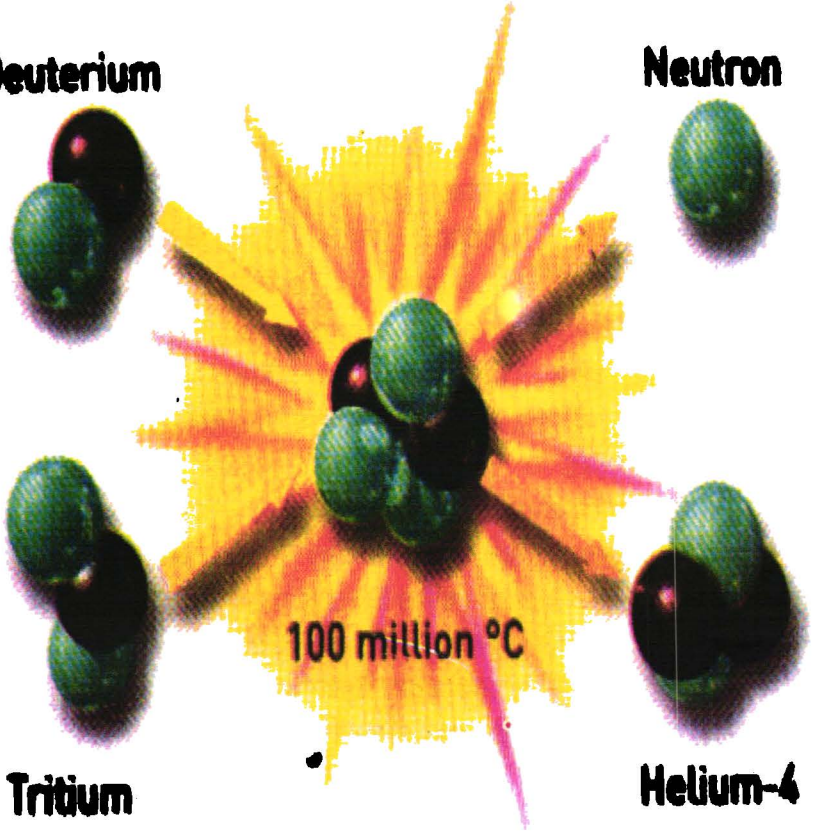
চিত্র -২০৭

"আর বল, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর-ই, তিনি তোমাদিগকে সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন; তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে (একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয় 'নূর' থেকে এ মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা)।" (২৭ ঃ ৯৩)

-- ওপরের ছবিটি প্রকাশ করেছে অতি সম্প্রতি মার্কিন 'Fusion researcher team-ITER (The International Thermonuclear Experimental Reactor)'। এ দলের বিজ্ঞানীগণ প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে দশতলা ভবন সমান প্রজেক্ট নির্মান করেছেন, যেখানে Fusion পদ্ধতিতে 'ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াসের সাথে ট্রিটিয়াম (Tritium) নিউক্লিয়াস'-এর বিগলন ঘটিয়ে প্রায় সূর্যের ভেতর উৎপন্ন শক্তির সমান (100 million° c) তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) সৃষ্টি করা যাবে। তাদের প্রকাশিত 'Fusion' ছবিতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে ২টি প্রোটন ও ৩টি নিউট্রন ঠিকই থাকছে। অথচ দুটি নিউক্লিয়াসের বিগলনে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপীয়শক্তি নির্গত হচ্ছে। এত তাপ এলো কোথা থেকে? উত্তর একটাই- পৃথক হয়ে যাওয়া নিউট্রন কণিকার ভিত্তি থেকে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) মুক্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় উক্ত তাপশক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। সুতরাং সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে 'আল্লাহ্' বিজ্ঞানের নামে মানব সম্প্রদায়ের দ্বারা-ই তাঁদের সম্মুখে কুরআনের বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহ একটি একটি প্রমাণিত করে চলেছেন। যাতে করে এ সকল দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে মানবজাতি এক আল্লাহ্‌কে স্বীকারে করে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

Energetic Photon কণিকার কারণে পৃথিবীর বেলায় ঐ এলাকায় সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। আর সূর্যের বেলায় ওর ভেতর প্রচন্ড তাপশক্তির উদ্ভব ঘটাচ্ছে।

সুতরাং, 'কুরআন এবং 'বিজ্ঞানের' নব আবিষ্কারের মাধ্যমে যে তথ্য আমরা বাস্তবতার আলোকে প্রাপ্ত হয়েছি তার ওপর নির্ভর করে বলা যায় পদার্থের 'পরমাণু' ভাংগার কারণে ওদের 'ভিত্তি' বা Foundationও ভেংগে গিয়ে প্রচন্ড তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হচ্ছে এবং 'ভিত্তি' বা Foundationও পদার্থ কণা-র ন্যায় 'নূর' বা 'আলো' (Radiation) থেকেই মূলতঃ সৃষ্টি বলে নির্গত শক্তি 'তেজস্ক্রিয়তার' (Radiation) রূপ নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টার এ এক অবিশ্বাস্য মহাবিস্ময়কর কীর্তি-ই বলা চলে। এতে কুরআনের দাবী "আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব)" (২৪ ঃ ৩৫)। সে দাবী আবারও দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত হল।

ওপরে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান' এর বক্তব্য একই দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপিত হওয়ায় (যদিও উভয়ের মাঝে ব্যবধান প্রায় ১৪০০ বৎসর) প্রমাণ হচ্ছে- 'আল্-কুরআন' সত্য-সঠিক ও এক অনন্য ঐশী গ্রন্থ, যা সকল যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতাকে একত্রিত করে বুকে ধারণ করে আছে। সাথে সাথে আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্-কুরআনের রচয়িতা মহান স্রষ্টা, এক ও একক প্রতিপালক মহান 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন'ও অনস্বীকার্যরূপে স্বমহিমায় ও স্বগৌরবে বিরাজমান আছেন। এ এক মহাসত্য বিষয়। তিনি বাস্তবে আছেন বিধায় একটি দীর্ঘ সময় পূর্বেই তিনি 'কুরআনে' তা সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আর এর-ই প্রেক্ষাপটে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় আল্লাহ্ তাআলা এই একক বিস্ময়কর ঐশীগ্রন্থ যে মহামানবের ওপর অবতীর্ণ করেছিলেন তিনিও শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল ছিলেন। "এইগুলি জ্ঞানগর্ভে গ্রন্থের নিদর্শন" (১০ ঃ ১)

"এইগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য" (৩১ ঃ ৩৪)

জ্ঞানের আঙ্গিনায় দাড়িয়ে নিরপেক্ষ ও সঠিক জ্ঞানের মাপকাঠিতে এই বিষয়গুলো মেনে নেয়া জ্ঞানীজনের জন্যই শুধু সম্ভব, যা তাদের এই পার্থিব

জীবন ও পরকালীন জীবনকে করবে আলোঝলমল, সুন্দর, সাফল্যময় ও কল্যাণকর।

এবার পুরো আলোচনাকে আমরা এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অযথা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।" (৪৪ ঃ ৩৮) "আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং উহাদিগের উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাহাই। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দূর্ভোগ।" (৩৮ ঃ ২৭)	(১) পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব জ্ঞানের সকল দিক, বিভাগ ও পর্যায়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে অসংখ্য নিগুঢ় 'তথ্য ও তত্ত্ব' উদ্‌ঘাটন সম্ভব করে তোলায় তা সার্বিক বিবেচনায় প্রমাণিত হয়েছে- মহাবিশ্বের মাঝে কোন একটি বস্তুও অযথা বা অহেতুক সৃষ্টি হয়নি। প্রতিটি বস্তু এবং বিষয়ের সৃষ্টির পেছনে যেমনি আছে সুশৃংখল ধারাবাহিক ইতিহাস তেমনি প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের জন্য আছে নির্ধারিত কোন না কোন কাজ। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মহাসূক্ষ্ম উপ-আণবিক কণিকা থেকে শুরু করে বৃহৎ-বৃহৎ ঐ গ্যালাক্সী পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ই সৃষ্টি হয়েছে এক মহাপরিকল্পনার আলোকে, কোন না কোন কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে, যার কিছু কিছু আমরা অনুধাবন করতে পারি এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অনুধাবন করতে পারি না। তবে

	সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীজন বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রভাবে বিষয়টি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি উপলব্ধি করে থাকে।
(২) "মানুষ সৃজন অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সৃষ্টিতো কঠিনতর কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।" (৪০ ঃ ৫৭) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) যাহাকিছু আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।" (১০ ঃ ১০১) "আল্লাহ্ তাআলার মহা-নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) তাঁহারই 'আমর' দ্বারা (নির্দেশের মাধ্যমে মহাশূণ্যে ভাসমান অবস্থায়) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।" (৩০ ঃ ২৫)	(২) বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান মানবদেহের সার্বিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে গিয়ে 'জিন মানচিত্র' আবিষ্কারের মাধ্যমে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে মানবদেহ কোষে ডিএনএ (DNA)-এর ৪টি উপাদান (এ, টি, সি, জি) বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে প্রায় এক লক্ষ 'জিন' সৃষ্টি করেছে, যে 'জিন'গুলো মানবদেহের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। একটি জীবকোষে এই জিন মানচিত্র প্রায় ৩০০ কোটি তথ্য সংকেত ধারণ করে থাকে। প্রায় ৩.১২ বিলিয়ন রাসায়ণিক সংকেত বা বেইস পেয়ার একত্রিত হয়ে DNA Double Helix তৈরী করে। প্রতিটি বেইস পেয়ারে থাকে ঐ ৪টি উপাদান, যথা, এডিনিন, থায়োমিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন। এতকিছুর পরও লক্ষ-কোটি কোটি কোটি গুণে ও বৈশিষ্ট্যে এবং মহাজ্ঞানে সমৃদ্ধ মহাবিশ্বটির তুলনায় মানবদেহ একেবারেই

“অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষন শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।” (১৫ ঃ ৭৫)	নগণ্য ও তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। মহাবিশ্বের জ্ঞানের সমাহারকে যদি সাগর ভাবা যায় তাহলে শুধু মানুষ ও তার সৃষ্টি এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড সেই সাগর পাড়ে একটি বালি কণার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচিত হতে পারে না। যুগে যুগে বড় বড় বিজ্ঞানীগণ তা স্বীকার করে গেছেন। বিষয়টি সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে হলে অবশ্যই পূর্বে বিজ্ঞানের সকল প্রকার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে তৈরী করে নিতে হবে।
(৩) “তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন?” (২৯ ঃ ১৯) “বল, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর আল্লাহ্ কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।” (২৯ ঃ ২০)	(৩) প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকেই (প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকেই) এই পৃথিবীতে মানব সমাজের জ্ঞানীজন সমগ্র বিশ্বজাহানের উৎস, সৃষ্টি, অস্তিত্ব এবং এর ‘বিল্ডিং ব্লক’রূপী মৌলিক মহাসূক্ষ্ম কণিকার সন্ধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা কার্য চালাতে শুরু করে। এ যাত্রা পথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ‘তথ্য ও তত্ত্ব’ আবিস্কৃত হওয়ায় মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান, মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পর্যায়সমূহ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই মানুষ অবগত হতে সক্ষম হয়। যেমনঃ

"আল্লাহর 'নূর'-এ উদ্ভাসিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব)।" (২৪ ঃ ৩৫)

"অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি) মিশিয়াছিল ওতপ্রোতভাবে? অতঃপর আমি (প্রচণ্ড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে) উহাদের পৃথক করিয়া দিলাম।"
(২১ ঃ ৩০)

"আলোর উপর আলো।"
(২৪ ঃ ৩৫)

১৯৬৪ সালে সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'Big Bang' প্রস্তাব প্রমাণিত হয়েছে। যে প্রস্তাবে উল্লেখিত হয়েছে- কল্পনাতীত বিশাল আলোক শক্তির একটি উৎস থেকে বিরাট একটি অংশ 'ঘনায়ন' পদ্ধতিতে সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় 10^{-33}cm. মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে পৌছার পর প্রচণ্ড চাপ ও তাপে বিন্দুটি বিষ্ফোরিত হয়ে মহা-সম্প্রসারণ লাভ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান মহাবিশ্বের রূপ ধারণ করেছে।

মহাবিষ্ফোরণের (Big Bang) পরক্ষণে শক্তির আঁধারটি অগ্নিগোলক (Fireball) রূপে বর্ধিত হতে থাকে। ফলে আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রাও হ্রাস পেতে থাকে। বিষ্ফোরণ মুহূর্তে তাপমাত্রা ছিল 10^{32}k. এ সময় মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও শক্তি 'আলোক শক্তি' (Radiant Energy) রূপেই একত্রে মিশে ছিল। পরবর্তীতে আয়তন বৃদ্ধির সাথে সমানুপাতিক হারে তাপমাত্রা কমতে থাকলে এক এক পর্যায়ে এক এক ধরণের মহাসূক্ষ্ম বস্তু-কণিকা সৃষ্টি হয়ে বস্তুর আকৃতি

"তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।" (১৫ ঃ ৮৬) "সকল ক্ষমতা আল্লাহর-ই জন্য রহিয়াছে।" (১৩ ঃ ৩১)	ধারণ করে দৃশ্য ও অদৃশ্যযোগ্য বর্তমান মহাবিশ্বে রূপ নেয়। এতে করে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকে চেষ্টা-সাধনা করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং এর অস্তিত্ব গঠন সম্পর্কে প্রথমে ভাবতে গিয়ে মানব সম্প্রদায় দেখতে পেল আদিতে 'আলোক শক্তি' (Radiant Energy) থেকেই একটি ধারাবাহিক পদ্ধতিতে প্রথমে বিস্ফোরণ ও পরবর্তীতে মহাসূক্ষ্ম মৌলিক বস্তু কণিকার আবির্ভাবের ভেতর দিয়ে এ মহাবিশ্ব অস্তিত্ব ধারণ করেছে। 10^{32}k. তাপীয় অবস্থা থেকে নিম্নগামী তাপমাত্রার এক একটি স্তরে এক এক ধরনের বস্তুব আবির্ভাব এবং বর্তমান সময়ে নাম মাত্র 2.73k. তাপমাত্রার যৎসামান্য উত্তাপসম্পন্ন অবস্থায় আমাদের আবাসযোগ্যতা নিশ্চিত হওয়া পরিবেশে ওপরের দিকে তাকালে এ মহাবিশ্ব যে প্রকৃতপক্ষেই 'আলোর ওপর আলো'-র একক খেলা তা প্রতিভাত হবে।
(৪) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন, আর উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন অন্ধকার ও আলোর।" (৬ ঃ ১)	(৪) বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন- আমাদের এই মহাবিশ্বটি সৃষ্টির ব্যাপারে 'একটি

"তিনি সূর্যকে করিয়াছেন তেজস্কর ও চন্দ্রকে করিয়াছেন জ্যোতির্ময়।" (১০ ঃ ৫)	নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ধারবাহিকতা' ক্রমান্বয়ে সুষ্ঠুভাবে ও সুসামঞ্জস্যের সাথে এগিয়ে গিয়ে প্রায় ১৫০০ কোটি বছরের প্রান্তে এসে বর্তমান আকৃতি ও রূপ ধারণ করেছে। আবার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পর মহাশূণ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে টিকে থেকে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ভিন্ন ধারার ওপর নির্ভরশীল হয়েছে।
"তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে।" (১৪ ঃ ৩৩)	যেমন- 'Big Bang' মহাবিষ্ফোরণ পরবর্তী নিম্নগামী তাপমাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট পদার্থ কণিকা দিয়ে (এক পর্যায়ে) আমাদের সৌরজগত অস্তিত্ব ধারণ করেছে। কিন্তু এই সৌরজগতকে এবং এর আয়ত্বাধীন জীবনময় জগতগুলোকে প্রাণবন্ত ও প্রাণচাঞ্চল্য রাখার জন্য সৌর জগতের কেন্দ্রে 'নক্ষত্র' বা 'সূর্য' সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণময় জগতগুলোর সজীবতা ও আবাসযোগ্যতাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই সূর্য এবং উপগ্রহ চন্দ্রের ওপর-ই নির্ভরশীল। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের বিপর্যয়ের অর্থই হচ্ছে- এদের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবনময় জগতগুলোর সর্বনাশ ঘটে যাওয়া। অপরদিকে সূর্য ও চন্দ্রের আলো

	সৌর জগতের গ্রহ ও উপগ্রহদের মাঝে আলো-অন্ধকারের পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় রেখে চলেছে। বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি উল্লেখিত সত্য তথ্য সরবরাহ করে মানব জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।
(৫) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বের) সর্বভৌমত্ব আল্লাহর-ই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন।" (৪২ : ৪৯) "আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।" (২৯ : ৪৪)	(৫) বিজ্ঞানের বর্তমান সিদ্ধান্ত হচ্ছে- এই মহাবিশ্বটি বোধগম্য সময় 10^{-43}Sec. ও আয়তন 10^{-33}cm. থেকে মহাসম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু করে প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসর পাড়ি দিয়ে বর্তমানে যে আয়তন লাভ করেছে তারও একটা মাপ-ঝোপ অনুমান করা যায়। আর তা হচ্ছে- বর্তমান মহাবিশ্বটি বর্ধিত হয়ে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব এই সীমানার চতুর্দিকেই প্রান্তে মহাবিশ্বের একটি পরিবেষ্টনী অবশ্যই রয়েছে, যা মহাবিশ্বটির প্রান্তকে একটি সুষমপন্থায় নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি এবং এর ভেতর সকল প্রকার বস্তু ও শক্তি এবং জ্ঞানের প্রতিটি পর্যায়ে জ্ঞানের পরম, প্রচণ্ড শক্তিক্ষমতার অবিশ্বাস্য প্রভাব, প্রতিটি বিষয়েরই

"আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫) "তিনিই-তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি-ই সবিশেষ অবহিত।" (৬ ঃ ১০১) "অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত, আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।" (৬ ঃ ৭৩)	পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতা ও সযোগিতা, আলোর গতিতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়সহ অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যেগুলো মানবীয় কল্পনা ও শক্তি-ক্ষমতায় সম্পাদনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব ব্যাপার। উল্লেখিত নিদর্শনাবলী প্রকতৃপক্ষেই সর্বদা মানব সমাজকে এক উচ্চতর জ্ঞানের পথে পরিচালিত করছে। আর দৃশ্য-অদৃশ্য এই সকল জ্ঞানের পেছনে একটি মহান 'উৎস' যে সর্বদা সক্রিয় রয়েছে, বর্তমান বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর 'তথ্য ও প্রমাণের' কারণে এখন আর তা অস্বীকার করছে না। সমগ্র বিজ্ঞান বিশ্বই এখন নিরেট বাস্তবতার কারণে 'কার্য কারণের' প্রতি অধিকতর ঝুঁকে পড়েছে। না পড়েই বা উপায় কী? সকল প্রকার কার্যের কারণ খুঁজতে গিয়েই তো আবিষ্কারের পাহাড় তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।
(৬) "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।" (৬ ঃ ৬৭)	(৬) ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞান জগতে ব্যাপক আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের জোয়ারের সূচনা ঘটে। ফলে মহাবিশ্বের অগণিত

"মানুষ ত্বরাপ্রবণ সৃষ্টিগতভাবে, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শন দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।" (২১ ঃ ৩৭)	গোপন বিষয়ের আবরণ উন্মুক্ত হয়ে সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রদায়ের নিকট ধরা দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আবিষ্কারের তুলনায় পরবর্তী আবিষ্কারসমূহ উচ্চতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং তথ্যবহুল। এতে প্রমাণিত হয়েছে মানব জ্ঞানের উন্নতির সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করেই ক্রমান্বয়ে অধিক জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে এবং এই অদৃশ্য ধারাবাহিকতার ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে মানুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উচ্চতর কোন এক 'স্থান' থেকেই যেন সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মানুষতো এতই অসহায় যে কি বিষয় আবিস্কৃত হবে এবং কখন হবে এর কোন কিছুই পূর্বে নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। সুতরাং আবিষ্কারের মৌলিক কোন দিক-ই মানুষের হাতে নেই, আছে অন্যত্র কোথাও।
(৭) "মানুষের (বুঝার) জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিয়া থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)	(৭) আমাদের এই মহাবিশ্বটি মূলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানের এক বিশাল সমাহার। যারা জ্ঞানবান তারা জ্ঞানের প্রতিটি শাখার অগ্রগতি ও সাফল্য নিয়ে সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন এবং সর্বত্রই বিপুল জ্ঞানের সমারোহ ও

“(সমস্ত) অদৃশ্য সম্পর্কে (পরিপূর্ণরূপে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে অবহিত করিবার নহেন, তবে আল্লাহ্ তাঁহার রাসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, সুতরাং তোমরা ‘আল্লাহ্’ ও তাঁহার রাসুলদিগের উপর ঈমান আন।”

(৩ ঃ ১৭৯)

“নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃশ্য-অদৃশ্যজগত সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে) উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।” (৮৪ ঃ ১৯)

অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপ দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেন, যা সাধারন মানুষের জীবনে এরূপ ঘটে না।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে, মহাবিশ্বে আবিস্কৃত অদৃশ্য বিষয়সমূহের ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির যে ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে. তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে- মানুষ তার সংক্ষিপ্ত হায়াত এবং সীমিত জ্ঞান দিয়ে মহাবিশ্বের সকল প্রকার গোপন রহস্যের ওপর থেকে আবরণ সরাতে সক্ষম হবে না। ইতোমধ্যে বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীগণের মুখ থেকেই সে কথার স্বীকৃতি মিলেছে। তবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সাথে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কারণে ধাপে-ধাপে জ্ঞানের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে অনেক বিষয়ে অনেক কিছুই তারা অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। ইতোমধ্যেই আবিস্কৃত ও উদ্‌ঘাটিত বিষয়গুলোর ওপর গভীর মনোনিবেশের কারণে বিজ্ঞানীগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

(৮) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বেব্যাপী) গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪৫ ঃ ৩৭) "তিনিই ইলাহ্ নভোমন্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূ-মন্ডলে এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।" (৪৩ ঃ ৮৪) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) সার্বভৌমত্ত্ব আল্লাহ্‌র-ই।" (৪৫ ঃ ২৭)	(৮) বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে সুনামধন্য বিজ্ঞানীগণের অবস্থা হচ্ছে- 'জয় জয়কার'। সর্বত্র-ই কেবল তাদের নামে ঘোষিত হচ্ছে 'নোবেল' পুরস্কার। শত-সহস্র পুস্তকে লিখিত হচ্ছে তাদের গুণগান। এই মহাবিশ্বে পূর্বেই সৃজিত বস্তু বা বিষয়কে মাত্র আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটন করে যদি এই বিজ্ঞানী সমাজ কথিত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন, তাহলে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর ভেতর যত প্রকার বস্তু, শক্তি ও বিষয় আছে, সেই সমস্ত যিনি সৃষ্টি করেছেন নিজ মহাজ্ঞানে, প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে, তাঁকে বিজ্ঞান যেদিন সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিছক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে মেনে নিবে, সেই দিন সমগ্র মহাবিশ্বের সাথে এই পৃথিবী নামক বিশ্বেও একচ্ছত্রভাবে তাঁর গৌরব-গরিমা অবশ্যই মুখরিত হয়ে উঠবে। বাস্তবে 'বিজ্ঞান' কিন্তু পা-পা করে এগুচ্ছেও সেই কাঙ্খিত শুভ মুহূর্তের দিকে। বিজ্ঞ বিজ্ঞানী সমাজ বিষয়টি ঠিক-ই টের পাচ্ছেন বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে।

সমাপ্তি কথা

হঠাৎ করেই বিগত বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি করে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের রহস্য উন্মোচনে সফলতা বয়ে আনতে শুরু করলে স্বল্প জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানব সমাজের গুনীজন আনন্দে, আবেগে আপ্লুত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে উঠে-পড়ে লেগে যায়। তারা ভাবতে এবং বলতে শুরু করেন যে, অন্ততঃ এই মহাবিশ্বে একজন স্রষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। তারা সমগ্র মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' সহ সব কিছুই জেনে ফেলেছেন এবং মহাবিশ্বটি দূর্ঘটনা কবলিত পরিস্থিতিতে অগ্রসর হয়ে বিশৃংখলার ভেতর থেকেই এলোমেলো ভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। সুতরাং আর যায় কোথায়? বিশৃংখলায় জন্ম নেয়া মহাবিশ্বে উশৃংখল মানবসমাজ যে যার ইচ্ছেমত সকল ব্যাপারেই নিজস্ব মতামত ও থিউরী গড়ে তোলার কাজে এবং বীর দর্পে তা প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পরিস্থিতি এতই নাটকীয়তায় মোড় নেয় যে এই সুন্দর পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এক লম্ফে নাস্তিকদের পাল্লা আস্তিকদের পাল্লার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ভারী হয়ে পড়ে। নাস্তিকতার প্রচন্ড প্রতাপে শিক্ষিত সমাজের প্রায় সিংহ ভাগই সেদিকে কম-বেশী ঝুঁকে যায়। সমাজের সাধারণ গণ-মানুষের কল্পনার রাজ্যে একথা স্থান করে নিতে শুরু করে যে, 'স্রষ্টা' এবং 'ধর্ম' মানুষের তৈরী কল্পনাপ্রসুত একটি 'বন্ধন' মাত্র। যা এহেন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে একেবারে মূল্যহীন।

এ ধরনের এক বিষন্নময় পরিস্থিতির মাঝেও ব্যাপক জ্ঞানে সমৃদ্ধ সুশীল ও চিন্তাশীল সমাজের হাতে গোনা যে কয়জন গড্ডালিকা প্রবাহের বিপরীতে মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিটি নতুন আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনকে খুবই সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা শেষে নিরেট সত্যতার মাপকাঠিতে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করছিলেন, তাদেরই একজন হচ্ছেন- বিখ্যাত আমেরিকান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 'অলিভার ওয়েনডেল' তিনি এই ব্যাপারটির মূল বার্তাকে গভীর জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরে, এক সময় বলেছিলেন– 'জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রুকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সাথে বুঝতে পারলে দেখা

যাবে, সর্বশক্তিমানে (স্রষ্টায়) বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে, আর সে ক্ষেত্রে এটাই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে বিজ্ঞান যথার্থই ঈমানের দাবীদার। যদিও স্বল্প ও হাল্‌কা জ্ঞানে সমৃদ্ধ অবিশ্বাসী সমাজ তা বুঝে উঠতে পারে না। এই না পারাটা মূলতঃই তাদের নিজস্ব ত্রুটি এবং দূর্বলতা মাত্র এবং এটা তাদের জন্য দূর্ভাগ্য ও বটে।

সুধী পাঠক! অবিশ্বাসী সমাজের জ্ঞানী বন্ধুদের নিজস্ব ত্রুটি ও দূর্বলতা এবং সর্বোপরি তাদের দূভাগ্য বলাটা অবশ্যই যুক্তিসম্মত পন্থায় পর্যালোচনার দাবী রাখে। আর সেজন্য আমি একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করে প্রমাণ পাই যে, অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপিত বক্তব্যটি পুরোপুরি সত্যতায় মন্ডিত। এখন পর্যায়ক্রমে তা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কারে অতি বিজ্ঞান প্রিয়দের যারা বিভ্রান্ত হয়ে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব নিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলেছেন, তারা যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নগন্য বাচ্চা শিশুদের তুলনায় বেশি অজ্ঞতার নজির স্থাপন করেন, তা প্রমাণ করার জন্য দুটি ছবি, একটি টেলিফোন সেট ও একটি টেলিভিশন সেট বেছে নেই। এই প্রকল্প সম্পাদনের নিমিত্তে ডজন খানেক ছোট সোনা-মনিদের উপস্থিত করি। প্রথমে নীচের ছবিটি মেলে ধরি এবং জিজ্ঞাসা করি-'ছবিটিতে কি জিনিষ প্রকাশ পাচ্ছে? সবাই আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে একযোগে বলে দিল- 'ছবিটি একটি গাড়ীর চাকার চিহ্ন যুক্ত ছবি'। আমি এবার আবার প্রশ্ন করি 'এখানে ছবিতে গাড়ীর কোন ছবি নেই তাহলে তোমরা বুঝলে কিভাবে?' এই প্রশ্ন রাখতে রাখতে সবাই একযোগে উত্তর দিল–'গাড়ীর চাকার নিদর্শন (চিহ্ন) দেখেই আমরা বুঝে গেছি যে গাড়ীটি– ছবিতে দৃশ্যমান না থাকলেও ঐ 'চাকার চিহ্নের' কার্যের জন্য 'কারণ' হিসেবে অবশ্যই একটি গাড়ী জড়িত রয়েছে। আমি ছোট শিশুদের বিবেকের সঠিক রায়ের দৃষ্টান্ত দেখে যারপরনাই অভিভুত হয়ে যাই।

এরপর তাদের সম্মুখে নীচের দ্বিতীয় ছবিটি বের করে দেই এবং জিজ্ঞাসা করি–'ছবিটিতে কিসের ছায়া দেখা যাচ্ছে?' শিশুরা ছবিটির দিকে একবার

চিত্র -২০৮

"যাহারা আল্লাহর নিদর্শন (Sign)কে (দেখিতে পাইয়াও অজ্ঞ মূর্খদের ন্যায়) প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে (আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা)।" (৩ ঃ ৪)

-- ওপরের ছবিটিতে ভূমিতে চিহ্ন সৃষ্টিকারী যান্ত্রিক বস্তুটিকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যন্ত্রদানবটি যে চিহ্ন (Sign) অঙ্কিত করে গেছে, তাতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এমনকি একটি ছোট্ট শিশুও বুঝতে পারে- অঙ্কিত চিহ্নের জন্য একটি যন্ত্রদানব-ই দায়ী, যদিও ঐ বস্তুটি ছবিতে উপস্থিত নেই। আছে অদৃশ্যে কোথাও। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে এ জাতিয় অসংখ্য চিহ্ন বা নিদর্শন (Sign) দেখে দেখে তারপর ভেবে ভেবে বাস্তবতার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এবং পরিশেষে মহাবিশ্বে তাঁর বাস্তব উপস্থিতির অসংখ্য নিদর্শন (Sign) দেখে তাঁর অদৃশ্যবস্থাকে মেনে নেয়ার জন্য জ্ঞানপূর্ণ কত কিছুরই না অবতারণা করেছেন। দুঃখনজক হলেও সত্য যে, সৃষ্টির সেরা মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে মহাবিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য জ্ঞানময় নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পরও অজ্ঞ মানুষের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করেই এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের জ্ঞানীদের এ আচরণ কি কখনও শোভনীয় হতে পারে? বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে স্বীকার করা হচ্ছে, কিন্তু একই বিষয়ে অগ্রিম কুরআনের দাবীকে অমান্য করা হচ্ছে কেন? এরই প্রেক্ষাপটে মহাসত্যকে উপেক্ষা করে কল্যাণ লাভের আশা করা চরম বোকামী নয় কী?

তাকিয়ে বলে দিল–'এখানে কয়েকজন মানুষের 'ছায়া-র ছবি তোলা আছে'। প্রশ্ন করলাম- 'এখানে তো কোন মানুষের কোন ছবি দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কিভাবে বুঝতে পারলে যে এই ছায়াগুলো কোন মানুষের'? ওরা উত্তরে জানালো–'ছবিতে মানুষকে দেখা যাচ্ছে না ঠিক-ই, তবে ছায়াতে যে নিদর্শন (চিহ্ন) ফুটে উঠেছে তাতে কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান একে মানুষের 'ছায়া' বলেই সায় দিচ্ছে'। আমি হতবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, ছোট শিশুর বিবেকও 'নিদর্শন' দেখেই অদৃশ্য 'সত্ত্বাকে' সনাক্ত করার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভূল করে না।

শিশুদের জ্ঞানের উল্লেখিত বাস্তবতাকে আরও একটু যাচাই করার জন্য এবার তাদের সম্মুখে একটি টেলিফোন সেটের রিসিভার হাতে নিয়ে আমার পরিচিত এক বন্ধুকে রিং করি। বন্ধুটি রিং পেয়েই টেলিফোনে আমার সাথে আলাপ চারিতা জমিয়ে বসে। আমি কথোপকথনের এক ফাঁকে শিশুদের দিকে তাকিয়ে দেখে নিই। দেখি ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, একটু পরে আমি কথা শেষ করে টেলিফোন রেখে দেই এবং শিশুদের জিজ্ঞাসা করি–' আচ্ছা বলতো এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কি করছিলাম'? ওরা সবাই উত্তর দিল-'আপনি আপনার এক বন্ধুর সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন'। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি–'তোমরা কি আমার বন্ধুটিকে দেখ্তে পেয়েছ'? ওরা বললো–' আপনার বন্ধুটিকে আমরা দেখিনি ঠিকই, তবে আপনাদের কথোপকথনে কিছু 'নিদর্শন' ফুটে উঠে, তাতে আমরা নিশ্চিত হই যে, লোকটি আপনার অবশ্যই বন্ধু হবে'। এতে আমি আনন্দে আত্বহারা হয়ে ওদের বাহ্বা জানালাম। ছোট শিশুরাও যে কোন কার্যের জন্য 'কারন' খুঁজে নিতে এবং ঐ 'কারণ'-কে 'সনাক্ত' করতেও পূর্নমাত্রায় সক্ষম। কি অদ্ভুদ এই 'জ্ঞান'-এর রাজ্য।

এবার আরও একটু ভালোভাবে যাচাই করার জন্য একটি রঙিন 'টিলিভিশন সেট' ওদের সম্মুখে এনে তা 'On' করে দেই। সাথে সাথে পর্দায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান ভেসে উঠে। শিশুরা মনভরে অনুষ্ঠান দেখতে লেগে যায়। এক পর্যায়ে আমি ওদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করি- 'এই যে তোমরা টেলিভিশন-এর অনুষ্ঠান উপভোগ করছ, এই অনুষ্ঠান কিন্তু বাস্তবে

চিত্র -২০৯

"কেহ আল্লাহর নিদর্শন (Sign)কে (দেখিতে পাইয়াও না দেখার ভান করিয়া, বুঝিতে পারিয়াও না বুঝার ভান করিয়া) প্রত্যাখ্যান করিলে আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" (৩ ঃ ১৯)

-- ওপরের ছবিতে কতগুলো 'ছায়া' দেখেই যদি ছোট শিশুরা ঐ ছায়াগুলো মানুষের (তা না দেখেই) বলে দিতে পারে, তাহলে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী অগণিত অসংখ্য নিদর্শন (Sign) দেখে, যেগুলো কখনই কোন মানবগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়, কেন এগুলোর পেছনে এক ও একক সত্ত্বা 'আল্লাহর' কৃতিত্বকে মানবগোষ্ঠী স্বীকার করে নিচ্ছে না? মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই যে আল্লাহর 'নূর' থেকে অস্তিত্ব ধারণ করেছে, বর্তমান বিজ্ঞান এর ভূরি-ভূরি প্রমাণ পেশ করার পরও কেন আল্লাহকে মানা হচ্ছে না? মানব সমাজের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা গণনাতীত মহাসূক্ষ্ম অদৃশ্য জগতের সন্ধান পাওয়ার পর এবং সেগুলোর কঠিন নিয়ম-শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরও একজন 'কর্তা' যে এসবের পেছনে সর্বদা সক্রিয়া আছেন সে পরম সত্যটি কেন প্রত্যাখান করা হচ্ছে? দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যেখানে দৃশ্যমান জগতের প্রায় ৯৯%-এর চেয়ে বেশি মানুষ দর্শন লাভে ব্যর্থ সেখানে 'Show me God' বলাটা মস্ত বড় পাগলামী নয় কী? বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাতে এসে যাওয়ার পরও কি মানুষ এখনো অন্ধকারে হাতড়িয়ে ধ্বংসের দিকেই কেবল ধাবিত হবে?

কেউ তৈরী করেনি, এখানে কোন মানুষও জড়িত নেই। সবই এমনি এমনি নিজ থেকেই হচ্ছে, ইচ্ছেমত হচ্ছে এবং ইচ্ছেমত-ই আবার চলবে এবং বন্ধ হয়ে যাবে'। আমার এই কথাগুলো শুনে সকল শিশুরা একযোগে হা-হা করে হেসে ফেললো। তারপর বলতে লাগলো-'আপনি একটি মস্ত বড় বোকা, কোন মানুষ ছাড়া এই অনুষ্ঠান তৈরী হয় কিভাবে? এটা অযৌক্তিক। আপনি ভূল বলেছেন, বরং যে অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা একদল শিল্পী সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে তৈরী করেছেন এবং তাদের সেই যোগ্যতাও রয়েছে। আর এই অনুষ্ঠান নিজ ইচ্ছামত চলতে এবং বন্ধ হতে পারে না। সে জন্যও একজন যোগ্য পরিচালকও রয়েছেন। যিনি পরিকল্পনানুযায়ী সময় মতো তা চালু করেন এবং সময় মতো আবার তা বন্ধ করে দেন, নিজ থেকেই টেলিভিশন এই কাজটি সমাধা করার মত যোগ্যতা রাখে না'। আমি ছোট্ট এই সোনা-মনিদের বিবেকের সঠিক চিন্তা এবং সিদ্ধান্তকে কিভাবে যে বরন করে নেব তা সেই সময় বুঝে-উঠতে পারছিলাম না। শুধু হাত তুলে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট প্রার্থণা পেশ করলাম।

সুধী পাঠক! পক্ষপাতহীন ও পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতায় সমৃদ্ধ ছোট সোনা-মনিরা যদি ওপরে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়কে জ্ঞানের আবরনে মোড়ানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর পেছনে অদৃশ্য কর্তাকে খুঁজতে ও তাকে পেয়ে যেতে পারে, তাহলে সমগ্র মহাবিশ্বের পরতে পরতে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, অসংখ্য মেধাকে সর্বক্ষন নিয়োজিত করে এবং অগনিত আবিষ্কার ও উদঘাটন সম্পাদন করে ঐ সকল আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের ভিতর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্ননাতীত জ্ঞানের উৎকর্ষতার সমারোহ, সুশৃংখল নিয়ম-পদ্ধতি ও ক্রমোন্নতি, ধারা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিরাট অদৃশ্য কর্মকাণ্ড দেখে শুনে ও বুঝে নেয়ার পরও বিজ্ঞানীমহলের এবং আমাদের সমাজের জ্ঞানীদের একাংশ এর পেছনে সার্বক্ষনিক কর্মরত 'কর্তা' রূপে অদৃশ্য অথচ চরম বাস্তবতায় পরিপূর্ণ প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞান সম্পন্ন একক সত্ত্বা আল্লাহকে মেনে নিতে [illegible] কেন অনীহা প্রকাশ করছেন? এই মহাবিশ্বের ভিত্তিমূলক উপাদান- আলো, ফোটন কণা, কোয়ার্ক, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস, গ্র্যাভিটন, গ্লুওন, এবং
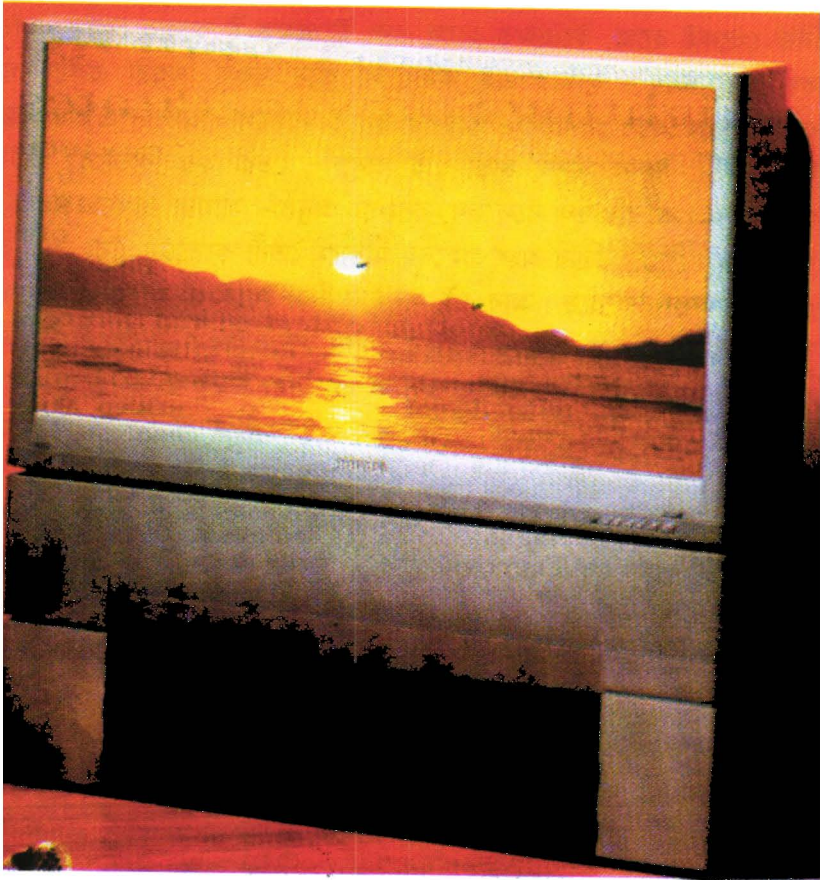
চিত্র -২১১

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদিগের জন্য রিযক; আল্লাহ অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।" (৪০ : ১৩)

-- একটি টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শিত অনুষ্ঠান দেখে যদি ছোট শিশুরাও বুঝে নিতে পারে যে, ছোট আয়োজনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিও নিজ থেকেই তৈরী হয়নি এবং নিজ থেকেই সম্প্রচারিতও হয়নি, এর পেছনে অবশ্যই একদল যোগ্য লোকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং সর্বোপরি একজন সর্বময় ক্ষমতাধর পরিচালকও রয়েছেন এবং এ বিশ্বাসে ওরা দৃঢ় থাকতে পারে, তাহলে বিশাল সীমা-পরিসীমাহীন এ মহাবিশ্ব, এর ভেতর অসংখ্য বস্তু-শক্তি ও পরিবেশের যে সমারোহ এবং বৈচিত্র নিদর্শন দেখা যাচ্ছে এ সবের পেছনে মূল 'কর্তা' যে একজন আছেন এবং তিনি হচ্ছেন মহান প্রতিপালক 'আল্লাহ' মানব সমাজের জ্ঞানীরা তা কি বুঝতে পারেন না? তারা কি ছোট শিশুর তুলনায় আরও অবুঝ হয়ে গেলেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার এবং উদঘাটিত সৃষ্টির বস্তুর উপস্থিতি চোখে আঙ্গুল রেখে দেখিয়ে দেয়ার পরও কি মুখ ফিরিয়ে নেয়া নিরাপেক্ষ মন-মানসিকতার পরিচয় বহন করে? বস্তুত: আল্লাহ যার কল্যাণ চান কেবল তার পক্ষেই প্রকৃত সত্যকে সত্য জানা এবং বিশ্বাসের দিকে অন্তরের জন্য তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। বিজ্ঞানের প্রমাণের [illegible] দিয়ে 'আল্লাহকে' [illegible] কেউ আছে কি?

চিত্র -২১০

"এবং অন্ধকেও পথে আনিতে পারিবে না উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।" (৩০ ঃ ৫৩)
"উহারাই তাহারা, আল্লাহ্ যাহাদিগের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।"(১৬ ঃ ১০৮)
-- অদৃশ্যবস্থাকে উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ছোট শিশুদের মধ্যেও জ্ঞানের সঞ্চার করেছেন। তাই তারা না দেখেও শুধু এক পক্ষের কথা-বার্তা বলার মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছে টেলিফোনের অপর প্রান্তে কথা বলা ব্যক্তিটি কে। ছোটদের জ্ঞানের এতটুকু অগ্রগতি ঘটে থাকলে সমাজের জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর জ্ঞানরাজ্য কি তার চেয়েও নীচে নেমে গেছে যে, চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা পরিবেশ পরিস্থিতির একদিকে যদি দৃশ্যমান এই বাস্তবতা বিরাজ করে, তাহলে অপরদিকে অদৃশ্য পক্ষও যে বাস্তবে আছেন সে কথা তাদের মন-মস্তিষ্কে কেন প্রবেশ করছে না? শিশুদের কচি মনের বোধদয়ওকি জ্ঞানীদের জ্ঞান রাজ্যকে আলোড়িত করবে না?
আল্লাহর দৃষ্টিতে জ্ঞানী তারাই যারা সত্য দর্শনের পর বিমূখ না হয়ে বরং তার স্বীকৃতি প্রকাশ্যে প্রদান করে এবং বাস্তব জীবনে সে স্বীকৃতির প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকে। অন্ধকারের আবর্তে হারিয়ে যায় না।

WELLCOME

'$W^{\pm}$' ও 'Z' নামক মহাসুক্ষ্ম অদৃশ্য কনিকাদের বিশাল কর্মকান্ডের যে চিত্র তারা আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী 'নোবেল' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, সেই অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়পূর্ণ বিষয়গুলোর নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি, শৃংখলা ও ধারাবাহিকতা কি 'একজন কর্তা' ছাড়া এভাবে কোটি, কোটি, কোটি বছর থেকে একইভাবে মহাবিশ্বব্যাপী চলে আসতে পারে? মূল 'কর্তা' অদৃশ্যে বিরাজমান থাকার পরও মহাবিশ্বের সর্বত্র বিছিয়ে থাকা অগনিত স্পষ্ট 'নিদর্শন'সমূহ দর্শন লাভ করার মাধ্যমে সঠিকভাবে কর্তাকে খুঁজে নিতে শিশুদের কচি-কচি বিবেক বুদ্ধি সফল হলেও দুঃখজনকভাবে আমাদের উল্লেখিত জ্ঞানী বন্ধুরা কিন্তু সে ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার-ই নজির স্থাপন করে চলেছেন।

সুতরাং চোখে অঙ্গুলি রেখে দেখানোর মত স্পষ্ট আলোতে এত বিস্ময়কর 'নিদর্শন' সমূহ যখন দর্শন লাভ করেও আমাদের ঐ সকল গুনীজন এর পেছনে সক্রিয় অদৃশ্য 'সত্ত্বা' ও 'কর্তা'-কে অনুধাবন ও সনাক্ত করতে পারছেন না এবং 'যা দেখিনা, তা মানিনা' বলে চিৎকার দিচ্ছেন তখন মূলতঃই যে এ জন্য অতিমাত্রায় বিজ্ঞানপ্রিয় বন্ধুদের নিজস্ব ত্রুটি ও দূর্বলতা এবং সর্বোপরি তাদের দূর্ভাগ্য-ই যে দায়ী তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না বরং নিজ থেকেই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সমাজে একটি প্রবাদ বাক্য চালু আছে 'বিদ্যান ব্যাক্তিকে বুঝানো যায়। কিন্তু অজ্ঞ ও মূর্খ লোককে বুঝানো দায়'। এই প্রবাদটি একশত ভাগ সত্যে পরিণত হোক শেষপ্রান্তে আমাদের এই কামনা-ই থাকলো। আমরা আমাদের অবিশ্বাসী জ্ঞানী সম্মানিত বন্ধুদেরকে, তাদের প্রিয় বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারসমূহের জ্ঞানগর্ভ নিদর্শনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্' (যিনি আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য তাঁকে)কে প্রথমে জ্ঞানের আঙ্গিকে উপলব্ধি করার এবং পরে অবনত শীরে তাঁকে মেনে নেয়ার বাসনা পোষণ করে 'সিরিজ-৩'-এর এখানেই ইতি টানছি। সত্য-সঠিক রাজপথ সবার জন্য উন্মুক্ত হোক, বিনিময়ে মানবতা প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্যে সার্বিকভাবে ধন্য হোক এবং সর্বোপরি মহাবিশ্বের মহাবিজ্ঞানময় একমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহ্'-র মাহাত্ম ও গৌরব গরিমায় মহাবিশ্ব আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

'ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাবিল্লাহ্'

Glossary – (পরিভাষা সংগ্রহ)

Atom (পরমাণু): বস্তুর উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

Asteroid (গ্রহানু): ছোট পাথুরে বস্তু বা শীলাখন্ড যা সূর্যকে কেন্দ্র করে এর চতুর্দিকে আবর্তন করে থাকে। সৌরজগতের ভিতর মঙ্গল এবং বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে লক্ষ-লক্ষ শীলাখন্ড দিয়ে বিরাট বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। তাছাড়া শনিগ্রহের চতুর্দিকেও অনুরূপ পাথুরে-শীলাখন্ডের বেল্ট বর্তমান আছে।

Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান): মহাবিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যত প্রকার বস্তু বর্তমান আছে, এদের বিজ্ঞানভিত্তিক (Scientific) পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-ই (Study) হচ্ছে 'এ্যাস্ট্রোনোমি' (জ্যোতির্বিজ্ঞান)।

Atmosphere (বায়ুমন্ডল): মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ বা উপগ্রহের চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী গ্যাসীয় স্তরকে Atmosphere (বায়ুমন্ডল) বলা হয়।

Aurora (মেরু জ্যোতি): গ্রহের মেরুদ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে সূর্যের প্রবহমান উত্তপ্ত বায়ু (Solar wind)-র দ্বারা উর্ধ্ব আবহ্মন্ডলে আলোর যে বৈচিত্রময় রংয়ের প্রদর্শনী সৃষ্টি হয়, এটাকেই Aurora বা মেরুজ্যোতি বলা হয়। মেরুজ্যোতি সবসময়ই নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।

Big Bang (সৃষ্টিতত্ত্ব): যে মতবাদ কল্পনাতীত এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করে, এটাই 'Big Bang' নামে পরিচিত।

Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র): খুবই পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি নক্ষত্রের একটি অপরটিকে ঘিরে যদি আবর্তন করে এবং পরস্পর পরস্পরের অভিকর্ষ (Gravitation) বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে Binary star বলা হয়। অধিকাংশ নক্ষত্রই Binary পদ্ধতিতে মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছে।

Black hole (নক্ষত্র ধ্বংস-স্থান): মহাকাশে বৃহৎ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বাস্তব অথচ অদৃশ্য এমন স্থান যেখানে অভিকর্ষ বল (Gravitation) অকল্পনীয় টানে (Enormous pull) সকল কিছুকে কেন্দ্রের দিকে টান্তে থাকে। এই টান থেকে সবচেয়ে দ্রুততম 'আলোকরশ্মি' ও আত্মরক্ষা করতে পারে না, ব্ল্যাক হোলের মুখে পড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। Black hole মহাকাশে 'মৃত্যুকুপ-র' ভূমিকায় রত।

Cluster (গুচ্ছ): বহু সংখ্যক নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সীর কাছাকাছি-নিকটে 'গ্রুপ' হয়ে অবস্থান করাকে ক্লাস্টার বলা হয়।

Comet (ধূমকেতু): ধূলা-বালি, শিলাখন্ড ও পাথর কুঁচি এবং বরফের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু খন্ডকে 'ধূমকেতু' বলে। ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে (oval orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Coma (কোমা): ধূমকেতুর বরফাচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সূর্যের কিরণে সৃষ্ট ব্যাপক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জকে 'Coma' বলে।

Constellation (নক্ষত্র পুঞ্জ): খুবই নিকটবর্তী হয়ে অবস্থানগ্রহণকারী একগুচ্ছ তারকা, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে দেখতে কোন জিনিসের একটা আকৃতির মত দেখায়, এটাই নক্ষত্র পুঞ্জ (Constellation) নামে পরিচিত। পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্য জুড়ে সর্বমোট ৮৮টি Constellation নির্দিষ্ট আছে।

Core (মধ্যবর্তী স্থান): নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা Asteroid বা Comet-এর কেন্দ্রীয় অংশকে বলা হয়, যা এর চতুর্দিকের একাধিক স্তরের বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

Corona (কোরোনা): সূর্যের আবহমন্ডলের বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরের (Outermost part) অংশকে 'Corona' বলা হয়।

Cosmic ray (মহাজাগতিক রশ্মি): খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা (Highly energetic particles) যা মহাশূন্যে প্রায় আলোর গতিতে ভ্রমণ করে থাকে। Gamma-ray, X-ray, Ultra violet ray সবই Cosmic ray-র অন্তর্ভুক্ত।

Cosmology (সৃষ্টিতত্ত্ব): মহাবিশ্বের সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসম্পর্কে 'গবেষণাই' হচ্ছে 'Cosmology।

Day (দিন): কোন গ্রহ তার অক্ষের উপর একবার পূর্ণ ঘূর্ণনে (Spin around once) যে সময়ের প্রয়োজন হয়, এর সমষ্টিকে দিন (Day) বলা হয়।

Dwarf Star: আমাদের সূর্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট সূর্যকে Dwarf star বলা হয়।

Eclipse (গ্রহণ): মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় আবর্তন করতে গিয়ে কখনও একটি বস্তুকর্তৃক অপর কোন বস্তু পূর্ণ বা আংশিক ঢেকে যায়, এটাই 'Eclipse'। যেমন চন্দ্র যখন সূর্যের সম্মুখ দিয়ে গমন করে, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় না, ঐ অবস্থাকেই তখন সূর্য গ্রহণ (Eclipse) বলে।

Electron (ইলেকট্রন): সকল পরমাণুর ভিতর নেগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণিকা যা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত পরিভ্রমণ করতে থাকে। সংখ্যায় এরা সবসময় নিউক্লিয়াসের উপাদান প্রোটন কণিকার সমানসংখ্যক হয়ে থাকে। এদের ওজন প্রায় 9.1×10^{-31} kg.

Element (উপাদান): একই রকম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

Escape Velocity (মুক্তি গতি): কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশের আওতাভুক্ত এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে পালিয়ে যেতে সর্বনিম্ন যে গতির প্রয়োজন হয়, তাই Escape velocity। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে পূর্ণরূপে পালিয়ে যাওয়ার সর্বনিম্ন 'মুক্তিগতি' হচ্ছে ১১.২ কিঃমিটার/সেকেন্ড।

Event horizon: ব্ল্যাক হোলের চতুর্দিকে সৃষ্ট 'বাউন্ডারী' (Boundary) যেখানে 'মুক্তি গতি' (Escape velocity) আলোর গতির সমান প্রায়। এই স্থানে কোন বস্তু আসার পর আর তার রক্ষা নেই, বস্তুটি মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে 'ব্ল্যাক হোলে' চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

Gas Giant: তুলনামূলকভাবে ছোট কোর (Core) বিশিষ্ট এবং ঐ কোরকে ভিত্তি করে চতুর্দিকে গ্যাস ও তরল পদার্থ দিয়ে সৃষ্ট গ্রহকে 'গ্যাস জায়ান্ট' বলা হয়।

Light Second (আলোক

Galaxy (নক্ষত্র শহর): নক্ষত্রসমূহ, ধূলা-বালি ও গলিত পদার্থের মেঘপুঞ্জ (নেবুলা), স্টার ক্লাস্টার, গ্লোবুলার ক্লাস্টার ইত্যাদির একত্রে মিলিত এক বিরাট দল বা গ্রুপকেই বলা হয় গ্যালাক্সী। বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছেন।

Giant Star: আমাদের সূর্যের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় সূর্য হচ্ছে 'Giant Star'.

Gravitation (অভিকর্ষ): যে শক্তি (The force of attraction) বস্তুসমূহকে পরস্পরের দিকে টানে, তাই অভিকর্ষ বল বা Gravitation, উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ই সবসময় অভিকর্ষ (Gravitation)বলের টানে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Gamma-ray (গামা-রে): সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বিশিষ্ট হাই এনার্জি রেডিয়েশান (High energy radiation), যা জীব এবং প্রাণীর দেহকোষের সংস্পর্শে আসামাত্র কোষগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ধ্বংসসাধন করে থাকে। সকল প্রকার আলোকরশ্মির মধ্যে Gamma-ray সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও বিপদজনক।

সেকেন্ড): এক সেকেন্ড সময়ে আলোকরশ্মি যতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট সেকেন্ড বলা হয়। এক সেকেন্ডে আলোকরশ্মি প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

Light Minute (আলোক মিনিট): পূর্ণ এক মিনিটে আলোকরশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে. ঐ দূরত্বকে এক লাইট মিনিট বলে।

Light Year (আলোকবর্ষ): আলোক রশ্মি (Ray of light) এক বৎসর সময়ে যতটুকু পথ যেতে পারে, ঐ দূরত্বকে 'এক আলোকবর্ষ' (One light year) বলা হয়। প্রমাণিত হয়েছে এক আলোকবর্ষ সমান দূরত্ব হচ্ছে ১০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার (৬ ট্রিলিয়ন মাইল)।

Magnitude: মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের 'উজ্জলতা'কে বলা হয়।

Moon (চাঁদ): ধূলা-বালি. শিলাপ্রস্তর দিয়ে তৈরী প্রায় দুই হাজার মাইল ব্যাস সম্পন্ন বিরাট বল, যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Meteor (উল্কা)ঃ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাথরকণা বা কুচি যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করা মাত্র বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আলোর ফুলকি সৃষ্টি করে যা, Shooting Star হিসাবেও পরিচিত।

Meteorite (ভূপাতিত উল্কা)ঃ যে সকল উল্কা বায়ুমন্ডলে পুড়ে-পুড়ে পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত সে আঘাত করে। এদেরকে Meteorite বলা হয়।

Meteorid ঃ

যে সমস্ত উল্কা আকারে একটু বড় এবং সূর্যকে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, এদেরকেই বলা হয় Meteoroid ।

Meteor shower ঃ

পৃথিবী যখন কোন ধুমকেতুর কক্ষপথ ছেদ করে পরিভ্রমণ করে তখন ঐ ধূমকেতু থেকে নির্গত ব্যাপক Meteor (উল্কা) পৃথিবীর আবহমন্ডলে প্রবেশ করে (স্বল্প সময়ের জন্য) বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে পুড়ে বিরাট এলাকা নিয়ে একই সাথে যে ব্যাপক আলোর ফুলঝুরি প্রদর্শনীর সৃষ্টি করে, ওটাই Meteor shower।

Matter : বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দিয়ে মহাবিশ্বের সকল বস্তু অস্তিত্ব ধারণ করেছে।

Molecule (অনুঃ)ঃ রাসায়ণিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক পরমাণু মিলিত হয়ে 'অণু' গঠিত হয়। অনুকেই সাধারণত পদার্থের মৌলিক এক হিসেবে ধরা হয়।

Milky Way Galaxy : আমাদের এই সৌরজগত যে গ্যালাক্সীর অন্তর্গত, তাকেই Milky way galaxy বলা হয়। গ্যালাক্সীটির মাঝখানে অত্যাধিক বিকিরণের কারণে দুধের মত সাদা ধবধবে পথের ন্যায় চিহ্ন থাকায় ঐ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

NASA (নাসা)ঃ The National Aeronautics and Space Administration যা আমেরিকান সরকারের নির্দেশে মহাকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের পিছনে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

Nebula (নেবুলা) ঃ ধূলা-বালি এবং গ্যাসের সমন্বয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি নামে না, কিন্তু জন্ম নেয় শত-সহস্র নক্ষত্র। অর্থাৎ, নক্ষত্র সৃষ্টির কাঁচামাল হচ্ছে নেবুলা।

Neutron (নিউট্রন)ঃ বস্তুর ক্ষুদ্রতম Unit- 'এ্যাট্মিক নিউক্লি'-র ভিতর এক প্রকার ক্ষুদ্র কণিকা (Sub atomic particle) যা নিরপেক্ষ, চার্জবিহীন (Zero electric charge) এবং ওদের ওজন হচ্ছে প্রায় 1.67 x 10^{-27}kg.। পরমাণুর ভিতর প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' তৈরী করে।

Neutron Star (নিউট্রন ষ্টার)ঃ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র (Supergiant Star) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধ্বংসাবশেষে ছোট আকারের যে প্রচন্ডগতিতে আবর্তনশীল অংশটি (Small spinning part) থেকে যায়, তাকেই 'নিউট্রন স্টার' বলা হয়। এটা 'নিউট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

Nova (নোভা)ঃ যে সকল নক্ষত্র হঠাৎ করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকহারে উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়ে চিরতরে ম্লান হয়ে যায়, ঐ নক্ষত্রগুলোকে নোভা বলা হয়।

Nucleus : জ্যোতিশাস্ত্রে গ্যালাক্সীর মধ্যস্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট অংশকে 'nucleus' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ধূমকেতুর সম্মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকেও Nucleus হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

Nuclear Fusion: যে পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ভিতর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্যাসীয় কণা (Atoms) পরস্পর মিলিত হয়ে বড় বড় ভারী বস্তুকণা সৃষ্টি করে, ঐ পদ্ধতিকেই 'Nuclear Fusion' বলা হয়। উক্ত পদ্ধতি সংঘটিত হওয়ার সময় ব্যাপক-বিশাল পরিমাণে তেজস্ক্রীয়তা (Radiation) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

Orbit (কক্ষপথ)ঃ মহাশূন্যের মাঝে কোন একটি বস্তু যে কাল্পনিক পথের ওপর দিয়ে পরিভ্রমণরত অবস্থায় আরেকটি বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে ঐ পথটিকেই 'Orbit' বা কক্ষপথ বলে। যেমন পৃথিবী তার কক্ষপথের ওপর দিয়ে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে।

Planet (গ্রহ)ঃ নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত অপেক্ষা-কৃতভাবে বড় বস্তুকে গ্রহ বলা হয়। নক্ষত্রের মত এদর ভিতরে তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয় না। আমাদের সৌরপরিবারে এ পর্যন্ত ৯টি গ্রহ আবিস্কৃত হয়েছে।

Pulsar (পালছার)ঃ নিউট্রন স্টার থেকে নির্গত আলোকরশ্মি (Radiation) যা নক্ষত্রের অক্ষের চতুর্দিকে প্রচন্ড গতিতে আবর্তিত হয়ে থাকে।

Planetary nebulae: ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের বাইরের দিকের স্তরের নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত গ্যাসপুঞ্জ যা মহাশূন্যে মেঘের ন্যায় ছড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে।

Prominence: সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, যা কখনও লম্বায় প্রায় চার লক্ষ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আট হাজার মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Protostar: একটি পূর্ণ নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পথে 'প্রাথমিক একটা পর্যায়', যে পর্যায়ে তখনও ঐ নক্ষত্রের কেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার ফিউশান' শুরু হয়ে পারমাণবিক চুল্লী চালু হয়নি।

Proton (প্রোটন)ঃ পরমাণুর অভ্যন্তরে পজেটিভ চার্জযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা, যা নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সাথে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। এর ওজন হচ্ছে 1.67×10^{-27} kg।

Photon (ফোটন)ঃ আলোর ক্ষুদ্রতম কণিকাই হচ্ছে 'ফোটন'। মহাশূন্যে এর চলার গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল।

Parsec (পারসেক)ঃ ৩.২৬ আলোকবর্ষ সমান এক 'Parsec'। মহাশূন্যে ব্যাপক-বিশাল দূরত্বের হিসাবকে সংক্ষিপ্ত করে সহজ করার নিমিত্তে 'পারসেক' হিসাবের অবতারণা করা হয়েছে।

Quasar (কোয়াসার)ঃ টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত সীমানার প্রায় প্রান্তে আবিস্কৃত খুবই উজ্জ্বল মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক, যা দেখতে একটি নক্ষত্রের মত কিন্তু এটা উজ্জ্বলতা ছড়ায় ১০,০০০ মিলিয়ন গড় গ্যালাক্সীর তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং আলো ছড়ায় প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সীর আলোর সমান।

Radiation (তেজস্ক্রিয়তা)ঃ কোন বস্তু থেকে নির্গত তাপ যা শক্তি হিসেবে ঢেউয়ের (Wave) মত চলার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে।

Red Giant (লাল বামন)ঃ আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় নক্ষত্রের ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত, যখন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে গিয়ে আয়তনে বহুগুণে বেড়ে যায়।

Satellite (উপগ্রহ)ঃ মহাশূন্যে কোন গ্রহকে অপর কোন বস্তু কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকলে ঐ আবর্তনকারী বস্তুটিকে উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। মানুষের তৈরী উপগ্রহ ও (Satellite) পৃথিবীকে, চাঁদকে আবর্তন করছে, তবে শর্ত হচ্ছে উপগ্রহের আবর্তনগতি আবর্তনকৃত বস্তুর কমপক্ষে 'মুক্তিগতির' সমান হতে হবে।

Solar System (সৌর জগত)ঃ একটি নক্ষত্রকে ঘিরে যে কয়টি গ্রহ উপগ্রহ, ধুমকেতু ও গ্রহানু চতুর্দিকে আবর্তন করে এবং নক্ষত্রের অভিকর্ষবলের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে, নক্ষত্রসহ ঐ গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহানুগুলোকে একত্রে সৌরজগত বলা হয়ে থাকে।

এক কথায় নক্ষত্রের চারদিকে কক্ষপথে আবর্তনশীল সকল বস্তুকে একত্রে সৌরজগত নামে অভিহিত করা হয়।

Solar wind : সূর্যের পৃষ্ঠদেশ (Surface) থেকে মহাশূন্যে (Invisible particles) অদৃশ্য ক্ষুদ্রবস্তুকণার অনবরত যে আলোক ধারা (Stream) প্রবাহিত হতে থাকে, এটাই Solar wind।

Space Craft: মহাশূন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানকার্যে পরিভ্রমণ করার জন্য যা তৈরী করা হয়।

Space probe: মনুষ্যবিহীন আকাশযান, এর কাজ হচ্ছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কসমূহের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরক্ষণে তা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীগণের নিকট প্রেরণ করা।

Space Shuttle: যে আকাশ যানের (Space craft) মাধ্যমে নভোচারী এবং প্রয়োজনীয় মালামাল মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়, তাকে Space shuttle বলে। একে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপন করা হয় কিন্তু অবতরণ করে বিমানের মত। Space shuttle বার বার ব্যবহার করা হয়।

Space Station: এটা বড় ধরনের মনুষ্যবাহী উপগ্রহ বা Satellite মহাশূন্যের মধ্যে, মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকার্য চালাবার জন্য একে ভাসমান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Universe (মহাবিশ্ব)ঃ মহাশূন্যে বিরাজমান সকল প্রকার

Sun (সূর্য): একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র, যা আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং এর অভ্যন্তরে 'ফিউশান' পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন তাপ ও আলো ছড়িয়ে গোটা সৌরজগতকে ভাসিয়ে রাখছে।

Supergiant star: খুবই উজ্জ্বলতা সম্পন্ন বৃহৎ নক্ষত্র। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েক মিলিয়ন বৎসর। নক্ষত্র যত বড় হবে তার আয়ুষ্কাল তত কম হবে।

Supernova (সুপার নোভা): বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের (supergiant star) ধ্বংসজনক 'মহা বিস্ফোরণ'-ই হচ্ছে 'সুপার নোভা', যা কল্পনাতীত আলো এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই সুপার নোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাক হোল'।

Star (নক্ষত্র): অবিরত বিস্ফোরণশীল গ্যাসীয় বল যার ভিতর থেকে উৎপন্ন হয় আলো এবং তাপ (Light and Heat)। আমাদের সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র।

মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যে আয়তনের জায়গায় বিস্তৃত হয়ে আছে, ঐ স্থান এবং বস্তুসমূহ সহ পুরোটাকেই মহাবিশ্ব বলা হয়।

X-ray (এক্স-রে): খুবই সংক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ (wave length) বিশিষ্ট 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশান', যা জীব এবং প্রাণী দেহের জন্য খুবই বিপদজনক আলোক রশ্মি।

Year (বৎসর): একটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার আবর্তন করে আসতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়ের দৈর্ঘকেই 'বৎসর' বলা হয়। পৃথিবী ৩৬৫ দিন, ৬ঘন্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে, যা গণনায় এক বৎসর ধরা হয়।

Zone of avoidance: আমাদের গ্যালাক্সী কর্তৃক চারপাশ থেকে Interstaller gas এবং dust শোষন করে নেয়ায় এর একই Plane-এ আকাশের যে এলাকা গ্যালাক্সী সৃষ্টি হতে না পেরে শূন্যস্থানে পরিণত হয়েছে ঐ শূন্য এলাকাকে Zone of avoidance বলা হয়।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ ইং
2. The Holy Quran – Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Saudi Arabia.
3. The Translation of The Holy Quran in Simple English – SMH, QADRI.
4. তাফহীমুল কুরআন - সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
5. Guide to Space – Peter Bond – 1999
6. Night Sky – Discovery Channel – 1999
7. A Photographic Tour of the Universe – Garbiele Vanin – 1996
8. The Search for Infinity – Gordon Farser, Egil Lillestor & Inge sellevag – 1999.
9. The Universe Revealed – Pam Spence – 1996.
10. Astronomy From the Earth to the Universe – Pasa Choff – 1995.
11. Stars & Planets – Ian Ridpath – 1997.
12. Astronomy & Space – Lisa Miles and Alastair Smith – 1999.
13. Astronomy Dictionary – Philip's – 1999.
14. Inventions – G.I. Brown – 1996.
15. Man in Space – Eugene A. Cernan – 1999.
16. The Changing Universe, Big Bang and After – Trinh Xuan Thuan – 1993.
17. Astronomy & Astrophysics – Zeilik, Gregory – 1998.
18. Space Atlas – Robin Kerrod – 1996.
19. Embracing Earth – Payson R. Stevens and Kevin W. Kelly – 1992.
20. The Universe Explained – Colin Ronan – 1994.

21. The Visual Dictionary of the Universe – Eyewitness Visual Dictionaries – 1994.
22. How the Universe Works – Eyewitness Science Guides -- 1994.
23. Inventors and Discoverers – Changing Our World – 1888.
24. LIFE – Eyewitness Science – 1996.
25. ECOLOGY – Eyewitness Science – 1995.
26. Guinness Book of Knowledge – 1997.
27. Force & Motion – The Science Museum, London – 1993
28. MATTER – The Science Museum – 1992.
29. Time & Space – Eyewitness Science – 1994.
30. Astronomy – Eyewitness Science – 1995.
31. Atlas of the Universe – Patrick Moore – 1999.
32. Quran for Astronomy and Earth Exploration from Space – S. Waqar Ahmed Hussini – 1996.
33. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ কাজী জাহান মিয়া
34. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২ কাজী জাহান মিয়া
35. বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান - ডঃ মরিস বুকাইলি - ১৯৮৬
36. মহাকাশের হাজারো জিজ্ঞাসা - সুধাংশু পাত্র - ১৯৮৫
37. চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব - অনুবাদকঃ সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান - ১৯৯৫
38. The Universe Seen Through The Quran – Mir Anees-ud-din – 1999.
39. Great Scientific Discoveries – Chambers Compact Reference – Gerald Messadie – 1992.
40. Astronomy Magazine (U.S.A.), from July – 1998 to June 2000.
41. Astronomy Magazine (England), from July 1998 to June – 2000.

- বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের হীরণময় কিরণে উদ্ভাসিত এই বিশ্বে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে 'রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স' তার যাত্রা শুরু করেছে। আর সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'র‍্যাকস্ পাবলিকেশন্স' একযোগে প্রকাশ করেছে 'আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স', সিরিজ-১ থেকে সিরিজ-৫ পর্যন্ত মোট পাঁচটি খণ্ড, আলহামদুল্লিাহ।

  - সিরিজ- ১ : কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ
  - সিরিজ- ২ : কুরআন, কিয়ামত ও পরকাল
  - সিরিজ- ৩ : কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব
  - সিরিজ- ৪ : কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস
  - সিরিজ- ৫ : কুরআন, কোয়াসার ও শিংগায় ফুৎকার

- ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তী আরও ৫টি খণ্ড (সিরিজ- ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০) খুব সহসাই প্রকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত সিরিজের বইগুলো আপনার সমগ্র জীবনে জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি উত্তম সংগ্রহ হিসেবে অবদান রাখতে পারে। তাই সিরিজের পরবর্তী বইগুলোও সংগ্রহ করুন।

  নিজে বইগুলো পড়ুন এবং অপরকে পড়তে উৎসাহিত করুন।